জয়ঢাক

বর্ষা ২০১৫ ,পঞ্চদশ বর্ষ , ৫৩তম সংখ্যা ,৩০তম ইন্টারনেট সংখ্যা

প্রচ্ছদঃ পিয়ালী ব্যানার্জি

সূচিপত্র–জয়ঢাক–বর্ষা ২০১৫

কমিকস	কমিকস	কমিকস	কমিকস
দাঁড়া দেখাচ্ছি– কুর্লিয়ানস্কি এবং হাইত	টোটা আর টিটো– হ্যারল্ড নের। অনুবাদ তাপস মৌলিক	টোটা আর টিটো উর্ফ কাজেনজ্যামার কিডস –একটি রোমাঞ্চকর ইতিহাস– তাপস মৌলিক	পাপ্পি আর গাপ্পি– নচিকেতা মাহাত
চিঠিপত্র	**গল্প প্রতিযোগিতার পুরস্কৃত গল্প**	**গল্প প্রতিযোগিতার পুরস্কৃত গল্প**	**গল্প প্রতিযোগিতার পুরস্কৃত গল্প**
বিজ্ঞানবিভাগ নিয়ে কিছু কথা– কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়	রাপ্পা ও একটি তারা–অষ্টম– মৌমিতা	সলিউশান এক্স–নবম– দোয়েল বন্দ্যোপাধ্যায়	হারানো সুর পথের বাঁকে–দশম– রাখী নাথ কর্মকার
গল্প	**গল্প**	**গল্প**	**গল্প**
বুধু পাড়ুই– শিবশংকর ভট্টাচার্য	অন্ধকারে ভুবনডাঙার মাঠ– শিশির বিশ্বাস	বিমর্ষবর্ধনের রথযাত্রা– তাপস মৌলিক	নটি বয়– কিশোর ঘোষাল
রামতনু বাবু আর তাঁর গান– সৌভিক ব্যানার্জী	তপুর ইশকুল– তরুণ সরখেল	কুয়াশার ডাক– পুষ্পেন মণ্ডল	বাঁধাকপির তরকারি– রাজীবকুমার সাহা
ভ্রমণ	**ভ্রমণ**	**ভ্রমণ**	**ভূতের আড্ডা**
পাহাড়ি গ্রামের গপ্পো– মার্তোলি– ইন্দ্রনাথ	অতীত ভ্রমণের অন্তরালে– রাখী নাথ কর্মকার	বেড়ানোর ছড়া–পাটেরগাঁও– শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়	ভূতের গল্প–খুলির আর্তনাদ– ইন্দ্রশেখর
ভূতের আড্ডা	ভূতের আড্ডা	ভাষা শেখবার আসর	ভাষা শেখবার আসর
ভূতের বাড়ি–টেরা ভেরা– দেবজ্যোতি	দেশবিদেশের ভূতেরা–– সংহিতা	বোম ফেলেছে জাপানি– দোয়েল বন্দ্যোপাধ্যায়	ইতালির ইলিবিলি– অদিতি সরকার
বিদেশী গল্প	বিদেশী গল্প	বিদেশী গল্প	
একটি ভদ্রতার প্রশ্ন– রবার্ট ব্লচ অনুবাদ অমিত দেবনাথ	রাশিয়ান–সাদকো ও সমুদ্র সম্রাট– অনুবাদঃ দেবজ্যোতি	ইয়েডোর ওটোকোডেটের গল্প চতুর্থ পর্ব– সংহিতা	
বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	বৈজ্ঞানিকের দপ্তর
অংকের বিচিত্র জগত– বৈজ্ঞানিক	মাথে মে ট্রিকস– অঙ্করঙ্গ– সূর্যনাথ ভট্টাচার্য	গল্পে বিজ্ঞান–ঠান্ডা করার সহজ উপায়– রবি সোম	মহাবিশ্বে মহাকাশে–গ্রহে গ্রহে নানা বিস্ময়– কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়
টেকনো টুকটাক–পথের শেষ কোথায়– কিশোর ঘোষাল	ভারতের বৈজ্ঞানিক–আন্না মণি– সংহিতা	লক্ষ করি পক্ষীকে–প্যাঁচা কয় প্যাঁচানি, খাসা তোর চ্যাঁচানি– মনস্বিনী ঘোষাল	বিচিত্র জীবজগত– লাউডগা– পল্লব চট্টোপাধ্যায়
কেম্যাজিক– পান্নালাল গোস্বামী	রসায়নের ছড়া– অমিতাভ প্রামাণিক	প্রতিবেশী গাছ সুপারি– অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়	
বনের ডায়েরি	বনের ডায়েরি	বনের ডায়েরি	বিজ্ঞাপন
ভারতের মানুষ ও না মানুষদের গল্প –বিস্ট অ্যান্ড মেন ইন ইন্ডিয়ার বঙ্গানুবাদ– পিয়ালী চক্রবর্তী মূল লেখা জন লকউড কিপলিং)	ভালু– স্বপ্না লাহিড়ী	ভারতের বনাঞ্চল– সংহিতা	জয়ঢাকি বিজ্ঞাপন–তাপস মৌলিক ও ইন্দ্রশেখর

ছড়ার পাতা	ছড়ার পাতা	ছড়ার পাতা	ছড়ার পাতা
ছুতোর আর সিন্ধুঘোটক– মূল লুই ক্যারল অনুবাদ আবু হোসেন	শব্দের খাঁজে– অচিন্ত্য সুরাল	জোড়া ছড়া– প্রকল্প ভট্টাচার্য	ভূতের ছড়া– তরুণ সরখেল
বাঘুমকে চিঠি– রতনতনু ঘাটী			
ধাঁধা মজা রহস্য	ধাঁধা মজা রহস্য	ধাঁধা মজা রহস্য	ধাঁধা মজা রহস্য
ধাঁধা– ইন্দ্রশেখর	কুইজ ও মগজ ধোলাই– ইন্দ্রশেখর ও রণিত পাল	জানো কি– ইন্দ্রশেখর	ডুড়ল– ইন্দ্রশেখর
কীসের ফটো– ইন্দ্রশেখর	আশ্চর্য উলকি– ইন্দ্রশেখর	অবিশ্বাস্য– ইন্দ্রশেখর	গত সংখ্যার উত্তর– ইন্দ্রশেখর
ধারাবাহিক উপন্যাস	ধারাবাহিক উপন্যাস	ধারাবাহিক উপন্যাস	
অন্তিম অভিযান– পিটার বিশ্বাস	পঙ্খা নামে ভালুকটি– চিত্ত ঘোষাল	অলোকপর্ণার বিড়াল– রোহণ কুদ্দুস	
কাতুকুতু	লিখিব খেলিব আঁকিব সুখে	লিখিব খেলিব আঁকিব সুখে	
রেলভ্রমণ ইত্যাদি– রসিকলাল দাস	নুনদানী– ঋত্বিক	তানের ছবি– তান	
পুরাণ কথা	জাতক কথা	পুরাতনী	স্মরণীয় যাঁরা
নচিকেতা ও সত্য দ্বিতীয় পর্ব– সংহিতা	ছোট্টো চড়াই আর বাজপাখি– নন্দিনী চট্টোপাধ্যায়	ইল রাজার উপাখ্যান– কুলদারঞ্জন রায়	মাসুদুর রহমান বৈদ্য– উমা ভট্টাচার্য
টাইম মেশিন	টাইম মেশিন	টাইম মেশিন	বিশ্বের জানালা
ভারতভ্রমণ– দীন মহম্মদ –অনুবাদ শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়	সীমান্তের অন্তরালে– সমরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী	ঠগির আত্মকথা– অলবিরুণী	তুর্কমেনিস্তান– উমা ভট্টাচার্য
বই পড়া	বই পড়া	বই পড়া	লোককথা
নতুন বই-শোভনলালের গল্প– তাপস মৌলিক	পুরোনো বই-কালোর বই– পিয়ালি ব্যানার্জি	বইবাতিক-দীপক গোস্বামী	শুকতারার গল্প– মহাশ্বেতা
আমার শহর	সেই মেয়েরা	দেশ ও মানুষ	সিনেমা হল
ফেলে আসা কলকাতা– সুজয় রায়	কমলা সোহনি– উমা ভট্টাচার্য	না ছোড়নু– উমা ভট্টাচার্য	সেল্কিদের গান– মহাশ্বেতা
খেলার পাতা	খেলার পাতা	এসো গান শুনি	ক্যামেরার পেছনে
এভারেস্ট– এরিক শিপটন অনুবাদ বাসব চট্টোপাধ্যায়	অন্নপূর্ণা– মরিস হারজগ অনুবাদ তাপস মৌলিক	সুরঢাক– প্রদীপ মুখার্জি	ওয়ান টু থ্রি ক্লিক– শম্পা গুহমজুমদার

জয়ঢাকি বোল

ঝোড়ো দিনে জল ঝরঝর মেঘ ঘরঘর রবে
ভরে গেছে আকাশটা আজ বৃষ্টি বুঝি হবে
মেঘের ওই রঙ পালটায় দিক পালটায় হাওয়া
হবে কি হবে না রে খেলতে মাঠে যাওয়া?
মাঠে তুই যাস যদি আজ খুলে ঘরের দোর
দাঁড়িয়ে থাকে দুয়ার ধরে মা বুঝি ওই তোর
আকাশে চোখ তুলে
সেই কথাটা খেয়াল রাখিস যাস না যেন ভুলে
হাওয়াতে লাগল মাতন উঠছে ঘুরে উঠছে ঘুরে
চেয়ে দেখা নাড়ছে মাথা
গাছগুলো ঐ কেমন দূরে
হঠাৎই ঘূর্ণিচালে বাতাস চলে বেড়ে
শুকনো পাতা পাক খেয়ে ধায় মাটির মায়া ছেড়ে
ইচ্ছে করছে আমার আমি অমন করে নাচি
হাওয়ায় শরীর ভাসিয়ে দিয়ে ওদের মতন বাঁচি

এসে গেল বর্ষাকালের দিন। বৃষ্টি ভিজতে বেজায় মজা। বেশি ভিজলে আরো মজা, জ্বর হয়ে ইশকুল বন্ধ। তবে ওতে একটু মুশকিল আছে, মা রেগে যাবে। কাজেই সে চেষ্টা না করাই ভালো। ভালো করে বৃশটি দেখো, একটু আধটু গায়েও মেখো।

ভালোবাসায়, তোমাদের জয়ঢাকি দাদাদিদিরা

এবারের বোল লিখেছেন তোমাদের গৌরীদিদি আর সঙ্গে রং পেনসিলে সঙ্ঘমিত্রাদিদি

কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইস প্রেসিডেন্ট , বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

আজীবন সদস্য, এশিয়াটিক সোসাইটি

আজীবন সদস্য, সাহিত্য পরিষদ

আকাশবাণী

প্রতি,
সম্পাদক
জয়ঢাক

মান্যবরেষু

অবশেষে তিন মাসের প্রতীক্ষার শেষ। ১৫ মার্চ ২০১৫, ভোর পাঁচটা। সুইচ অন করে বসে পড়লাম কম্পিউটারের সামনে। সার্চ 'জয়ঢাক'। নতুন সাজে স্ক্রিনের পর্দায় ভেসে উঠল পত্রিকাটি। দিনটি (রবিবার) আমার শুরু হয়েছিল এই ভাবেই।

ভালবাসা ও নিষ্ঠা না থাকলে এমন একটি সুন্দর পত্রিকা উপহার দেওয়া সম্ভব নয়। তাই সম্পাদক এবং সম্পাদকমণ্ডলীর সকল সদস্যকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন। আমার মতো একজন অখ্যাত লেখকের লেখা নিবন্ধটি (মহাকাশে আমরা কোথায়) প্রকাশ করার জন্য আমি সকলের কাছে কৃতজ্ঞ।

অনেকদিন ধরেই একটা কথা বলবো বলে ভাবছিলাম। আমাদের যা কিছু যোগাযোগ তা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে। সামনাসামনি আলাপের সুযোগ এখনও হয়ে ওঠে নি। যদিও আপনাদের সঙ্গে আমার পরিচয় মাত্র তিন- চার মাসের। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদে প্রতি মাসের একটি নির্দিষ্ট দিনে লেখক- পাঠক আড্ডা বসে। সেই আড্ডায় যে কেউ যোগ দিতে পারেন। এই ধরনের আড্ডা বা নিজেদের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ কি আপনাদের হয়?

পুরো পত্রিকাটি এখনও পড়া হয় নি। তবে যে কটা গল্প ও প্রবন্ধ পড়েছি সে সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলছি। সূচীপত্রে আমার প্রবন্ধটির শিরোনাম লেখা হয়েছে, 'মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাশে আমরা কোথায়'। আমার মনে হয় 'মহাবিশ্বে মহাকাশেঃ মহাকাশে আমরা কোথায়'। এই ভাবে লিখলে বোধ হয় ভালো হত। ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি। কারণ নিবন্ধটির প্রকৃত শিরোনাম 'মহাকাশে আমরা কোথায়'।

অঙ্কের বিচিত্র জগৎ বিভাগে প্রাচীন ভারতের একজন গণিতবিদকে নিয়ে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। লেখক— বৈজ্ঞানিক। সম্ভবত ছদ্মনাম। আমার ভুলও হতে পারে। তার জন্য আগাম মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি। গণিতবিদের নাম লেখা হয়েছে 'আর্যভট্ট'। হওয়া উচিত 'আর্যভট'। পরিতাপের বিষয় অনেক পত্র- পত্রিকায় এবং বইয়ে 'আর্যভট্ট' এই ভুল নামটিই দেখা যায়। এই ভুলের পিছনে দুটি কারণ থাকতে পারেঃ (১) নামের সঙ্গে 'ভট্ট' যুক্ত অনেক নাম পাওয়া যায়। যেমন, ব্রহ্মবিদ্যাবিদ, সিদ্ধান্ত- তন্ত্র গণিত- ফলসজ্ঞিতার সুপণ্ডিত কুমারিল

ভট্ট, স্মৃতি চণ্ডিকা গ্রন্থের লেখক দেবলভট্ট, সুবিখ্যাত যদুভট্ট প্রভৃতি। (২) 'ভট্ট'- এর সঙ্গে আমরা অধিক সরগর। তাই 'ভট' উচ্চারণে অস্বস্তি হয়। যা হোক, উল্লিখিত গণিতবিদের নাম 'আর্যভট্ট' না হয়ে 'আর্যভট' কেন হবে তার কারণটি ডঃ নীহার রঞ্জন রায়ের 'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করলামঃ "ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেই ভট্ট ব্রাহ্মণ নামে আর এক নিম্ন বা 'পতিত' শ্রেণীর ব্রাহ্মণের খবর পাওয়া যাইতেছে; সূত পিতা এবং বৈশ্য মাতার সন্তানরাই ভট্ট ব্রাহ্মণ এবং অন্য লোকদের যশোগান করাই ইহাদের উপজীবিকা। ইহারা নিঃসন্দেহে বর্তমান কালের ভাট ব্রাহ্মণ।"
এই প্রসঙ্গে গণিতপাদের প্রথম শ্লোকটি নীচে উল্লেখ করলাম—

"ব্রহ্মকুশশিবুধভৃগুরবিকুজগুরুকোণ ভগণান্ নমস্কৃত্য
আর্যভটস্ত্বিহ নিগদতি কুসুমপুরেহভ্যচিতং জ্ঞানম্ ।।"

প্রাচীন ভারতীয় গণিতের ইতিহাসে আমরা তিনজন 'আর্যভট' নামে গণিতবিদকে পাই। প্রথম আর্যভটের জন্ম ৪৭৬ খ্রিস্টাব্দে। এটা ছিল গুপ্তযুগের শেষের দিক। কুসুমপুরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা তিনি তাঁর নিজের গ্রন্থে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে গেছেন। তাই তাঁকে অনেক সময় কুসুমপুরের আর্যভট বলা হয়ে থাকে। দ্বিতীয় আর্যভটের জন্ম আনুমানিক ৯৫০ খ্রিস্টাব্দে (বিতর্ক আছে)। প্রথম আর্যভটের আগে আরও একজন আর্যভট ভারতের মাটিতে জন্মেছিলেন। ইনি 'বৃদ্ধ আর্যভট' নামে পরিচিত। তবে এঁর সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তাই প্রবন্ধে উল্লিখিত গণিতবিদকে প্রথম আর্যভট বা কুসুমপুরের আর্যভট নামে উল্লেখ করাই কাম্য।

শুভেচ্ছান্তে,

কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদকের দফতর থেকেঃ

অনেক ধন্যবাদ আপনাকে স্যার। "মহাবিশ্বে মহাকাশে" সংক্রান্ত গত সংখ্যার ত্রুটিটি ঠিক করে দেয়া হয়েছে। এই সংখ্যা থেকে "অঙ্কের বিচিত্র জগত" এ আর্যভটের নাম সংক্রান্ত ত্রুটিও সংশোধন করে দেয়া হল। চিঠিটা আমরা একটি তথ্যের উৎস হিসেবেই প্রকাশ করলাম আমাদের পাঠকদের কাজে লাগবে এই আশায়। আপনাদের মত মানুষদের কাছ থেকে না চাইতেই এত সাহায্য পাওয়া জয়ঢাকের কমবয়েসি পাঠকদের কাছে সৌভাগ্যের ব্যাপার বলে মনে করি। আমাদের তরফ থেকে কৃতজ্ঞতা জানবেন। আড্ডার ব্যাপারে বলি, জয়ঢাকের যে দলবল পত্রিকা তৈরিতে অংশ নেন তাঁদের অধিকাংশই ছড়িয়ে রয়েছেন ভারত ও বিশ্বের নানান এলাকায়। কাজ এবং আড্ডা দুটোই তাই হয় যন্ত্রপথেই বেশি। তবে বছরে দুবার, যখন প্রবাসীরা ঘরে ফেরেন, সেই পুজো আর বইমেলার সময় আমরা দুবার একত্র হই মহা আড্ডায়। একটি হয় আমার বাড়িতে (পুজোর আগে) আর অন্যটি বইমেলা প্রাঙ্গনে জয়ঢাকের বিভিন্ন হার্ড কপি প্রকাশনার উদ্বোধনকে উপলক্ষ করে। সেই দুই আড্ডায় আপনাকে স্বাগত জানাই।

বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞাপন

এই অমাবস্যায়–সবচেয়ে সাহসী ভূতেরও দিনদুপুরে গা ছমছম

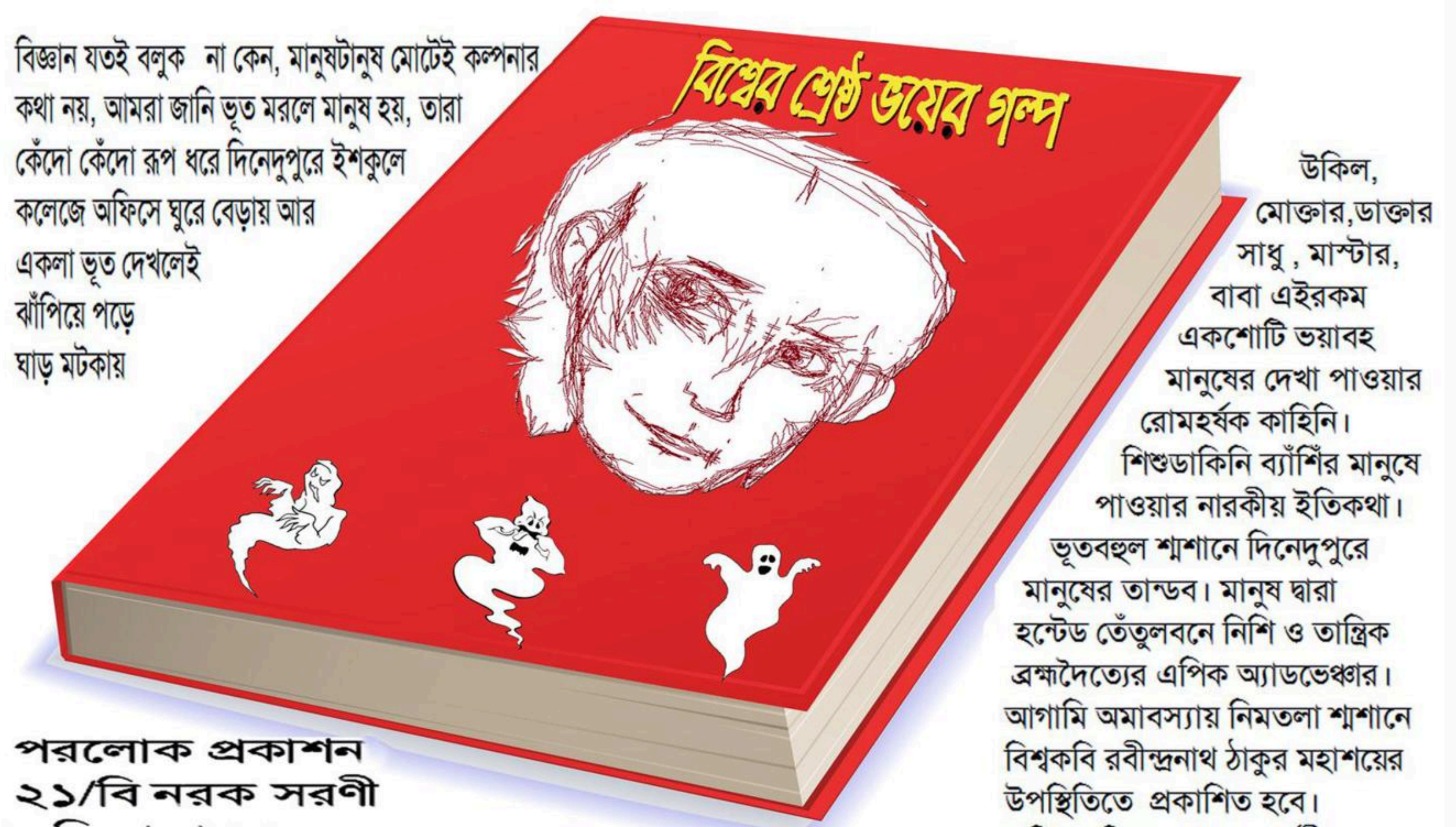

দাঁড়া,
দেখাচ্ছি!
তোমাদের মনে আছে তো, টেলিভিশন স্টুডিওতে
খরগোসকে ধরার প্রথম চেষ্টায় বিফল হয় নেকড়ে।
বড়ো বেশি মণ্ডপ আর দরজার ছড়াছড়ি সেখানে,
আর তার পেছনে কী যে আছে কে জানে। কার্টুন ফিল্মের
চিত্র-নাট্যকার আ. কুর্লিয়ান্দ্স্কি আর আ. হাইত, পরিচালক ভ. কতেনোচকিন
এবং শিল্পী-প্রযোজক স. রুসাকোভ ব্যাপারটা ওইভাবেই সাজিয়েছিলেন।
এবার স্টুডিওর লম্বা করিডোরের প্রতিটি মোড়েই
আমাদের নায়কদের নতুন নতুন অ্যাডভেঞ্চার।

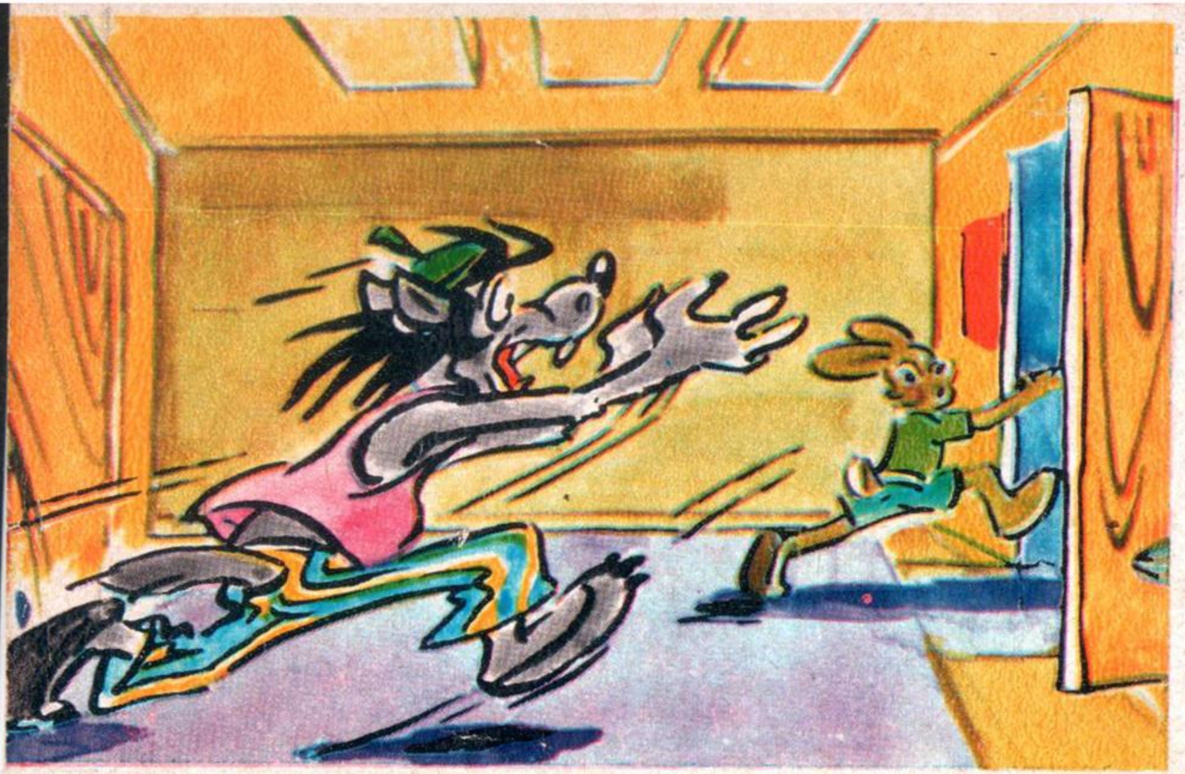

(১) সামনের খোলা দরজার দিকে ছুটল খরগোস, স্বভাবতই নেকড়েও তার পেছু পেছু।

(২) এখানে তখন মহলা চলছিল। তবে ঠিক সেই মুহূর্তেই বাজনদার ছিল না সেখানে। খরগোসও অমনি লাফ দিয়ে বসে পেটাতে লাগল ড্রাম।

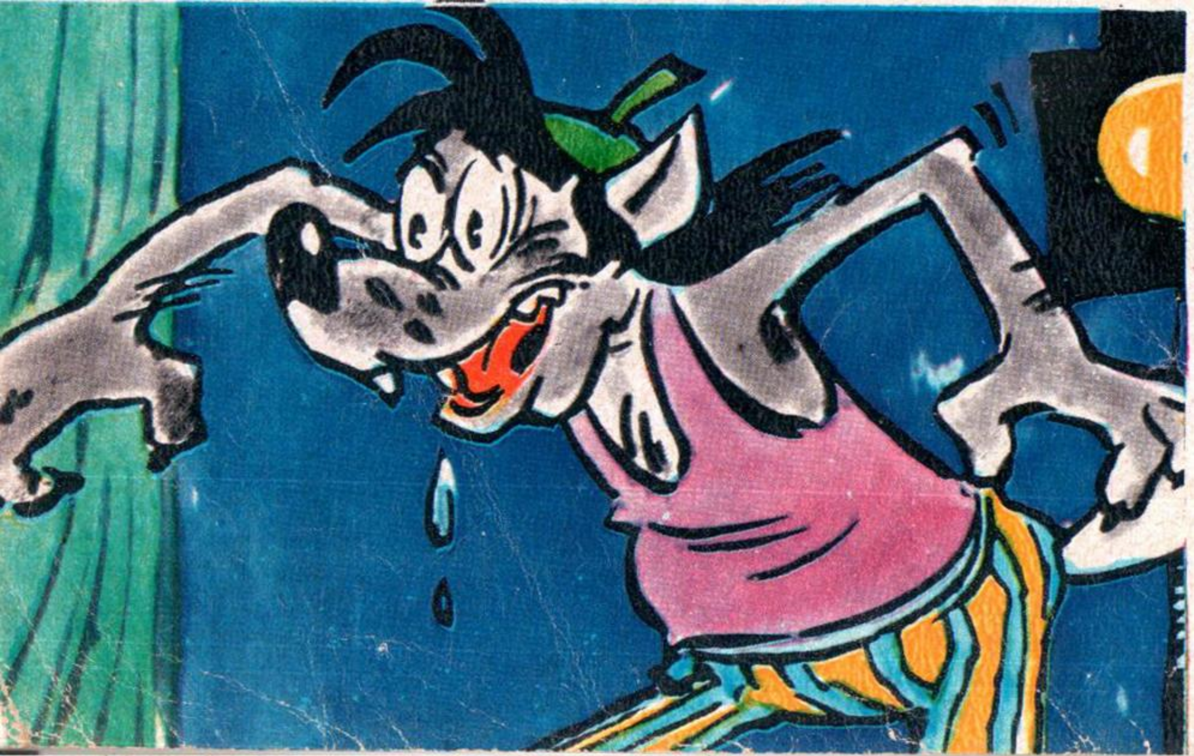

(৩) নেকড়েও হাবা নয়। খরগোসের এই চালাকিটা ধরে ফেলে সে ভাবলে, এবার খরগোস, আমার কাছ থেকে আর পালাতে হচ্ছে না।

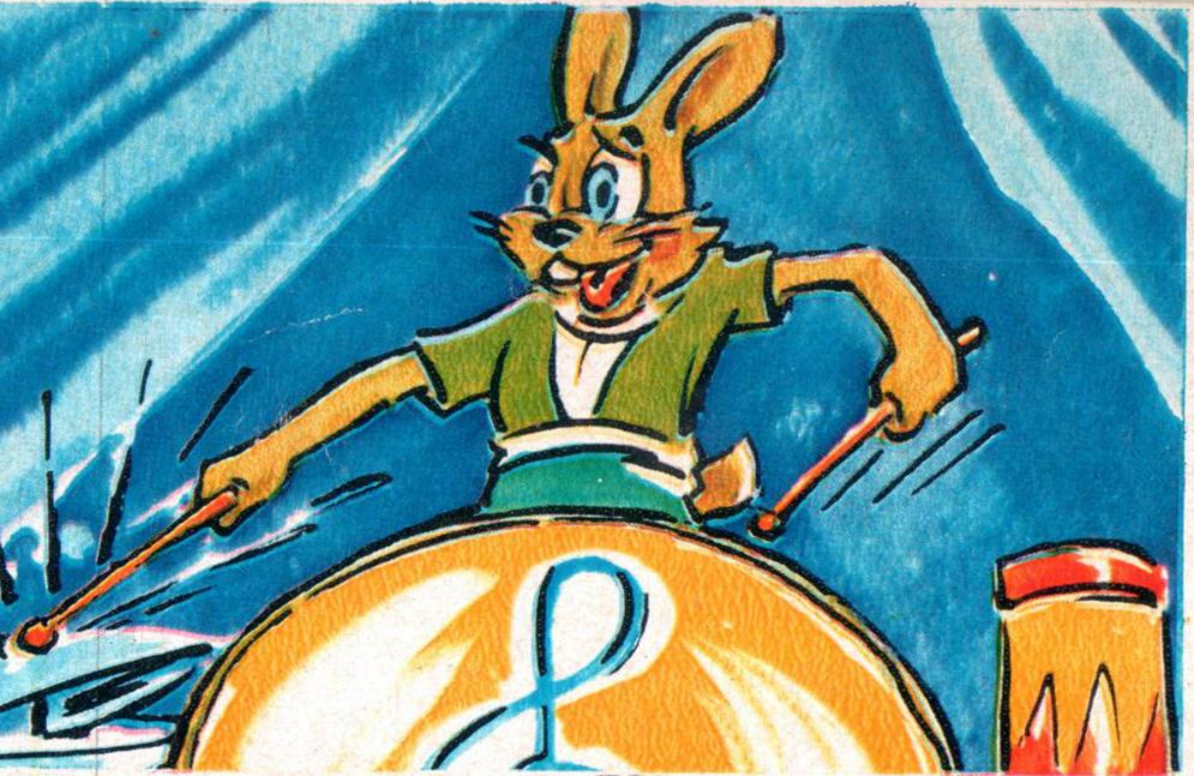

(৪) খরগোসও কোনো কেয়ার না করে ড্রামে আর ঝাঁঝে বাড়ি মেরে চলল, যেন সারা জীবনই সে বাজনদার।

(৫) খরগোসকে ধরতে চায় নেকড়ে কিন্তু তাদের মাঝখানে এক কেঁদো কুকুর 'গান গাইছে।

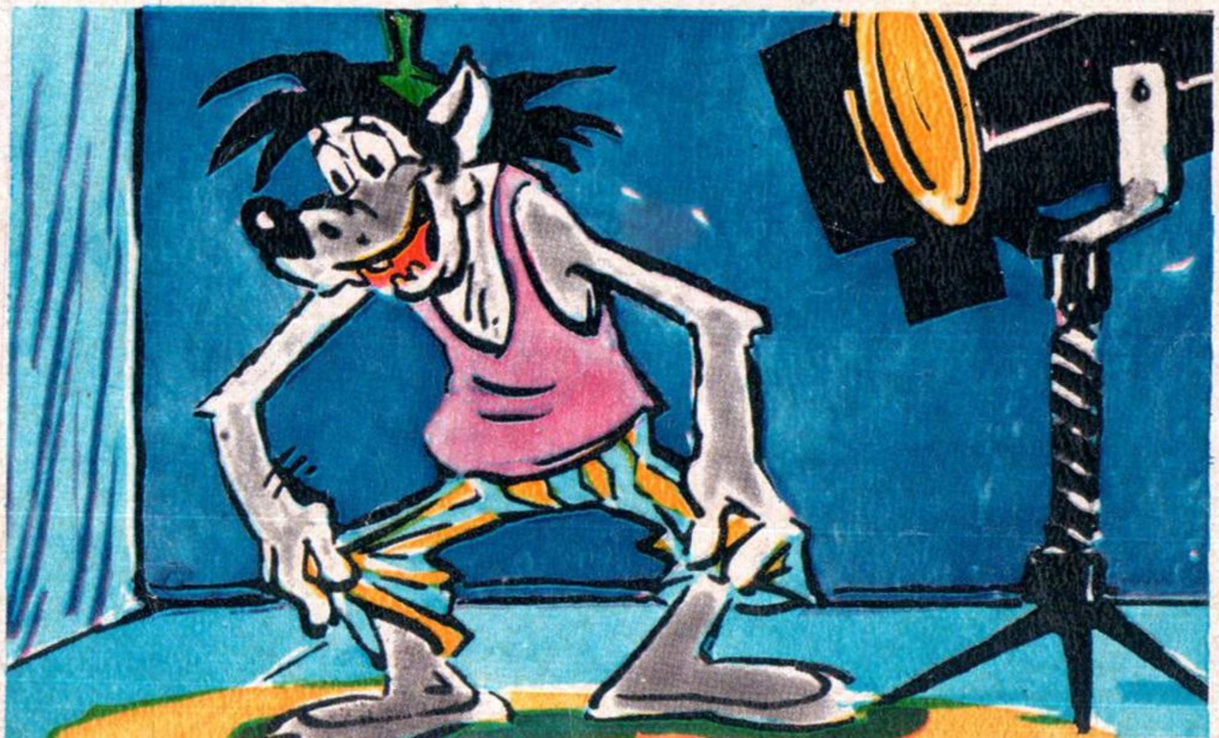

(৬) নেকড়ে ভাবলে, 'ওদের প্যাণ্ট ডোরাকাটা, আমারও। ভান করা যাক যে আমি ওদেরই একজন'।

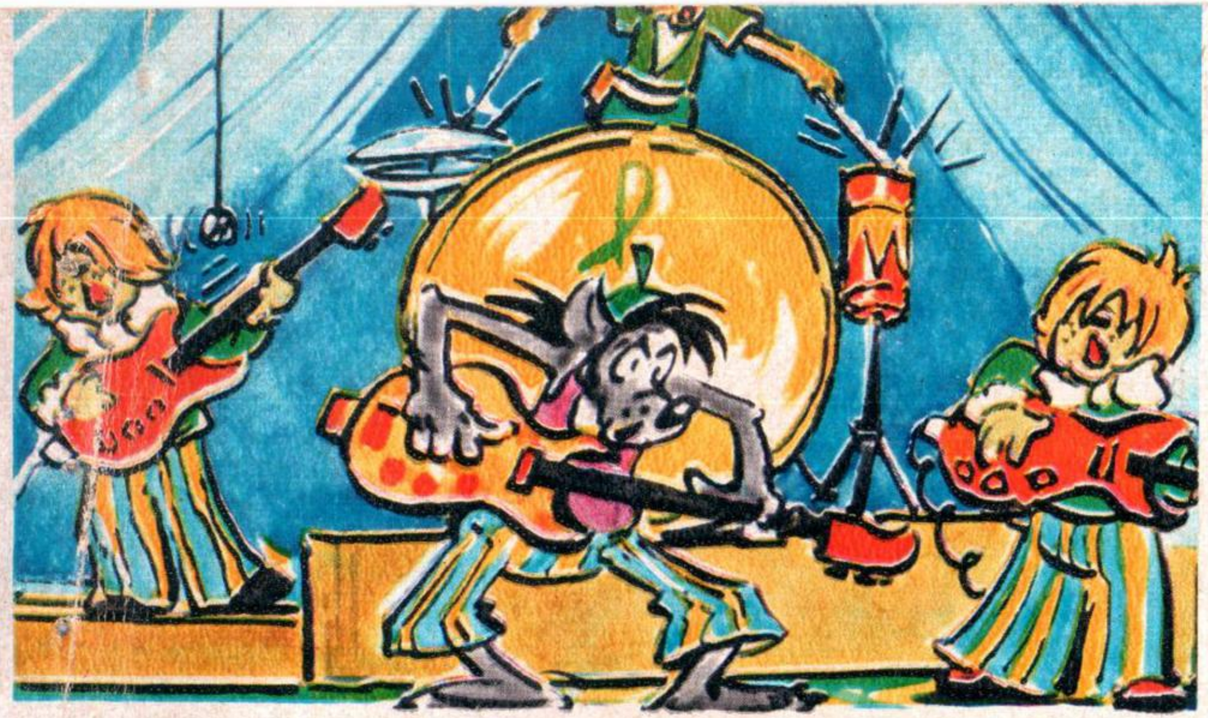

(৭) করলেও তাই। কার একটা গিটার টেনে নিলে... কুকুরদের চোখ লোমে ঢাকা, তাছাড়া নিজেদের গানে তারা এত বিভোর যে কিছুই খেয়াল করলে না। তারে টঙ্কার দিল নেকড়ে।

(৮)... কিন্তু কোনো আওয়াজ নেই। গিটার সে মোচড়ালে, ঝাঁকালে, ফল হল না কোনো। এদিক ওদিক চাইল নেকড়ে...

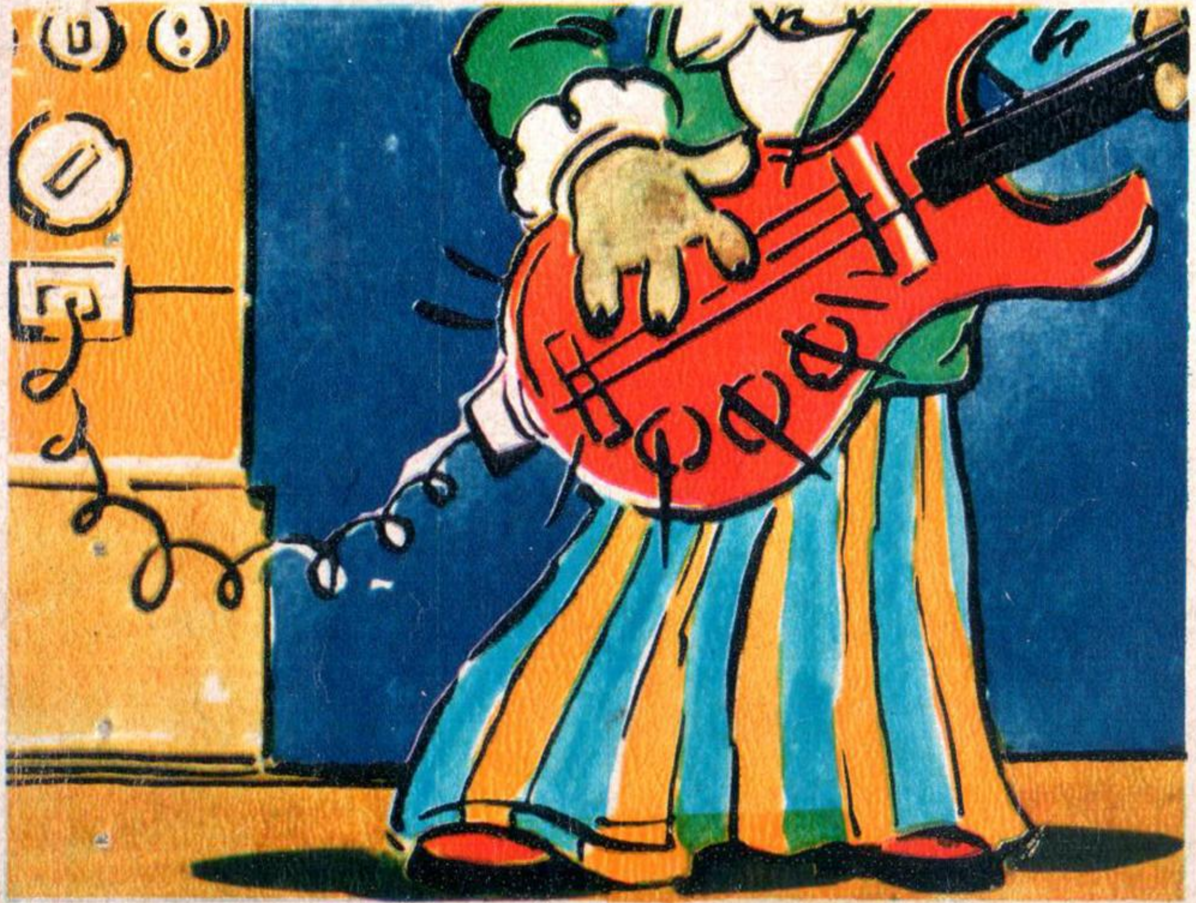

(৯) দেখে সব বাজনদারের গিটার বৈদ্যুতিক কোটরে লাগানো।

(১০) ভাবলে, বটে, এই ব্যাপার? তাতে আর কী হয়েছে। এই তো প্লাগ...

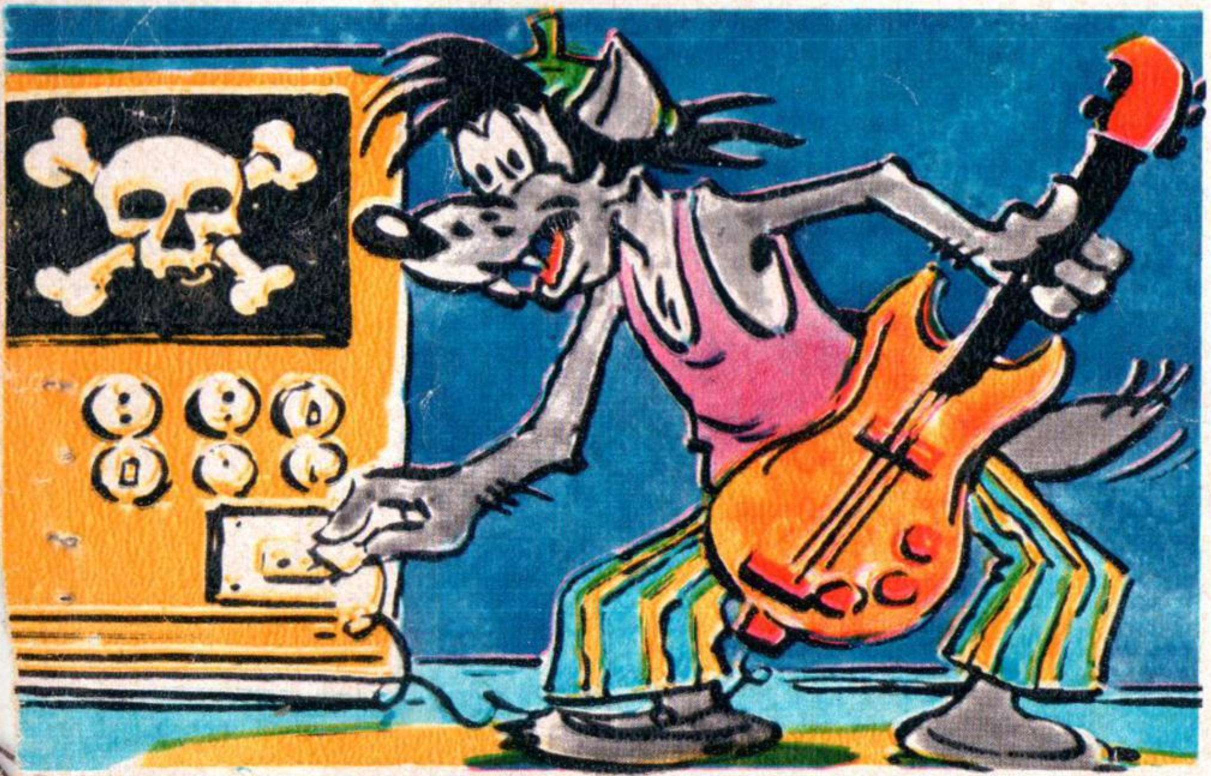

(১১) আর ওই তো সকেট। গিটারকে সে লাগাল চড়া টেনশনের সকেটে।

(১২) অমনি ফুলকি, আওয়াজ, নেকড়ে ভেবেই পায় না কী ব্যাপার ?

(১৩) নেকড়ে আর তার গিটার ধাক্কা খেল প্রচণ্ড। মঞ্চে ছোটাছুটি করে নেকড়ে, গিটা-রের তারে লাফায় তার থাবা...

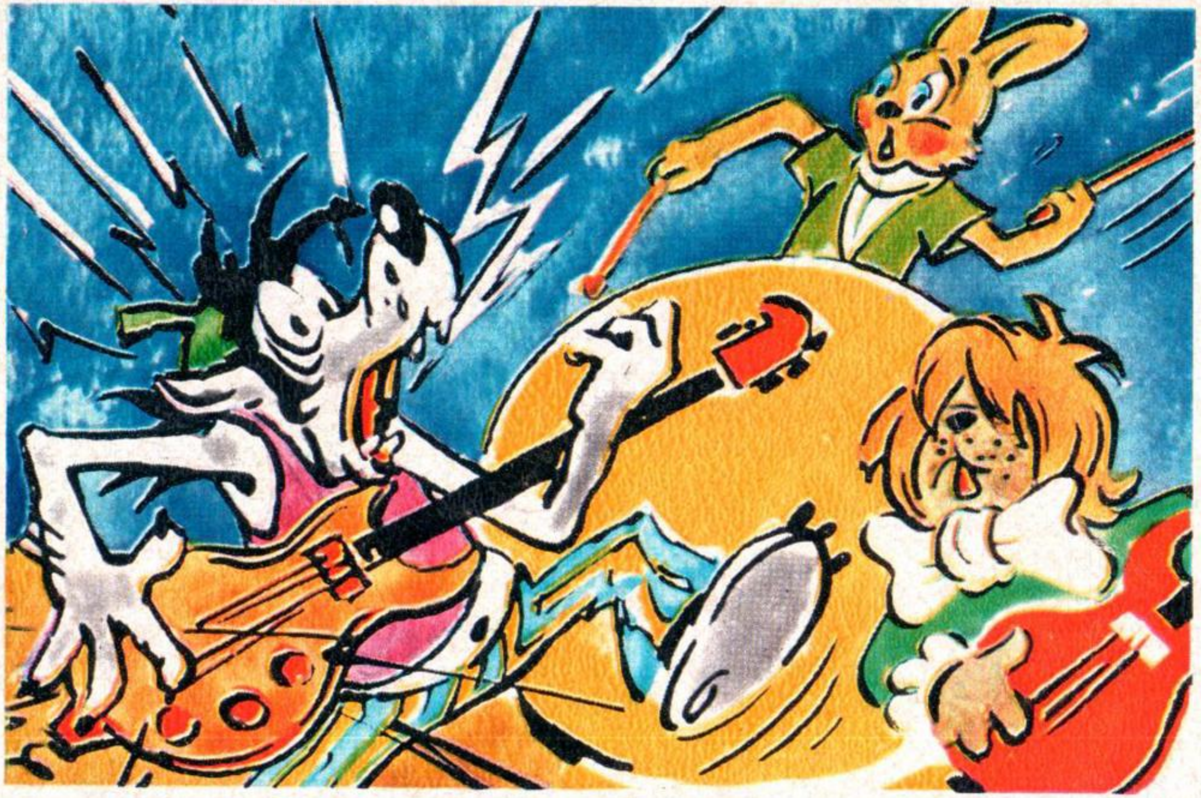

(১৪)... ওদিকে ঝমঝম করে বাজনা, গাঁ-গাঁ করে কুকুরেরা, খরগোস পিটিয়ে যায় ড্রাম, যেন এমনটিই হওয়ার কথা।

(১৫) শুধু নেকড়ের শক্তি আর নেই। চুলোয় যাক খরগোস, নিজেই সে জড়িয়ে পড়েছে বিদ্যুতের ফাঁদে।

(১৬) প্লাগ কী করে সে খসিয়েছিল নেকড়ের তা মনে নেই। প্রচণ্ড আওয়াজ হল স্টুডিওতে, অন্ধকার হয়ে এল নেকড়ের চোখ...

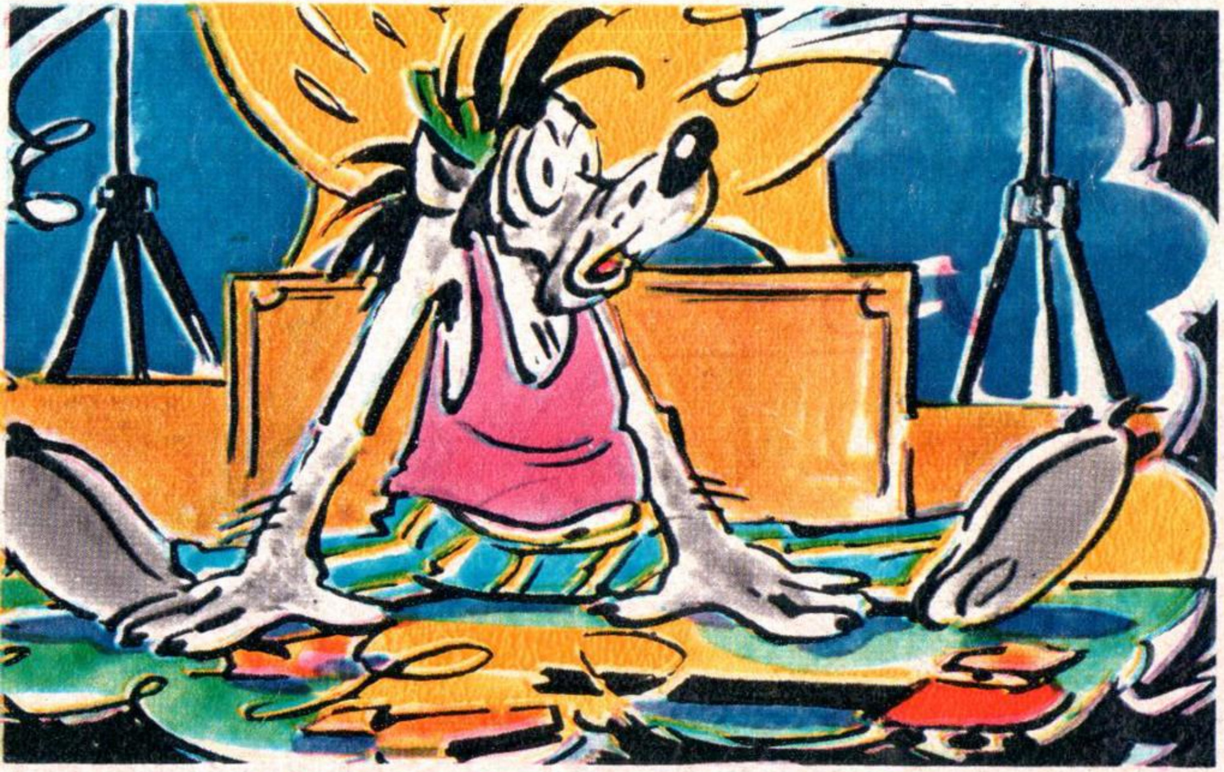

(১৭) জ্ঞান ফিরতে দেখে, স্টুডিওতে কেউ নেই, সবাই পালিয়েছে, নিজে সে বসে আছে ভাঙা গিটারের ওপর।

(১৮) কী চণ্ডাল রাগ তার হল বলার নয়। বিদ্যুৎ-খাওয়া ঘুসি পাকিয়ে সে বীভৎস গলায় চ্যাঁচাল, দাঁড়া খরগোস দেখাচ্ছি!

টোটা আর টিটো

মূল কমিকসঃ হ্যারল্ড নের

অনুবাদঃ তাপস মৌলিক

দ্যাখো, কাকে নিয়ে এসেছি! ইনি হলেন সেই বিখ্যাত কমিক স্ট্রিপ ‘নেপো আর ডেঁপো’-র স্রষ্টা রসরাজ শ্রী শ্রী হারাধন কবিরাজ মহাশয়। আমাদের দেশ দেখতে এসেছেন।
ওমা!! ‘নেপো আর ডেঁপো’? খুব মজার। আমি পড়ি তো!
তাই? হাঃ হাঃ হাঃ

বুঝলেন মশাই, জীবনের প্রতিটা জিনিসই মজায় ভর্তি।
কমিকস মহারাজ ভদ্রলোকটি বেশ মজার কিন্তু! হি হি হি। ঠিক বোয়াল মাছের মত দেখতে!
মহারাজের আবার তামাক খাবার শখ! বলে কিনা, ‘একটা পাইপ নিয়ে এসো’। দাঁড়ান, খাওয়াচ্ছি আপনাকে পাইপ। বেচারা!!
2

শোনো বাছারা, আমার সঙ্গে কিন্তু চালাকি করতে এসো না। আমায় বোকা পাওনি, বুঝলে?
কক্ষনো না। আমরা করব চালাকি?
চালাকি? এ মা, ছি ছি!
3

ফু উ উ উ উঃ
ফুঃ ফুঃ ফুঃ!

বেচারারা!! এই চালাকিটা ‘নেপো-ডেঁপো’-য় সেই প্রথমদিকে ছিল, পাঁচ কি ছ’নম্বর এপিসোডে।
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ! জীবনে কোনও দিন এত আনন্দ পাই নি! ধন্য রসরাজ! ওফ, মরে গেলাম!
খুব চালাক, না?
S

যেই আমি বলব ‘এবারে একটু পায়েস দি মহারাজ?’ ওমনি তুই পুরো গামলাটা লোকটার ওপর ঢেলে দিবি।
পুরো আঠাটাই যে শেষ হয়ে গেল। কী কপাল!
আটা
আঠা

কী সোনামণিরা! পায়েস রান্না করছ বুঝি? হাঃ হাঃ হাঃ
আঠা

হি হি! দেখেছ? একেই বলে বুদ্ধি!!
হো হো হো! রসরাজ, আপনি এদেশে চলে আসুন। আমাদের সাথে থাকবেন সারাজীবন।
হ্যাঃ, এ তো জলভাত! ‘নেপো-ডেঁপো’র ১৭ নম্বর এপিসোড!
৪

কোন ব্যাপারটা ভাবলে সবচেয়ে দুঃখ হয় জানিস!!
না, জানি না! আর জানতেও চাই না!
৩
ডিনামাইট

ভুলো না কিন্তু! চলে এসো ফের শিগগিরই।
টা টা বাই বাই। সোনামণিদের আমার ভালোবাসা দিও। পরের বার এসে কমিকসের ভালো কিছু চালাকি শিখিয়ে দেব ওদের।

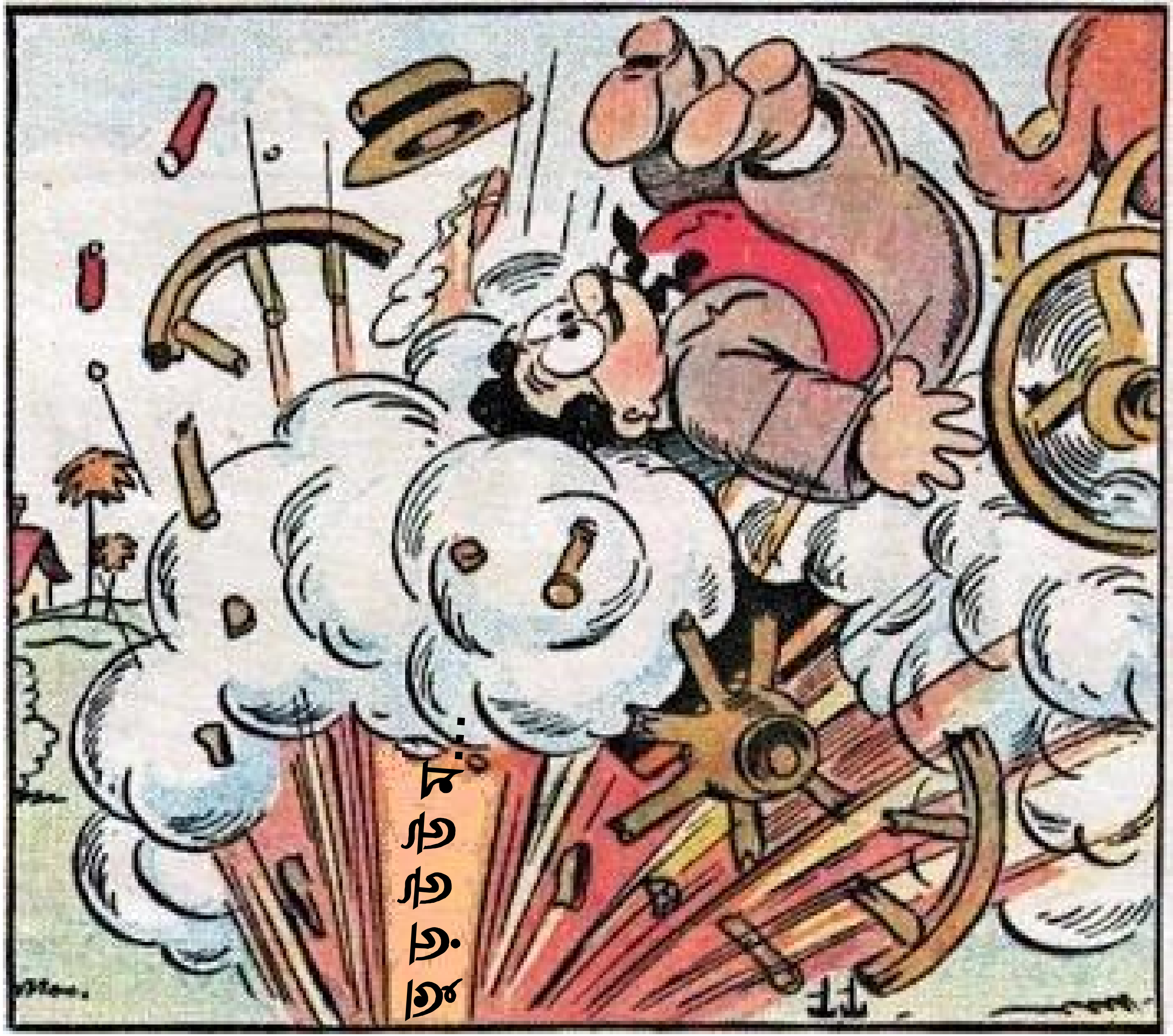
ভু ড় উ উ ম...

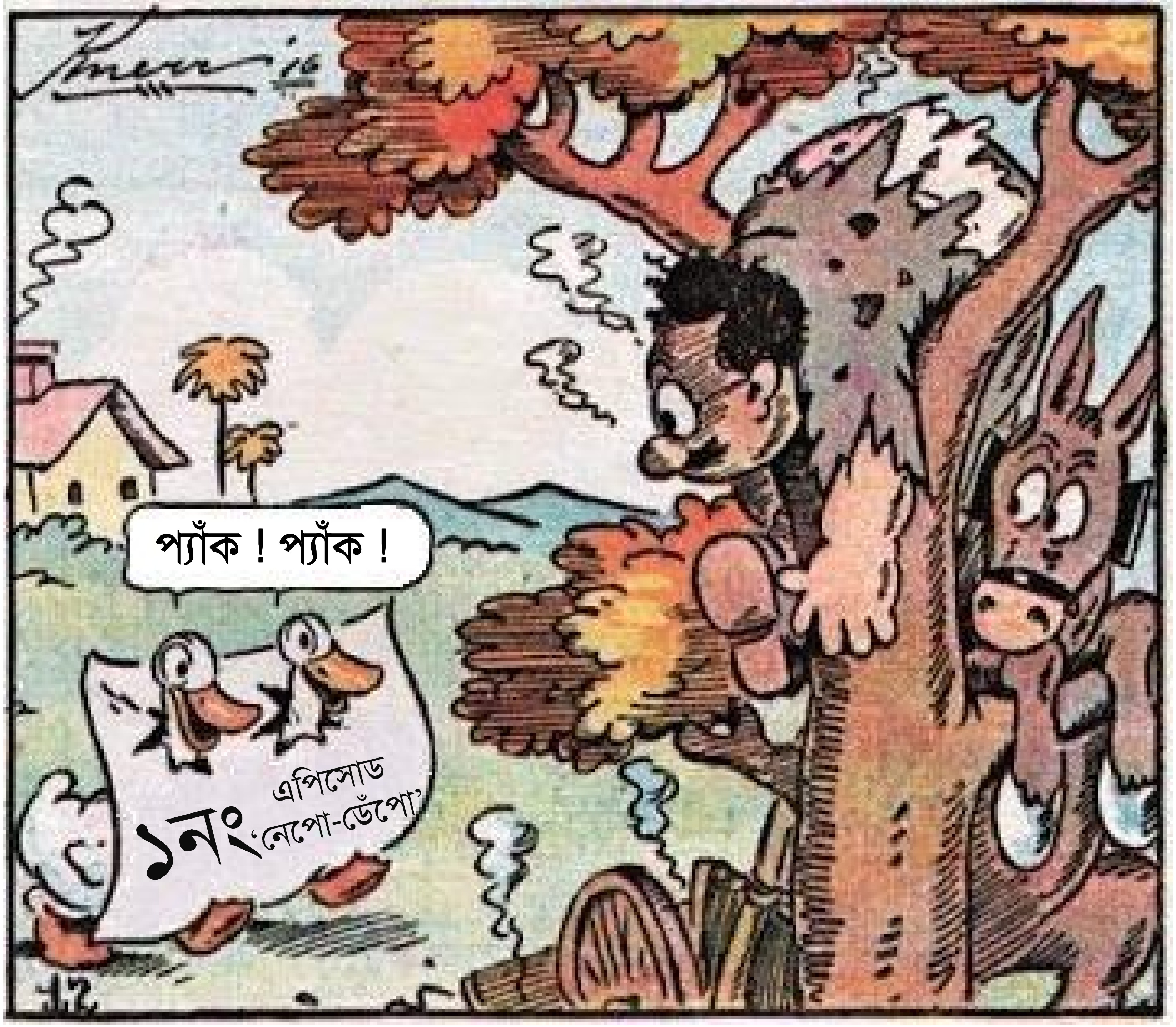
প্যাঁক ! প্যাঁক !
এপিসোড
১নং 'নেপো-ডেঁপো'

দ্য কাজেনজ্যামার কিডস : দুই বিচ্ছুর গল্প

তাপস মৌলিক

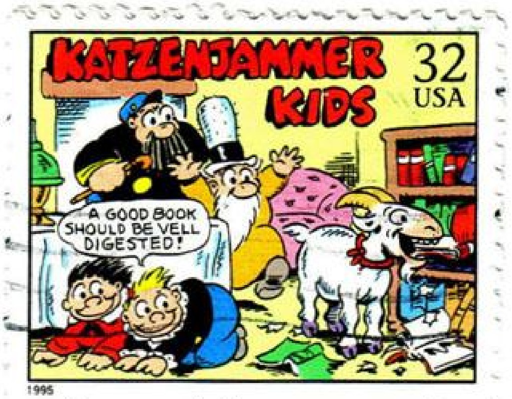

কমিকসের শতবর্ষ পূর্তিতে ১৯৯৫ সালে আমেরিকায় প্রকাশিত ডাকটিকিটে কাজেনজ্যামার কিডস

পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশিদিন ধরে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে চলা কমিক স্ট্রিপের নাম 'দ্য কাজেনজ্যামার কিডস'। জার্মান- আমেরিকান শিল্পী রুডলফ ডার্কস- এর লেখায়- রেখায় এর আত্মপ্রকাশ ১৮৯৭ সালের ১২ই ডিসেম্বর নিউ ইয়র্ক জার্নালের রোববারের পাতায়। এক শতাব্দী পার করেও সেই কমিক স্ট্রিপ আজও চলেছে। তার চলার পথের কিছু গল্প হোক আজ।

রুডলফ ডার্কস- এর জন্ম জার্মানির হাইড শহরে ১৮৭৭ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি। তাঁর যখন সাত বছর বয়স, তাঁর বাবা জোহানেস ডার্কস পরিবারের সবাইকে নিয়ে চলে আসেন আমেরিকার শিকাগোয়। মাত্র সতেরো বছর বয়েস থেকেই রুডলফের আঁকা কার্টুন আমেরিকার লাইফ ম্যাগাজিন সহ নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হতে শুরু করে। অতঃপর ১৮৯৭ সালে কুড়ি বছর বয়সে তিনি যোগ দেন নিউ ইয়র্ক জার্নাল সংবাদপত্রে।

নিউ ইয়র্ক জার্নালের সম্পাদক তখন উইলিয়াম হার্স্ট। জোসেফ পুলিৎজার সম্পাদিত নিউ ইয়র্ক ওয়ার্ল্ড কাগজের সাথে নিউ ইয়র্ক জার্নালের বেজায় রেষারেষি চলত। ১৮৯৫ সাল থেকে পুলিৎজারের কাগজে প্রতি রবিবার প্রকাশিত হত 'দ্য ইয়েলো কিড' নামের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় রঙিন কমিক স্ট্রিপ। তার সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্য হার্স্ট রুডলফকে একটি কমিক স্ট্রিপ তৈরি করতে বললেন। তখন, জার্মানির উইলহেলম বুশের লেখা ছোটদের জনপ্রিয় গল্পমালা 'ম্যাক্স অ্যান্ড মরিজ'(১৮৬৫)- এর আদলে হান্স আর ফ্রিৎজ নামের দুই বিচ্ছু যমজ ভাইয়ের গল্প নিয়ে রুডলফ শুরু করলেন 'দ্য কাজেনজ্যামার কিডস'।

রুডলফের ছোট ভাই গাস ডার্কসও নিউ ইয়র্ক জার্নালে দাদার সহকারী হিসেবে যোগ দিলেন। 'কাজেনজ্যামার কিডস' অচিরেই জনপ্রিয় হয়ে উঠল। ১৮৯৮ সালে রুডলফ দেশের হয়ে যুদ্ধে গেলেন, তাই কমিক স্ট্রিপ বন্ধ রইল কিছুদিন। তারপর আর তা থামেনি। দুই ভাই রুডলফ আর গাস মিলে এগিয়ে নিয়ে চললেন দুই বিচ্ছুর গল্প। দুর্ভাগ্যজনকভাবে গাস আত্মহত্যা করলেন ১৯০২ সালের ১০ই জুন। তাই এরপর দাদা রুডলফকে একাই চালিয়ে যেতে হল সেই কমিক স্ট্রিপ।

যৌবনে রুডলফ ডার্কস

কমিকসের চিত্রভাষা তৈরিতে রুডলফ ডার্কসের অবদান অনেক। ডার্কসই প্রথম সংলাপ বোঝাবার জন্য কমিকসে 'স্পিচ বেলুন'- এর ব্যবহার শুরু করেন। কমিকসকে প্রাণবন্ত করে তোলার আরও বহু কায়দা – যেমন মনে মনে ভাবা কথা বোঝানোর জন্য 'থট বেলুন', গতি বোঝাবার জন্য স্পিড লাইনস, যন্ত্রণা বোঝানোর জন্য চোখে তারা দেখা – ইত্যাদি বহু রীতি ডার্কস চালু করেন যা আজ জলভাত হয়ে গেছে।

পনেরো বছর একটানা কাজ করার পর ১৯১২ সালে ডার্কস সম্পাদক হার্স্টের কাছে একবছর ছুটি চাইলেন, বললেন বৌকে নিয়ে ইউরোপ ঘুরতে যাবেন। হার্স্ট রাজি নন, 'কাজেনজ্যামার কিডস' তখন বিপুল জনপ্রিয়, ডার্কসকে তিনি ছাড়েন কীভাবে? ওদিকে ডার্কসও নাছোড়বান্দা, ছুটিতে তিনি

যাবেনই। অগত্যা হার্স্ট নিয়োগ করলেন আরেক জার্মান- আমেরিকান শিল্পী হ্যারল্ড নেরকে, তাঁকে দিয়ে চালু রাখলেন কমিক স্ট্রিপ। ডার্কস ছুটি থেকে ফিরে দেখেন তাঁর সিংহাসন বেদখল হয়ে গেছে। হার্স্ট তাঁকে তাঁর কমিক স্ট্রিপের দায়িত্ব ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করলেন। ডার্কস চাকরি ছেড়ে মামলা ঠুকে দিলেন। শুরু হল আইনি লড়াই।

রুডলফ ডার্কস ও তাঁর সৃষ্ট চরিত্রেরা

হ্যারল্ড নের

দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর কোর্ট রায় দিল, ডার্কস তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি নিয়ে অন্য কাগজে নতুন কমিক স্ট্রিপ আঁকতে পারেন, কিন্তু 'দ্য কাজেনজ্যামার কিডস' নামটি তিনি ব্যবহার করতে পারবেন না, সে নামের স্বত্ব রইল নিউ ইয়র্ক জার্নালের কাছে। ১৯১৪ সালে ডার্কস যোগ দিলেন প্রতিদ্বন্দ্বী সংবাদপত্র নিউ ইয়র্ক ওয়ার্ল্ডে, ফের শুরু করলেন দুই বিচ্ছুর গল্প, নাম দিলেন 'হ্যান্স অ্যান্ড ফ্রিৎজ'। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় আমেরিকায় তীব্র জার্মানবিদ্বেষী হাওয়ার ফলে সে নাম বদলে হল 'দ্য ক্যাপটেন অ্যান্ড দ্য কিডস'।

ওদিকে নিউ ইয়র্ক জার্নালে হ্যারল্ড নের এঁকে চলেছেন 'দ্য কাজেনজ্যামার কিডস'। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তিনিও কমিকসের নাম বদলে করলেন 'দ্য শেনানিগান কিডস', জার্মান বংশোদ্ভূত হ্যান্স আর ফ্রিৎজ নাম বদলে হয়ে গেল ডাচ বংশোদ্ভূত মাইক আর আলেক। ১৯২০ সালে অবশ্য হ্যান্স আর ফ্রিৎজ ফিরে এল পুরনো 'দ্য কাজেনজ্যামার কিডস' নামেই।

ফলে হল কি, একই চরিত্রদের নিয়ে আঁকা ভিন্ন নামের দুই কমিক স্ট্রিপ প্রকাশিত হয়ে চলল দুই প্রতিদ্বন্দ্বী সংবাদপত্রে। শুরু হল নিত্যনতুন উদ্ভাবনী শক্তির তুমুল রেষারেষি। একদিন- দুদিন নয়, সেই প্রতিযোগিতা চলল দীর্ঘ ৬৫ বছর। দুটি কমিকসই দারুণ জনপ্রিয় হল। লাভ হল পাঠকের।

রুডলফ ডার্কসের বয়স হল। ১৯৪৬ সালে ছেলে জন ডার্কস তাঁর সহকারী হয়ে যোগ দিলেন। ১৯৫৮ সালে ৮১ বছর বয়সে রুডলফ ছেলের হাতে সমস্ত দায়িত্ব সঁপে অবসর নিলেন। কিন্তু ১৯৬৮ সালের ২০শে এপ্রিল ৯১ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যুর আগে অবধি কমিক স্ট্রিপের নিচে তিনি নিজেই সই করতেন। ছেলে জন ডার্কস আরও ১১ বছর কমিকসটি চালান। অবশেষে ১৯৭৯ সালে 'দ্য ক্যাপটেন অ্যান্ড দ্য কিডস' তার দৌড় শেষ করল।

'দ্য কাজেনজ্যামার কিডস' কিন্তু আজও প্রকাশিত হয়ে চলেছে। দীর্ঘ ৩৫ বছর কমিকসটি চালান হ্যারল্ড নের, ১৯৪৯- এ তাঁর মৃত্যু অবধি। তারপর অনেক হাতবদলের পরে এখন সেটি আঁকেন হাই আইসম্যান।

'জয়ঢাক'- এর পাতায় শুরু হয়েছে সেই ঐতিহাসিক কমিক স্ট্রিপ 'দ্য কাজেনজ্যামার কিডস'- এর বাংলা অনুবাদ 'টোটা আর টিটো'। থাকবে রুডলফ ডার্কস এবং হ্যারল্ড নের দুজনেরই সৃষ্টির অনুবাদ। প্রথম এপিসোড পড়তে হলে ক্লিক করো এইখানেঃ টোটা আর টিটো।

এসো পড়ি, মজা করি।

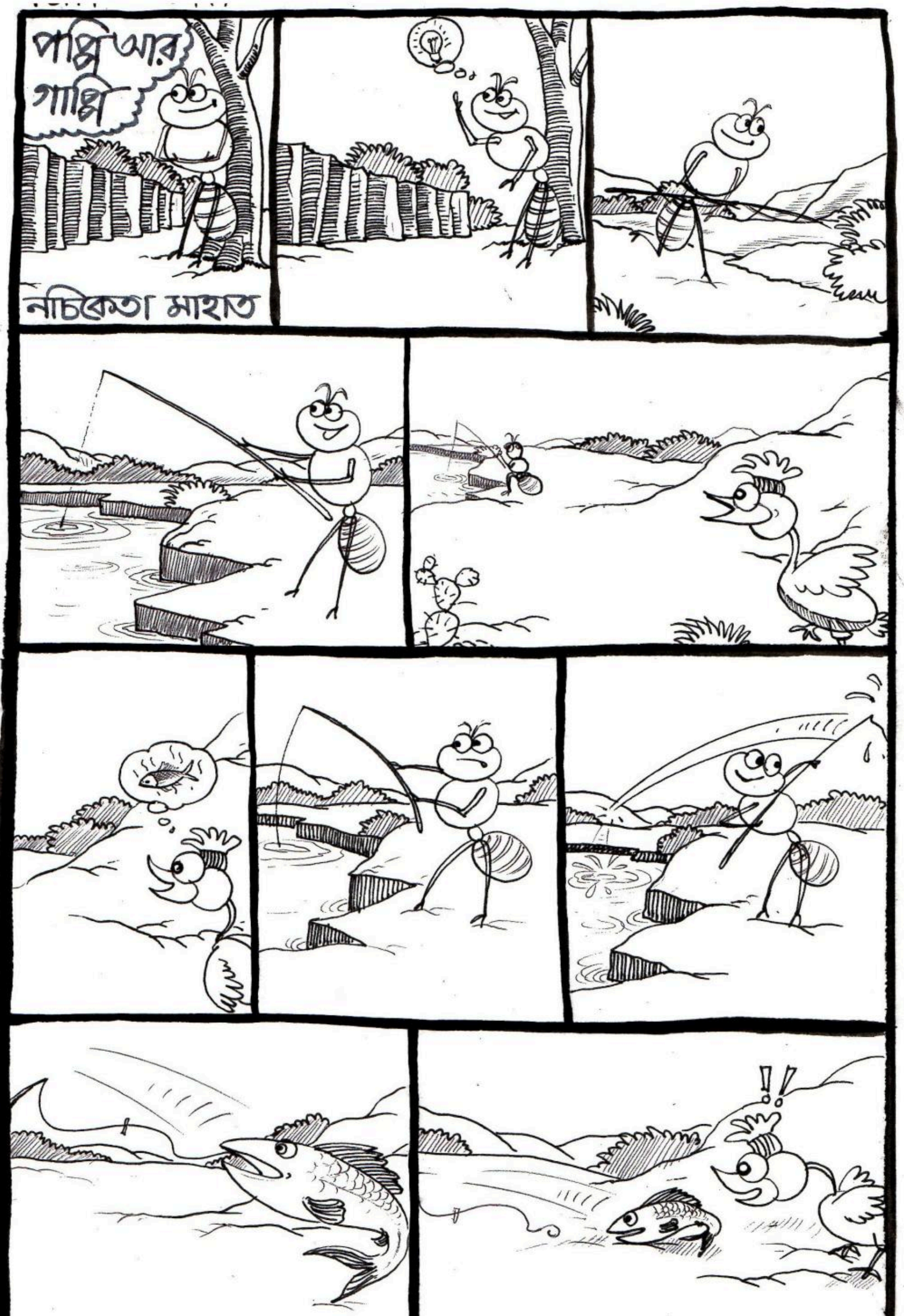

পাপ্পু আর গাপ্পি
নচিকেতা মাহাত
!!
2014

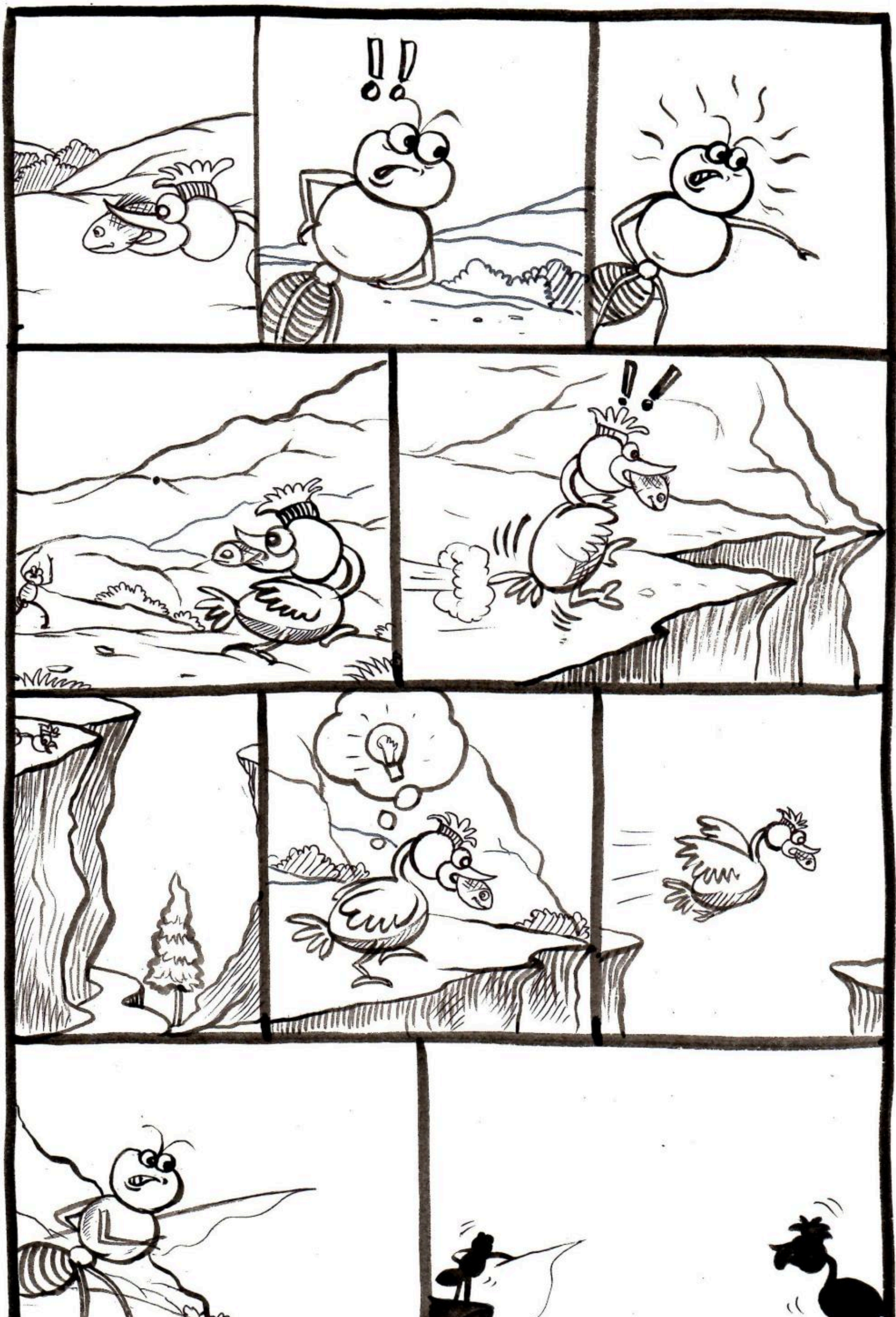
!!
!!
2014

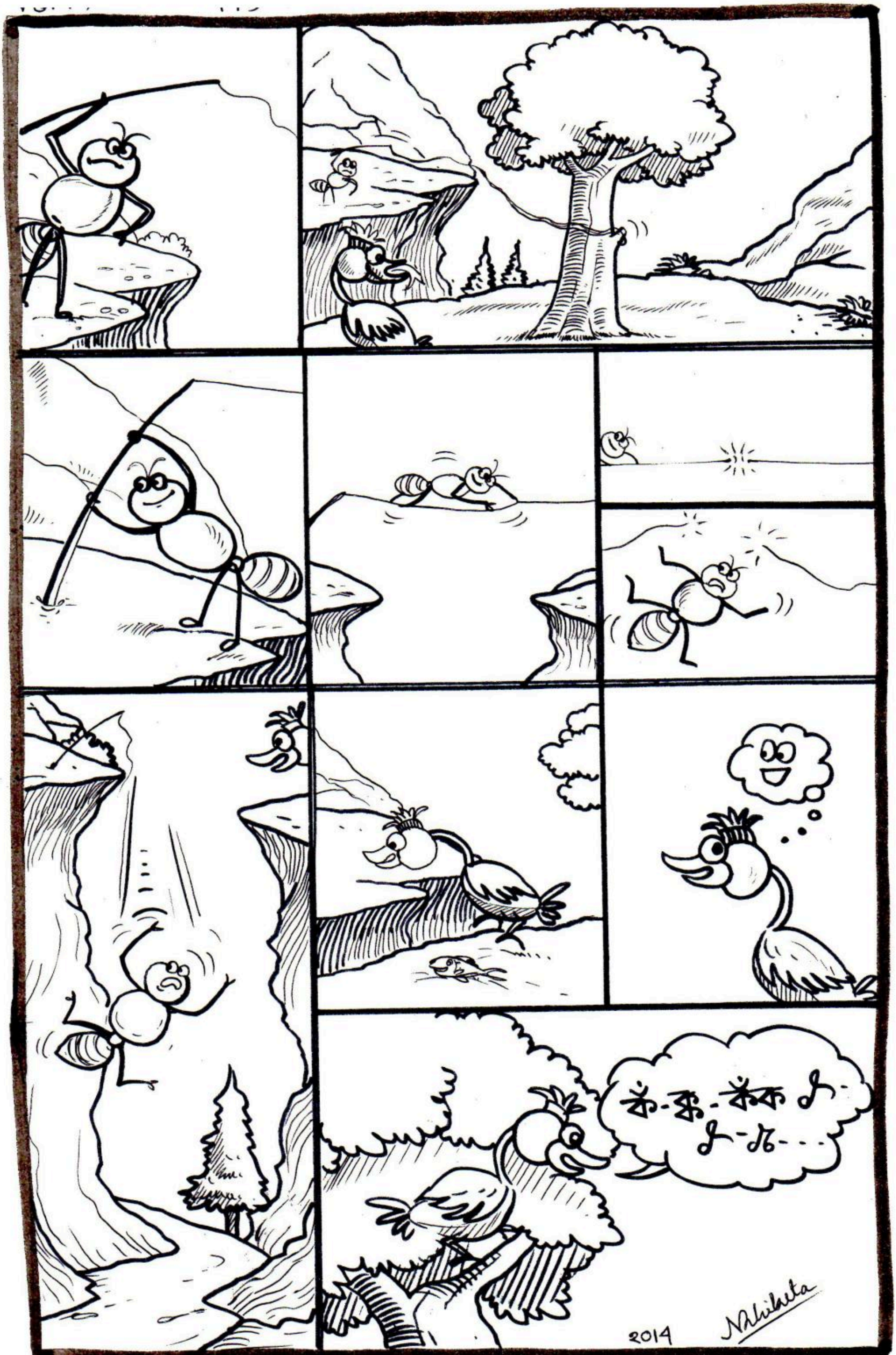
কঁ-ক্ক-কঁক ♪-
♪-♫---
2014
Nachiketa

রাপ্পা ও একটি তারা

মৌমিতা

"রাপ্পা কোথায় গেলি রে, ভাই এর কাছে একটু বস, আমি পুজোটা সেরে আসি।"

মায়ের ডাকে সম্বিত ফিরল রাপ্পার। এতক্ষণ মন দিয়ে গুলতির কাঠ ছুলছিল একটা পেনসিল কাটার ছুরি দিয়ে। টেবিলের ওপর ভৌত বিজ্ঞানের বইটা খোলা পড়ে আছে। ফ্যানের হাওয়ায় ফরফর করে উড়ছে পাতাগুলো। পরশু হাফ ইয়ারলি পরীক্ষা শুরু, প্রথমেই এই ভৌত বিজ্ঞান। পিরিয়ডিক টেবিল এর প্রপার্টি ভেরিয়েশনগুলো কিছুতেই মুখস্থ থাকছে না। হাল ছেড়ে দিয়ে তাই মনোযোগ দিয়ে গুলতি বানাচ্ছিল। এখন উঠে হেলে দুলে ভাইয়ের কাছে গিয়ে বসল।

দুই বছরের বাপ্পার চোখ দাদাকে দেখেই আনন্দে ঝিলমিল করে উঠল। হাত বাড়িয়ে বলল, "আয়, আয়, আয়।" এই কথা কটাই শিখেছে ও এখনও। বাপ্পাকে একটু চটকে দিয়ে রাপ্পা এবার গেল মায়ের কাছে।

আগামী সপ্তাহে গুলেদের পাড়ায় ফুটবল ম্যাচ, খুব গুরুত্বপূর্ণ খেলা। শুনেছে পশ্চিমপাড়ার দুটো ইলেভেনের ছেলেকে আনছে গুলেরা। মাকে রাজি করাতেই হবে। বাবার কানে গেলে আর রক্ষে নেই, পিটিয়ে ছাল তুলে নেবে। এ বছর নাইনে উঠেছে মাত্র ফিফটি টু পার্সেন্ট নম্বর পেয়ে, এর চেয়ে ভালো না করতে পারলে তার কপালে দুঃখ আছে।

"মা, শনিবার আমি একটু বিকেলে বেরোব? সন্ধের মধ্যেই চলে আসব।"

“কেন? শনিবার কী? তোর বাবা এই পরীক্ষার সময়ে বেরোতে বারণ করে গেছে না? আমি জানি না, বাবাকে জিজ্ঞেস করে নেবে।”

“মা, প্লিজ প্লিজ, তুমি একটু বাবাকে ম্যানেজ করতে পারবে না? একদিনের তো ব্যাপার।”

“রাপ্পা, তুমি কিন্তু এ বছর রেজাল্ট খুব খারাপ করেছ। বাবা ভীষণ রেগে আছে। তারপর এসব আমি আর প্রশ্রয় দিতে পারব না।”

“আমি এইবার ঠিক ভালো করব, তুমি দেখো। এই একটা ম্যাচ শুধু খেলতে দাও, তারপর আমি আর পরীক্ষার মধ্যে বেরোব না কথা দিচ্ছি।”

“তুই তো দেখছিস আমার শরীর কত খারাপ, মাথার যন্ত্রণাটা যাচ্ছেই না। তোর বাবা এইসব নিয়ে চিন্তার মধ্যে থাকে, তার পর তোর পড়াশোনার চিন্তা। মাসে মাসে স্কুলে মাইনে কত দিতে হয় জানো তুমি? বড়ো হচ্ছ, এবার বাবা- মার কষ্টটা বুঝতে শেখো। ওসব কিছু হবে না, পড়তে বোসো গে যাও।”

অগত্যা রাপ্পা আবার পড়ার টেবিলে গিয়ে বসে। সেই বেরিলিয়াম- এ্যালুমিনিয়াম আর বোরন- সিলিকন- এর ডায়াগোনাল সম্পর্ক। ধুত্তেরি! কিছুই মাথায় ঢুকছে না। বসে বসে খাতায় আঁকিবুকি কাটতে লাগল সে। একটা কাগজ ছিঁড়ে গোল্লা পাকিয়ে একটা পেনসিল দিয়ে সেটাকে এলোমেলো করে ছড়ানো বইপত্তর- এর ভিতর দিয়ে এঁকেবেঁকে ঠেলে নিয়ে যেতে লাগল। আর ফিসফিস করে বলতে লাগল, “ডাইনে কাটা, আরে সেন্টার কর, সেন্টার কর, মার ডান পায়ে।”

বলতে বলতে কাগজের গোল্লাটা এক ঠেলায় রেডিওর ওপর দিয়ে নীচে মায়ের বাঁকুড়ার ঘোড়ার মাথায় ফেলে দিল। ‘গো- ও- ও- ও- ল’ — ফস করে একটু জোরেই বলে ফেলেছে।

অমনি পাশের ঘর থেকে বাপ্পা আধো গলায় চেঁচিয়ে বলতে লেগেছে, “কোল কোল কোল।”

কানে একটা মোক্ষম মোচড় খেয়ে ঘাড় ঘোরাতে বাধ্য হল রাপ্পা।

“পড়াশোনার নামে এই হচ্ছে নাকি আজকাল?”

বাঘের গর্জনে কানে তালা লেগে যাওয়ার মতন হল। কখন বাবা ফিরে এসেছেন খেয়ালই করেনি সে।

আমতা আমতা করে কিছু বলতে গেল, তার আগেই আবার গর্জন, “তোমার বল আর গুলতি এবার জ্বালিয়ে দেব আমি। কী পেয়েছিস তুই? সারাদিন শরীরের রক্ত জল করে খাটছি কার জন্যে? তোর একটুও লজ্জা হয় না? এ বছর যদি সেভেন্টি পার্সেন্টের কম পাও তাহলে আমি পড়াশোনা ছাড়িয়ে দোকানে বসিয়ে দেব। তখন বুঝবে কত ধানে কত চাল পাওয়া যায়। বুড়ো ধাড়ি ছেলে, পড়তে বসে খেলা করছে।” গজগজ করতে করতে চলে গেলেন বাবা।

যতীন দাস- এর মোড়ে বাবার খুব চালু মুদিখানার দোকান, মানে, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। সারাদিন খদ্দের সামলে ক্লান্ত হয়ে যখন বাড়ি ফেরেন তখন প্রায়দিনই রাপ্পা পড়ে যায় তোপের মুখে। এই আজ যেমন হল। আর সব বক্তৃতা গিয়ে শেষ হয় দোকানে বসিয়ে দেবার হুমকিতে। মায়ের চিকিৎসার জন্যে অনেক টাকা

বেরিয়ে যাচ্ছে জলের মতন, তাই বাধ্য হয়ে একজন কর্মচারীকে ছাড়িয়ে দিয়েছেন বাবা। কী জানি হয়তো সত্যিই রাপ্পাকে বহাল করে দেবেন তার জায়গায়।

খাবার টেবিলেও কেউ বিশেষ কথা বলছিল না তার সঙ্গে। মা তো খেলই না, আবার মাথা যন্ত্রণা বেড়েছে। বাম লাগিয়ে ঘর অন্ধকার করে শুয়ে পড়ল। একলা বসে বাবার মুখোমুখি খাওয়া শেষ করা যে কী কঠিন, তা রাপ্পা টের পাচ্ছিল। উঠে যাওয়ার আগে বাবা তার দিকে তাকিয়ে একবার বলে গেলেন, "পেট তো ভরল, এবার মাথাটা ভর্তি করো গে যাও। ওই ছক যেটা খোলা ছিল, সেটা কাল সকালের মধ্যে মুখস্থ করে আমাকে শোনাবে। নাহলে কাল তোমার খাওয়া বন্ধ।"

অর্থাৎ পিরিয়ডিক টেবিল মুখস্থ করতে হবে এইবার! বেশিদূর পড়াশোনা না করলেও বাবা খুব কড়া মানুষ। রাপ্পা জানে বই ধরে বসে পড়া নেবে বাবা। না পারলেই কপালে হকি স্টিকের মার।

ক্ষোভে চোখ ফেটে জল এল রাপ্পার। কেন যে বিজ্ঞানটা কিছুতেই তার মাথায় ঢোকে না। এই তো অভিনন্দন, পড়াশোনাতে কেমন ভালো এদিকে ফুটবল মাঠেও দুর্দান্ত। এমন চিপ করতে পারে, কলেজের ছেলেরা পর্যন্ত সমঝে চলে ওকে। তারই কপালটা খারাপ। অভিনন্দনের বাবা রেল কোম্পানিতে চাকরি করে, কেমন ওদের দু ভাইকে মাঝে মাঝে দীঘা- পুরী বেড়াতেও নিয়ে যায়। আর রাপ্পারা গত দু বছর হল এই জ্যাংরার বাইরেই যায়নি। যাক, ভেবে আর কী হবে, ঘরে ঢুকে বইটা খুলে বসল রাপ্পা।

ভৌত বিজ্ঞান পরীক্ষার দিন বাড়ি ফিরে এসে রাপ্পা দেখল কেউ নেই। দরজায় তালা আর একটা চিরকুট আটকানো কড়াতে।

বাবার হাতের লেখা, "রাপ্পা, মায়ের শরীর বেশি খারাপ হয়েছে। কলকাতায় হাসপাতালে ভর্তি করতে যাচ্ছি আমি। ভাই আছে সেনকাকুর বাড়িতে। তুমি ফিরে ওদের বাড়িতেই খেয়ে নেবে। আমার ফিরতে রাত হবে।"

হতভম্ব রাপ্পা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ওইখানেই। ব্যাপারটা যেন মাথায় ঢুকছিল না। এই তো সকালেও যখন সে বেরোচ্ছিল, মা তার কপালে দই এর ফোঁটা দিলেন। সে প্রণাম করলে চিবুক ছুঁয়ে আশীর্বাদ করলেন। এর মধ্যেই এত শরীর খারাপ হয়ে গেল?

ধীর পায়ে রওনা দিল সেনকাকুদের বাড়ির দিকে। কাকিমা খুব যত্ন করছিলেন তাদের দুই ভাইকে। আদর করে ভাত বেড়ে খাওয়ালেন তাকে, বাপ্পাকে খাইয়ে দিলেন। রাপ্পা কিছু জিজ্ঞেস করল না তাঁকে। কেন যেন তার ভয় ভয় করছিল। খেয়ে উঠে টুকির সঙ্গে একটু চাইনিজ চেকার খেলল রাপ্পা। টুকি সেনকাকুর মেয়ে, ক্লাস সিক্স- এ পড়ে, কিন্তু বেশি পাকা। রাপ্পাকে বলল, "রাপ্পা দাদা কাকিমার কী হয়েছে রে? আমি সিনেমাতে দেখেছি হাসপাতালে নাকে- মুখে নল দিয়ে দেয়, খুব লাগে না রে?" রাপ্পার মেজাজটাই খারাপ হয়ে গেল, একটা জুতসই জবাব এসে গেছিল মুখের ডগায় কিন্তু বলল না।

বাবার ফিরতে রাত সাড়ে এগারোটা হল। খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল বাবাকে, অন্যদিন কোশ্চেন পেপার ধরে ধরে সব জিজ্ঞেস করেন, আজ সেসব যেন মনেই পড়ল না বাবার।

সেনকাকু আর কাকিমার সাথে নীচু গলায় কিসব আলোচনা করল। বায়োপসি, সার্জারি, লাস্ট স্টেজ এসব কথা কানে এল তার। বায়োপসি... বায়োপসি... ধুত, কেন যে বায়োলজিটাও ঠিক করে পড়েনি। খুব শোনা শোনা লাগছে এই কথাটা কিন্তু মনে করতে পারছে না কী প্রসঙ্গে পড়েছে।

বাবা খুব নরম গলায় কথা বলল তার সাথেও, যেন অন্য মানুষ। ভারী অবাক লাগল রাপ্পার। এমন তো হয় না। সাহস করে বলেই ফেলল, "বাবা, কাল কি আমরা মাকে দেখতে যাব?"

"হ্যাঁ, যাব।" অন্যমনস্ক গলায় উত্তর দিলেন বাবা।

পরদিন দেখে সত্যি মার নাকে- মুখে অনেক নল দিয়েছে ডাক্তাররা। মাথায় একটা নীল ক্যাপ পরা। তাকে দেখে মা করুণ একটু হাসল ছলছল চোখে, "পরীক্ষা কেমন হয়েছে রে রাপাই?" আদর করে মা তাকে ওই নামে ডাকে। "ভালো করে পড়াশোনা করিস, বাপ্পার সাথে বেশি মারপিট করিস না যেন। বাবার কথা শুনিস, রাগ করিস না। বাবার অনেক পরিশ্রম হয় রে, বড়ো হলে বুঝবি।"

এত কথা বলছে কেন মা? কদিন পরেই তো বাড়ি ফিরবে। "ঠিক আছে মা," বলতে গিয়ে দেখল গলার কাছে একটা বাষ্প ঠেলে উঠছে, আওয়াজ বেরোল না। সময় হয়ে যাওয়াতে নার্স এসে সবাইকে বের করে দিল।

পরশুই সেই খেলা। যাহ, মাকে তো জিজ্ঞেস করা হল না যাবে কিনা। বাবা অবশ্য খেলা নিয়ে কিছু বলেনি এখনও, আর কাল থেকে একটুও বকছে না। তার মানে খেলতে গেলে কিছু বলবে না হয়তো। এই ভেবে একটু আনন্দ হলো রাপ্পার।

বাবা হাসপাতালে। বাপ্পাকে রান্নার লোক জানকি মাসির হেফাজতে রেখে রাপ্পা মাঠে চলে এসেছে। কয়েক ঘণ্টা পরেই তো ফিরবে, মাসি ততক্ষণ থাকতে রাজি হয়েছে। আজ গুলেদের শিক্ষা দিতেই হবে। অভিনন্দন ওদের টিমে খেলে, ওরা চারজন বুট পরছিল মাঠের বাইরে বসে। রাপ্পাকে দেখেই একটা অবজ্ঞার হাসি দিল। গুলে বলল, "কীরে ধাপ্পা, পরীক্ষা কেমন দিচ্ছিস? কান দুটো তো বাবার কানমলা খেয়ে লম্বা হয়ে গেছে দেখছি। দেখিস এবার যেন ফেলুবাবু হোস না।"

বাকিরা খুব একচোট হ্যা- হ্যা করে হাসল। উত্তর দিল না রাপ্পা। কোথায় কথা বাড়বে, দরকার কী। আজ জান লড়িয়ে দেবে রাপ্পা, এদের মুখ বন্ধ করতে হবে। তার কলম না চললেও পা যে খুব ভালো চলে সেটা এরাও ভালো জানে। সেইজন্যেই খেলা শুরুর আগে তাতিয়ে দিতে চাইছে, যাতে মাথা গরম করে রাপ্পা ভুল করে আর ওদের সুবিধা হয়ে যায়। কোনও ফাঁদে পা দেবে না সে। বুটের লেসটা বেঁধে মনে মনে মাকে প্রণাম করে মাঠে নামল রাপ্পা।

এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। সেনকাকুর মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল। তুলতেই ভাঙা গলা শুনতে পেলেন, "ও আর নেই সেনদা। অপারেশনের পর তিন ঘণ্টা মাত্র বেঁচে ছিল। তারপরে সব শেষ। ব্রেন টিউমারটা পুরো ছড়িয়ে পড়েছিল, কিছু করা গেল না। আপনি রাপ্পাকে খবর দিয়ে একটু নিয়ে আসতে পারবেন?"

"নিশ্চয় নিশ্চয়। আপনি একদম চিন্তা করবেন না, আমি আসছি।"

আরও মিনিট পনেরো পর, হন্তদন্ত হয়ে রাপ্পার বাড়িতে বেল বাজালেন সেনকাকু। মাসি দরজা খুলে বলল, “রাপ্পা তো ওই ডাকবাংলো মাঠে গেছে।”

সাইকেলে মাঠে পৌঁছতে আরও মিনিট কুড়ি লাগল সেনকাকুর। নেমেই ছুটে মাঠে যেতে গিয়ে থমকে গেলেন তিনি। রাপ্পাকে একদল ছেলে কাঁধে নিয়ে নাচতে নাচতে মাঠ ঘুরছে। পাশের একটা ছেলেকে জিজ্ঞেস করে জানলেন রাপ্পাদের টিম আজ চার- এক গোলে জিতেছে, তিনটে গোলই দিয়েছে রাপ্পা একা।

এগিয়ে যেতে গিয়েও পারলেন না সেনকাকু। মাঠের মাঝে যাকে দেখলেন সে তাঁদের সবার চেনা অপদার্থ, মাথামোটা রাপ্পা নয়। তাকে কী খবর দেবেন তিনি?

সূর্য ডুবে যাচ্ছে। সন্ধের মায়াবী কমলা আলোয় সতীর্থদের কাঁধের সিংহাসনে বসে আত্মবিশ্বাসের হাসি হাসছে মাঠের রাজা।

এইমাত্র ধ্রুবতারা দেখা গেল আকাশে। পাশে আরও একটা তারা টিপটিপ করে জ্বলছে, হাসছে রাপ্পাকে দেখে। বকাবকি করলেও প্রতিবার খেলায় জেতার পর মার চোখ দুটোও এইরকম জ্বলজ্বল করে উঠত গর্বে।

ছবিঃ শ্রী শাম্ব

সলিউশন এক্স্

দোয়েল বন্দ্যোপাধ্যায়

চৌকির উপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে আছে নাড়ুমামা। একটা ঠ্যাং আরেকটির উপর তোলা। গানের তালে তাল দেওয়ার মতো মৃদু- মৃদু নড়ছে পাদুটো। চোখের দৃষ্টি কড়িকাঠের দিকে স্থির। আমি জানি এসব কীসের লক্ষণ! নির্ঘাত একটা গুলগাপ্পা মার্কা গপ্পো ফাঁদছে। মানে আমার বিকেলে ফুটবল খেলাটা মাটি হবে। বাড়ির সকলে বেড়াতে গিয়েছে। আমি পেট কামড়াচ্ছে বলে যাইনি। পেট কামড়াচ্ছে না কচু! আজ গোকুলবাগানের ছেলেদের সঙ্গে আমাদের একটা ফাটাফাটি ম্যাচ আছে। এসপার নয় ওসপার। ওদের ক্যাপ্টেন ষষ্ঠীর খুব দেমাক। আজ ব্যাটাকে দেখে নেব। দুপুর থেকেই উত্তেজনায় ফুঁসছিলাম। তার মধ্যে কোথা থেকে বাক্স-প্যাঁটরা সমেত নাড়ুমামা এসে হাজির। নাড়ুমামাকে দেখে আমার মাথাটা ঝাঁ করে গরম হয়ে গেল। একে তো বাড়িতে কেউ নেই, তাই মামার হাজারো ফাইফরমাশ আমাকেই খাটতে হবে। শুধু তাই নয়, নাড়ুমামার একরাশ হাবিজাবি মনগড়া গপ্পোগুলোও শুনতে হবে। তবে নাড়ুমামা যে এতটা অপয়া, জানতাম না। ভেবেছিলাম দুপুরটা কোনওমতে টালবাহানা করে কাটিয়ে দেব আর মামা যখন ঘুমোবে টুক করে মাঠে চলে যাব। ও বাবা, সে গুড়ে বালি! নাড়ুমামা যখন একপেট খেয়ে ইয়াব্বড়ো একটা ঢেঁকুর তুলে তার ল্যাকপ্যাকে শরীরটা নিয়ে পায়চারি করছে, ঠিক তখনই আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। ধুত্তোর! এ তো মহা জ্বালা হল। এতক্ষণ তো দিব্যি কটকটে রোদ্দুর ছিল। আর বৃষ্টি হওয়া মানেই ম্যাচ পণ্ড হওয়া। ব্যস! সেই সুযোগে আমাকে একলা পেয়ে নাড়ুমামা আমায় উষ্টুম- ধুষ্টুম গপ্পো শুনিয়ে আটকে রাখবে।

আমি নাড়ুমামার দিকে মোটেও না তাকিয়ে একমনে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলাম। "হে ঠাকুর বৃষ্টি থামিয়ে দাও, আর কোনওদিন রান্নাঘরে ঢুকে চুরি করব না। হে ঠাকুর, বৃষ্টি থামিয়ে দাও। আর কোনওদিন অঙ্ক পরীক্ষায় ফেল করব না, হে ঠাকুর বৃষ্টি থামিয়ে দাও, আর কোনোদিন..."

"তুই হাড়জিরজিরি গ্রামের নাম শুনেছিস?" নাড়ুমামা মৌনব্রত ভাঙলেন। আমি জিভ ভেংচিয়ে বললাম, "জম্মে শুনিনি। ওরকম অলুক্ষুণে, আককুটেপানা গ্রামের নাম শুনতে আমার বয়েই গিয়েছে। হে ঠাকুর..."

"ঠাকুরকে আর ডাকিসনি রে নেবু, বৃষ্টি আজ আর থামবে না।"

"খবরদার বলছি, এরকম কথা বলবে না। বৃষ্টি থামবে, আলবাত থামবে।"

"সে যখন থামবে তখন দেখা যাবে। হাড়জিরজিরি গ্রাম থেকেই ডাইরেক্ট তোদের বাড়ি এলুম কিনা, তাই জিজ্ঞেস করছি।" এই বলে হে হে করে দাঁত বের করে হাসল।

বুঝতে পারলাম গপ্পো আস্তে আস্তে দানা বাঁধছে। আর নিস্তার নেই। তা এখন আমার যা অবস্থা, বাড়িতে কারেন্ট নেই, ফুটবল নেই, বোনের সঙ্গে খুনসুটি নেই। আমার তো মনে হচ্ছে চৌকির উপর আপাতত পদ্মাসনে বসে থাকা দি গ্রেট নাড়ুমামা আর আমি ছাড়া এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কিছুই নেই।

নাড়ুমামা বললেন, "ভাবিস না মিথ্যে বলছি। হাড়জিরজিরি গ্রাম সত্যি আছে। খুব ছোটোবেলায় যখন একবার গিয়েছিলুম, তখন দেখেছি বুঝলি। ওখানকার মানুষজন থেকে শুরু করে গরু, ছাগল, কুকুর এমনকী গাছপালা পর্যন্ত হাড়পাঁজরা বের করা। সেই থেকেই ওই নাম। এখন অবিশ্যি দেখলে বুঝবি না। আর এসব সম্ভব হয়েছে ক্ষ্যান্তপিসির জন্য।"

"তা তোমার এই জঘন্য গ্রামটা কোন জেলায় শুনি? আর এই ক্ষ্যান্ত পিসিই বা কে?"

"তুই আর জেলা- টেলার কোথা বলিসনি নেবু। তোর ভূগোলের দৌড় কতখানি সে আমার জানা আছে। মেদিনীপুরের পাশেই হচ্ছে সিঙ্গাপুর একথা লিখিসনি তুই পরীক্ষার খাতায়? আর ক্ষ্যান্তপিসি হচ্ছেন..."

এই পর্যন্ত বলে নাড়ুমামা আচমকা চৌকি থেকে নেমে সাঁ করে আমার পাশে সেঁটে দাঁড়িয়ে বললেন, "আগে বল পুরো গপ্পোটা শুনবি?"

"ঠিক আছে বাবা শুনব, উপায় কী না শুনে!"

"পুরোটা না শুনে বল পেটাতে যাবি না?

"না রে বাবা।"

মূলোর মতো দাঁত দেখিয়ে নাড়ুমামা এবার নিশ্চিন্ত হলেন। চৌকির উপর পুনরায় গুছিয়ে বসে বললেন, "তবে শোন। আমার মাসতুতো বোন পুঁটির শ্বশুরবাড়ি হল রতনপুর। হাড়জিরজিরির ঠিক পাশে। মাসির সঙ্গে ছোটোবেলায় ওখানে গিয়েছিলাম। সে অনেক কাল আগের কথা। তারপর ভয়ানক রকমের বড়ো হয়ে যখন মস্ত গোয়েন্দা হলুম..."

"ত- ত- ত- তুমি আবার গোয়েন্দা হলে কবে?" নিজের কানে শুনেও বিশ্বেস হচ্ছিল না আমার।

"হলে কবে মানে কী? আমি তো গোয়েন্দাই!"

"তবে যে মা বলল তুমি বাতের ব্যথার তেল বিক্রি করো!"

"করিই তো। ওটা হচ্ছে ছদ্মবেশ। ইংরিজিতে যাকে বলে ক্যামোফ্লাজ। ওসব তুই বুঝবি না। অনেক উচ্চমানের ব্যাপার কিনা।"

"বটে!" আমি মুখ হাঁড়িপানা করে বললাম। নাড়ুমামা পাত্তা না দিয়ে বলল, "যাক গে। যা বলছিলাম, গোয়েন্দা হওয়ার পর ওখানে গিয়ে তো আমার চক্ষু চড়কগাছ। সক্কলের চেহারা ফিরে গিয়েছে। কুকুরগুলো তেজী হয়ে খ্যাঁকখ্যাঁক করে কামড় দিতে আসছে, গরুগুলো গাঁকগাঁক করে গুঁতোতে আসছে। সে এক বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড। মানুষজনের চেহারাও দিব্যি খোলতাই হয়েছে। কী দেমাক তাদের ! ভাবলাম ব্যাপারটা একটু সরেজমিনে তদন্ত করতে হবে। কিন্তু পুঁটির আস্তানায় থেকে সেটা সম্ভব নয়। জানিসই তো ভালো গোয়েন্দারা সব সময় স্পটে গিয়ে তদন্ত করে।"

"কোন গণ্ডগ্রামের লোকেদের শরীর স্বাস্থ্য চেকনাই হল, তা নিয়ে তোমারই বা এত তদন্তের কী দরকার ছিল বাপু?"

“মেলা ফ্যাঁচফ্যাঁচ করিসনি তো। পুরোটা শোন আগে। হাড়জিরজিরিতে পুঁটির আপন দেওরের আপন শালীর আপন বান্ধবীর আপন মামীর বাড়িতে ডেরা জমালাম।”

“তোমার মাসতুতো বোনের দেওরের শালীর বান্ধবীর মামী তোমায় থাকতে দিল?”

“দেবে না কেন শুনি? তখনকার দিনে অত আপন- পর ছিল না। তাছাড়া আমার নামডাক শুনে তো মামী এক্কেরে আহলাদে আটখানা! তো সেই মামীর কাছ থেকেই প্রথমে কথা বের করার চেষ্টা করলাম। মামী জানাল কোনও এক ক্ষ্যান্তপিসির তৈরি আচার খেয়ে সকলের নাকি সব রোগব্যাধি সেরে গিয়েছে। পিসির তৈরি আচারে নাকি বিশেষ একটা জিনিস মেশানো হয়। কিন্তু সেটা যে কী, সেটা পিসি ছাড়া কেউ জানে না। আর জানে না বলেই নাম দিয়েছে সলিউশান এক্স। ব্যস! তদন্তের প্রথম সূত্র হাতে এসে গেল। মনে মনে পিতিজ্ঞে করলুম এই অজানা জিনিসটা কী আমাকে জানতেই হবে। নইলে আমার নাম নাড়ু গোয়েন্দা নয়।

“যেমন ভাবা তেমনি কাজ। পরের দিন থেকেই তদন্তে নেমে পড়লুম। খুব গোপনে রীতিমতো প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে কয়েকটা তথ্য জোগাড় করলুম ক্ষ্যান্ত এবং তার আচার সম্পক্কে। প্রাথমিক তদন্ত অনুযায়ী বোঝা গেল, ক্ষ্যান্তর সাত পুরুষের ভিটে হল এই হাড়জিরজিরি। অল্প বয়সে বিধবা হয়ে এখানেই আস্তানা পাতলেন পিসি। মাঝে মধ্যে আচার তৈরি করে পাড়ার লোকজনদের বিক্রি করতেন। গ্রামের মাতব্বররা পিসিকে এই আচারের ব্যবসা করার পরামর্শ দিলেন। তা বাপু গেরামভারী গোছের উপদেশ দিলেই তো আর হল না। ব্যবসাপত্তর করতে তো টাকা লাগে, সে আর তিনি পাবেন কোথায়। এমন সময় ঘটল এক অদ্ভুত ঘটনা। আমার অবিশ্যি সব শুনে- টুনে খুব একটা পেত্যয় হইনি। ধাপ্পাও হতে পারে।”

“অনেকটা তোমার গল্পের মতো।” আমি আস্তে করে ফুট কাটলাম। বৃষ্টি আর বাজের শব্দে নাড়ুমামা বোধ হয় কথাটা ঠিক শুনতে পেল না।

“কী বলছিস?”

“কিছু না, বলছি সে তো হতেই পারে।”

“হ্যাঁ, আমারও সেটাই বক্তব্য। তবে ঘটনাটা ভারী মজার। তোর মতো হুঁকোমুখোদের তো আরও বেশি করে শোনা দরকার। হে! হে! হয়েছিল কী, হাড়জিরজিরিতে নদীর উপর সেতু তৈরি করার জন্য এলেন এক মস্ত সাহেব ইঞ্জিনিয়ার, সঙ্গে এলেন তার মেম। সেতু তো ধীরে- ধীরে তৈরি হতে থাকল, কিন্তু এখানকার জল হাওয়ায় মেমের বেদম অসুখ হল। এই ডাক্তার সেই ডাক্তার, হাকিম বদ্যি সকলেই হার মানল। এদিকে সাহেবের তো মাথায় হাত। এমন সময় মেমের অসুখের খবর পেয়ে কোঁচড়ে আচারের শিশি নিয়ে ক্ষ্যান্ত সেখানে এসে হাজির। সাহেব ভুরু কুঁচকে জানতে চাইলেন, ‘হোয়াট ইজ দিস?’ ক্ষ্যান্তও দমে যাবার পাত্রী নন। তিনিও তোর মতো জঘন্য ইংরিজিতে জবাব দিলেন, ‘সাহেব, দিস আচার, মেম ইট, একদম ফিট!’ বলেই আচারের শিশি খুলে মেমের লম্বা নাকের সামনে ধরল। মেমও বাপু বলিহারি যাই। আচারের গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে দিল এক খাবল মুখে পুরে। ব্যস! আর যায় কোথা। ওই জাঁদরেল টক আচার খেয়ে মেম

তো খো- খো- খি- খি- খোয়াস- খোয়াস করে হেঁচে কেশে অস্থির হয়ে বিষম খেতে- খেতে কাটা কলাগাছের মতো দুম করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। সাহেব তো পুরো রেগে ফায়ার। ক্ষ্যান্তরও মুখ শুকিয়ে আমসি। অবশেষে আধবালতি বরফ জল মেমের মাথায় ঢেলে আর সাহেবের মস্ত জুতোখানা শোঁকাবার পর মেমের জ্ঞান যখন ফিরল, দেখা গেল মেমের সব রোগ সেরে গিয়েছে। পেট কামড়ানো, দাঁত কিড়মিড়, মাথা ব্যথা, কান কটকট, অম্বল, চোঁয়া ঢেকুর সব উধাও! মেম তো আনন্দে আত্মহারা হয়ে ইংরিজিতে অনেক কঠিন- কঠিন শব্দ বলে ক্ষ্যান্তকে জড়িয়ে ধরল আর সাহেবেরও হুলোপানা মুখে এক চিলতে হাসি দেখা গেল। মোদ্দা কথা হচ্ছে সাহেব দেশে ফেরার আগে ক্ষ্যান্তকে মোটা রকমের বকশিশ দিয়েছিলেন, সেই টাকাতেই আচার ব্যবসার শুরু। তবে সাহেব তো এ্যাদ্দিনে মরে ভূত। মেমসাহেবও খুনখুনে বুড়ি। তো আমি করলাম কী, সাহেবের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দুর্দান্ত ইংরিজিতে চিঠি লিখে যোগাযোগ করলাম। আমার চিঠি পড়ে তো সাহেবের ছেলেমেয়েরা অবাক। আমাকেও ওদের মতো সাহেব- টাহেব ভেবে...”

“বুঝেছি। আর সলিউশন এক্স?”

“ইয়েস, সলিউশন এক্স। ওরা জানাল, ক্ষ্যান্ত নাকি সাহেবকে শর্ত দিয়েছিল, এই কথাটা জিজ্ঞেস করা চলবে না। আর সাহেবদের তো জানিস কথা ইজ কথা! কবরে যাওয়া পর্যন্ত স্পিকটি নট। তাই শেষমেষ আমাকেই মাঠে নামতে হল। মানে আমি ইতিমধ্যেই মাঠে ছিলাম, শুধু কোমর বাঁধলাম কষে।”

“হুলোবেড়ালের মতো।” আমি ভালোমানুষ মুখ করে বললাম।

“বাজে বকিস না।” নাড়ুমামা খেঁকিয়ে উঠল।

“আমার গোয়েন্দাগিরি সম্পর্কে তোর কোনও ধারণাই নেই।আমি প্রথমেই ক্ষ্যান্ত পিসির থেকে ঝটপট কয়েক বোতল আচার কিনে ফেললাম। আম, জাম, তেঁতুল, লেবু... আচার খেয়ে খেয়ে আমার চেহারা ফিরে গেল। কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারলাম না, ওতে কী এমন আলাদা জিনিস মেশানো আছে। কিন্তু হাল ছাড়লে তো চলবে না। জানিসই তো আমার আবার দেশে- বিদেশে বন্ধুর ছড়াছড়ি। আচারের খানিকটা নমুনা পাঠালাম আমার জাপানি বন্ধু হামাগুড়িকে। হামাগুড়ি ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে আমায় জানাল, এতে আছে ম্যাঙ্গো, অয়েল, সুগার আর...”

“আর?” আমি চোখ গোল করে জানতে চাইলাম।

“আর সল্ট, মানে ইয়ে নুন!” কাঁচুমাচু মুখে বলল মামা।

“মানে?”

“মানে আমার মুন্ডু। হামাগুড়িও ধরতে পারল না ওতে স্পেশ্যাল কী মেশানো হয়। আমি তখন নাওয়া- খাওয়া ভুলে ক্ষ্যান্তকে সর্বত্র ফলো করতে লাগলাম। ক্ষ্যান্ত ডালে- ডালে আমি পাতায়- পাতায়, ক্ষ্যান্ত ফুলে- ফুলে আমি ফলে- ফলে, ক্ষ্যান্ত মাঠে- মাঠে আমি...”

"ধুত্তোর! বুঝেছি রে বাবা। এত উপমা দেওয়ার কী আছে?"

"আরে এসব তো তোকে আমি তদন্তের গুরুত্ব বোঝাবার জন্য বলছি। তবে কী জানিস নেবু, এত ফলো করেও কিচ্ছুটি টের পেলাম না। মাঝখান থেকে একদিন বাঁশবনের মধ্যে ক্ষ্যান্তকে শ্যাডো করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলাম। পিসি আমায় পা থেকে খড়ম খুলে আগাপাশতলা পেটালেন। তারপর বললেন, 'বল বদমায়েশ, কেন আমার পিছু নিয়েছিস?'

"আমি কোঁ-কোঁ করে বললাম, 'আচারে কী মেশান, সেইটে জানতেই...'

"তখন আমায় ছেড়ে দিয়ে হাত ঝেড়ে পিসি বললেন, 'ওহ এই ব্যাপার। তার জন্য এত কসরত কেন বাপু। আমি তো সলিউশন এক্স মেশাই। গাঁশুদ্ধু লোক জানে।'

"'আরে ওই সলিউশনটা কী সেটাই তো...'

"পিসি ফিক করে হেসে ফেললেন, 'ঠিক আছে, কাল সকালে আসিস, বলে দেব।'

"সেকী? এত সহজ? কাউকে বলেনি আর তোমাকে বলে দিল?"

"এমনি কি আর দিল রে! গোটাদশেক জর্দাপান আর পিসির পেয়ারের বেড়াল লবনচুষের জন্য কুঁচো মাছ ঘুষ দিলাম তবেই না বলল।"

"শুধু গোটাকয়েক জর্দা পান আর কুঁচো মাছেই কাজ হাসিল?"

"নয়তো কী? তবে হ্যাঁ, আমার এই অধ্যাবসায় দেখেও পিসির মন গলেছিল বৈকি।"

"এবার দয়া করে এটাও বলে দাও ওতে আসলে কী আছে? মানে এই সলিউশন এক্সটা আসলে কী?"

নাড়ুমামা খুব কায়দা করে পা দুলিয়ে-দুলিয়ে বলল, "কিস্যু না! আধছটাক মনের জোর আর পোয়াটাক ভরসা।"

"ক-ক-কী?"

"হ্যাঁরে। হাড়জিরজিরে গ্রামের গরিবগুর্বো লোকগুলো কী আর খায় বল। পিসির তৈরি আচার হাতে পেয়ে ভাবল ওতে কিনা জানি মেশানো আছে। এই ভেবেই সাদামাটা ডালভাত দিব্যি আরামে খেয়ে নিল। আরে

বাবা, দেশ গাঁয়ে তো আচার- টাচার তৈরি হয়েই থাকে। পিসির বুদ্ধিখানা দ্যাখ। ওই একই জিনিস কেমন আলাদা করে দিল! রহস্যেরও সমাধান হল আর আমিও পিসির পায়ে পেন্নাম ঠুকে এখানে চলে এলুম।”

অনেকক্ষণ বকবক করে নাড়ুমামা ক্লান্ত হয়ে আবার চৌকিতে চিৎপাত হলেন। ওদিকে বৃষ্টিও ধরে এসেছে। তার মানে ম্যাচটা হচ্ছেই। আমি খুশি মনে পায়ে বুট গলাচ্ছি। নাড়ুমামা আবার সাঁ করে আমার কাছে এসে কানে- কানে বললেন, “শোন নেবু, আমি যে গোয়েন্দা, সেটা কিন্তু কাউকে বলিস না। চারদিকে শত্তুর কিলবিল করছে। জানাজানি হলে কেলেংকারি হয়ে যাবে।”

আমি হেসে ফেললাম, “ঠিক আছে, বলব না।” মাঠে লোক আসতে শুরু করেছে। চিৎকার শুনতে পাচ্ছি। খেলা বোধ হয় শুরু হয়ে গেছে। আমি দরজার কাছে গিয়ে আবার ফিরে এসে নাড়ুমামাকে বললাম, “আচ্ছা, এই যে গোপন কথাটা তুমি জেনে ফেললে, তুমি যদি কাউকে বলে দাও তখন…”

নাড়ুমামা হাই তুলে বললেন, “নাহ বলব না, আমারও ওই সাহেবদের মতো ব্যাপার। কথা ইজ কথা! আর তাছাড়া...”

নাড়ুমামার বাকি কথাটা শোনা হল না। মাঠ থেকে সমবেত চিৎকার এল, “গো- গো- গো- ল!”

ছবিঃ শ্রী শাম্ব

হারানো সুর পথের বাঁকে

রাখী নাথ কর্মকার

"কাল আমরা সবাই পাখির ছবি আঁকব, কেমন?" ক্লাস ছেড়ে চলে যাবার আগে আর্ট টিচার সুজাতা ম্যাম সবাইকে বলে গেলেন। সকলেই সমস্বরে ঘাড় নাড়ল, "হ্যাঁ।" এক ঋষভ ছাড়া। ও তখন বেঞ্চের এক কোণে মাথা নিচু করে বসে।

এছাড়া আর কীই বা করার ছিল ঋষভের। ছবি আঁকার সময় হয় পেনসিল, নয় রঙ, নয় ওর কল্পনাশক্তি — কোনও না কোনও একটা ঠিক বিগড়ে যায়। যেমন আজকেই কী হল দ্যাখো না। সুজাতা ম্যাম ফুলের ছবি আঁকতে বলেছিলেন। তো ঋষভ কত যত্ন করে কী সুন্দর একটা ফুলের ছবি আঁকল, তাতে লাল টুকটুকে প্যাস্টেল ঘষে জীবন্ত করে তুলল। অথচ যেই না সুজাতা ম্যামের হাতে খাতাটা পড়ল, ম্যাম গম্ভীর স্বরে ডাকলেন, "ঋষভ, এটা কীসের ছবি এঁকেছ?"

ঋষভ দাঁত বের করে বলেছিল, "গোলাপ ফুল ম্যাম।"

"এটা গোলাপ ফুল!" সুজাতা ম্যামের গলায় অতল বিস্ময়। খাতাটা সবার সামনে তুলে ধরে বললেন, "এটা কি তোমাদের গোলাপ ফুল বলে মনে হচ্ছে নাকি একটা আনটাইডি লাল রঙের হিজিবিজিবিজ?"

ক্লাসশুদ্ধ বাচ্চারা হো হো করে হেসে উঠেছিল আর ঋষভ লজ্জায় লাল হয়ে মাটির সাথে মিশে গিয়েছিল। না। কাল ও স্কুলেই আসবে না, ঠিকই করে নিল ঋষভ। কাল সকালে উঠেই মাকে বলবে, "পেট ব্যথা করছে।"

মনটা এমন খিঁচড়ে গেল ঋষভের যে, বিকেলে বুবাইরা ওকে খেলতে ডাকল যখন, ইচ্ছেই করল না ওর বেরোতে। সন্ধেবেলা অঙ্ক করতে বসে দীপ্তি আন্টির কাছে চারটে অঙ্ক ভুল করল ও। ইংরেজির পাঁচটা 'অপোজিটস' লিখতেই পারল না। দীপ্তি আন্টি বলে গেলেন, "তোমার পড়াশুনোয় আজকাল একদম মন নেই। মাকে বলতে হবে।"

রাতে রুপাদিদি রুটিতরকারি আর এক গ্লাস দুধ সামনে এনে রাখল ঋষভের। ঋষভ ক্লান্ত স্বরে বলল, "খেতে মোটে ইচ্ছে করছে না দিদি।" রুপাদিদি রাগ করে বলল, "মার ফিরতে দেরি হবে, অফিসে মিটিং আছে। খেয়ে নাও। নয়তো মা খুব রাগ করবে।" প্রচণ্ড বিরক্তিতে, বেজার মুখে কোনও মতে একটা রুটি চিবিয়ে, আধগ্লাস দুধ নাক বন্ধ করে গিলে নিয়ে বিছানায় গিয়ে উপুড় হল ঋষভ।

চোখ বুজলেই ওর চোখের ওপর ভেসে উঠছিল ক্লাসসুদ্ধ যত ছেলেদের হাসি, "হো- হো- হো- হো।" কান্না পেয়ে যাচ্ছিল ঋষভের-

- চোখটা বোধ হয় একটু লেগে এসেছিল। কীসের যেন একটা ঝটপট আওয়াজে ওর ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলে জিরো পাওয়ারের বাল্বের মৃদু আলোয় ঋষভ দেখল অদ্ভুতদর্শন একটা পাখি ওর পড়ার টেবিলের ওপর বসে ডানা ঝাপটাচ্ছে।

ভয় পেয়ে গিয়ে ঋষভ ঘরের বড়ো টিউবলাইটটা জ্বালাতে যাচ্ছিল, পাখিটা তড়িঘড়ি কট কট করে বলে উঠল, “আরে- রে- রে- রে আলো জ্বালো কেন! আলো জ্বালো কেন! আলোয় এখন আমার বড়ো কষ্ট হয়।ভালো করে চোখটা একটু কচলে নাও। এই আলোতেই আমায় দেখতে পাবে।”

ভালো করে চোখ কচলে নিয়ে ঋষভ তাকাল পাখিটার দিকে। পায়রার মতো দেখতে নিরীহ একটি পাখি। লেজ আর ডানা ছাড়া উপরের অংশ ধূসর কালো। মাথাটিতে সবুজাভ বেগুনী রঙ। তাতে কেমন যেন রামধনু রঙের ছোঁয়া। ঘাড়ের কাছটা চকচকে সোনালি সবুজ। ছোট ফুরফুরে ডানা দুটি নীলাভ সবুজ আর ঘন নীলে ঢাকা লেজের ওপরের অংশটুকু উজ্জ্বল হলদে সবুজ। বুক ও পেটের কাছে ছড়িয়ে আছে সবুজ বেগুনী আভা। চোখ দুটি ঘন নীল আর ঠোঁটটি যেন সবুজে হলুদে মাখামাখি। গাঢ় লাল পা দুটিতে চনমনে তাড়া।

পাখিটা এবার কক্ কক্ করে বলে উঠল, “আমায় চিনতে পারছ না তো? আমি হলুম গিয়ে বনিন উড পিজন, অর্থাৎ কিনা বনিন কাঠ পায়রা। আমার আদি বাস হল জাপান। তোমায় একা একা কাঁদতে দেখে ভারী কষ্ট হল। তাই ভাবলুম তোমাকে একটু সাহায্য করি। এবার আমাকে ভালো করে দেখে নাও দিকিনি। এই দেখো না কেমন আমার ঘন নীলাভ সবুজ ডানা, কেমন নীল চোখ, কেমন রঙের খেলা চলছে আমার সারা দেহে। আচ্ছা এক কাজ করো না কেন? খাতা পেনসিল নিয়ে বসে যাও। এই আমি স্থির হয়ে বসছি। একটু প্র্যাকটিস করে নাও না কেন?”

টেবিলের উপর ছোট্ট টেবিল ল্যাম্পটার সুইচের ওপর টুক্ করে গিয়ে বসল পাখিটা। ল্যাম্পের হলদে আলোয় ছবি আঁকতে গিয়ে ঋষভ ভীষণ অবাক হয়ে দেখল, পেনসিল বা রঙ, কোনওটাই আজ আর বেগড়বাঁই করছে না। পাখিটার লেজের হলদে সবুজ রঙটা ঘষে ছবিটা শেষ করতে যাচ্ছে, চঞ্চল পাখি ছটফট করে উঠল, “ঋষভ, এবার আমার যাবার সময় হয়ে এল। দেখবে, কাল তোমার আঁকায় আর কোনও ভুল হবে না।”

পাখিটা উড়ে যাবার মুহূর্তে ঋষভ চিৎকার করে উঠল, “তোমার সাথে আবার কোথায় দেখা হবে গো, চিড়িয়াখানায়?”

জানালার বাইরে আবছা অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে যেতে পাখিটা বলে গেল, “না ঋষভ, আর তোমার সাথে আমার দেখা হবে না। মানুষের হিংসা, চোরাশিকারির অত্যাচার, অহেতুক গাছ কেটে সাফ করে দেওয়া — এ সবের কারণে উনিশ শতকের গোড়া থেকেই আমি হারিয়ে গেছি। অবলুপ্ত হয়ে গেছি মানুষের হিংসার কারণে। এরকম কত শত পাখি হারিয়ে যাচ্ছে যে বন্ধু। ঋষভ, আমায় ভুলো না, ভুলো না…”

সকালের উজ্জ্বল, হলুদ সূর্যটা তেরছাভাবে ঋষভের চোখে পড়তেই ও চোখ খুলল। দিনের ঝলসানো আলোয় কাল রাতের স্বপ্নটা মনে পড়তেই ওর হাসি পেল, কী সব যে আবোলতাবোল স্বপ্ন দেখছে ও আজকাল! কিন্তু... কিন্তু ওটা কী? টেবিলের ওপর ঐ পাখির ছবিটা, ওটাই কাল রাতে এঁকেছিল না ও?

স্কুলে ছবি আঁকার ক্লাসে শেষে সুজাতা ম্যাম ঋষভকে কাছে ডাকলেন, "ঋষভ, এটা কী এঁকেছ?" দুটি চোখে অপরিসীম উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে দিয়ে ঋষভ হাসল, "ম্যাম, এটা হল বনিন উড পিজন। এক সময়ে জাপানে দেখা যেত। মানুষের হিংসা, গাছ কেটে ফেলা এসব নানা কারণে এরা হারিয়ে গেছে ম্যাম, অবলুপ্ত!" এই নতুন শব্দটার মানে কাল রাতেই প্রথম জেনেছে ঋষভ।

সুজাতা ম্যাম অবাক হয়ে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন ঋষভের দিকে। বোধ হয় ঋষভের কথাগুলো বুঝে ওঠার চেষ্টা করছিলেন। তারপর বিস্ফারিত দুই চোখে মিষ্টি হাসির ছোঁয়া বুলিয়ে দিয়ে ম্যাম বলে উঠলেন, "খুব সুন্দর হয়েছে এই ছবিটা ঋষভ। কিপ ইট আপ।"

ক্লাস ছেড়ে যাওয়ার আগে ম্যাম বলে গেলেন, "পরের দিন আমরা অ্যানিম্যাল অর্থাৎ জীবজন্তুর ছবি আঁকব, কেমন?"

ঋষভ সেদিন বেশ ভয়ে ভয়েই ঘুমোতে গেল। কাল কী জীবজন্তুর ছবি আঁকবে ও! আবার তো সেই আবোলতাবোল আঁকিবুকি – গাধার লেজটা ছাগলের মতোই এঁকে ফেলবে হয়তো। হয়তো ওর আঁকা খরগোশের ছবিটা দেখতে লাগবে জোজোদের হুমদো, বিদঘুটে বিড়ালটার মতো। আর ক্লাসসুদ্ধ সব্বাই – "হো হো হো।"

কিচ্ কিচ্ কিচ্ – অদ্ভুত একটা আওয়াজে ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে বিছানার ওপর উঠে বসল ঋষভ। নাইট ল্যাম্পের মৃদু আলোয় ও দেখল টেবিলের ওপর ঘুরঘুর করছে ছোট্ট একটা প্রাণী। কী ওটা? কামড়ে- টামড়ে দেবে না তো? ভয়ে চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল ঋষভ। প্রাণীটা গম্ভীর স্বরে বলে উঠল, "আ- হা- হা আবার চিৎকার করো কেন? আমি কি তোমায় মারছি না ধরছি? আমি কোথায় তোমার সাথে একটু গল্প করতে এসেছি, আর তুমি নাকি চেঁচিয়ে লোক জড়ো করছ!"

ঋষভ বিস্ময়ে কয়েক সেকেন্ড কোনও কথাই বলতে পারে না। প্রাণীটার দিকে তাকিয়ে থাকে নির্নিমেষ। ছোট্ট খরগোশের মতো আকারের একটা জন্তু – কুতকুত করে চকচকে চোখে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। প্রাণীটা আপনমনে বলতে থাকে, "নাও, নাও, এবার একটা আমার সুন্দর ছবি এঁকে ফেলো দিকিনি। দেখবে কাল স্কুলে জীবজন্তুর ছবি আঁকতে তোমার একটুও কষ্ট হবে না।"

ঋষভ তড়িঘড়ি খাতা পেনসিল নিয়ে বসে যায় ছবি আঁকতে। জন্তুটা খুট করে টেবিলল্যাম্পের ওপর গিয়ে বসে। ছোট্ট ইঁদুরের মতো দেখতে লম্বা লেজ, গায়ের রঙ হালকা বাদামি। পেছনের পা দুটি ক্যাঙারুর পায়ের মতো লম্বা। ছবিটা রঙ করতে করতে ঋষভ প্রশ্ন করল, "তোমার নাম কী গো?"

প্রাণীটা কিচকিচ করে বলে উঠল, "আমি হলুম গিয়ে মরুভূমির ইঁদুর- ক্যাঙারু। আমার আদি বাস উত্তরপূর্ব অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু কী বলব, মানুষের অহেতুক হিংসা আর লোভের কারণে আমি আজ প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছি। থাক সেসব কথা। ঋষভ, কাল তুমি কিন্তু আমার সুন্দর ছবি আঁকবে কেমন?"

পরের দিন ঘুম ভেঙে উঠে হাই তুলতে তুলতে ঋষভ টেবিলের দিকে তাকায়। হ্যাঁ, টেবিলের ওপর আলগোছে পড়ে রয়েছে ছোট্ট প্রাণীটার ছবি, যেটা কাল রাতেই এঁকেছে ঋষভ।

ছবি আঁকার ক্লাসে সুজাতা ম্যাম যথারীতি সবার খাতা জমা নিলেন। নাঃ, ঋষভ সেদিনও কোনও ভুল করেনি। না ড্রইং- এ, না রঙে। ছোট্ট প্রাণীটার চেহারাটা যেন স্পষ্ট ভেসে উঠছিল ওর চোখের পাতায়। ছবি আঁকার ফাঁকে ফাঁকে ম্যাম এদিক ওদিক ঘুরে সবাইকে দেখিয়ে দিচ্ছিলেন। ঋষভের কাছে এসে ম্যাম থমকে গেলেন, "ঋষভ! এটা কীসের ছবি?"

"ম্যাম, এটা ডেজার্ট র‍্যাট ক্যাঙারুর ছবি," বুক ফুলিয়ে বলল ঋষভ, "এই প্রাণীটিও মানুষের হিংসা ও লোভের কারণে প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে।"

দু চোখে অপার বিস্ময় নিয়ে সুজাতা ম্যাম কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন ঋষভের দিকে। তারপর আলতো হেসে ঋষভের পিঠ চাপড়ে দিলেন।

সেদিন ঋষভ নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে যাবে ভাবল। পরের দিন ম্যাম গাছের ছবি আঁকতে বলেছেন। গাছ আঁকা তো খুবই সোজা। একটা কাণ্ড, খানকয়েক পাতা, শিকড়... কিন্তু কীসের একটা আওয়াজ হচ্ছে না? মৃদু হাওয়ায় গাছের পাতা দোলার শনশন শব্দ! ঋষভ ঘরের চারিদিকে তাকায়। মৃদু আলোয় দেখে, ওর বিছানার দক্ষিণ দিকের খোলা জানালার ওপারে অনেকটা নারকেল গাছের মতোই দেখতে একটা গাছ।

লম্বায় প্রায় পাঁচ- ছ মিটার উঁচু হবে। জানলা দিয়ে ভেসে আসা বসন্তের মৃদু হাওয়ায় দুলছে ওর ঝাঁক ঝাঁক পাতা। ঘন সবুজ পাতাগুলো চাঁদের মৃদু আলোয় ঝলমল করছে। ঋষভ কিছু বলে ওঠার আগেই গাছটা পাতা দুলিয়ে বলে ওঠে, "কাল তুমি আমার ছবি এঁকো কেমন? যারা হারিয়ে যায়, তাদের খোঁজ কজনই বা রাখে? আমার আদিবাস ছিল দক্ষিণ আফ্রিকায়। আমি হলুম গিয়ে উডস্ সাইক্যাড। আমার মতো এরকম কত গাছপালা হারিয়ে গেছে কালের অতলে, যার পিছনে মানুষের দায়িত্ব কম কিছু নয়।"

ঋষভ ছবি আঁকতে বসার আগেই ঘরের দরজায় খুট করে আওয়াজ হয়। দরজার বাইরে মার গলা শোনা যায়, "ঋষভ! এত রাতে ঘুমের মাঝে কী বকবক করছ সোনা?" ঋষভের গায়ের ওপর পাতলা চাদরটা টেনে দিতে দিতে মা মৃদু হাসেন, "উঃ! কী বেকায়দায় ঘুমোয় না ছেলেটা !"

পরের দিন সকালের নরম, হলুদ সূর্যটা টুক করে ঋষভের ঘরে ঢুকে পড়তেই ও আড়মোড়া ভেঙে ওঠে। রোজের মতোই টেবিলের দিকে তাকায় ঋষভ। নাঃ! গতরাতে তো ছবিটা আকাঁই হয়ে উঠল না। কিন্তু ঋষভ জানে, ও পারবে, ও ঠিক পারবে, প্র্যাকটিস না করেই আজ ও ড্রইং ক্লাসে এঁকে ফেলবে সবুজ চিকন পাতার রাশি দুলিয়ে হেসে ওঠা একটা হারিয়ে যাওয়া গাছের ছবি।

সুজাতা ম্যাম সেদিনও ঋষভের আঁকা ছবিটার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। তারপর মিষ্টি হেসে বলেন, "তোমাদের জেনে ভালো লাগবে, তোমাদের স্কুলের অ্যানুয়াল পেন্টিং একজিবিশনে তোমাদের ক্লাস থেকে থেকে ঋষভের নাম পাঠাচ্ছি। আরও যে তিনজনের নাম তোমাদের ক্লাস থেকে পাঠাচ্ছি তারা হল..."

অ্যানুয়াল পেন্টিং এগজিবিশনে ঋষভের আঁকা ছবিটা হাতে নিয়ে প্রিন্সিপ্যাল বলে ওঠেন, "ছোটো ছোটো শিশুদের মনে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মভাব গড়ে তোলার এই তো প্রকৃত সময়, প্রকৃতি আর মানুষ যে একে ওপরের নির্ভরশীল — এই সত্যটা তাদের বুঝিয়ে দেওয়ার এই তো উপযুক্ত সময়।" তখন আকাশে বাতাসে সোনা রোদের ছড়াছড়ি। কৃষ্ণচূড়া, পলাশের রঙে রাঙানো বিশ্বচরাচর। গাছে গাছে পাতায় পাতায়, ফুলে ফলে হাজার পাখিদের কলকাকলি, কাঠবেড়ালির কিচিরমিচির।

ভিকট্রি স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আট বছরের ছোট্ট ঋষভ যখন বলল ও প্রাইজ মানিটা ওদের পাড়ার 'নেচার অ্যাডোরার্স অ্যাসোসিয়েশন'- এর হাতে তুলে দেবে; সবাই উৎসাহঘন চোখে, উচ্ছ্বসিত হাসিতে মুখর হয়ে ওঠেন। কিন্তু এই বইটা, যে বইটা প্রিন্সিপ্যাল ম্যাম আজ এই মুহূর্তে ওর হাতে তুলে দিলেন, এই বইটা ও যেন কোথায় দেখেছে? ভীষণ চেনা চেনা লাগছে না? কোথায় দেখেছে ও? ছোটোমামার বাড়িতে না?

ছোটোমামার পড়ার ঘরে কি? পাতায় পাতায় কত শত অবলুপ্ত পাখি, জন্তু, গাছের ছবি... আরে! এই তো বনিন উড পিজনের আর ডেজার্ট র‍্যাট ক্যাঙারুর ছবি। এই তো উডস সাইক্যাডের ছবি। ঋষভ অবাক হয়ে পাতা ওলটায়। অস্ফুটে বলে ওঠে – "তোমাদের আমি কক্ষনো ভুলব না... কক্ষনো না..."

ছবিঃ শ্রী শাম্ব

সকালবেলা হামু এসে বলল, “মুড়িতো খাচ্ছিস গরুর মত চপর্ চপর্ করে সকাল সন্ধে, যেতিস যদি কাজল দিঘিতে এই বড়ো বড়ো পানিফল। আর দিঘির পাড়ে আনারসি আম। ভূতুড়ে আম, জামরুল, লিচু – কত্ত গাছ। ফলের ভারে ডালগুলো মাটি ছুঁই ছুঁই, তোলো আর খাও। যাস যদি চল, নয়তো খেয়ে দেয়ে কাজ কিছু কম নেই আমার। ব্যাঙাকে ডেকে এসেছি, ল্যাংড়া গোঁসাই- এর দোকানে ঢাউস ঘুড়ি কিনতে যেতে হবে। নাঃ – যাই। কই গো দিম্মা মোয়া- টোয়া কি দেবে দাও”।

আমি আস্তে আস্তে ঢোঁক গিলে বললাম, “কিন্তু কাজল দিঘিতে নাকি কী কারা সব থাকে। সবাই যেতে বারণ করেছে! হ্যাঁরে লিচুও হয়েছে দেখেছিস?”

“দুর্ যত ভীতু নিয়ে পড়েছি। যেতে ইচ্ছে না করে তো যাস না। হ্যাঁ ওখানে ভূত থাকে, রাক্ষস থাকে, ডাইনোসর থাকে – কই গো দিম্মা মোয়া দিলে না? নাঃ, ব্যাঙার সাথেই যাই।”

আমার রাগ হয়ে গেল। আমি ভীতু! আর ও যে রাত্তিরে বাইরে যেতে ভয় পায়! ও যে বন বেড়ালে ডাকলে ফিট হয়ে যায়! হাতের আধখাওয়া মোয়াটা দিদিমার পেয়ারের কুকুর লালীর দিকে গড়িয়ে দিয়ে মুখটুক মুছে উঠে দাঁড়ালাম।

কাজল দিঘির পথে শেষ বাড়ি মিস্তিরিদাদুর, তারপরেই বেঘো জঙ্গল। পাথর বিছোনো পথ শেষ হয়ে সেখানে কেবল রাঙামাটির পথ। বর্ষার কাদা গরুর গাড়ির চাকার দাগ বুকে নিয়ে শুকিয়ে পাথরের মত শক্ত। সেই রাস্তা বন জঙ্গলের মধ্যে খানিকটা খানিকটা দেখা যাচ্ছে বাকি ঢাকা পড়ে গেছে। কী সব অদ্ভুত ব্যাপার সেই জঙ্গলে! পথের মাঝেই দোতলাবাড়ি সমান মস্ত উইঢিপি। উইমাটির মাঝে মাঝে পোড়ামাটির লাল খুদে খুদে মূর্তি বসানো পুরনো মন্দিরের গা দেখা যাচ্ছে। মাথার উপরে কোথায় কাঠঠোকরা ঠক্ ঠক্ ঠকাস্ ঠক্ করে কামারের দোকানের হাতুড়ি পেটার শব্দ তুলছে। হামু মাথার উপর আঙুল তুলে দেখাল লাল পিঁপড়ের পাতা সেলাই করা বাসা। বাবা রে! কানের পর্দা ফেটে যাবার মত নিঃঝুম চারধার। কেমন খিদে পেয়ে গেল হাঁটতে হাঁটতে। কতকগুলো লিচু পেড়ে নিয়ে বসে গেলাম একটু ফাঁকা

মত দেখে ঘাসের ওপর। আর ঠিক তক্ষুনি সেই লোকটা মাথার ওপরকার তেঁতুলের ডালপালা থেকে ধুপ্ করে লাফিয়ে নাবল আমাদের পাশে। আমি অত মিথ্যুক নই যে বলব ভয় পাইনি, তবে কিনা লোকটাই একগাল হেসে বলল, "ভয় কী গো খোকারা? এখানেই থাকা হয় আমার। জেতে ঠ্যাঙাড়ে কিনা তাই বনে বাদাড়ে বাস। তা মুড়ি কি নিদেন মোয়া কিছু আনো নি কোঁচড়ে করে? অ, এমনি শুকনো বেড়াতে এয়েছ, তা বেশ। নামটি কী গা তোমাদের?"

হামু বললে, "নামে কী কাজ? যাকে তাকে নাম বলি আরকি, তায় ঠ্যাঙাড়ে!" আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, "ছিঃ হামু, বড়োদের এভাবে বলতে নেই।"

লোকটা চোখ বড়ো বড়ো করে হামুর দিকে চেয়েছিল, আমার কথায় ঠান্ডা হয়ে পাশেই মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে থাকা তেঁতুল গাছের মস্ত শেকড়ের ওপর ঠেস দিয়ে বসে মাথার শক্ত করে বাঁধা গামছাটা খুলে নেড়ে নেড়ে বাতাস খেতে লাগল।

কয়লাকালো তেঢ্যাঙা লম্বা লোকটার শরীরে কেবল শক্ত হাড়ের ওপর খড়ি ওঠা কোঁচকানো চামড়া। চুলদাড়ি কতকাল না কামানো কে জানে? চোখদুটো বড়ো বড়ো ছাড়ানো লিচুর মত টস্‌টসে। খানিক দেখলে কষ্ট হয়, হঠাৎ দেখলে ভয়! কপাল থেকে গালের একপাশ বেয়ে পেঁচিয়ে গলা অবধি নেবে আসা একটা কতকালের পুরনো কাটা দাগ।

আমাদের বয়ে গেছে ওরকম বসে থাকতে, হামুকে কনুই ধরে টান মেরে উঠে দাঁড়াতেই লোকটা আবার ব্যস্ত হয়ে বলল, "কী যে তোমাদের শখ না! এই কড়া রোদ্দুর মাথায় নিয়ে এখন জঙ্গলটি টহল না দিলেই নয়? তার চেয়ে বোস তোদের সাথে কটা কথা বলে বাঁচি। তা- বাবারা নাম বলবিনে?"

আমি বললাম, "এর নাম হামু, আমার নাম শিবু। তোমায় দাদু বলে ডাকলে রাগ করবে?"

লোকটা কী যে খুশি! প্রায় নাচতে লেগে গেল, "ওরে, আমার নাতিরে, ষেটের পো জোড়া নাতি কোথায় তোদের রাখিরে।"

তারপর বলল, "দাঁড়া তোরা এট্টু, ভেতরের বনের দিকে মেলাই নারকেল গাছ, ডাব লিয়ে আসি তোদের লেগে।" বলে একছুটে বনের আঁধারে ভোঁ।

হামু চুপচাপ ছিল। এবার তড়িঘড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "বাড়ি চল শিবু, দিম্মা চিন্তা করবে, মা খুঁজবে।"

আমার রাগ হল। এ পেয়েছে আসলে ভয় আর শোনানো হচ্ছে মা খুঁজবে হ্যান ত্যান। বললাম, "আমি ডাব খেয়ে আম খেয়ে গল্প শুনে তবে যাব, বোস চুপ করে।"

একরত্তি শব্দ নেই। ক'টা ছাতারে পাখি খানিক দূরে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে, মাঝে মাঝে তাদেরই কিচ্ কিচ্। শুকনো পাতার ওপর তাদের পা ফেলার খচ্ মচ্। শাল বাবলার গা বেয়ে গিরগিটি বহুরূপী দুলছে, ছুঁচোর ডগা চোখ ঠায় চেয়ে আছে কোন দিকে। বুনো পানের লতা যেন অজগর বেড় দিয়ে আছে বিশাল ভূতুড়ে আমগাছের গায়ে। তাতে হাতির কানের মত বড়ো বড়ো পানপাতা। ওরই আড়ালে কে জানে কোথায় বসে কাঠঠোকরা ঠোঁটের ধার পরখ করছে ঠক্ ঠক্ ঠকা ঠক্! একা এখান থেকে বাড়ি ফিরতে ভয় করবে বলেই বোধহয় হামু চুপটি করে তেঁতুল গাছের গায়ে ছুরি দিয়ে নাম খোদাই করতে লেগে গেল। আর শেকড়ে মাথা রেখে শুয়ে বনের মাথায় নীল আকাশে চিলের চক্কর দেখতে কী যে ভালো লাগছিল আমার।

এমন সময় ঝোপ ঝাড় ঠেলে খচ্ খচ্ করে লোকটা আবার এসে গেল। কাঁধে এই বড়ো বড়ো সাত আটটা ডাব। তেঁতুল গাছটারই কোথায় কোন ফোকরে হাঁসুয়া লুকোনো ছিল তাই দিয়ে সব কটা ডাবের মুখ কাটা হয়ে গেলে বললে, "খা বাছারা। ভারী মিঠে জলটা। শরীর ঠান্ডা হবে।" বলে আবার তেঁতুল গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে গামছার বাতাস খেতে লাগল।

খেতেখেতেই শুনলাম লোকটার নাম বুধু পাড়ুই। নিবাস ছিল গুপ্তিপাড়ার দিকে। দুষ্টু

লোকদের অত্যাচারে গাঁ ছেড়ে এসে চাষের কাজ ভুলে ঠ্যাঙা দিয়ে মানুষ মেরে তাদের টাকা কেড়ে নিয়ে পেট চালাত। এখন এখানেই থাকে, ফল পাকুড় খেয়ে পেট ভরায়।

আমি বললাম, "কিন্তু বুধুদাদু, মানুষ মারা, ডাকাতি করা এসব তো অন্যায় কাজ। তুমি ওসব করতে যে, খারাপ লাগত না?"

কেমন ঝিম মেরে আমার কথা শুনল বুধুদাদু। তারপর ফিস্ ফিস্ করে যেন নিজেকেই বলল, "খারাপ কাজ মানলাম। তার ফল ভোগও করছি। এই জঙ্গলে কত বচ্ছর গেল গাছে গাছে, কোটরে কোটরে। হুঁ বলতে চিতার তাড়া, সাপের ছোবল। বর্ষার জলে মাথায় ছাত নেই, শীতে গায় ঢাকা নেই – ফল ভোগ হয়নি? আর ওদের কথা কে বলবে নাতি? যারা আমার ঘরে আগুন দিল ওদের গোলামি করতে চাইনি বলে। আমার লাঙল হাল গরু কেড়ে নিলে মিথ্যে দাদনের টাকা শুধবার কথা বলে। আমার ছেলেকে ধরে ফাঁসিতে লটকাল মিথ্যে খুনের দায়ে – ওরা কী ফল ভুগল নাতি? ওদের তো এখন বাড়বাড়ন্ত! ওরাই কি ভগবানের নিজের লোক, আমরা কেবল ভেসে এসেছি? তা থাকগে নাতিরা, চল তোদের দিঘি দেখিয়ে আনি।"

খানিক হাঁটবার পর হাত ধরতে হল বুধুদাদুর। যত এগোই বন আরও ঘন আরও আঁধার হয়ে আসে। হামু মাঝে মাঝে রাগ রাগ চোখে আমার দিকে দেখছে। দিঘির পশ্চিমের উঁচু পাড়ে বড়োসড়ো একটা কালো পাথর, মাটিতে আধডোবা, মাথায় ছাতিমের ছাতা, সেখানে জুত করে বসে বুধুদাদু বললে, "দেখ নাতিরা, এ তল্লাটে এতবড়ো দিঘি আর নেই। দিল্লির বাদশা বর্ধমানের জায়গিরদার শের আফগানকে হুকুম দিয়ে এই দিঘি এক রাত্তিরের মধ্যে কাটান। কত জমজমা তখন এখানে। আশপাশের দুশোজন জমিদার তাঁদের লোক লশ্‌কর পাঠিয়েছিলেন দিঘি কাটার কাজে। এছাড়া দু"হাজার বাদশাহি সৈন্যও এসেছিল কাজে। সে এক এলাহি ব্যাপার। সন্ধে থেকে রাতভর নাগাড়ে মাটি কাটবার পর চল্লিশহাত গভীরে কোদালের মুখে ঠেকল এক পাথরে বাঁধানো কুয়োর মুখ। সেই কুয়োর দশ হাত গভীরে এক কালো পাথরের শিবলিঙ্গ। স্থানীয় মজুরের দল বললে দেবতার থান, মাটি কাটা চলবে না। বাদশার ফরমান হাতে শের আফগান নিজে দাঁড়িয়েছিলেন। হুকুম দিলেন, কাজ বন্ধ হবে না, হাত থামলে পিঠে পড়বে কোড়া। মজুররা বললে – রইল কোদাল। চন্ডির দেউলের পুজারি ছুটে এল বাধা দিতে, তার পিঠেও পড়ল কোড়া। তারপর দিল্লির বাদশার দর্প চূর্ণ করে শিবলিঙ্গ থেকে বাণ ডাকল। প্রলয়ের মত হাজার বছরের জমে থাকা কালো বাসুকির মত জল ভাসিয়ে দিল বাদশার দু'হাজার সেনাকে। শের আফগান মাথা নুইয়ে ভোর রাত্তিরের আঁধারে বর্ধমানে পালালেন। তারপর থেকে ফি বছর শিবচতুর্দশীতে দিঘির ধারে হিঁদুর ঠাকুরের কাছে পুজো পাঠিয়ে দিতেন তিনি।

"যে পাথরে বসে আছি তার নিচেই পাথরে বাঁধানো ঘাট। ঘাটের পাথর ফাটিয়ে এক মহাবট অনেক উঁচুতে ডালপালা ঠেলে চারদিকে ঝুরি নামিয়ে যেন ধ্যান করছে। বটের ডালপালার নিচে জমে থাকা আঁধার চেয়ে থাকলে মন ঠান্ডা হয়ে আসে।"

অবাক হয়ে ভাবছিলাম কী সুন্দর করে বলে লোকটা, যেন চোখের সামনেই দেখছি সব। একটা খটকা লাগল, বললাম, "তুমি কী করে জানলে এত সব গল্প?"

একটু বেজার হল লোকটা, "ওই তো তোদের দোষ নাতি। চোখে দেখা ব্যাপারটা গল্প হল? মাটি খোঁড়াদের সর্দার ছিলুম আমি, জানিস! আমিই তো বলেছিলুম দিঘি খোঁড়া বন্ধ কত্তে শিবলিঙ্গ পাবার পর। এই তো পিঠে চাবুকের দাগ দেখেছিস?"

"সে তো অনেক বছর আগেকার কথা। তুমি কি এত বুড়ো নাকি!"

"বেশ তো গুপ্তিপাড়ার কাওকে জিজ্ঞেস করিস, শুনতে পাবি।"

আমি কড় গুনে হিসেব করছি দিল্লির বাদশার আমল কত দিন আগের। বুধুদাদু হঠাৎ তিড়বিড়িয়ে উঠে বললে, "তুই কোথায় থাকিস বললি?"

আমি হিসেব গুলিয়ে বললুম, "কলকাতার কালীঘাটে।"

"কল- কা- তা, সে আবার কোথারে!"

"কলকাতা, কালীঘাট শোননি! তুমি কী গো? এখান থেকে গঙ্গায় সোজা ত্রিবেণী বাঁশবেড়ে হয়ে চুঁচড়ো চন্দননগর হয়ে আর একটু গেলেই তো কলকাতা, কালীঘাট – জাননা? কী আশ্চর্য। মা কালীর মন্দির যে।"

বুধুদাদু এবার লাফিয়ে উঠল – "ও হো। কালীক্ষেত। তুই বললি কালীঘাট, কী করে বুঝব। তা কলকাতার কই, সুতোনুটির দিকে?"

ইতিহাস বইতে সুতোনুটি গোবিন্দপুর পেয়েছি, বললুম, "হ্যাঁ সুতোনুটি, তুমি কী করে জানলে দাদু?"

"হ্যাঁ, ওখানে বলে আমার বন্ধু বাড়ি করেছে। মস্ত বড় জাহাজ তার। কী তার লোক- লস্কর- কামান- বন্দুক; পাক্কা সাহেব। সোঁদরবনে ডাকাতি করত এককালে।"

হামুর গা টিপুনিতে পারা গেল না। এমনিতে ঘুড়ি ওড়াতে বেরুলে বাড়ি ফেরার নাম করে না এখন একেবারে সুপুত্তুর। কোথায় একটু গল্প টল্প শুনব বুধুদাদুর কাছে, যদিও মনে হচ্ছে বেশির ভাগটাই ভুল। তবু ভালো লাগে তো। অবশ্য বেলাও গড়িয়েছে বেশ। উঠে পড়লাম। পেটে কল্ কল্ করছে ডাবের জল। রোদটা বেশ গা সওয়া লাগছে।

বুধুদাদুও উঠে পড়ল, "হ্যাঁ চ বাবা চ তোদের এগিয়ে দি, বেলা গেল। আসিস আবার। কেউ তো আসে না। ভয় পায় আমাকে। আসিস নাতিরা। আরও কত দেখবার আছে এই বনে, দেখাব।"

তেঁতুল গাছটার গোড়ায় দাঁড়িয়ে যতক্ষণ দেখা যায় আমাদের দিকে চেয়ে রইল বুড়ো। বেলা কত কোনো খেয়াল ছিল না। মসজিদের কাছে আসতেই ঝপ্ করে সাঁঝের আঁধার নামতে লাগলেন। আমরা অবাক। পুরো দিন কেটে গেল টের পেলাম না। ঝোপঝাড়ের গায়ে গায়ে রাতের আঁধার জমে গেল বাড়ি ফিরতে ফিরতেই। বাড়িতে হই হই কান্ড! সারাদিন সবাই মিলে খুঁজেছে আমাদের, এখন মামারা লাঠি লন্ঠন নিয়ে আবার খুঁজতে বার হচ্ছে এমন সময় বাড়ি পৌঁছুলাম।

তারপরের কথা শুনলে চোখে জল আসবে তোমাদের! আমাদের কাছে সব শুনে গুপ্তিপাড়ার ডাক্তারদাদু শুধু চোখ কপালে তুলে বললেন, "বুধু পাড়ুই! এ তল্লাটের সব চাইতে নামকরা ঠ্যাঙাড়ে ছিল তো, ওকে নিয়ে কত গপ্প আছে। আমাদের ছোটকালে শুনেছি। নবাবের ফৌজের হাতে মরেছিল বুধু এই কালনাতেই। কিন্তু সে তো সাড়ে তিনশো বচ্ছর আগেকার কথা!"

ছবিঃ শিবশংকর ভট্টাচার্য

অন্ধকারে ভুবনডাঙার মাঠে

শিশির বিশ্বাস

এবড়োখেবড়ো মেঠো পথে গুরুপদ যখন তাঁর সাইকেল নিয়ে ভুবনডাঙার কাছে পৌঁছলেন তখন সন্ধে পার হয়ে গেছে। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠতে দেরি আছে এখনও। চারপাশে অন্ধকার ইতিমধ্যেই বেশ ঘন। হোগলডাঙার ওদিকে আজ না গেলেও চলত। গতকাল বিকেলে লাইব্রেরিতে নতুন কিছু বই এসেছে। সেগুলো এন্ট্রি করতে অনেকটা সময় লাগল। আজ তাই বেরোতে মানা করেছিল অনেকে। অনেকটা পথ।

কিন্তু অন্য ধাতের মানুষ গুরুপদ কান দেননি। মধুখালি গ্রাম পঞ্চায়েত বছর কয়েক হল গ্রামের মানুষের জন্য জনগ্রন্থাগার খুলেছে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। বইয়ের খোঁজে সারাদিনে একটি মানুষেরও দেখা মিলত না। আগে যিনি লাইব্রেরিয়ান ছিলেন, সারাদিন প্রায় শুয়ে বসেই কাটিয়ে দিতেন। আসলে আজকাল বই পড়ার চল এমনিতেই কমে গেছে। তার উপর এই অজ গ্রাম। চাষবাস, বাড়ির কাজ আর পেটের ধান্দাতেই দিন কেটে যায়। বই পড়ার সময় কোথায়?

কিন্তু গুরুপদ হার মানেননি। নতুন লাইব্রেরি। র‍্যাক ভর্তি নতুন বই এভাবে অব্যবহারে নষ্ট হয়ে যাবে, মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। শেষে দুপুর হলেই গোটাকয়েক বই সাইকেলের পিছনে চাপিয়ে গ্রামের বাড়ি-বাড়ি হানা দেওয়া শুরু করলেন। চাষিবাড়ির মানুষের ওই সময় কিছুটা হলেও অবসর। বিশেষ করে মেয়ে-বউরা। যাদের অক্ষর পরিচয় আছে, সামান্য লিখতে পড়তে পারে তাদের কাছে বাছাই করা বই পৌঁছে দিয়ে আসতেন। গোড়ায় খুব একটা সাড়া মেলেনি। কিন্তু অবস্থা পাল্টাতে দেরি হয়নি। বিশেষ করে বাড়ির মেয়েদের মধ্যে। আর তারই ফলশ্রুতি, এখন দম ফেলার ফুরসত নেই গুরুপদর। তাঁর বই

ভর্তি সাইকেল এখন ছুটতে শুরু করেছে আশপাশের আরও গোটাকয়েক গ্রামে। আজ বই নিয়ে হোগলডাঙা যাওয়ার দিন। বেশ জানেন, গ্রামের অনেকেই হাঁ করে আছে তাঁর জন্য। তাই দেরি হলেও পরোয়া করেননি।

অন্ধকার ঘন হয়ে আসতে গুরুপদ একটু দ্রুতই প্যাডেল করছিলেন। আসলে জায়গাটা ভালো নয়। সীমান্ত অঞ্চল। সন্ধে নামলেই বিএসএফ নয়তো পুলিশের টহল শুরু হয়। পথে লোকজন তেমন বের হয় না। আজও ব্যতিক্রম নয়। এতটা পথ পার হয়ে এলেন, একটি মানুষেরও দেখা মেলেনি। তবে সেজন্য চিন্তা হয়নি। এই ক"বছরে এখানে সকলেই তাঁর পরিচিত। তবে সীমান্ত অঞ্চল যখন, শুধু পুলিশ বিএসএফ কেন, সন্ধের পর আরও অনেকেরই আনাগোনা শুরু হয়। তাদের সবাই সমান নয়। বিশেষ করে এই ভুবনডাঙার খালের ধারটা। মাঠের শেষে সরু এক খাল। বর্ষা ছাড়া অন্য সময় তির্‌- তির্‌ করে জলের ধারা। পার হলেই ভিন দেশ।

খালের পাড় বরাবর মোরামের সরু এক মেঠো রাস্তা খানিক দূর গিয়ে সমকোণে বেঁকে বাঁশবেড়ে গ্রামের দিকে গেছে। এই জায়গাটা পার হলে খানিকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। মোড়ের কাছে পৌঁছে গুরুপদ প্যাডেলে আরও জোর দিতে যাচ্ছিলেন, পিছনে খানিক দূরে পথের পাশে ঝাঁকড়া বাবলা গাছের দিকে হঠাৎ চোখ পড়তে থেমে গেলেন। অন্ধকারে একটা ছায়ামূর্তি নড়াচড়া করছে। কেমন সন্দেহজনক। বাবলা গাছটা আগেই পার হয়ে এসেছেন। অন্য কেউ হলে অযথা সময় নষ্ট না করে এগিয়ে যেতেন নিজের পথে। কিন্তু গুরুপদ ব্রেক চেপে দাঁড়িয়ে পড়ে হাঁকলেন, "কে? কে ওখানে?"

গোড়ায় কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। তবে গুরুপদর চোখ এড়াল না, অন্ধকারে ছায়াটা নড়ছে। মৃদু খড়্‌মড়্‌ শব্দ। তারপরেই আচমকা গা হিম করা খিল্‌খিল্‌ হাসি। হঠাৎই অন্ধকার ফুঁড়ে একরাশ ঝকঝকে দাঁত বের করে ঝিলিক দিয়ে উঠল আস্ত একটা নরকঙ্কালের মাথা, "হেঁ- হেঁ, আমি।"

নির্জন অন্ধকার রাতে এই প্রত্যন্ত প্রান্তরের মাঝে হঠাৎ ওই দৃশ্য দেখে দাঁত কপাটি লেগে যাওয়ার কথা। কিন্তু অন্য ধাতুতে গড়া গুরুপদ কিছুমাত্র দমলেন না। ভূতপ্রেতে কোনও দিনই বিশ্বাস নেই। বেশ জানেন, ওসব মনের ভুল ছাড়া কিছু নয়। পথের পাশে সাইকেল দাঁড় করিয়ে সাবধানে এগিয়ে গেলেন বাবলা গাছের দিকে।

খানিক এগোতেই সেই নরকঙ্কালের মুন্ডু বাবলা গাছের আড়ালে উধাও হয়ে গেল। তবু সাবধানে বাকি পথটা পার হয়ে কাছে এসে পৌঁছতে অজান্তেই একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল। বাবলা গাছের গোড়ায় ঝোপের আড়ালে মুখ খোলা একটা বস্তা পড়ে রয়েছে। অন্ধকারে চারপাশে যথাসম্ভব খুঁজেও অন্য কিছু দেখতে পেলেন না। সাবধানে বস্তাটা উল্টে দিতেই খড়্‌মড়্‌ শব্দে একরাশ নরকঙ্কালের হাড়গোড় ছড়িয়ে পড়ল মাটিতে।

হঠাৎ এক মতলব খেলে গেল গুরুপদর মাথায়। দেরি না করে ধীরে- ধীরে ফিরে এলেন সাইকেলের কাছে। রাস্তা ধরে বাঁশবেড়ের দিকে খানিক এগিয়ে একসময় মাঠে নেমে পড়লেন। তারপর এক ঝোপের পাশে সাইকেল রেখে নিঃশব্দে প্রায় গুঁড়ি মেরে ফের এগিয়ে গেলেন সেই বাবলা গাছের দিকে।

কিছুটা ঘুরপথ। তাই সময় লাগল। তবে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হল না। কাছে যেতেই দেখতে পেলেন, গাঢ় অন্ধকারে বাবলা গাছের তলায় খালি গায় লিকলিকে ছোটখাট একটা মানুষ ঢাউস সেই বস্তাটা পিঠে নিয়ে সবে উঠে দাঁড়িয়েছে। সরে পড়বে এখনই। দেরি না করে গুরুপদ ছুটে গিয়ে দু'হাতে জাপটে ধরলেন তাকে।

“আঁক্!” বেজায় ঘাবড়ে গিয়ে অস্ফুট শব্দে প্রায় আঁতকে উঠল লিকলিকে মানুষটা। বস্তা ফেলে ছিটকে প্রায় বেরিয়েও পড়েছিল। কিন্তু গুরুপদও কম যান না। তাই সুবিধা করতে পারল না।

“কে রে তুই?” কড়া গলায় গুরুপদ প্রশ্ন করলেন।

“আজ্ঞে আমি নন্দ। নাক কান মলছি এবারের মত ছেড়ে দ্যান।”

“কোন গ্রামে বাড়ি?”

“আজ্ঞে, বাঁশবেড়ে।”

ইতিমধ্যে পকেট থেকে একটা পেনসিল টর্চ বের করে গুরুপদ জ্বেলে ফেলেছেন। তাকিয়ে দেখলেন, হাতের মুঠোয় ধরা মানুষটি বয়সে একেবারেই নাবালক। বড়ো জোর বছর বারো। কৃশ রুগ্ন শরীর। খালি গা। পরনে তেলচিটে একটা হাফ প্যান্ট। তবে চিনতে পারলেন না। কিন্তু সেই স্বল্প আলোয় অপরপক্ষ ততক্ষণে চিনে ফেলেছে ওঁকে। মুহূর্তে একগাল হেসে বলল, “আরে আপনি লাইবেরি স্যার! আগে বলবেন তো। অন্ধকারে আমি ভাবলাম বিএসএফ। ওফ্! সেবার ক্যাম্পে নিয়ে কী পেটানটাই না পিটিয়েছিল। কিন্তু সে ওই একবার। তারপর আর পারেনি।” কথা শেষ করে ফের একগাল হাসল ছেলেটা।

“বুঝেছি।” বলতে গিয়ে গুরুপদ মৃদু হেসে ফেললেন। “আর সেই থেকে কাছে ওদের কাউকে দেখলেই ওইভাবে বস্তা থেকে কঙ্কালের মাথা বের করে নাকিসুরে ----- ।”

“ঠিক ধরেছেন।” ফের একগাল হাসল ছেলেটা। “অন্ধকারে ওই দেখে পালাবার পথ পায় না কেউ। কিন্তু আপনি যে অন্য রকম, জানব কেমন করে?”

“ততক্ষণে সব পরিষ্কার হয়ে গেছে গুরুপদর কাছে। কানে আসে, ইদানীং নাকি এখান দিয়ে মানুষের কঙ্কালও চালান যাচ্ছে ওপারে। কলকাতা থেকে মাল আসে। সীমানা পার করতে পারলেই এক একটা কঙ্কালের দাম বেড়ে যায় চার-পাঁচ হাজার টাকা। এদিকের অনেকেই তাই ভিড়ে পড়েছে এই কাজে। কিন্তু তাদের মধ্যে দশ-বারো বছর বয়সের ছেলেছোকরাও যে রয়েছে ভাবেননি। ঢোঁক গিলে বললেন, “এই অন্ধকার রাতে একা নরকঙ্কালের বস্তা নিয়ে সীমানা পারাপার করিস! ভয় করে না?”

“ভয় করবে কেন!” ফের হাসল ছেলেটা। “ও তো মরা জিনিস। তা বলেন যদি, বড্ড ভয় পাই ওই বিএসএফ-এর লোকজনকে। সেবার ধরা পড়ে শুধু বিএসএফ নয়, পিটুনি খেয়েছিলাম মহাজনের কাছেও। তা ছেড়ে দ্যান স্যার এবার। ঝপ্ করে মালটা ওপারে বুঝিয়ে দিয়ে ঘরে যাই।”

“ঘরে গিয়ে কী করবি?”

“দুপুরের পান্তা আছে। খেয়ে শুয়ে পড়ব।” চটপট জবাব এল।

“কেন, লেখাপড়া করিস না?”

“নাহ্।” ঠোঁট বেঁকিয়ে মাথা নাড়ল ছেলেটা, “কেলাস ফোরের পর আর ইস্কুলে যাইনি। তারপর তো বাবাই ভিড়িয়ে দিলে এই কাজে।”

এই এতক্ষণে সামান্য নড়ে উঠলেন গুরুপদ। অন্ধকারে নেচে উঠল চোখ দুটো। গম্ভীর গলায় বললেন, “তোকে ছেড়ে দিতে পারি। তবে এক শর্তে।”

“কী?” গুরুপদ দেখল, এই প্রথম গলার স্বর কেমন করুণ হয়ে উঠল ছেলেটার।

“আমাকে চিনিস যখন, তখন ভালোই জানিস, গ্রামের সবাইকে ধরে ধরে বই পড়তে দিই আমি। তোকেও পড়তে বই দেব একটা।”

“অ্যাঁ বই!” প্রায় যেন খাবি খেল নন্দ।

“হ্যাঁ, বই। পড়ে সাত দিনের মধ্যে ফেরত দিয়ে যাবি। যদি রাজি থাকিস তো বল। নইলে বমাল নিয়ে হাজির করব বিএসএফ ক্যাম্পে। জানিস তো, ওদের ওখানেও যাওয়া-আসা আছে আমার।”

নন্দর ভালোই জানা ছিল সেটা। খানিক চিন্তা করে শেষে ব্যাজার হয়ে বলল, “তাহলে দ্যান স্যার।”

খানিক দূরে সাইকেলে বই রাখা ছিল। নন্দকে সঙ্গে নিয়ে গুরুপদ তার থেকে একটা বই বের করে গুঁজে দিলেন হাতে। “মনে থাকে যেন। পড়ে সাত দিনের মধ্যে ফেরত দেওয়া চাই।”

সময় বয়ে যাচ্ছে। নন্দ দেরি করল না আর। সট্ করে বইটা কোমরে গুঁজে ঘাড় নাড়ল সামান্য। তারপর বস্তা পিঠে তুলে নিয়ে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

দিন পনেরো পরের কথা। সেদিন দুপুরে গুরুপদ লাইব্রেরি- ঘরে কাজ করছিলেন। হঠাৎ তাকিয়ে দেখেন সামনে দাঁড়িয়ে সেদিনের নন্দ ছেলেটা। চোখে চোখ পড়তেই কাঁচুমাচু মুখে বলল, “একটু দেরি হয়ে গেল স্যার।”

শ’খানেক পাতার বই। পড়াশুনো ছেড়ে দেওয়া ক্লাস ফোরের একটা ছেলে সে বই পড়তে দিন পনেরো লাগতেই পারে। গুরুপদ চোখ নাচিয়ে বললেন, “তা পড়েছিস তো বইটা?”

“হ্যাঁ স্যার।” একগাল হেসে ঘাড় নাড়ল নন্দ। তিন দিনেই শেষ করে ফেলেছি। “টেরেজার আইল্যান্ড” গল্পটা দারুণ স্যার!”

ছেলেটার কথায় বুকটা ভরে গেল গুরুপদর। কিন্তু সেটা যথাসম্ভব চেপে বললেন, “টেরেজার নয় রে, ট্রেজার, মানে গুপ্তধন। তা তিন দিনে বইটা শেষ করেও পনেরো দিন পরে নিয়ে এলি যে বড়ো?”

“কী করব স্যার।” সামান্য মাথা চুলকে নন্দ বলল, “বন্ধুদের বলেছিলাম গল্পটা। শুনে সবাই তো হাঁ। কলিমও আমার মত কেলাস ফোর পর্যন্ত পড়েছে। ও পড়তে নিয়ে গেল। দিনচারেক বাদে ফেরত দিয়ে গেলেও বাকিরা ধরল পড়ে শোনাবার জন্য। তাই তো দেরি হয়ে গেল। জিম ছেলেটাকে বড্ড মনে ধরেছে সবার।”

অন্ধকারে প্রায় হাতড়ে গুরুপদ সেদিন ট্রেজার আইল্যান্ড বইয়ের ছোটদের একটা সংক্ষিপ্ত অনুবাদ নন্দকে দিয়েছিলেন। এতটা একেবারেই আশা করেননি। এগিয়ে এসে ওর রুক্ষ মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, “নন্দ, তুই কিন্তু সাহস আর মনের জোরে জিমকেও পিছনে ফেলে দিবি।”

কিন্তু ‘লাইবেরি স্যারের’ সেই প্রশংসায় নন্দর তেমন ভাবান্তর হল না। সামান্য মাথা চুলকে বলল, “একটা কথা বলব স্যার। আর একটা বই দেবেন আজ?”

ছবিঃ শিবশংকর ভট্টাচার্য

বিমর্ষবর্ধনের রথযাত্রা

তাপস মৌলিক

রথের দিন সকালবেলা বিমর্ষবর্ধনের বাড়ি ঢোকার সময় ভাই বলবর্ধনকে বারান্দায় দেখে জিগ্যেস করলাম, "কী, দাদার মুড কেমন?" বলু বলে, "নট গুড, নো ফুড। নো ব্রেকফাস্টিং, ওনলি ফাস্টিং।" বলুর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টিতে সময় নষ্ট না করে ঘরে ঢুকে দেখি ভদ্রলোক যথারীতি মুখখানা হাঁড়িপানা করে বসে আছেন।

বললাম, "কী ব্যাপার? মুখ ব্যাজার কেন আবার?"

বিমর্ষবর্ধন বললেন, "ব্যাজার নয় হে, বাজার, বাজার।"

"মানে? আনন্দবাজার কিছু লিখল? নাকি আপনিও বলুর মত ইংরিজি বলছেন? বাজার মানে তো ঘণ্টি! বিপদ ঘণ্টা মানে ওয়ার্নিং বাজার। কোনও ওয়ার্নিং বাজার বাজার কথা বলছেন?"

“ঘন্টা বলছি! কী বাজে বকছেন, বাজার মানে বোঝেন না? বাংলায় যাকে বলে মার্কেট।”

“ও, বাংলা বাজার! তা সেও তো কতরকম। আমাদের শ্যামবাজার, বাগবাজার, বড়বাজার তো আছেই। এছাড়াও আনন্দবাজার, শেয়ার বাজার, কাজের বাজার। কোন বাজার বলছেন?”

“ওঃ, আপনাদের লেখকদের নিয়ে এই এক সমস্যা মশাই। আমি বারোটা বাজার কথা বলছি। দেশটার বারোটা বেজে গেল।”

“তাতে অসুবিধের কী আছে? সবুর করুন না, একটু পরেই দেখবেন বারোটা পাঁচ, বারোটা দশ করে দেশ এগিয়ে চলেছে। দেশটা তো আর থেমে নেই।”

“থেমে যে নেই সে তো বাজারে গিয়েই বুঝলাম। বাংলাদেশের ইলিশ বলছে হাজার টাকা কিলো! আমাদের গঙ্গার ইলিশও ছ’শ টাকার কমে নেই। গেল বছরই তো সাড়ে তিন’শ- চার’শ টাকায় ইলিশ খেলাম! দেখেশুনে বলুকে বললাম, ধুত্তোর, বাজারই করব না ছাতার। খালি ব্যাগ নিয়ে ফিরে এসেছি।”

“হুঁ, বলু বলছিল বটে, জলখাবার ব্যাপারটা হয়নি আজ।”

“জল খাবার বেলা তো বারণ করিনি! জল খেয়েই থাকব শুধু, আর কিছু খাওয়া আর পোষাবে না। ভালোই হবে, ভুঁড়িটাও একটু কমবে তাতে।”

“আপনার ভুঁড়ি যদি না ভরে, গরীব লোকেরা তবে কোথায় যাবে ভেবেছেন? আপনার এত টাকা, এত বড় ব্যাবসা, আপনিই বলছেন না খেয়ে থাকবেন?”

“টাকার কোনও দাম আছে নাকি আর? মনে মনে সেই অঙ্কই তো কষছিলাম। অঙ্কে আমায় ফাঁকি দেওয়ার উপায় নেই, ম্যাট্রিকে সাতচল্লিশ পেয়েছিলাম। গতবছরের চার’শ টাকার ইলিশ এবার ছ’শ টাকা হওয়ার মানে, গতবছর যদি আমার ব্যাংক ব্যালান্স ছ’লাখ টাকা হয়, এখন সেটা চার লাখ টাকা। দু’দিন পর তো ফতুর হয়ে যাব মশাই, ঘটিবাটি বিক্রি করতে হবে। ব্যাংকরাপ্ট না অ্যাবরাপ্ট কী যেন বলে!”

এইসময় দরজার আড়াল থেকে বৌদির ইশারা পেয়ে বুঝলাম, কিছু একটা এবার করতে হয়, কেননা বৌদিরও মনে হল সকাল থেকে পেটে কিছু পড়ে নি। দাদাকে ফেলে উনি খাবেনই বা কী করে! এদিকে বারোটা এখনও না বাজলেও এগারোটা প্রায় বাজে।

বললাম, “বালাই ষাট, আপনি ব্যাংকরাপ্ট হতে যাবেন কেন? ও সব করাপ্ট লোকেরা হয়। আপনার মত একজন সৎ ব্যবসায়ীর বাজার কখনও পড়ে না। কিন্তু এরকম ব্যাজার হয়ে বসে থাকলে বাজার ধরবেন কী করে? খাবারের সঙ্গে পেটের যেমন যোগ আছে, মনেরও তো আছে। ফুড অফ মানেই মুড অফ।”

“মুডের নিকুচি করেছে। ছোটবেলায় বাবাকে দেখেছি বাড়ির উঠোনে পাঁচ টাকা কিলো দরে ইলিশ কিনতে। আর সে ইলিশ বলে ইলিশ! একেবারে রুপোর পাতের মত ঝকঝক করছে।”

"এই এতক্ষণে আপনি ঠিক লাইনে এসেছেন। স্মৃতির জগতে ঢুকে পড়লেই দেখবেন মুড আপনি ভাল হয়ে গেছে। স্মৃতি সততই সুখের। ছোটবেলার সেই গ্রামের দিনগুলোর কথা একবার ভেবে দেখুন, কোথায় লাগে তার পাশে এখনকার দিনকাল। নস্টালজিয়াকে নষ্ট বলাটা নষ্টামো ছাড়া কিছু নয়। বর্তমানে আমরা সবাই বর্তমানে থাকি, কেউ বুঝি না যে বর্তমানের কোনও ভবিষ্যৎ নেই। আর ভবিষ্যতের অবর্তমানে বর্তমানের কোনও মানে বর্তায় কি? অতীত ছাড়া তবে আর রইলটা কী?"

"কিন্তু শ্যামল মিত্র যে গেয়েছিলেন – স্মৃতি তুমি বেদনা? আমারও কিন্তু ছোটবেলার কথা ভাবলে একটু কষ্টই লাগে। সেই দিঘীর জলে দু'ঘন্টা দাপিয়ে স্নান, সেই আমবাগানে জামবাগানে ঘুরে বেড়ানো, ফল চুরি, আইসপাইস আর পিট্টু খেলা – ভাবলে গলার কাছটা একটু ব্যথা ব্যথাই করে।"

"সে আপনি বেশিদিন পেছোন না বলে। স্মৃতির ব্যাপারটা মদের মত, যত পুরনো তত বেশি নেশা। আপনি নিজেই ব্যাপারটা বুঝবেন। গতবছরের কথা ভাবুন, ইলিশ তখনও চার'শ টাকা ছিল। স্মৃতি ততটা সুখের নয়। ছোটবেলায় চলে যান, পাঁচ টাকা কিলো। আরও পেছোতে পেছোতে সেই মর্তমানে চলে যান, একেবারে অ্যাবসলিউট সুখ।"

"মর্তমানে মানে?"

"মানে, বর্তমানে মানুষ বর্তমানে থাকলেও এককালে তো মর্তমানে ছিল। মানুষের ইতিহাস তাই বলে। সেখানে পেছিয়ে যেতে পারলে একেবারে নিরবচ্ছিন্ন সুখ। কেবল গাছে গাছে শাখায় শাখায় ঘুরে বেড়াও আর ফল খাও, পল্লবগ্রাহীদের মত, ধরণীর বুকের এই শোকতাপ মূল্যবৃদ্ধি আর গায়েই লাগবে না।"

"ও, মর্তমান বলতে কলার কথা বলছেন? তা সোজা করে বলুন না, এত ছলাকলার দরকার কী? কিন্তু অত আগের স্মৃতি আপনার মনে পড়ে? আমার তো ছোটবেলার স্মৃতিই কেমন ঝাপসা হয়ে এসেছে।"

"আহা, স্মৃতির কথা হচ্ছে না। আমি তো আর জাতিস্মর নই। কিন্তু ব্যাপারটা আমাদের মজ্জায় আছে, জিনে আছে। এককালে তো আমরা ফল খেয়েই বাঁচতাম, তাই ফল খেলেই জিনগুলো উত্তেজিত হয়ে ওঠে। মনটা সঙ্গে সঙ্গে সেই মর্তমান যুগের তূরীয় আনন্দের অবস্থায় চলে যায়। তাই, জল খাবার বেলা আপনি যেমন বারণ করেন নি, ফল খাবার বেলাও বারণ করা উচিত নয়। জলখাবার যখন হয় নি, ফলখাবার তখন হতেই পারে এখন।"

বিমর্ষবর্ধন একঝলক ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আর একবার ভুঁড়িতে হাত বুলিয়ে নিয়ে বললেন, "তা, আপনি যখন বলছেন তখন একবার চেষ্টা করে দেখাই যায়। ভুঁড়িটাও একটু কমেছে বলেই মনে হচ্ছে। ওরে বলু, দেখ তো বৌদির কাছে ফল- টল কিছু আছে কিনা? আমি তো খুব একটা কিনি- টিনি না, ফল কি আর পাব এখন?"

বলু প্রায় নাচতে নাচতে ভেতরে চলে যাবার পর অবশ্যম্ভাবী জয়ের উত্তেজনায় আমি বলে চললাম, "ফল পাবেন না মানে? আলবাত পাবেন। ফল খেলেই ফল পাবেন, আর ফল পেলেই ফল খেয়ে ফেলবেন, এবং খেয়ে দেখবেন অবশ্যই ফল পাচ্ছেন। তবে ফলের তো

হরেক রকমফের আছে। কর্মফল, পরীক্ষার ফল এসব অখাদ্য ফল বাদ দিলেও আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, আপেল, কমলা – ফল কি আর কম? তবে সবার সেরা ফল কিন্তু সেই কলা। কলারও আবার বৈচিত্র্যের অভাব নেই। চারুকলা, শিল্পকলা, নৃত্যকলা, সঙ্গীতকলা, চন্দ্রকলা, বেনীআসহকলা – একেবারে ষোলকলা পূর্ণ। এসব চারুকলা-টলা পাবলিকে খেলেও আমাদের পূর্বপুরুষদের খাদ্যতালিকায় ছিল বলে জানা যায় না। তাঁদের খাদ্যের মধ্যে বিচিকলা, চাঁপাকলা, কাঁঠালিকলা এসব নিম্নবর্গীয় কলার পিরামিডের শীর্ষে সেই আদি ও অকৃত্রিম মর্তমান কলা। ফল খেতে হলে তাই মর্তমান কলাই খাওয়া উচিৎ।”

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বলু ভগ্নদূতের মত ফিরে এসে হার্ট ব্রেকিং নিউজটি ঘোষণা করে, “দাদা, ফল তো নেই। তুমি তো বাজার কিছু করো নি আজ। ভাঁড়ার একদম নিষ্ফলা।” দরজার ওপাশ থেকে বৌদির গজগজও কর্ণগোচর হয়। সঙ্গে সঙ্গে আমি কৌশল পাল্টাই, “তবে আরও অনেকরকম ফলও আছে। সেগুলোও ফলস্ বলা যায় না। যাহা ফলে তাহাই ফল। ধানগাছে ধান ফলে, বেগুনগাছে বেগুন ফলে। এসবই মানুষের কৃষিকর্মের ফল। আপনি দেখেননি কাগজে লেখে, এবারে ধানের ফলন ভাল, ডালের ফলন খারাপ ইত্যাদি? ফলন তো ফলেরই সম্ভব। তাই চাল, ডাল এসবও ফলই বলা যায়। মর্তমান কলার মত কুলীন ফল না হলেও, ফ্যালনাও নয় কিছু। খেলে কুফল কিছু পাবেন না।”

বলু মাঝখান থেকে যোগ করে, “হ্যাঁ হ্যাঁ, যাহা ফলে তাহাই ফল। জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎবাণী যদি ফলে সেটাও তো একরকম ফলই হল। ফল ফললে অর্থাৎ ফলন হলে তাকে ফলিত বলা যায়। তখন বলে ফলিত জ্যোতিষ। এছাড়াও ফলিত গণিত, ফলিত অর্থনীতি এসবের কথাও শুনেছি। সে সবেরও নিশ্চয়ই ফলন হয়।”

বলুটার সত্যি আর বুদ্ধি হবে না। বেশ কায়দা করে চাল-ডালে নিয়ে এসেছিলাম যাতে অন্তত খিচুড়িতে পৌঁছন যায়, কোথা থেকে ফলিত গণিত-টনিত নিয়ে এল। সাধে কি আর বলি, ওর নাম বলবর্ধন নয়, বল(দ)বর্ধন। ইংরিজি নিউমোনিয়ায় যেমন পি সাইলেন্ট, বল(দ)বর্ধনে সেরকম ‘দ’এর উচ্চারণ হয় না।

বলুর ফলিত শাস্ত্রচর্চার পিটফলে পড়ে নিট ফল হল এই যে, বিমর্ষবর্ধন বললেন, “দূর মশাই, চাল-ডাল আবার কবে থেকে ফল হল? সে সব তো আর গাছে ফলে না, চাষ করতে হয়। এদের তো শস্য বলে। আমাদের লাঙ্গুলযুক্ত পূর্বপুরুষরা কোনও দিন লাঙ্গল ধরেছিলেন বলে তো জানা নেই। তাদের সময়ে পৌঁছতে গেলে ওই গাছের ফলই ভরসা। চাল-ডাল খেয়ে যদি সেই কপিযুগে পৌঁছন যেত তবে তো প্রতিদিনই একবার মানসভ্রমণ করে আসতাম। আর আপনি যেমন বললেন, ফল যদি খেতেই হয়, আর খেয়ে ফল পেতে হয়, তবে মর্তমান কলা খাওয়াই ভাল। কলার প্রতি একটা নাড়ির টান অনুভব করছি, বুঝলেন মশাই। আর বেশ বুঝতে পারছি, কলাই আমাদের পূর্বপুরুষদের সবচেয়ে পছন্দের ফল। ছোটবেলায় বাড়ির গাছে হনুমান এলেই আমরা কচিকাঁচারা সবাই মিলে ছড়া কাটতাম – অ্যাই হনুমান কলা খাবি, জয় জগন্নাথ দেখতে যাবি? নাহ, এবার থেকে কলা খেয়েই থাকব।”

দরজার আড়াল থেকে বৌদির কলা দেখানো দেখে বুঝলাম ভাঁড়ারে কলাও নেই। তৎক্ষণাৎ আমার সমস্ত রাগটা গিয়ে পড়ল বলুর ওপর, “তুমি ওই ফলিত গণিতের কী জানো হে বলু? পাটিগণিতেই তো দাঁতকপাটি লেগে যায়। খালি বড় বড় কথা।”

বিমর্ষবর্ধন বললেন, "আরে ও তো ফলিত গণিতেই পোক্ত। ছোটবেলা থেকেই। সে গল্প আবার কলা নিয়েই। শোনেন নি?"

"কী রকম?"

বলু এইসময় 'আহ দাদা, তুমি না!' বলে আপত্তি জানানো সত্ত্বেও বিমর্ষবর্ধন বলে চললেন, "আরে লজ্জা কীসের? ছোটবেলায় সবারই ওরকম কিছু না কিছু ঘটনা থাকে। শুনুন বলি। ছোটবেলায় বলু যে কীরকম বিচ্ছু ছিল সে তো আপনি দেখেননি! সারাদিন আপনার বৌদিকে উত্যক্ত করে মারত। আমি তাই প্রতিদিন সকালে বলুকে একটা অঙ্ক করতে দিয়ে গদিতে চলে যেতাম, দুপুরে ফিরে দেখতাম অঙ্ক ঠিক হল কি না। তা, এক অঙ্কেই বলু সারা সকালটা ঠাণ্ডা থাকত। একদিন ওকে একটা সহজ পাটিগণিতের অঙ্ক দিলাম, বলে গেলাম এক্স ধরে করলে কিন্তু শূন্য। অঙ্কটা ছিল – একটা কলার দাম যদি পঞ্চাশ পয়সা হয়, তবে আট আনায় কটা কলা পাওয়া যাবে? তা ফিরে দেখি বলু তখনও অঙ্ক কষেই চলেছে। অঙ্কখাতা শেষ। ঘরের দেওয়ালগুলো চকের আঁকিবুঁকিতে ভর্তি। তারপর সে মেঝেতে নেমেছে। চক দিয়ে পুরো মেঝেতে হিসেব করেও অঙ্ক মেলেনি। কিন্তু আর তো জায়গা নেই! তখন মেঝের যে জায়গাটায় বলু বসেছিল, খাটের ওপর উঠে নিচু হয়ে সেই সবেধন নীলমণি খালি জায়গাটুকুতে অঙ্ক মেলাতে বসেছে। বললাম, কী রে, এখনও অঙ্ক মেলে নি? আমায় দেখেই বলু বলে কী, এই তো হয়ে এসেছে। কিন্তু দাদা, কলাটা কি পাকা ছিল না কাঁচাকলা?"

"হুম, তার মানে বলু সেই ছোটবেলা থেকেই কলার ঘোরেই আছে। এখনও তো সারাদিন কী সব কলার টিউন, কলার আই ডি হেনতেন নিয়েই ব্যস্ত।"

এইসময় বৌদি হঠাৎ ঝমঝম করে ঘরে ঢুকে একটা পেতলের কলসি মেঝেতে নামিয়ে রেখে বললেন, "বলু, আমি ঘুমোতে গেলাম। সন্ধেবেলা ডেকে দিস। তোমাদের তিনজনের দুপুরের খাবার জল রেখে গেলাম, খেয়ে আমায় উদ্ধার কোরো।"

এমনিতে আমার ওপর বৌদির অগাধ আস্থা। উনি বলেন, বিমর্ষবর্ধনের বিমর্ষতা কাটানোর মর্স কোডটা নাকি খালি আমিই জানি। কিন্তু আজ ঘর থেকে বেরোনোর সময় আমার ওপর যেমন অগ্নিদৃষ্টি হেনে গেলেন, তাতে বুঝলাম সে আস্থায় ফাটল ধরেছে বড়োসড়ো। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি সর্বনাশ, দু'টো প্রায় বাজতে চলেছে। বৌদিকে খুব যে দোষ দেওয়া যায় তা নয়। আমি তো তবু জলখাবার খেয়ে এসেছি। এঁরা তো কাল রাতের পর থেকে পেটে জল ছাড়া আর কিছু চালান করেছেন বলে মনে হচ্ছে না। ছুটির দিনে সকালবেলা আমার বিমর্ষবর্ধনের বাড়ি আসার উদ্দেশ্যই হল দুপুরবেলাটায় আর হাত পুড়িয়ে রান্না না করে এখানেই খেয়ে যাওয়া। বিমর্ষবর্ধনের তরফ থেকেই প্রতিবার প্রস্তাবটা আসে। আজ আমি বাইরে বেরিয়ে হোটেল- টোটেল দেখে খেয়ে নিতেই পারতাম। আমার তো আর উপোস নয়! কিন্তু সেটা বিমর্ষবর্ধন আর বৌদির প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা হবে না কি? তাছাড়া কালই হয়তো 'সুখের পায়রা' বলে একটা মোক্ষম বিশেষণ জুটে গেল।

কিন্তু এদিকে যে পরিস্থিতি ক্রমশ হাতছাড়া হতে চলেছে। প্রসঙ্গ অন্যদিকে মোড় নিচ্ছে। মনে মনে তাড়াতাড়ি একটু ক্যালকুলেশন করে নিয়ে তাই আমি আবার সেই ক্যালকুলাস বা কলনবিদ্যারই শরণাপন্ন হলাম, "তা কলা খেয়ে থাকার ব্যাপারটা মন্দ নয়।

আপনার আর বলুর দু'জনারই যখন ছোটবেলা থেকেই কলার ওপর একটা টান আছে, তখন জিনে ব্যাপারটা আছে ঠিকই। শুধু একটু কলাকৌশলের প্রয়োজন। আর আমিও তো কলাম লিখেই কলার তুলে ঘুরে বেড়াই, আমাকে তাই কলাকার বলাই যায়।"

বিমর্ষবর্ধন বললেন, "সে তো বুঝলাম। কিন্তু কলা এখন পাই কোথায় বলুন দেখি? বাজার তো বন্ধ হয়ে গেছে। ওদিকে কলাবতীর হালচালও তো খুব সুবিধের ঠেকছে না।"

"কেন? আজ তো রথযাত্রা। রথের মেলায় গেলেই তো কলা মেলার সুবর্ণসুযোগ। রথ দেখার সঙ্গে কলা বেচার একটা চিরকালীন সম্পর্ক আছে জানেন না? অনেকেই সেখানে রথ দেখার সঙ্গে কলা বেচতেও যায়।"

"ব্যাপারটা মন্দ বলেন নি। জগন্নাথ দর্শনের সাথেই বোধহয় কলার একটা সম্পর্ক আছে। আহা, ছোটবেলায় না বুঝেশুনে আমাদের পূর্বপুরুষদের কতবার উত্যক্ত করেছি। আজ নিজেরাই জগন্নাথ দর্শন করে এবং কলা খেয়ে সে পাপেরও কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত করা যায়। কিন্তু এই বেলা দু'টোর সময় রথের মেলা কি বসেছে?"

"মেলা তো মেলাই। ইসকনের রথ আছে, বেলঘরিয়ার রথতলায় রথের মেলা হয়, আরও কত জায়গায় ছোট ছোট মেলা হয়। কিন্তু ঝামেলা হল সে সব মেলা সন্ধের আগে বসে না। এখন গেলে যেতে হয় মাহেশের প্রাচীন রথের মেলায়। সেখানে মেলা লোকজন, মেলা আয়োজন। মাহেশের রথে গেলে ফল পাবেনই, বিফলমনোরথ হবার কোনও সম্ভাবনাই নেই।"

"মাহেশ তো অনেকদূর, সেই শ্রীরামপুরের কাছে শুনেছি।"

"দূর মশাই, মাহেশ আবার দূর কোথায়? এই বাগবাজার থেকে তিন নম্বর বাসে চেপে বসলেই হল, একঘণ্টায় পৌঁছে যাব। তাছাড়া কেষ্ট পেতে গেলে একটু কষ্ট তো করতেই হয়।"

"চলুন তবে, মাহেশেই যাওয়া যাক। রথ দেখাও হবে, কলা খাওয়াও হবে।"

বলু তো একপায়ে খাড়া। বিমর্ষবর্ধনও তাঁর সাদা ধুতি- পাঞ্জাবী চড়িয়ে তৈরি হয়ে নিলেন। এমনকি, বিমর্ষবাবু কোন কলার প্রয়োগ করলেন জানা নেই, বৌদিও দেখি শাড়ি-টাড়ি পালটে দশ মিনিটে প্রস্তুত। আমরা সবাই মিলে বাগবাজার গিয়ে একটা তিন নম্বর দেখে চেপে বসলাম। রথের মেলার জন্য সেদিন তিন নম্বর মাহেশ অবধিই চলছে, শ্রীরামপুর অবধি পুরো রাস্তা যাচ্ছে না। প্রায় ঘন্টাদেড়েক পর যখন মাহেশ পৌঁছলাম, তখন খিদেয় আমারই পেট কলকল করছে। কিন্তু বিমর্ষবর্ধন অ্যান্ড পার্টির তখন নতুন উৎসাহের জোয়ার এসেছে।

মেলা তখন বেশ জমতে শুরু করেছে। চারিদিকে অজস্র লোকের কলকলানি। বাস থেকে নেমে সেই বিশৃঙ্খল ভিড়ের মধ্যে ঢুকেই বিমর্ষবর্ধন বললেন, "কই, আপনার কলা কোথায়?"

রাস্তার দু'পাশে হরেক রকম দোকান বসেছে। পাঁপরভাজা, জিলিপি, জিবেগজা এসবের সারি সারি দোকান। তারপর আছে কাঁচের চুড়ি, সস্তার হার ইত্যাদি মহিলাদের

প্রসাধনসামগ্রীর দোকান, ছোট ছেলেমেয়েদের খেলনার দোকান। কলার কোনও দোকান চোখে পড়ল না। কিন্তু এযাত্রা বলু আমায় বাঁচিয়ে দিল, "দাদা, প্রথমেই কলা খাবে? জগন্নাথ দর্শন করবে না? দর্শন না করেই ফলভোগ করা কি ভক্তির নিদর্শন?"

বিমর্ষবর্ধন বললেন, "তা অবশ্য ঠিক। বলুর দর্শনটার মধ্যে দর আছে। চল, তাহলে আগে রথ দেখাটাই সেরে নি।"

রথের কাছে পৌঁছে দেখি বেজায় ভিড়। রথ তখন সবে চলতে শুরু করেছে। রথের দু'পাশে দুটো লম্বা দড়ি বাঁধা। একেকটা দড়ি ধরে অন্তত কুড়ি- পঁচিশজন লোকে রথ টানছে। যে যত বড় ভক্ত সে রথের তত কাছে। আবালবৃদ্ধবনিতা শুধু দুটো দড়ির একটা কোনও রকমে ছোঁয়ার চেষ্টায় মরিয়া হয়ে হুড়োহুড়ি করছে। আমরা সেই দড়ির ধারেকাছে পৌঁছতে পারলাম না। বিমর্ষবর্ধনকে বললাম, "আমি মশাই ওই দড়ি টানাটানির মধ্যে নেই। আপনারা ইচ্ছে হলে এগিয়ে যান।"

বিমর্ষবাবু বললেন, "পাগল! আমিও ওতে নেই। এমনিতেই তো টানাটানির মধ্যে আছি সবাই। কারণটা তো দেখতেই পাচ্ছেন। স্বয়ং জগন্নাথও দেখুন কেমন টানাটানির মধ্যে আছেন। ওরে বলু, দূর থেকেই প্রণাম করে নে। রথ দেখা তো হল। এবার দেখি চল কলা কোথায় পাই। দড়াদড়ি ছেড়ে এবার বরং দরাদরির চেষ্টা করা যাক।"

আমরা আবার মেলার স্টলগুলোর মাঝখান দিয়ে ভিড় ঠেলে এগোতে আরম্ভ করলাম। কিন্তু কলার দেখা নেই। কলার অপূর্ণ প্রত্যাশায় আমার পেটে তখন বৈকল্যই হয়েছে বলা যায়। এমনসময় হঠাৎ বৌদি একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, "বলু, এদিকে আয়না।"

বলু তাড়াতাড়ি সেদিকে এগিয়ে গেল, "বলো, কী বলছ?"

বৌদি বলেন, "আয়না, আয়না, এই দোকানে আয়না।"

"এলাম তো, বলো, কী বলবে?"

"আরে, বলছি আয়না, ওই দ্যাখ আয়না।"

বোঝা গেল বৌদি একটা আয়না কেনার বায়না ধরেছেন। দরদাম কেনাকাটা হল, তারপর আবার ভিড় ঠেলে এগোনো। বিমর্ষবর্ধন প্রায় অধৈর্য হয়ে পড়েছেন, "কোথায় আপনার কলা মশাই? কলা ছাড়া আর তো সবই দেখতে পাচ্ছি।"

"আছে আছে। রথের মেলায় কলা পাব না তা কি হয়? তবে কলার ব্যাপারীরা একটু কোণাখাপচিতে লুকিয়ে থাকে, চট করে দেখা পাওয়া ভার। ওদের তাই কলাকুশলী বলে। একটু চোখকান খোলা রেখে হাঁটুন, ঠিক দেখতে পাবেন।"

মেলা- টেলা ছাড়িয়ে তখন প্রায় গঙ্গার ধারে চলে এসেছি। রাস্তার ধারে একটা বুড়োমতন লোক একটা লাঠির মধ্যে অনেকগুলো তালপাতার ভেঁপু বেঁধে বিক্রি করছে। বলু তড়বড় করে সেদিকে এগিয়ে গেল, "এই ভেঁপুগুলো কি বাজে?"

লোকটি বলল, “বাজে কেন হবে? বাজে হলে কি আর বিক্রি করতে এনেছি? যে ভেঁপু বাজে তা আমি বেচি না।”

“আরে বাজে বলেছি নাকি? বলছি বাজে কি না। বাজে না হলে অবশ্যই বাজে বলতে হবে। কেমন বাজে একটু বাজিয়ে দেখি। যদি দেখি বাজে না, তবে বাজেই বলব। আর যদি দেখি বাজে, তবে ভাল বলা যায়।”

এই বলে বলু একটা ভেঁপু নিয়ে সজোরে ফুঁ দিল। বিমর্ষবর্ধন অবাক হয়ে একটা দোকানের সামনে ছেলেছোকরাদের বন্দুক দিয়ে বেলুন ফাটানো দেখছিলেন। বলুর ভেঁপুর বিকট আওয়াজে সম্বিত ফিরে পেয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললেন, “আবার তুই এখানে সময় নষ্ট করছিস? ওদিকে কলাগুলো সব বোধহয় বিক্রিই হয়ে গেল।”

বলু কোনও রকমে ভেঁপুর দাম মিটিয়ে দিতে না দিতে বিমর্ষবর্ধন প্রায় তাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে আবার মেলার ভিড়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে চললেন, “ভাল করে নজর করে দ্যাখ, কলা কোথায় আছে।”

বলু চিঁ চিঁ করে ওঠে, “অমন কলার ধরে নিয়ে যাচ্ছ কেন! আমার কলার বোনটাই যে গেল।”

“কলার বোন কিম্বা ভাই নিয়ে আমার কোনও মাথাব্যথা নেই। আমার দরকার আদি ও অকৃত্রিম মর্তমান কলা। বিশল্যকরণী। ও ছাড়া আমি আর খাব না কিছুই। তোদেরও খেতে দেব না।”

এমনসময় বলু হঠাৎ দুটো স্টলের মাঝখানে একটা অন্ধকার ঘুপচি মত জায়গার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে উৎসাহে চিৎকার করে উঠল, “দাদা, ওই দ্যাখো, কলা ইস কলিং।”

দেখি এক বিহারী কলাওয়ালা সেখানে কলার ঝুড়ি নামিয়ে বসে আছে আর মাঝে মাঝে কেলা কেলা বলে ডাকছে। আমার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। চারজনই সেদিকে এগিয়ে গেলাম তাড়াতাড়ি। তা মর্তমান কলাই বটে। বেশ বড় বড় পাকা মর্তমান কলা। বিমর্ষবর্ধন দেরি না করে দরাদরি শুরু করে দেন, “তোমার কেলা কিতনা করকে ভাই?”

“তিনঠো দশ রুপিয়া বাবু, ডজন চালিস।”

“একডজন দে দো জলদি।”

এক কাঁদি কলা কিনে আমরা চারজন সেখানে দাঁড়িয়েই খেতে আরম্ভ করি। অবশেষে পেটে শান্তি নামে। খেতে খেতেই বিমর্ষবর্ধন বলে ওঠেন, “বেশ রোমাঞ্চকর লাগছে মশাই। জিনগুলো সত্যি উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু, ব্যাপারটা তো উল্টো হয়ে গেল। কথাটা তো ছিল রথ দেখা আর কলা বেচা। কলা বেচার বদলে তো কলা কেনা হয়ে গেল। অকল্যাণ হবে না তো?”

বললাম, “কিচ্ছু অকল্যাণ হবে না। এই বিকিকিনির হাটে কেউ বেচে, কেউ কেনে। কেউ কেনে বলেই তো কেউ বেচে! আবার কেউ বেচে বেঁচে থাকে বলেই কিনা কেউ কিনে বেঁচে থাকে, যেমন আমরা। ব্যাপারটা ওই একই।”

“কিনে বেঁচে থাকার ব্যাপারটা মন্দ বলেননি। আপনার কথা আলাদা, কিন্তু আমাদের ব্যবসায়ীদের বেঁচে থাকতে গেলে কিনতেও হয়, বেচতেও হয়। চলুন, রথ দেখা তো হয়েছে, কলা খাওয়াও হল, এবার সবাই কলা বেচি। এ ভাইয়া, তুমহারা ঝাঁকায় কিতনা ডজন কেলা হ্যায়?”

আমি মনে মনে প্রমাদ গুনলাম। ওদিকে কলাওয়ালাটা বলল, “হোগা বাবু, বিস-পচ্চিস ডজন। কিঁউ বাবু?”

বিমর্ষবর্ধন পকেট থেকে দুটো পাঁচ’শ টাকার নোট বার করে কলাওয়ালাটার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, “ইয়ে রখ্ লো হাজার রুপিয়া। ইয়ে সব কেলা অভি মেরা হ্যায়। তুম যাও, জগন্নাথ দরশন করকে আও।”

কলাওয়ালা বেজায় খুশি হয়ে বলল, “জী বাবু, ইয়ে ঝাঁকা ভি আপ রখ্ লিজিয়ে।”

বলে সে ট্যাঁকে টাকা গুঁজতে গুঁজতে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল।

বিমর্ষবর্ধন বলুর দিকে ফিরলেন, “কী রে বলু, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কী? তোর ভেঁপুটা বাজা আর হাঁকাহাঁকি শুরু কর।” বলে নিজেই রাস্তার ধারে ঝাঁকার পেছনে দাঁড়িয়ে হাঁকতে শুরু করলেন, “কলা নিয়ে যান, কলা। আদি অকৃত্রিম মর্তমান কলা। টাইম মেশিন কলা। দুটো খেলেই ধাঁ করে একদম কপিযুগ।”

বলু প্রথমে একটু হতভম্ব হয়ে গেলেও খুব তাড়াতাড়িই ব্যাপারটা সামলে নেয়, “কিন্তু দাদা, কত দামে বেচব? তিনটে দশ টাকা দরে একটা কলার দাম হিসেব করতে গেলে তো রেকারিং ডেসিমাল চলে আসছে। কেউ যদি তিনের গুণিতকে না কেনে ডেসিমাল সামাল দেব কী করে?”

“তিনটে দশ টাকায় বেচতে তোকে কে বলেছে? তা হলে তো ওই বিহারী কলাওয়ালাটার মত বসেই থাকতে হবে, বিক্রি আর হবে না। বলাই তো ছিল, একটা কলার দাম পঞ্চাশ পয়সা। ছোটবেলার সেই না মেলা অঙ্ক মেলাবার এমন সুযোগ আর পাবি না। নে নে ভেঁপু বাজা।”

এরপর বিমর্ষবর্ধন আমার দিকে ফিরে বললেন, “আপনি দাঁড়িয়ে দেখছেন কী? আপনি আর আপনার বৌদি একটার পর একটা কলা খেয়ে যান। বিজ্ঞাপন হবে। মাঝে মাঝে একটু আধটু হুপ- হাপও করতে পারেন।”

বলুর ভেঁপু বিকট সুরে বেজে উঠল। ভেঁপুর আওয়াজে আর এরকম ধুতি- পাঞ্জাবী পরা ধোপদুরস্ত কলাওয়ালার হাঁকডাকে মুহূর্তেই ভিড় জমে উঠল। তারপর বলুর ‘টাকায় দুটো, টাকায় দুটো’ নামতা পড়ায় সব কলা আধঘণ্টায় হাওয়া।

কলার খোসাগুলো ঝাঁকায় গুছিয়ে রেখে বিমর্ষবর্ধন বললেন, “অনেক হয়েছে, চলুন এবার ওই জিলিপির দিকটায় যাওয়া যাক।”

যাক, তাহলে ফল খেয়ে ফল কিছু ফলেছে। আমাদের মাহেশ অভিযান সফলই বলতে হবে। ফলাও করে বলার মতই ফলার হল একটা। প্রফুল্লচিত্ত বিমর্ষবর্ধন এবং বল(দ)বর্ধনকে দেখে মনে হল ওঁদের জিনগুলো যথেষ্টই উত্তেজিত অবস্থায় আছে। একেবারে কপিযুগে না পৌঁছতে পারলেও, ওঁদের সাক্ষাৎ পূর্বপুরুষ হর্ষবর্ধন আর গোবর্ধনের মতই লাগছে যেন।

দেবাদিদেব মহাদেব শ্রীশ্রী শিব্রাম চক্কোত্তির খুরে খুরে দণ্ডবৎ। দোষ নিও না প্রভু। নন্দীভৃঙ্গী-চ্যালাচামুন্ডাদের একটুআধটু নকলনবিসিতে গুরুর গুরুত্ব কিছু টাল খায় না।

ছবিঃ শিবশংকর ভট্টাচার্য

রামতনুবাবু আর তাঁর গান

শৌভিক ব্যানার্জি

রামতনুবাবুর আজকে মন খারাপ। আজকে ওঁর বয়েস সাতষট্টি বছর, আটমাস, তিন দিন। গত আটমাস তিন দিন ধরে ওঁর মন খুবই ভাল ছিল। ভাল থাকার কারণ জানতে হলে তোমাদের একটু পিছন দিকে যেতে হবে।

ছোটোবেলার থেকেই রামতনুবাবুর শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ওপর খুব ঝোঁক, বিশেষ করে যেদিন জেনেছেন যে তানসেনের আগের নাম ছিল রামতনু পাণ্ডে, সেদিন থেকে ওঁর দৃঢ় বিশ্বাস উনি সঙ্গীতের জগতে একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ।

তোমরা যারা তানসেনের নাম শোননি তাদের জন্য একটু বলি, তানসেন ছিলেন মোঘল সম্রাট আকবরের নবরত্ন সভার একজন রত্ন। জন্ম আন্দাজ ১৪৯৩ – ১৫০৬ (সঠিক সময় জানা যায় না) আর মৃত্যু ১৫৮৬ – ১৫৮৯ এর মধ্যে। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে ওঁর অনেক মৌলিক অবদান আছে।

রামতনুবাবু ছোটোবেলার থেকেই গান বাজনার মধ্যে মানুষ, ওঁর ঠাকুরদা মানে বাবার বাবা ছিলেন একজন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের পণ্ডিত। কিন্তু কেন কে জানে রামতনুবাবুর গলাতে ঠিক গান আসে না। প্রথমদিকে উনি বেশ কয়েকজন ওস্তাদের কাছে নাড়া বেঁধেছিলেন কিন্তু কেউই

ওঁকে বেশিদিন শেখাতে রাজি হননি। শেষ বারে পণ্ডিত বিজয় চক্রবর্তী ওঁকে বলেই ফেললেন "রাম তোর অধ্যবসায় আছে ঠিকই, কিন্তু সবার দ্বারা তো সবকিছু হয় না, তুই বরং অন্য কিছু চেষ্টা করে দেখ।"

কিন্তু রামতনুবাবু এত সহজে হাল ছেড়ে দেবার পাত্র নন। সেই থেকে উনি তানসেনের একটি ছবির সামনে একলব্যের মত সঙ্গীতসাধনা জারি রেখেছেন। প্রচুর বইও পড়েছেন ওঁর গুরুর সম্বন্ধে। অধ্যবসায়ে যে একেবারে ফল দেয়নি তাও নয়, এই যেমন উনি পড়েছেন যে তানসেনের গান শুনে নাকি পশুপাখিও বশ মানত, একবার তো একটা পাগলা হাতি পর্যন্ত তানসেনের গান শুনে শান্ত হয়ে গেছিল। তা সেদিনকে উনি সকালে উঠে গলা সাধা সেরে বারান্দায় বসে আদা দেওয়া চা খাচ্ছিলেন, এমন সময় ফজল মিয়াঁ এলো, হাতের ঝুড়িতে একটা কুমড়ো, বেশ কয়েকটা বেগুন আর কিছু কাঁচা লংকা। ফজল মিয়াঁর পাঁচ কাঠা জমি আছে রামতনুবাবুর বাড়ির পাশেই। রামতনুবাবু দাম দিতে গেলে, ফজল মিয়াঁ জিভ কেটে জানাল "কী যে বলেন বাবু, আপনার থেকে কি দাম নিতে পারি! এত কাকতাড়ুয়া লাগালাম, টিন পিটলাম কিছুতেই কিছু হয় না, প্রতিবার পাখিতে, কাকে ঠুকরে ঠুকরে সব নষ্ট করে ফেলে। কিন্তু এবার আপনার ওই চিৎকার থুড়ি, মানে ওই গান আর কি! ত্রিসীমানায় আর কেউ নেই।" তারপর এই যেমন তপন মালাকার, কথা নেই বার্তা নেই একদিন সকালে এক হাঁড়ি মিষ্টি নিয়ে হাজির। তপন বাবু একেবারে বদ্ধ কালা, খুব ভোরে উঠে উনি মর্নিং ওয়াক্ করতে করতে রামতনুবাবুর বাড়ির কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, আচমকা কানের কাছে একটা বোমা ফাটার মতো শব্দ, তারপর থেকে ওঁর কান একদম পরিষ্কার। এখন নাকি কেউ জোরে শ্বাস ফেললেও উনি শুনতে পাচ্ছেন! এতসব সত্ত্বেও রামতনুবাবু ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না যে ওঁর গান ঠিক গান হয়ে উঠছে কিনা।

সেদিন ওঁর জন্মদিন, নিশীথ রাত্রিবেলা উনি মনের দুঃখে বিলাসখানি তোড়ি গাইতে লাগলেন। বিলাস খান ছিলেন তানসেনের ছেলে, বাবার মৃত্যুর পরে বাবার স্মৃতি এবং দুঃখে উনি এই রাগটি রচনা করেন। রামতনুবাবু খুব দরদ দিয়েই গাইছিলেন। আজ যদি ওঁর গুরু থাকতেন তা হলে কি আর ওঁর এই দুরবস্থা হতো। এই চিন্তায় আর গুরুদেবের মহাপ্রয়াণের দুঃখে ওঁর দু'চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছিল।

এমন সময় পাশ থেকে কে যেন বলল "উহুঁ, বিলকুল গলৎ!"

রামতনুবাবু সভয়ে চুপ করে গেলেন। এতক্ষণ গানে তন্ময় হয়েছিলেন বলে বুঝতে পারেননি, এখন বেশ বুঝতে পারলেন যে সারা ঘরময় একটা খানদানি আতরের গন্ধ, এঠিক আধুনিক সেন্ট বা ডিওডোরেণ্ট এর মত ফঙ্গবেনে গন্ধ নয়। এদিক ওদিক দেখে উনি বললেন, "কে? কে বলল কথাটা? শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সবাই বুঝতে পারে না!"

এবার বেশ একটা মোগলাই ধমক ভেসে এলো। "বেয়াদপ! গুরুর সঙ্গে কথা বলার সহবৎ জানিস না ?"

প্রথমটা ভয় পেলেও রামতনুবাবু সামলে নিলেন, বেশ বুঝতে পারলেন এ হল ওঁর এতদিনের অধ্যবসায়ের ফল। তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেমে মেঝের ওপর গড় হয়ে একটা প্রণাম ঠুকলেন, বললেন "মাপ করে দেবেন গুরুদেব, আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। তা আপনাকে প্রণাম করলে হবে, নাকি সেলাম, আদাব এসব করতে হবে? কিন্তু আমি তো ঠিক ওগুলো জানি না!" নিজের ওপরই নিজের বেশ রাগ হোল এই না জানার জন্যে। আওয়াজটা

কিন্তু এবার একটু নরম হল। বলল, "শ্রদ্ধা যে ভাবেই প্রকাশ করবি তাই কবুল করব। উঠে বস এবার!"

রামতনুবাবু জোড় হাতেই উঠে বসলেন। বললেন, "গুরুদেব, আমি নামডাক চাই না, শুধু চাই একটু ভাল গান করতে। আজ বাহান্ন বছর খেটেই মরলাম, গান আর হোল না।"

ওপাশ থেকে মোলায়েম গলা বলল, "ওরে ঘাবড়াসনি। কে বলেছে হয়নি? শুধু একটু ঘষা মাজা দরকার। দেখি তোর কণ্ঠটা। গলাটা একটু উঁচু করে ধর তো!"

রামতনুবাবুর কণ্ঠনালিটা ধরে যেন একটা ঠাণ্ডা ঝড় বয়ে গেল। বিভিন্ন ভাবে টিপে টুপে, এদিক ওদিক চেপেচুপে দিল। তারপর সেই আওয়াজ বলল, "নে ধর তো এবার দরবারি কানাড়া!"

রামতনুবাবু জানেন, ওঁর গুরুদেব স্বয়ং গাইতেন এই রাগটি। মোঘল সম্রাট আকবর এর দরবারে। বেশ ভয়ে ভয়ে ধরলেন। মাঝে মাঝে পাশ থেকে কেউ শুধরেও দিল।

সেই থেকে এই আটমাস তিনদিন উনি নিয়মিত রাত্রে সাধনা করেন, আর পাশে থাকেন ওঁর অশরীরী গুরুদেব। ওঁর প্রভূত উন্নতিও হয়েছে এর মধ্যে। এই তো একমাস আগে, রাত্রে সেদিন লোডশেডিং। উনি অন্ধকারেই দীপক গাইছিলেন, প্রায় শেষের মুখে পাশ থেকে কেউ বলল, "কেয়াবাৎ, কেয়াবাৎ, বহুত্ খুব।" এবং দপ করে ওঁর টেবিলে রাখা হারিকেনটা জ্বলে উঠলো।

রামতনুবাবু নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। উনি পড়েছেন যে তানসেন যখন নিজে দীপক গাইতেন তখন এরকম আগুন জ্বলে যেত। উনি তাড়াতাড়ি আর একবার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানিয়ে বললেন, "সবই আপনার কৃপা গুরুদেব!"

গতকাল আবার ফজল মিয়াঁ এসেছিল। যথারীতি সঙ্গে অনেক আনাজপাতি। বলল ওর একটা বলদ নাকি পাগল হয়ে গেছিল, দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে সারা মাঠ ছোটাছুটি করছিল। ফজল আর তার দুই ছেলে মিলেও কিছুতেই বাগে আনতে পারছিল না। এমন সময় রামতনুবাবু কী একটা গান ধরেন, সেই বলদ লক্ষ্মী ছেলেরে মতন গোয়ালে গিয়ে ঢুকেছে।

তপনবাবুও এসেছিলেন, তবে এবার আর মিষ্টি আনেননি। খুবই ক্ষেপে ছিলেন ভদ্রলোক। চিৎকার করে অনেক কিছু বললেন। মোদ্দা কথায়, কান সেরে যাবার পর উনি আর রামতনুবাবুর বাড়ির কাছাকাছি মর্নিং ওয়াক্ করতেন না। বরং অনেক দূর দিয়েই যেতেন, পাছে ওই বিকট চিৎকারে ওঁর কানে আবার তালা ধরে যায়! সেদিন ভোরেও তাই যাচ্ছিলেন। কিন্তু দূর থেকে একটা অদ্ভুত সুর ওঁর কানে আসে, আর সেটার টানে উনি প্রায় সম্মোহিতের মতন ছুটে আসেন। টের পান যে রামতনুবাবু নিজেই ওই সুরটা গাইছেন। মুগ্ধ হয়ে কতক্ষণ যে দাঁড়িয়ে ছিলেন নিজেই জানেননা। তারপর খানিকটা ঘোরের মধ্যেই বাড়ি ফিরে যান। তারপর থেকেই টের পান যে কানে আবার কিছু শুনতে পাচ্ছেন না। কেবল ওই সুরটাই যেন কানের পাশে ঘুরপাক খাচ্ছে।

আজকে বিকেলেও রামতনুবাবু প্রতিদিনের মতই একটু বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। কিছুটা দূরে একটা পার্ক আছে, সঙ্গে খানিকটা খেলার মাঠ। এখানেই একটু পায়চারি সেরে, পার্কের বেঞ্চে কিছুক্ষণ বসে উনি চলে আসেন। আজও বসেছিলেন, হঠাৎ নজর করলেন পাশে একটি দশ/এগার বছরের মেয়ে বসে আছে। না একটু ভুল হল, বসে বসে নিঃশব্দে কেঁদে চলেছে! একটু গলা খাঁকারি দিয়ে রামতনুবাবু বললেন "খুকি, কাঁদছ কেন?"

এতে বেশ কাজ হল, মেয়েটি কান্না থামিয়ে একটি কড়া চাউনি দিল এবং অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বলল, "আমার নাম খুকি নয় আর আমি বয়েসেও খুকি নয়, আমার নাম অদিতি। আমি ক্লাস ফাইভে পড়ি!"

রামতনুবাবু তাড়াতাড়ি নিজেকে শুধরে নিলেন, "বটেই তো, বটেই তো! তা অদিতি তোমার কি মন খারাপ ?"

খানিকক্ষণ কথাবার্তা চলার পর জানতে পারলেন ব্যাপার বেশ গুরুতর। ছোটোবেলা থেকেই অদিতির গানের প্রতি খুব ঝোঁক। তা ওর বাবা, মা তাতে বাধাও দেননি। গানের স্কুল, গানের জন্যে প্রাইভেট টিউটর, সঙ্গত করার জন্যে তবলচি, সবেরই যোগান দিয়েছেন। এই করতে করতে অদিতি মোটামুটি রেজাল্ট করে ক্লাসে উঠলেও কোনদিন স্ট্যান্ড করতে পারেনি। ওর বাবা, মা ভেবেছিলেন যে পড়াশুনোতে অতটা ভাল না হলেও গানে নিশ্চয়ই অদিতি কিছু করে দেখাবে। কিন্তু অদিতি আজ পর্যন্ত একটাও গানের প্রতিযোগিতাতে সুবিধে করতে পারলনা। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতন এখন আরও একটা সমস্যা উপস্থিত হয়েছে। অদিতির বাবা একটা বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন, সেটি এখন লাটে উঠেছে। শোনা যাচ্ছে বহু লোকের বহু টাকাও গায়েব। রোজ সকালে কাগজের প্রথম পাতায় লম্বা লম্বা খবর বেরোয়। তাই অদিতির গানের স্কুল বন্ধ। স্কুলটা কোনওরকমে চালু আছে। কোনদিন সেটাও হয়তো বন্ধ হয়ে যাবে।

আরও দু'তিন দিন পর রামতনুবাবু অদিতির সঙ্গে ওদের বাড়ি গেলেন। একথা ওকথার পরে নিজের ইচ্ছেটা প্রকাশ করলেন। গান শেখাতে চান অদিতিকে। না না, পয়সার বিনিময়ে নয়, ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের একটা ঘরানা যেন বেঁচে থাকে সেই জন্যই। অদিতি সেই থেকে তালিম নেয় রামতনুবাবুর কাছে।

দেখতে দেখতে কেটে গেছে দেড় বছর। রামতনুবাবুর কড়া নির্দেশ ছিল, অন্তত একবছর টানা রেওয়াজ করার আগে অদিতি কোন প্রতিযোগিতাতে যাবে না। একমাস আগে

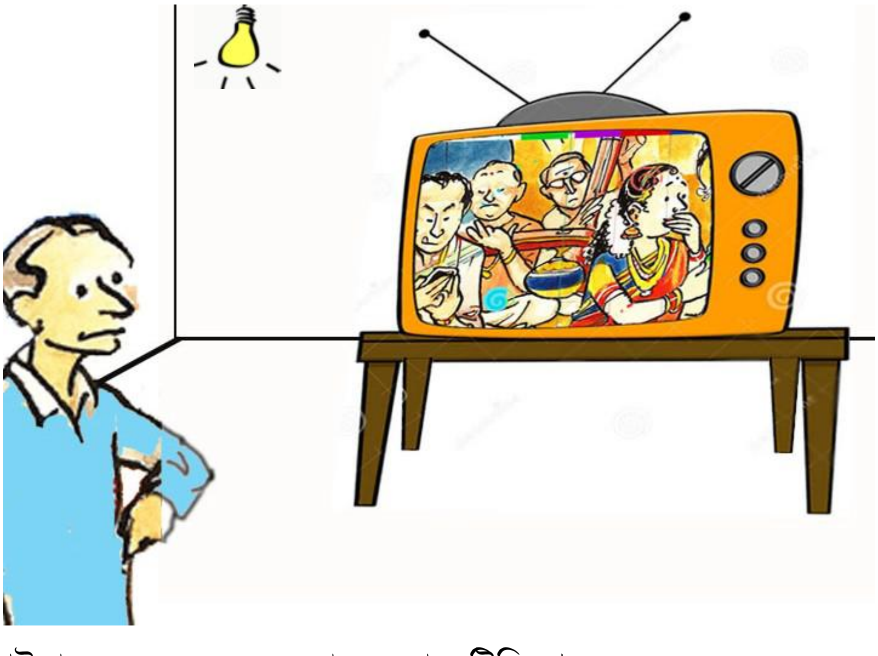

একটি সর্বভারতীয় গানের প্রতিযোগিতার আয়োজন করে একটি টিভি চ্যানেল। খুবই জনপ্রিয় এই প্রোগ্রাম। অদিতি অংশগ্রহণ করেছিল, আজ তার ফাইনাল। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের নানা প্রতিযোগীদের মধ্যে অদিতি আর একটি দক্ষিণ ভারতীয় ছেলের মধ্যে আজ ফাইনাল। সন্ধ্যের সময় রামতনুবাবু টিভি খুলে বসলেন। অন্য ছেলেটি খুবই ভাল গায়ক। দক্ষিণভারতীয় ঘরানায় খুব সুন্দর দখল। আজও অসাধারণ গাইল ছেলেটি। রামতনুবাবু পরিষ্কার বুঝলেন, জীবনের সেরা গানটা আজ না গাইলে অদিতির কোন সুযোগ নেই। অদিতি

এসে বসল। সরস্বতী, গুরু এবং তাঁর গুরু বন্দনায় আলাপ শুরু করল। রামতনুবাবু দম বন্ধ করে শুনছিলেন। অদিতি মেঘমল্লার ধরল। মনপ্রাণ দিয়ে গাইছে মেয়েটা। অনেকদিন বাদে রামতনুবাবু ঘরে সেই কড়া আতরের গন্ধটা পেলেন। তন্ময় হয়ে গান শুনতে শুনতে মনে হোল কেউ বলল, "কেয়াবাৎ, কেয়াবাৎ, বড়িয়া তালিম দিয়া তুনে"।

বাইরে ঝেঁপে বৃষ্টি নামল, লোডশেডিং।

গ্রাফিক্সঃ ইন্দ্রশেখর

তপুর ইস্কুল

তরুণকুমার সরখেল

একটু আগেই বাবা ফোন করে মাকে জানিয়েছে- "তপুর লটারিতে নাম ওঠেনি।" ফোন পেয়েই মায়ের মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল। ফোনে মা বলছিল, "তুমি শেষ পর্যন্ত লটারিতে ছিলে তো মাইকে সবার নাম ঠিকঠাক শোনা যাচ্ছিল?"

ওপাশ থেকে বাবা কী বলছিল তা শোনা না গেলেও মায়ের থমথমে মুখ দেখেই তপু ওখান থেকে সরে এসেছিল।

তপুর এখন ক্লাস ফোর। এ বছরই সে পঞ্চম শ্রেণিতে জেলাস্কুলে ভর্তি হবে বলে তার বাবা আবেদনপত্র জমা করেছিল। দু'কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবিও তোলা হয়েছিল। আবেদনপত্রের উপর ছোট্ট তপুর ছবিটা একপাশে সেঁটে বাবা মাকে বলেছিল, "দেখো ছবিটা কেমন ব্রাইট লাগছে। ছোট্ট তপু এবার কতো বড়ো স্কুলে পড়বে। আমরা তো এত ভালো স্কুলে পড়ার সুযোগ পাইনি কোনদিন। তপু নিশ্চয়ই একদিন স্কুলের সুনাম বৃদ্ধি করবে।

মা বাবাকে মাঝপথে থামিয়ে বলেছিল, "এখন জেলা স্কুলে ভর্তি হওয়া অত সোজা নয়। প্রতি বছরই কয়েকশ' ছেলে ভর্তি হওয়ার আবেদন জমা করে, কিন্তু লটারিতে সুযোগ হয় মাত্র কয়েকজনের। আমাদের তো লটারি লাগে না কোনদিন।"

তপু চুপচাপ ভাবছিল। বাবারও নিশ্চয়ই ভীষণ মন খারাপ হয়েছে। কেননা শেষ পর্যন্ত বাবার আশা ছিল তপু লটারিতে সুযোগ পাবেই। একমাস ধরে বাবা

নিয়মিত খবর রাখছিল কবে ভর্তির আবেদনপত্র দেওয়া হবে, জমা দেবার শেষ তারিখ কত এইসব। তপু জেলা স্কুলে চান্স পেলে বাবা অনেকটা চিন্তামুক্ত হতে পারত। কেননা এখানে একবার ভর্তি হতে পারলে এইচ এস পর্যন্ত বিনা বাধায় পড়তে পারবে।

বাবা তপুকে নিয়ে একদিন জেলা স্কুলের প্রকান্ড গেটের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিল, "এই স্কুল থেকে কত ছাত্র পড়াশোনা করে এখন দেশে-বিদেশে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। কেউ মস্ত বড়ো বিঞ্জানী হয়েছেন, কেউ বা বড়ো পন্ডিত হয়ে বিদেশের কলেজে কলেজে লেকচার দিয়ে বেড়াচ্ছেন।"

তপু লেকচার মানে কী জানে না। তবে বিজ্ঞানী কাদের বলে সে জানে। বিজ্ঞানীরাই তো নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার করে পৃথিবীকে এগিয়ে নিয়ে চলছেন। সে-ও একদিন মস্ত বড়ো বিজ্ঞানী হবে। তবে তার আগে এই স্কুলের গেট পেরিয়ে তাকে তো ভেতরে ঢুকতে হবে! তার ইচ্ছের কথা বোধহয় বাবা জানতে পেরেছিল। তপুকে নিয়ে বাবা স্কুলে ঢুকে খুব বড়ো একটা হলঘরে নিয়ে এসেছিল। হলঘরের দেওয়ালে বড়ো বড়ো ছবি টাঙানো।বাবা খুব পুরনো একটা সাদা কালো ছবি দেখিয়ে বলেছিল, "ইনি হলেন দুর্গা বর্মণ। ইনিই এই স্কুলের প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন। বিলেত থেকে ফিরে এসে ইনি এই স্কুলে পড়ানোর দায়িত্ব নেন। ছাত্ররা তাঁর স্নেহ ও শিক্ষা পেয়ে পরবর্তীকালে অনেক বড়ো হয়। দুর্গা বর্মণের নাম ছড়িয়ে পড়ে সব জায়গায়। এঁকে প্রণাম কর।"

তপু ভালো করে ছবিটার দিকে তাকিয়ে দেখল। মনে হল ছবিটা যেন তার দিকেই এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসিটা তপুর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে যেন একটু বেশি হয়ে গেল। তপু হাত জোড় করে ছবিটাকে প্রণাম করল।

বাবা বাড়িতে ফিরে এসে মা'কে ডেকে বলল, "সাড়ে চারশোর মত আবেদন জমা পড়েছিল। এদিকে পঞ্চম শ্রেণিতে নেবে মাত্র সত্তর জন। লটারিতে সুযোগ পাওয়া অত সোজা নয়।"

বাবা-মায়ের এরকম কথা হচ্ছে তখনই তপু তার সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। বিকেলে ও প্রতিদিনই তার ছোট্ট সাইকেল নিয়ে মানভূম ভিক্টোরিয়া স্কুলের মাঠে ঢুকে পড়ে। ভিক্টোরিয়া স্কুলেই তপু নার্সারি থেকে পড়ে আসছে। তাদের বাড়ি থেকে এই স্কুল খুব কাছে।

অর্ণব, কুনাল, রূপম কেউ আসেনি। তপু অনেক আগেই স্কুল মাঠে এসে গেছে। সাইকেল দাঁড় করিয়ে সে ঘাসের উপর বসে পড়ল। এই জায়গাটায় শীতের চমৎকার মিষ্টি রোদ সরাসরি এসে পড়ছে। তপুর মনে হল সে যেন রোদের মধ্যে সাঁতার কাটছে। পাশের খেজুর ঝোপটার ভেতরে চট করে দুটো ঘুঘু পাখি ঢুকে গেল। সে নিশ্চয়ই এসময় এখানে এসে ঘুঘু পাখি দুটোর খেলা মাটি করে দিল। পাখি দুটো যাতে ঝোপ থেকে আবার বেরিয়ে আসে তাই সে পা ছড়িয়ে ঘাসের মধ্যে শুয়ে পড়ল।

কিন্তু ঝোপের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এলেন ধবধবে সাদা চুলের এক ভদ্রলোক। পরনে ধুতি ও পাঞ্জাবি। গায়ে হাতে বোনা উলের হাফ সোয়েটার।

সোয়েটারের মধ্যে বড়ো বড়ো লেবু রঙের বোতাম লাগানো। পায়ে সাধারণ চপ্পল। ভদ্রলোককে দেখে তপু খুব অবাক হয়ে গেল। তপু এঁকে আগে এই স্কুলে দেখেছে বলে মনে হল না, তবে খানিকটা চেনা চেনাও মনে হল।

তিনি তপুর কাছে এসে একেবারে তপুর পাশটিতে বসলেন। তারপর স্নেহের সুরে বললেন, "কী তপুবাবু ভাল স্কুলে চান্স পাওনি বলে মন খারাপ, এই তো?"

তপু কিছু জবাব দিতে পারল না। ভদ্রলোক বললেন, "আমি একজন শিক্ষক। তুমি হয়তো আমায় চেনো না। কিন্তু তুমি কি জানো তোমার মতো আমিও এই স্কুলেরই ছাত্র ছিলাম।"

এরপর তিনি তপুর মাথায় হাত রেখে বললেন, "তুমি তো খুব ভালো পড়াশোনা কর। তাহলে আর চিন্তা কী? দেখবে এই স্কুলে পড়েও তুমি একদিন মস্ত বড়ো হবে। আর তাছাড়া এই স্কুলের এত বড়ো মাঠ, ক্যাম্পাসের মধ্যে এতসব গাছ-গাছালি, বুনো ঝোপ, ঘুঘু পাখি আর ক'টা স্কুলে পাবে বলো? প্রকৃতি পাঠের কত উপকরণ এখানে ছড়িয়ে রয়েছে। এই যে তুমি এখানে বসে বসে দেখতে পাচ্ছো- পাখিরা উড়ে বেড়াচ্ছে তোমার মাথার উপর, সারাদিন ধরে গাছেরা রোদ মেখে স্নান করে নিচ্ছে। এ দৃশ্য শহরের আর ক'টা স্কুলে পাওয়া যাবে? আমি তো বাপু এখনো দিব্যি আমার স্কুলেই পড়ে আছি। এখানের মাঠ, স্কুলের পুরনো দেওয়াল, দেওয়াল বেয়ে বেড়ে ওঠা লতা-গুল্ম দেখতে আমার বেশ লাগে। আমার ফেলে আসা স্কুলের ছেলেবেলাটা এখানে খুঁজে পাই।

আমরা যখন ছোটো ছিলাম তখন তো পড়াশোনার ব্যাপারে এত কড়াকড়ি ছিল না। পড়ার ফাঁকে ফাঁকেই আমরা স্কুল মাঠে খেলা করতাম। তাই বলে আমরা কি বড়ো হইনি? তাই তো তোমায় বলছি, একদম মন খারাপ করবে না।"

এই বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তপুর মাথার চুলগুলো খানিকটা এলোমেলো করে দিয়ে একটু

হাসলেন। তারপর পুটুস ঝোপের পাশ দিয়ে অন্য কোথাও চলে গেলেন। ভদ্রলোকের হাসিটা তপুর ভীষণ চেনা চেনা বলে মনে হল। কোথায় যেন দেখেছে। হ্যাঁ, মনে পড়েছে, দুর্গা বর্মণ!

তপুর এবার অবাক হবার পালা। রূপম, অর্ণব, কুনাল সবাই তার চারপাশে ভিড় করে আছে। কুনাল বলল, "কী রে তপোব্রত সাইকেলে চক্কর না দিয়ে পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছিস যে বেশ।"

তপু বলল, "তোরা দুর্গা স্যারকে দেখলি? এই একটু আগেই এখানে ছিলেন! "

বন্ধুরা বলল, "দুর্গা স্যার?, কই দেখিনি তো।"

তপোব্রতর মন খারাপ ভাবটা আর থাকল না। বন্ধুরা যে যার মতো খেলায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সে দেখল ঝোপের ভেতর থেকে এতক্ষণ পরে ঘুঘু পাখি দুটো বেরিয়ে ডানা মেলে আকাশে উড়ে গেল। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তপু ভাবল, "দুর্গা স্যার জেলা স্কুলের একজন আদর্শ শিক্ষক হলেও তিনি নিজেই তো এই মানভূম ভিক্টোরিয়া স্কুলের ছাত্র ছিলেন। এ কথাই তো তিনি তপুকে বলে গেলেন। সে এই স্কুলেই পড়বে! আর একদিন মস্ত বড়ো বিজ্ঞানী হয়ে সবাইকে অবাক করে দেবে! "

গ্রাফিক্সঃ ইন্দ্রশেখর

নটি বয়

কিশোর ঘোষাল

ছোটবেলায় আমরা মধ্য কলকাতার কলেজস্ট্রিট পাড়ায় একটি ভাড়ার বাসায় থাকতাম। সেখান থেকে আমার স্কুল, দাদার কলেজ ছিল পায়ে হাঁটা রাস্তায়। তখন আমাদের স্কুলজীবন শুরুই হতো ক্লাস ওয়ান থেকে। আর ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত আমাদের স্কুল বসত সকালবেলায়। বাবার হাত ধরে রোজ সকালে সাদা জামা, সাদা হাফপ্যাণ্ট পরে আমরা স্কুলে যেতাম। হাতে থাকত বই খাতা ভরা স্টিলের বা অ্যালুমিনিয়মের বাক্স।

আমাদের স্কুলবাড়িটা কলেজস্কোয়ার বা গোলদীঘির উত্তর পশ্চিমদিকে। কাজেই সকালবেলা স্কুল যাওয়ার পথে আমরা কলেজ স্কোয়ারের ভেতর দিয়েই যেতাম। তাতে রাস্তাটা কম হত, আর মজাও লাগত খুব। গোলদীঘির জলে সাঁতারু ছেলেদের ঝপাং ঝপাং ঝাঁপ মারা দেখতাম। দীঘির চারদিকের রাস্তার ধারের বেঞ্চে বসে থাকতেন হাতে লাঠিওয়ালা অনেক বুড়োমানুষ। অনেক মোটাসোটা মানুষ আবার দীঘির চারদিক ধরে দৌড়ত। পাশ দিয়ে যাবার সময় তাদের নিশ্বাসের হোঁসফোঁস আওয়াজ পেতাম। অনেকে আবার আমাদের ড্রিল ক্লাসের

– এক, দুই তিন, চারের নিয়মে হাত নাড়তে নাড়তে হেঁটে যেত পাশ দিয়ে। আমি হাঁ করে এইসব দেখতাম, আর স্কুল যেতে দেরি হয়ে যাচ্ছে বলে, বকা খেতাম বাবার কাছে।

পনেরই আগস্টে স্কুলের ছাদে পতাকা তুলতেন আমাদের হেডমাস্টারমশাই। ওই একদিনই আমাদের স্কুলের ছাদে যাওয়ার অনুমতি মিলত। বাকি সারাবছর তালা দেওয়া থাকত ছাদের দরজায়। স্কুলের ছাদে উঠে আমরা অবাক হয়ে দেখতাম, চারদিকে হাজার হাজার বাড়ির ছাদ। আর পশ্চিমদিকে বেশ খানিকটা দূরে হাওড়া ব্রিজ। ছাদের আলসেতে বুক দিয়ে নিচেয় দেখতাম, কলেজস্ট্রিট ধরে গড়িয়ে চলা, ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি। ছাদ থেকে দেখে মনে হত যেন, সব ঝুলনের খেলনা। আমাদের পাড়ায় খুব বড়োলোক পল্টুরা বাড়িতে ঝুলন সাজাত। রঙিন কাঠের গুঁড়ো দিয়ে ,আর কাঠের ছোট্ট ছোট্ট রেলগাড়ি, বাস, নৌকো, নানান রকম পুতুল দিয়ে। পল্টুদের বনেদি বিশাল যৌথ পরিবারটি ছিল বৈষ্ণব, কৃষ্ণঠাকুরের যে কোন পুজোতেই ওদের বাড়িতে খুব ধুমধাম হতো।

পনেরই আগস্টের একটু আগে বা পরে, কলেজ স্কোয়ারে পুজোর মণ্ডপ বানানোর কাজ শুরু হয়ে যেত। খুব অবাক লাগত। গতকাল সকালে যাবার সময় দেখলাম, কিচ্ছু নেই। আজ সকালে স্কুল যাবার সময় দেখলাম, মণ্ডপ বাঁধার জায়গায় বাঁশের পাহাড়, আর মোটামোটা শালের গুঁড়ি।

আমি হয়তো বাবাকে জিগ্যেস করলাম, "এত বাঁশ এনেছে কেন গো? "

বাবা বলতেন, "পুজোর মন্ডপ বানাতে হবে না? এই তো, আর মাসদেড়েক পরেই পুজো। আর সময় কোথায়? "

তারপরের দিন স্কুলে যাবার সময় দেখতাম, শালের গুঁড়ির অনেকগুলো খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। দু একদিন পরে দেখতাম শালের খুঁটির সঙ্গে বাঁশের কাজও শুরু হয়ে গেছে। আরো কয়েকদিন পর বাঁশের খাঁচা বানানো হয়ে যেত, আর মোটা ত্রিপল দিয়ে ঢাকা পড়ে যেত সেই মস্ত খাঁচা। ত্রিপলে ঢাকার পর শুরু হত আসল কাজ। নানান রংয়ের কাপড়ের কুঁচি বানানো। এই কুঁচি দেওয়া রঙিন কাপড়ে, ধীরে ধীরে অদ্ভুত সুন্দর হয়ে উঠতে থাকত সেই মণ্ডপ।

কলেজ স্কোয়ারের মণ্ডপে যত রং ধরত, আমার স্কুলে যাবার ইচ্ছের রং তত ফিকে হয়ে আসতো। সারাবছর অনায়াসে হেঁটে যাওয়া স্কুলের রাস্তাটাকে মনে হতো কি কষ্টকর! মণ্ডপের সেজে ওঠা দেখতে দেখতে আমার দুটো পা পাথরের মতো ভারি হয়ে উঠতো! বাবা আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে চলতেন স্কুলের দিকে, বলতেন, "তাড়াতাড়ি পা চালা, হাঁ করা ছেলে। এরপর স্কুলের দরজা বন্ধ হয়ে গেলে আর ঢুকতে দেবে না। "

আমাদের মাথায় তখন শুধু কি কলেজ স্কোয়ারের পুজো মণ্ডপ ঢুকে থাকত? ঢুকে থাকত পুজোর নতুন জামা প্যান্ট। ঢুকে থাকত সেই নতুন জামা প্যান্টের গন্ধ। স্কুল থেকে ফিরে, দুপুরে ভাত খেয়ে, মায়ের কাছে নতুন জামা প্যান্ট দেখানোর জন্য রোজ একবার বায়না করতাম। হাত বুলোতাম জামার গায়ে, গন্ধ নিতাম। দেখে হেসে ফেলতেন মা, বলতেন, "দ্যাখো, পাগল ছেলের কাণ্ড দ্যাখো, রোজ রোজ কী শুঁকিস কী ?"

জামার বুকে আর হাফ প্যান্টের পায়ের কাছে সুতো দিয়ে সেলাই করা থাকতো দোকানের লেবেল। লেবেলগুলোতে কি সুন্দর লেখা থাকত "কমলালয় স্টোর্স"।

একবার মনে আছে, পুজোয় অনেক বন্ধুদের নতুন জুতো কেনা হয়ে গেছে, আমার হয় নি। বাবা বলেছিলেন, আমার জুতোটা নাকি বেশ ভালোই আছে, এবারে আর জুতো কেনার

দরকার নেই। ভীষণ রাগ হয়েছিল বাবার ওপর, আর আমার খারাপ না হওয়া বিশ্বাসঘাতক জুতোর ওপর। পরদিন থেকে স্কুল চলার পথে, শুরু হল জুতোর ওপর অমানুষিক অত্যাচার। ফুটপাথে উঠতে গিয়ে হোঁচট খেলাম। পাথরে, ইঁটের টুকরোয় অনেকবার ঠোক্কর খেলাম। কিন্তু জুতোর কিচ্ছু হল না। স্কুলে গিয়ে ডাবের খোলা দিয়ে ফুটবল খেলার বুদ্ধি দিল কয়েকজন বন্ধু। এই উপায়ে আমার অনেক বন্ধুই নাকি সফল হয়েছে। স্কুল শুরু হওয়ার আগে আর টিফিনের সময় চলতে লাগল আমাদের অনলস ফুটবলচর্চা।

ডাব নিয়ে ফুটবল চর্চার দিন তিনেকের মাথায়, আমার জুতো হাল ছেড়ে দিল। আমার ডান পায়ের বিধ্বস্ত জুতোর তলা থেকে, মস্ত জিভের মতো, সোল খুলে গেল। আমার নিষ্ঠুর হাত থেকে তাও সে পরিত্রাণ পেল না। মায়ের হাত ধরে স্কুল থেকে ফেরার পথে, আমি পা ঘষে ঘষে, বিবর্ণ, বিকৃত করে দিলাম, আমার জুতোর সেই মস্ত জিভ। মা অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন, "জুতোর এই দশা কী করে হলো? কী করিস কী স্কুলে গিয়ে ?"আমি ঠোঁট উল্টে জবাব দিলাম," আমি তো বলেইছিলাম, এ জুতো আর চলবে না। তোমরা বললে ভালোই আছে"।

থমথমে মুখে মা কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে। সেদিন আমার সারাটা দিন কাটল চাপা আতঙ্কে। মা এখন কিছু বললেন না ঠিকই, কিন্তু সন্ধ্যেবেলা বাবা অফিস থেকে ফিরলে? কী হবে?

দিন যত গড়িয়ে চলল সন্ধের দিকে, আমার বুকের ভেতর ঢিব ঢিব ততই বাড়তে লাগল। বাবা ফিরলেন, জলখাবারের পর মা আমার জুতোর করুণ অবস্থার কথা সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। বাবা উঠে গিয়ে নিজের চোখে দেখলেন আমার জুতোর দশা। ঘরে ফিরে কিছু বললেন না। আমার দিকে তাকিয়ে একবার দেখলেনও না। মাকে বললেন, "কালকেই আমি ও জুতোর ব্যবস্থা করছি দাঁড়াও। "

সেই জুতোজোড়া সঙ্গে নিয়ে পরদিন বাবা অফিসে গেলেন, দিন সাতেক পর আবার অফিস থেকে ফেরার সময়েই জুতোজোড়া ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। মেঝেয় ফেলে দিয়ে মাকে বললেন,

"কেমন সারিয়েছে, দেখো। একদম নতুন করে দিয়েছে।" মা অবাক হয়ে হাসি মুখে বললেন, "সত্যিতো, বোঝাই যাচ্ছে না। যা হাল করে নিয়ে এসেছিল, একদম নতুন হয়ে গেছে"।

"বাটার দোকানে দিয়েছিলাম, ওরাই সারিয়ে দিয়েছে। ওরা বলল, "এ জুতো আরো অন্তত দু'বছর চলে যাবে। কিছু হলে নিয়ে আসবেন ,আবার সারিয়ে দেব। এ জুতোর নাম নটি বয়, খুব টেকসই।"

আমি হিংস্র চোখে তাকিয়ে রইলাম সেরে ওঠা চকচকে মজবুত জুতোজোড়ার দিকে। আমার পা'দুটোকে গ্রাস করার জন্যে ওদুটো হাঁ করে হা হা হাসছিল। ওরা যদি নটি বয় না হবে তো ,কে হবে ,আমি?

ছবিঃ ইন্দ্রশেখর

পুষ্পেন মণ্ডল

ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রাত্রিবেলা গাড়ি চালাচ্ছি। শীতকালের রাত।ঘড়িতে প্রায় বারোটা বাজে। গন্তব্যস্থল উত্তরপ্রদেশের ঝাঁসি থেকে মধ্যপ্রদেশের সাতনা। কোম্পানির খুবই জরুরি একটা মেশিনের পার্টস রাত্রের মধ্যেই সাতনা প্লান্টে গিয়ে ফিটিং করে দিতে হবে। পান্না ন্যাশনাল পার্কের গা ঘেঁসে রাস্তা, এন. এইচ. ৭৫। গাড়ির সব কাচ তোলা।হেডলাইটের আলোয় দশ ফুট সামনে পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে।তারপর ধূসর কুয়াশা। যত এগোচ্ছি কুয়াশা তত ঘন হচ্ছে। ফগ লাইট জ্বেলেও খুব একটা লাভ হচ্ছে না। পাশের জঙ্গলে বুনোশুয়োর, হরিণ, অন্যান্য জন্তুও মনে হয় অনেক আছে। মাঝেমাঝেই রাস্তার ওপরে দু'একটা উঠে আসছে। ঘন অন্ধকারের মধ্যে জ্বলজ্বল করছে তাদের চোখ। কিছুক্ষণ আগে একটাকে মারতে মারতে বাঁচিয়েছি।

"বাংলোটা আর কত দূর?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"আমিও তো অনেকদিন পরে আসছি এ রাস্তায়।ঠিক মনে করতে পারছিনা। শেষ বার যখন এসেছিলাম রাস্তাটা এত ভালো ছিল না।চওড়াও ছিল না।যতদূর মনে পড়ছে ডানদিকে একটা কাঁচা রাস্তা পড়বে।সেখান দিয়ে ঢুকে মিনিট পাঁচেক লাগবে বাড়িটাতে পৌঁছাতে।" জানাল মৈনাক।

আমরা ঠিক করেছি রাতটা কোথাও কাটিয়ে ভোরবেলা বেরিয়ে দশটার মধ্যে ফ্যাক্টরিতে পৌঁছাতে পারলেই হবে। আবার জিজ্ঞাসা করলাম, "সেই ডানদিকের কাঁচা রাস্তাটা চিনতে পারবে তো?"

"একটা ঝাঁকড়া মোটা মেহগনি গাছ ছিল। সেটাই ল্যান্ডমার্ক।"

"রাস্তা চওড়া হওয়ার সময় যদি গাছটা কেটে ফেলে থাকে?"

"তাহলে মনে হয় সেই রাস্তাটা চিনতে পারব না।"

"তখন কী হবে? রাত্রে একটা থাকার জায়গা চাই তো?"

"সারারাত ধীরে ধীরে গাড়ি চালালে ভোরবেলা আমরা সাতনা পৌঁছে যাব।"

আমি মাথা নেড়ে বললাম, “সামনে দেখ, যে হারে কুয়াশা পড়ছে আধঘন্টা পরে সেকেন্ড গিয়ারেও গাড়ি চালানো অসম্ভব হয়ে যাবে। বুনো জন্তুগুলো রাত বাড়তেই রাস্তার দখল নিচ্ছে। যেকোন মুহূর্তে অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে।”

সে আমার কথা উড়িয়ে দিয়ে বলল, “ধুস্! তুমি শুধুশুধু ভয় পাচ্ছ। অ্যাক্সিডেন্ট হলেও মানুষ তো আর মরবে না। বুনো জন্তু মরতে পারে। ঘণ্টাদুয়েক হল কোন মানুষের দেখা এ রাস্তায় পাওয়া যায়নি।”

“কেন, মিনিট পনের আগে একটা ট্রাক ক্রস করল উল্টোদিক থেকে দেখতে পাওনি? ট্রাকটা একদম সামনাসামনি চলে এসেছিল, কী করে যে বেঁচে গেলাম কে জানে! আরও ভয় পাচ্ছি, তার কারণ গাড়ির স্টেপনি চাকাটাও লিক হয়ে আছে, ইঞ্জিন থেকেও আওয়াজ হচ্ছে।এই অতিবৃদ্ধ অ্যাম্বাসাডার গাড়ি নিয়ে এত রাতে না বের হলেই ভালো হত। গাড়িটা মাঝে মাঝেই হেঁচকি তুলছে। যদি ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যায়! ”

হঠাৎ মৈনাক চেঁচিয়ে বলল, “ওইতো সেই বড়ো গাছটা। এই ডানদিকের সরু রাস্তায় ঢুকে পড়।”

আমি এক ঝলক দেখেই একটা হালকা ব্রেক মেরে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে দিলাম। এ গাড়ির স্টিয়ারিং আবার দু পাক ফলস খায়।একটা গোঁত খেয়ে এবড়োখেবড়ো কাঁচা সরু রাস্তায় নেমে গেল।ঘন জঙ্গল দু পাশ থেকে চেপে রাস্তাটাকে আরও ছোট করে দিয়েছে।ডালপালাগুলি ঘসে যাচ্ছে গাড়ির গায়ে।হেডলাইটের আলোয় অন্ধকারের মধ্যে শুধু দু- একটা জন্তুর চোখ জ্বলজ্বল করছে।

“আর কতটা?” প্রশ্ন করলাম।

“মিনিট দুয়েক। সামনেই দেখতে পাবে।” মৈনাক বলল।

ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক ছাড়া আর কিছুই কানে আসছে না। পাথুরে রাস্তা, আঁকাবাঁকা, সামান্য চড়াই উৎরাই। কিছুটা গিয়ে একটা বাঁক নিতেই সামনে বড়ো

গেট দেখা গেল। হেডলাইটের আলোয় বেশ ঝকঝক করছে। গেটের দু'দিকে দুটো বড়ো বাহারি আলো। পাশে স্টিলের নেমপ্লেটে বাংলায় লেখা "কুয়াশা"। অবস্থাপন্ন বড়োলোক বোঝাই যাচ্ছে।

তিনবার হর্ন বাজাতেই এক বৃদ্ধ গেট ফাঁক করে মুখ বাড়িয়ে হিন্দিতে জানতে চাইল, "কাকে চাই?"

মৈনাক গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে গিয়ে বাংলায় বলল, "বলরামবাবু আছেন? বলুন মৈনাক ঘোষ কলকাতা থেকে এসেছে।"

লোকটি ভিতরে ঢুকে যেতে আমিও গাড়ি থেকে নামলাম, "কী ব্যাপার বলো তো মৈনাক? এরকম অদ্ভুতুড়ে জায়গায় এত দামি বাংলো! কোন বাঙালির? তুমিই বা একে চিনলে কী করে?"

"সে অনেক কথা বরুণদা। আগে ভেতরে চলো, তারপর শুনবে।"

মিনিটখানেকের মধ্যেই লোকটি দৌড়ে এসে গেট খুলে দিল, "আসুন বাবু, গাড়ি ভেতরে ঢুকিয়ে দিন।"

বাংলোর পোর্টিকোর মধ্যে গাড়িটা রেখে আমরা ভিতরে ঢুকলাম। পোর্টিকোতে একটা দামি লম্বা গাড়ি দাঁড় করানো রয়েছে। বাড়ির ভেতরটা আলোআঁধারি ইন্টিরিয়র ডেকোরেশন করা। কালো আর ধূসর রঙের আধিক্য। খুব সুন্দর।ভদ্রলোক যেই হোন, তাঁর রুচির তারিফ না করে পারছি না।

আমরা লোকটির সাথে ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেলাম। একটা বড়ো বসার ঘরে দামি সোফায় বসতে বলে সে ভিতরে চলে গেল। মৈনাককে খোঁচা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "এবার তো খুলে বল। আমার পেটের ভিতরে বেড়াল আঁচড়াচ্ছে।"

"আর একটু সবুর করো। উনি আসছেন।"

বলতে বলতেই ঘরে ঢুকলেন এক সৌম্যকান্তি লম্বা চওড়া বয়স্ক মানুষ। সাদা সিল্কের মত বড়ো বড়ো চুল কাঁধ পর্যন্ত। পরনে কালো সিল্কের ধুতি পাঞ্জাবী। গম্ভীর সুন্দর গলায় বললেন, "কেমন আছো মৈনাক?"

মৈনাক এগিয়ে গিয়ে ঢিপ করে একটা প্রণাম করে বলল, "আমি ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন স্যার?"

"আমার আর কী? ওই একই রকম। সেই বিদঘুটে শখ নিয়ে কেটে যাচ্ছে। ইনি কে? তোমার বন্ধু? নমস্কার।" আমাকে দেখে হাত জড়ো করলেন।

আমিও উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিসম্ভাষণ জানালাম। মৈনাক পরিচয় করিয়ে দিল, "ইনি অফিশিয়ালি আমার বস। কিন্তু আমার দাদার মত। বরুণ সেন। আমরা যাচ্ছিলাম সাতনা প্ল্যান্টে একটা আর্জেন্ট কাজে।রাস্তায় এত কুয়াশা পড়েছে যে গাড়ি চালানোই মুশকিল। তাই ভাবলাম আপনার এখানে রাতটা কাটিয়ে ভোর ভোর বেরিয়ে পড়ব। কোন অসুবিধা করে দিলাম না তো?"

"আরে না না। জানোই তো আমার যত কাজ সব রাত জেগে।"

"আমি তো জানি, কিন্তু বরুণদাকে আপনার সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। তাই ওর কাছে সবটাই রহস্য।"

“বোসো, আগে ডিনারটা সেরে নাও।তারপর কথা হবে।”

“না স্যার, আমরা আসার পথে একটা ধাবাতে ডিনার করে নিয়েছি।ও নিয়ে ব্যস্ত হবেন না।”

“ঠিক আছে শীতের রাতে একটু কফি তো খাও।” এই বলে তিনি কফি আনতে বললেন।

সোফায় বসে কথা শুরু হল। মৈনাকই প্রথম শুরু করল, “ইনি হলেন বলরাম মোদক চৌধুরী। সাইকোলজির প্রফেসার। সারাজীবন বিদেশে কাটিয়ে, রিটায়ারমেন্টের পরে এখানে এসে প্যারাসাইকোলজি নিয়ে চর্চা করছেন। এই বাড়িটা এরকম জঙ্গলের মধ্যে বিশেষভাবে তৈরি ওঁর কাজের জন্য। আমার সাথে আলাপ প্রায় বারো বছর আগে। বেঙ্গালুরুতে একটা প্যারাসাইকোলজির কনফারেন্সে যোগ দিতে এসেছিলেন। সেই সময়ে এক বন্ধুর সাথে ওখানকার একটা প্ল্যানচেট ক্লাবে গিয়ে এঁর সাথে পরিচয় হয়। কথা বলে জানতে পারি ইনি আমাদেরই পুরানো পাড়ার বাসিন্দা।”

আমি মৈনাককে থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, “প্ল্যানচেট— মানে পরলোক চর্চা?”

“হ্যাঁ, মৃত আত্মাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা।”

আমি মৃদু হেসে বললাম, “আজকের দুনিয়ায় বসে আপনারা এসব মানেন?”

“কী বলছ বরুণদা? তোমার সামনে যিনি বসে আছেন ইনি একজন জীবন্ত কিংবদন্তী, বিশ্বের সব থেকে সেরা মিডিয়ামদের মধ্যে একজন। যে কোন মৃত ব্যক্তির আত্মা ইনি গ্যারান্টি দিয়ে নামাতে পারেন। দেশ-বিদেশের কত ক্লায়েন্ট এঁর অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাবার জন্য হত্যে দিয়ে পড়ে থাকে।”

“আরে না না, মৈনাক একটু বাড়িয়ে বলছে। স্পিরিচুয়ালিজম নিয়ে আমার বহু গবেষণাপত্র প্যারাসাইকোলজির অনেক পত্রপত্রিকায় বেরিয়েছে। আফ্রিকার ব্ল্যাক ম্যাজিক, দক্ষিণ আমেরিকার ভুডু ডল, প্রেততত্ত্ব, টেলিপ্যাথি, স্বপ্নাদেশ, এসব নিয়ে আমার গবেষণা বিশ্বের বড়ো বড়ো মনস্তত্ত্ববিদের কাছে সমাদৃত হয়েছে। উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ার দুরাহামের ‘প্যারাসাইকোলজিকাল এ্যাসোসিয়েশন’, আমেরিকার ‘রেনে রিসার্চ ইন্সটিটিউট’, লন্ডনের ‘সোসাইটি ফর সাইকোলজিক্যাল রিসার্চ’-এর আমি সদস্য।

“স্যার উইলিয়াম জেমস, কার্ল জিনার, জোসেফ বি. রেনে, হেনরি সিডুইক, থমসন জয় হুডসনদের মত পৃথিবী বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদরা প্রমাণ করে গেছেন মৃত্যুর পরেও আত্মার অস্তিত্ব থাকে।স্বামী অভেদানন্দের “মরণের পারে” বইটিও প্যারাসাইকোলজিকে সমর্থন করে। আর প্ল্যানচেটটা আমার বহু বছরের একটা নেশা, সারা রাত ধরে প্ল্যানচেট করে ভোররাতে ঘুমাতে যাই।এখনও তিনতলার চিলে ছাদের ঘরে আমি প্ল্যানচেটে বসেছিলাম। প্রতিদিন মনের অবস্থা তো আর ভালো থাকে না। আজকে তেমনই মনঃসংযোগ করতে দেরি হচ্ছিল। এক মাড়োয়ারি ক্লায়েন্টের মুম্বাই থেকে আসার কথা ছিল। কোন কারণে হঠাৎ সে আসতে পারেনি। তারপর সদাশিব গিয়ে তোমাদের কথা বলল।”

কফির পেয়ালাটা হাতে তুলে নিয়ে আমি বললাম, "কিছু মনে করবেন না, আমি কিন্তু যুক্তিবাদী।ভুত বা আত্মাতে আমার বিশ্বাস নেই।কলেজজীবনে এইসব বুজরুকির বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছি। তাই এই ব্যাপারগুলো আমার ঠিক হজম হচ্ছে না।"

চৌধুরীবাবু বললেন, "আমাদের চারপাশে এমন অনেক কিছু আছে যা ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করা সম্ভব নয়। ঈশ্বর বা আত্মা এরকমই সূক্ষ্ম অনুভূতির ব্যাপার। এটা সবার দ্বারা অনুধাবন করা অসম্ভব। যেমন ধরো কোন জন্মান্ধ ব্যক্তি কি কখনও সূর্যাস্ত বা সূর্যোদয়ের নৈসর্গিক দৃশ্য দেখে আনন্দ পেতে পারে? অন্যের কথা শুনে কতটা বোঝা সম্ভব?"

"আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু বিজ্ঞান এখন এতটাই উন্নত হয়েছে যে তার চোখ দিয়ে সব কিছু দেখা সম্ভব। জন্মান্ধ ব্যক্তিরাও এখন মেডিক্যাল সায়েন্সের কৃপায় চোখের দৃষ্টি ফিরে পাচ্ছে। তাছাড়া প্যারাসাইকোলজি কোনদিনই বিশুদ্ধ বিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি। অনেকেই দাবি করেছেন যে তাঁরা নাকি আত্মার ছবি তুলেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনুসন্ধান করে দেখা গেছে সে সবই এক রকম ট্রিক। ধরুন জগদীশচন্দ্র বসু এবং মার্কনি প্রায় একই সময়ে রেডিও তরঙ্গ আবিষ্কার করলেন। এরপরে পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে বহু বিজ্ঞানী ঐ একই পরীক্ষা করে একই ফল পেয়েছেন। এবং সেটাকে বিজ্ঞান স্বীকৃতি দিয়েছে। প্যারাসাইকোলজির ক্ষেত্রে এরকমটা হয়না। কেউ হয়ত কখনও কিছু একটা দাবি করল, কিন্তু পরে সে আর প্রমাণ করতে পারল না। যেমন এই টেলিপ্যাথি বা স্বপ্নাদেশ।"

তিনি হেসে বললেন, "যুক্তিবাদীদের একটা ভালো দিক হচ্ছে যে তারা সবকিছু প্রমাণসাপেক্ষে বিশ্বাস করে।এখন তোমাকে যদি আমি প্রমাণ করে দেখাই যে আত্মা সত্যিই আছে, আর তাদের সাথে ভালো মিডিয়ামের মধ্যে দিয়ে যোগাযোগও করা যায়, তোমার সামনে যদি তাদের এনে হাজির করাই, তাহলে নিশ্চয়ই মানবে?"

"অবশ্যই মানব," আমিও জোরের সাথে বললাম।

"চলো তাহলে আমার সাথে। তুমি যাকে বলবে আমি সেই আত্মাকেই আজকে ডেকে আনব," বলে ভদ্রলোক উঠে পড়লেন।

বুঝলাম তিনি আমার ওপর ভালোরকম অসন্তুষ্ট হয়েছেন।আমি জানি এই ব্যাপারগুলো প্রায় সবই শেষে ভাঁওতাবাজি বা বুজরুকির জায়গায় যায়। মৈনাকও গুম হয়ে গেছে। তার এত শ্রদ্ধেয় স্যারকে অবিশ্বাস করে চ্যালেঞ্জ করেছি। এটা মনে হয় ও আমার কাছ থেকে আশা করেনি।

আমরা সবাই তিনতলার একটা ছোট্ট অন্ধকার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। ভিতরটা চন্দন কাঠের ধূপের গন্ধে মম করছে। মেঝেতে দামি কার্পেটের ওপর ছোট্ট কাঠের একটা টেবিল। চারদিকে ঘিরে চেয়ার। একটা মোটা মোমবাতি জ্বলছে টেবিলের ওপরে। আমরা তিন দিকে ঘিরে বসলাম। লক্ষ করলাম টেবিলের ওপরে দাবার ঘরের মত ঘর কেটে এ থেকে জেড পর্যন্ত লেখা রয়েছে।

"প্ল্যানচেট শুরুর আগে কয়েকটা কথা বলে নেওয়া দরকার," বলরামবাবু শুরু করলেন, "অনেকের মতে, যারা বিশ্বাস করে না তেমন কেউ উপস্থিত থাকলে

আত্মা সহজে আসতে চায় না। কথাটা ঠিক, তবে এর আগেও আমি দু'তিনবার অবিশ্বাসী মানুষের উপস্থিতিতে আত্মাকে হাজির করিয়েছি।সেক্ষেত্রে মিডিয়াম অর্থাৎ আমার ওপর মানসিক চাপ অনেক বেশি পড়ে।সময়ও একটু বেশি লাগে। আশা করি তোমরা আমার সঙ্গে সহযোগিতা করবে। আর মনঃসংযোগ করার সময়ে চোখ বন্ধ রাখবে।"

কথা থামিয়ে পাশে রাখা এক গ্লাস জল তিনি পুরোটা খেয়ে নিলেন। তারপর সরাসরি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "বলুন বরুণবাবু কার আত্মা নামাতে চান?"

আমি প্রস্তুত ছিলাম। এই ধরনের ভণ্ডদের আমি আগেও কয়েকবার জব্দ

করেছি কলেজ লাইফে। সবাই সাধারণত কোন বিখ্যাত ব্যক্তির আত্মাকে ডাকতে চায়, যাকে সবাই চেনে। এই ব্যক্তিদের জীবনী ভালো মিডিয়ামদের মোটামুটি মুখস্থ থাকে। আর তাদের জীবনের অনেক কথা বলে সবাইকে চমকে দেয়। নাহলে নিজেদের কাছের কোন মৃত আত্মীয়ের আত্মা নামাতে বললে তারা অতি সাধারণ সব কথা বলে, যেমন – আমি সুখে আছি, মৃত্যুর পরে কোন রাগ অভিমান নেই, তোমাদের সামনে একটা ফাঁড়া আসছে। তারপরেই বলে আমি আর কথা বলতে পারছি না, মর্তলোকে এসে খুব কষ্ট হচ্ছে, আমাকে মুক্তি দাও। তখন মিডিয়াম ঝিমিয়ে পড়ে। নিরানব্বই শতাংশ ক্ষেত্রে এরকমই হয়।

আমি বললাম, "আমার এক পিসিমা গত হয়েছেন মাস তিনেক আগে। মৃত্যুর আগে বজবজের পুরোনো বাড়িতে থাকতেন। আমায় খুব ভালোবাসতেন। তাঁর আত্মাকে কি ডাকা যাবে?"

"হ্যাঁ ডাকা যাবে। তাঁর নাম কী?"

"ঈশ্বর রেখা ঘোষ।"

"তাঁর কোন ছবি আছে তোমার কাছে?"

"এক মিনিট।" বলে পকেট থেকে আইফোনটা বের করে একটু ঘাঁটাঘাঁটি করে বললাম, "এই যে পেয়েছি। মারা যাবার ক'দিন আগে তোলা ছবি। বয়স হয়েছিল পঁচাশি বছর।" বলে ওঁদের দুজনকে ছবিটা দেখিয়ে দিলাম।

বলরামবাবু বললেন, "এবার সবাই চোখ বন্ধ করে ঐ ছবিটার ওপরে মনটাকে কেন্দ্রীভূত কর। হয়ত আধ ঘণ্টার মত সময় লাগবে। রেডি।"

ফোন পকেটে রেখে চোখ বন্ধ করলাম। মনে মনে ভাবলাম, ভালো ভড়কে দিয়েছি দুজনকে। আধঘণ্টা পরে যদি আত্মা সত্যিই নামে তাহলে আমি আর হাসি চেপে রাখতে পারব না। কারণ আমার তিন কুলে কোন পিসিমা নেই। আর যে ছবিটা দেখালাম, সেটা "ওল্ড ওম্যান" শব্দটা গুগুলে সার্চ করে যে ছবিটা আমার পছন্দ হল সেটা। এইবার বলরামবাবুর মুখোশটা খুলে ফেলতে পারব। এই যে বিশাল বড়ো বাংলো বাড়ি বানিয়েছেন সেটা নিশ্চয়ই ক্লায়েন্টদের বোকা বানিয়ে হাতানো টাকায়।

অনেকক্ষণ বসে আছি কোন সাড়াশব্দ নেই। আগের একটা অভিজ্ঞতায় মনে আছে, বাগবাজারের একটা পোড়োবাড়ির চিলে ছাদে এক ভণ্ড তান্ত্রিকের কাছে আমরা চার বন্ধু গিয়েছিলাম। প্রায় একইরকম পরিস্থিতি। প্রথম টেবিলটা নড়তে শুরু করল। তারপর তান্ত্রিকটার গলার স্বর পাল্টে গেল। যে লোকটির আত্মা নামাল সেই লোকটিকে সশরীরে হাজির করানোর জন্য অন্য দুই বন্ধু তাকে নিয়ে নিচে অপেক্ষা করছিল। তান্ত্রিক যখন গোটা শরীর নাড়িয়ে নাড়িয়ে ভর হবার ভান করে কথা বলছে, তখন আসল লোকটিকে সামনে হাজির করানো হল। তাকে দেখেই মার খাবার ভয়ে তান্ত্রিক অজ্ঞান হয়ে গেল।

"চোখ খোলো।" বলরাম বাবুর আওয়াজে চোখ খুলে তাকালাম। কিন্তু চোখ খুলতে খুব কষ্ট হল। যেন কেউ চোখের পাতায় আঠা লাগিয়ে দিয়েছে। গম্ভীর গলায় তিনি বললেন, "আমার জীবনে প্রথমবার এমন ঘটনা ঘটল। যে আত্মাকে ডাকছিলাম, তার বদলে অন্য আত্মা এসে হাজির হয়েছে। এক নয় একাধিক আত্মা এসেছে। বুঝতে পারছ বরুণবাবু?" বলে আমার চোখের দিকে তাকালেন।

আমি মাথা নাড়লাম, "না"।

"তোমার চারপাশটা ভালো করে লক্ষ করো। দেয়ালের দিকে দেখ। মোমবাতির আলোয় আমাদের তিনজনের ছায়া দেয়ালে পড়েনি। এটা তোমার চোখ এড়িয়ে গেল কেমন করে, যুক্তিবাদী বরুণবাবু?"

আমার ভিতরটা ফাঁকা হয়ে গেল। সত্যিই তো আমাদের ছায়া পড়েনি কেন?

"কারণ আত্মাদের ছায়া হয়না। আধ ঘণ্টা আগে হাই রোডের ওপরে একটা ট্রাকের সাথে মুখোমুখি দুর্ঘটনায় তোমরা দুজনেই মারা গেছ। আর আমিও প্রায় একই সময়ে হার্ট অ্যাটাকের ফলে শরীর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি। ঐ দেখ পেছনে আমার শরীর পড়ে আছে। এবার বিশ্বাস হল তো ...."

ছবিঃ শিমুল

বাঁধাকপির তরকারি

রাজীবকুমার সাহা

তখন বয়স কত হবে? দশ-বারোর বেশি নয়। তখনও নিজেদের বাড়ি হয়নি আমাদের। বাবার চাকরির সূত্রে মামার বাড়ির খুব কাছাকাছি থাকতাম আমরা, একটা ভাড়াবাড়িতে। আমাদের বাড়ি আর মামার বাড়ির মাঝখানে একটা ছোট্ট উপত্যকামত ছিল। একটা ছোট্ট নদীর মতো এই উপত্যকাটাই মামার বাড়ির পাড়া আর আমাদের পাড়াটাকে আলাদা করে রেখেছিল। স্থানীয় ভাষার এই উপত্যকাকে 'ডোন' বলত সবাই। গ্রামের বাড়ি, চারদিকে পাকা বাউন্ডারি নেই। বদলে উঁইধরা নড়বড়ে ছেঁচা বাঁশের বেড়া ছিল। চারদিক তখন ঘন সবুজ গাছগাছালি আর ছোট ছোট ঝোপঝাড়ে ভর্তি ছিল। একেবারে পটে আঁকা গ্রাম। আজকালকার মতো চব্বিশ ঘণ্টা বাবা-মায়েরা ছেলেমেয়েদের পাহারা দিয়ে রাখত না। পাড়া-বেপাড়ার গোটা বিশেক ছেলেমেয়ে আর আমরা তিন ভাইবোন মিলে একটা বড়োসড়ো খেলার দল ছিল আমাদের।

আমরা প্রাইমারি স্কুলে পড়তাম সবাই। সকালবেলায় স্কুল বসত। কোনও মতে স্কুল থেকে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ফিরে এসে চাট্টি মুখে দিয়েই একদৌড়ে ওই ডোনে নেমে যেতাম আমরা দলবেঁধে। আর রোজ পেছন থেকে মায়েদের উঁচু গলায় একটাই সাবধানবাণী আস্তে আস্তে মিলিয়ে যেত বাতাসে, "ওরে, ওই গাবগাছ তলায় কিন্তু যাবি না একদম..."

ডোনটা পশ্চিমদিকে একটা ইটের রাস্তা থেকে শুরু হয়ে একেবেঁকে প্রায় আধা কিলোমিটার পরে একটা পুকুরে গিয়ে শেষ হয়েছে। লোকে বলে চালতাপুকুর। কয়েকটা ফলন্ত চালতাগাছ ছিল পুকুরপাড়ে। ওই ইটের রাস্তাটার ধারেই ছিল আমাদের বাড়ি। আর সেই নিষিদ্ধ গাবগাছটা ছিল আমাদের বাড়ি আর চালতাপুকুরের মাঝামাঝি একটা বাঁকে, একটু আড়ালে। সারা গায়ে আলকাতরা মেখে প্রায় ন্যাড়া মাথায় দাঁড়িয়ে থাকত গাছটা বছরভর। আমরা দুপুরবেলা অব্দি লুকান্তি, গোল্লাছুট, চোর-পুলিশ, রাজায় রাজায় যুদ্ধ ইত্যাদি হরেকরকম মজাদার খেলা খেলে, দল বেঁধে চালতাপুকুরে নেমে যেতাম ঝুপাঝুপ। ইচ্ছেমত হুটোপাটি করে শেষে পুকুরের মালিকের রাঙা চোখের বকা খেয়ে ছপাছপ উঠে পড়ে যে যার বাড়ি ফিরে যেতাম।

তবে আমরা কিন্তু সবসময় খেলতে গিয়ে চরম উত্তেজনার মুহূর্তেও খুব সচেতনভাবে ওই কালো গাবগাছটা এড়িয়ে চলতাম। লুকান্তি খেলার সময় মন মত লুকোবার জায়গা না

পেলেও ভুলেও ওই গাছটার কাছাকাছি যেতাম না। কারণ মায়েদের কল্যাণে আমাদের সবার মনে একটা কথা গেঁথে গিয়েছিল যে ওই গাবগাছে ভূত- পেত্নি বাস করে। কাছে গেলেই...

তো একদিন হল কী, রোজকার মতো স্কুল, ডোনে গিয়ে খেলাধুলো তারপর চালতাপুকুরে নেমে দাপাদাপি শেষে জবা ফুলের মতো চোখ লাল করে যখন ঘরে ফিরে এলাম তখন ভরদুপুর। সাড়া পেয়ে মা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে বলল, “হ্যাঁ রে, তোরা কি আমাকে এভাবেই জ্বালিয়ে মারবি চিরটা কাল! সেই কখন থেকে বসে আছি তোকে একটু মামাবাড়ি পাঠাবো বলে। ছেলের যদি পাত্তা থাকে!”

মামার বাড়ির কথা শুনে আনন্দে নেচে উঠল মনটা। ভাবটা গোপন করে ভালো মানুষের মতো জিজ্ঞেস করলাম, “এখন? কেন মা?”

“ওই একটু বাঁধাকপি রেঁধেছিলাম। কালই বেরোল বাজারে প্রথম, বাবা নিয়ে এল। যাবি? একটু দিয়ে আসবি দিদাকে?”

“তা দাও। তবে তোমার ওই গামছাবাঁধা বেঁধে দিলে আমি পারব না বলে দিলাম। আমার লজ্জা করে। দিতে হয় বাটিটা একটা কাপড়ের ব্যাগে দাও।”

“তাই দেবো। এখন চটপট খেয়ে নে। খেয়ে উঠে দিয়ে আসবি।”

“না, না। এখন খেতে বসলে দেরি হয়ে যাবে। দিদা হয়ত ততক্ষণে খেয়ে নেবে। আমি ও বাড়িতেই খেয়ে নেব। তুমি জলদি ব্যাগটা দাও।”

মা একটু মুচকি হেসে আবার রান্নাঘরে চলে গেল। একটু পরেই বাবার টিফিনের একটা পুরনো ব্যাগ আমার হাতে ধরিয়ে দিতে দিতে বলল, “এক কাজ কর রাজা, রাস্তায় না গিয়ে ডোনটা পেরিয়ে চলে যা। তাড়াতাড়ি হবে। আর গিয়েই খেয়ে নিবি কিন্তু।”

আমি কোনওমতে ঘাড়টা কাত করে হাঁটা লাগালাম ডোনের দিকে। টিলা থেকে ডোনে নেমে একবার পেছন ফিরে দেখলাম মা দাঁড়িয়ে আছে টিলার কিনারায়। আলতো হেসে হাত তুলে অভয়মুদ্রা দেখাল মা। তারপর বাঁকের আড়ালে চলে গেলাম আমি। মাঝে মাঝেই লাউচিংড়ি, কচুর শাক, মটর পনির, এটা ওটা নিয়ে মামাবাড়ি যাই। মা এভাবেই এসে টিলার পাশে দাঁড়ায়।

আমাদের বাড়ির টিলাটা থেকে মাত্র দুটো বাঁক পেরোলেই মামার বাড়ির টিলাটা দেখতে পাওয়া যায়। ইটের রাস্তায় গেলে অনেকটা ঘুরপথ। ডোনটার ওপাশে অর্থাৎ মামার

বাড়ির টিলার ঠিক নিচেই হচ্ছে সেই ভয়ঙ্কর গাবগাছটা। মামার বাড়িতে উঠতে গেলে ওটার কাছাকাছি দিয়ে যেতে হয়। গাছটা চোখে পড়তেই বুকটা ঢিপঢিপ করতে লাগল যেন। মামার বাড়ি যাবার আনন্দটা মিইয়ে গিয়ে কখন পথটা পেরিয়ে যাব সেই চিন্তাই মাথায় কাজ করতে লাগল। কোনওমতে একশ্বাসে দৌড়ে মামার বাড়ির টিলাটায় উঠতে যাব এমন সময় চোখে পড়ল, খুব সুন্দর একটা পাখি রাস্তাটার ঠিক পাশেই একটা করবী ফুলের গাছে উড়ে উড়ে মধু খাচ্ছে।

একটু থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি। এমন সুন্দর পাখি আমি জীবনেও দেখিনি। ডানাগুলোতে কমপক্ষে ছ'সাতটা রং আছে। গাবগাছের ভয়টা কেটে গিয়ে একটা বিস্ময় ফুটে উঠল আমার চোখে মুখে। পাখিটা তখন করবী ফুল গাছটাকে কয়েকটা চক্কর লাগিয়ে পাশের গাছটাতে বসেছে, আর আমার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে তিড়িং তিড়িং করে লেজ নাড়াচ্ছে।

একটু এগিয়ে গেলাম পাখিটার দিকে। যাওয়া মাত্রই পাখিটা ফুড়ুৎ করে পালিয়ে গেল। খুঁজে দেখলাম আর একটু দূরে বসে আছে ওটা। একই ভঙ্গিমায়। যেন আমার সাথে লুকোচুরি খেলছে। এগিয়ে গেলাম আর একটু। এভাবে একটু একটু করে কখন যে কালো গাবগাছটার ঠিক নীচে এসে পৌঁছে গেছি খেয়ালই করিনি। আমি তখন গাবগাছে পাখিটাকে খুঁজে চলেছি আকুলভাবে। কিন্তু কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি না।

হঠাৎ দেখলাম পাখিটা আমার চোখের সামনেই একটা সরু ডালে বসে আছে। কাছে যেতেই ওটা আস্তে আস্তে একটা কাঠবেড়ালি হয়ে গেল। পিটপিট করে আমার দিকে তাকাচ্ছে আর ঝাঁকড়া লেজটা নেড়ে চলেছে।

আমি তখন সব ভুলে বসে আছি। আমার খিদে, দিদার জন্য বাঁধাকপির তরকারি, মামার বাড়ি, মা-বাবা সব। এমন কি, এই গাবগাছের ভূত-পেত্নিকেও। কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে পড়ে আছি। চোখদুটোতে একটা নিদ্রালু ভাব। টের পাচ্ছি হাত পাগুলো কেমন যেন অসাড় হয়ে আসছে। এমন অবস্থায় ঝুপ করে গাছটার ওপর থেকে কী যেন একটা কিছু পড়ল বলে মনে হল। খুবই হালকা ধরণের কিছু। চকিতে ফিরে দেখি একটা থুত্থুড়ে বুড়ি দাঁড়িয়ে আছে আমার পাশে। শরীরে শুধু হাড় ক'খানা আর কুঁচকে যাওয়া চামড়াটাই আছে। চোখ দুটো যেন গর্তে ঢুকে আছে। প্রথমে হঠাৎ মনে একটা ধাক্কা লাগলেও বিশেষ ভয় পাইনি।

বুড়িই আগ বাড়িয়ে কথা বলল। গলাটা কেমন খোনা খোনা। প্রায় হলুদ হয়ে যাওয়া তিন চারটে দাঁত বের করে বুড়ি জিজ্ঞেস করল, "মামাবাড়ি যাচ্ছিস বুঝি রাজা?"

আমি থতমত খেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কে? আমার নাম জানো কী করে?"

"আমি সব জানি। এটাও জানি তোর হাতে কী আছে।"

আমি সন্ত্রস্ত হয়ে ব্যাগটা শক্ত হাতে ধরলাম। তোতলাতে তোতলাতে বললাম, "মানে? কী আছে আমার হাতে?"

বুড়ি হেসে হেসে ঘাড় নেড়ে বলল, "জানি, জানি... এতে বাঁধাকপির তরকারি আছে।"

তারপর হঠাৎ সুর পালটে আবদারের গলায় বলল, "এই শোন না রাজা, আমায় দে না ওই বাটিটা। বড্ড খিদে পেয়েছে রে!"

"বা-বা রে! ওটা দিদার জন্যে। তুমি খাবে কেন। তা ছাড়া আমি তোমায় চিনি না জানি না..."

“দূর বোকা, আমি তো এখানেই থাকি। এই গাছে। কেন, আমায় দেখিস নি তোরা? আমি কিন্তু তোদের সবাইকে দেখি, চিনি, এমন কি নামও জানি। খেলার সময় তোদের বল যখন অনেক দূরে চলে যায় তখন আমিই তো ওটাকে কুড়িয়ে এনে কাছাকাছি রেখে দিই।”

এতক্ষণে টের পেলাম আমার গা ছমছম করছে। হঠাৎ কেমন যেন ভার হয়ে গেছে শরীরটা। মাথাটা ঝিম মেরে আছে আর দপদপ করছে। সারা শরীরে একটা গরম স্রোত ছুটোছুটি করছে। ভয় বোধহয় একেই বলে। নিঝুম দুপুরে কাছে পিঠে একটা জনমনিষ্যিও

নেই। কী করব ঠাওর করে উঠতে পারছি না। ছুটে পালাব তার উপায়ও নেই। পা দুটোতে একদম জোর পাচ্ছি না।

“কী হল রে? দিবি নে আমায়!” তাড়া এল বুড়ির কাছে থেকে।

“না।” আমার গলায় গোঁয়ার্তুমির সুর।

বুড়ির মুখের হাসিটা ঝুপ করে মিলিয়ে গেল। কঠিন স্বরে বলল, “দে বলছি ওটা। আমার দিকে ছুঁড়ে দে বলছি। নইলে... নইলে...”

“নইলে ক- কী!” কথাটা বলতে গিয়ে আমার গলাটা যেন একটু কেঁপে গেল। ব্যাগটা দিয়ে দেওয়াই ঠিক হবে ভাবতে না ভাবতেই বুড়ি রেগে আগুন হয়ে বলল, “নইলে ঘাড়টা এখনই মুচড়ে দিতাম। শুধু তোর ওই মাদুলিটা...”

আমি এক পলক আমার ডান হাতে বাঁধা জামার ভেতরে মাদুলিটার দিকে তাকালাম। বুঝলাম কথাটা বুড়ি মুখ ফস্কে বলে ফেলেছে এবং এটাই আমার রক্ষা কবচ। আমাকে আর পায় কে! ওদিকে বুড়ি আমাকে শাসিয়ে যাচ্ছে খোনা গলায়, “ব্যাগটা ছুঁড়ে দে, ব্যাগটা ছুঁড়ে দে বলছি ভাল চাস তো। নইলে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।”

আমি তারপরও থম মেরে দাঁড়িয়ে আছি। বুড়ি তো রাগে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। আমিও ব্যাগ ছাড়ছি না, বুড়িও আশা ছাড়ছে না। এভাবে কিছুক্ষণ কাটার পর হঠাৎ বুড়ি আবার আগের মতো হেসে হেসে বলল, “দিবি না তা হলে? বাব্বা, কী দস্যি ছেলে রে তুই রাজা! যাক গে, চাই না আমার বাঁধাকপি।”

আমি একটু স্বস্তি পেলাম। গা টা এতক্ষণ খুব গরম হয়ে গিয়েছিল। এবার আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হতে লাগল। বললাম, “এবার আমি যাই। অনেকক্ষণ হয়ে গেল।”

“সে কী রে! পাখিটা ধরে নিয়ে যাবি না? এই লোভেই তো আমার কাছে এলি আজ।”

“মা- মানে?”

“মানে, ওই সাতরঙা পাখিটা চাই না তোর? কী সুন্দর পাখি না রে!”

“হ্যাঁ... কিন্তু... মানে...”

“ যদি চাস তো দিতে পারি।” বলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছে বুড়ি।

আমি দ্বিধায় পড়ে গেলাম। পাখিটা আমার চাই ঠিকই, কিন্তু বাঁধাকপিটা দিদাকে... “ঠিক আছে, কোথায় পাখিটা? তাড়াতাড়ি দাও। আমায় মামাবাড়ি যেতে হবে এক্ষুণি।”

“আরে দাঁড়া, দাঁড়া, বোকা ছেলে। পাখিটা নিবি কী করে? খাঁচা চাই না বুঝি? আমি খাঁচাসুদ্ধু পাখিটা নিয়ে আসছি এক্ষুণি। একটু দাঁড়া। পালাস নে যেন। ”

এই বলে বুড়ি গেল তো গেলই। আর ফেরার নাম নেই। আমিও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ফেরার জন্য পা বাড়িয়েছি এমন সময় পেছন থেকে একটা ক্ষীণ গলায় ডাক শুনতে পেলাম, “রাজা, ও রাজা, দাঁড়া, যাস নে।”

ফিরে দেখি চালতাপুকুরের দিক থেকে মিনি দৌড়ে আসছে। মিনি থাকে ওপাড়ায়। রোজ খেলতে আসে ডোনে। কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, “তুই এখানে কী করছিস? জানিস না গাছটা খারাপ?”

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, “তুই এই সময় কোত্থেকে এলি? ঘুমোস নি? সন্ধ্যে বেলায় স্যার আসবে না?”

“টুটনদের বাড়ি যাচ্ছিলাম একটা বই আনতে। তুই কোথায় যাচ্ছিস?”

“আ- আমি, আমি যাচ্ছিলাম দিদার কাছে। হঠাৎ একটা পাখি দেখে... আচ্ছা চলি।” চোখ নামিয়ে নিলাম মিনির চোখ থেকে।

“হুম। আমি কিন্তু দূর থেকে সব দেখেছি। তুই গাছটার সাথে কথা বলছিলি অনেকক্ষণ ধরে।”

আমি সাথে সাথে মিনির একটা হাত খপ করে ধরে মিনতি করে বললাম, “অ্যাই মিনি, কাউকে বলবি না বল! মার কানে গেলে আর এখানে খেলতে দেবে না।”

মিনি মলিন হেসে বলল, “আচ্ছা বলব না।”

তারপরেই হঠাৎ কী একটা মনে পড়তেই তড়বড় করে বলে উঠল, “অ্যাই রাজা, টুটনদের বাড়ি যাবি? টিভিতে একটা ভাল প্রোগ্রাম আছে।”

“কী প্রোগ্রাম?”

“সার্কাস দেখাবে। আমি আসলে এজন্যেই যাচ্ছিলাম। বাড়িতে বইয়ের কথা বলে এসেছি।”

মনটা নেচে উঠল। পরক্ষণেই দমে গিয়ে বললাম, “না রে! আমাকে মামাবাড়ি যেতে হবে। মা বলেছে তরকারিটা দিয়ে আসতে।” বলেই হাতে ঝোলানো টিফিনের ব্যাগটা দেখালাম।

মিনি কী একটা চিন্তা করে গম্ভীর গলায় বলল, “রাজা, তোর ঘটে কি একটুও বুদ্ধি সুদ্ধি নেই। এই গাবগাছ তলায় তুই তরকারিটা নিয়ে দাঁড়িয়েছিলি অনেকক্ষণ। ওতে ভূত-পেত্নির নজর লেগেছে। আর তুই বলছিস ওটা মামাবাড়ি নিয়ে যাবি! কী আক্কেল! ফেলে দে, ফেলে দে। কাকিমা শুনতে পেলে আস্ত রাখবে না।”

আমি অসহায় ভাবে জিজ্ঞেস করলাম, “ফেলে দেব! বলিস কী !আর এই ব্যাগ আর বাটি?”

“আচ্ছা ঠিক আছে, ওই ঝোপটার আড়ালে লুকিয়ে রেখে চল। যাবার পথে ফেরত নিয়ে যাবি। বাড়িতে বলে দিস যাবার সময় কুকুরের নোংরা মারিয়ে ফেলেছিলি। তাই ওদেরকে আর দিস নি। নে তাড়াতাড়ি কর। দেরি হয়ে যাচ্ছে যে এদিকে!”

সার্কাসের লোভে মিনির কথাগুলোই যুক্তিযুক্ত মনে হল। ওর কথামত টিফিনের ব্যাগটা একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রেখে দুজনে মিলে টুটনদের বাড়ির দিকে ছুট লাগালাম। টুটনদের বাড়িতে পৌঁছে মিনি বলল, “শোন, তুই সোজা টিভির ঘরে চলে যা। আমি ওপাশের দরজা দিয়ে ঢুকছি। যাতে কেউ বুঝতে না পারে যে আমরা একসাথে প্ল্যান করে ঢুকেছি। দেখবি আমি ঠিক তোর আগে গিয়ে বসে থাকব।”

ঠিক তাই হল। টুটনদের বাড়িতে

অনেকগুলো ঘর। আমি আগে কয়েকবার এলেও টিভির ঘরে ঢুকি নি কখনও। তাই খুঁজেপেতে প্রায়ান্ধকার একটা ঘরে ঢুকে দেখলাম পাড়ার অনেকেই টিভি দেখছে। কারণ, দু'তিনটে পাড়া মিলে তখন টিভি বলতে একমাত্র টুটনদেরই ছিল। এদিক ওদিক তাকিয়ে মিনিকে খুঁজে নিয়ে ওর পাশে বসে পড়লাম। মিনি আশ্চর্য চোখে আমার দিকে এক পলক তাকিয়েই টিভিতে মন দিল।

আসলে টিভিতে তখন কমনওয়েলথ গেমস জাতীয় একটা খেলার আসরের লাইভ টেলিকাস্ট চলছিল। সেদিন একটা জিমনাস্টিক ইভেন্ট দেখাবার কথা। জিমনাস্টিককেই মিনি সার্কাস বলেছিল। যথারীতি গেম শুরু হল। দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। আস্তে আস্তে সারাদিনের খিদেটা চাগাড় দিয়ে উঠল। উশখুশ করতে লাগলাম। মিনি বিরক্ত হচ্ছিল দেখে চুপ মেরে রইলাম। আরও কতক্ষণ কেটে গেছে হিসেব নেই। এক সময় মরিয়া হয়ে ফিসফিস করে কাতর গলায় জিজ্ঞেস করলাম, "অ্যাই মিনি, আর কতক্ষণ রে! বাড়ি যাবি না?"

"আহ, চুপ কর না! দেখতে দে।" মিনি ধমকে উঠল। আমার একটু অভিমান হল। মনে মনে ভাবলাম, দেখেছ মিনির কাণ্ডটা! আমায় প্রায় একরকম জোর করে টেনে এনে এখন ধমকাচ্ছে। আর কক্ষণো যদি মিনির সাথে কোথাও গিয়েছি! ভাবতে ভাবতে অন্ধকার ঘরে একটু ঝিমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ দরজার গোড়ায় একটা হুঙ্কার কানে আসতেই সোজা হয়ে বসলাম। একটা বাঁজখাই গলায় কে যেন জিজ্ঞেস করছে, "মিনি, কোথায় বসেছিস তুই? বেরিয়ে এলি?"

ওহ, কাকুর গলা। মিনির বাবা। কে যেন ঘরের লাইট জ্বালিয়ে দিল। মিনি মুখ ভার করে আস্তে আস্তে দরজার দিকে এগোল। পেছন পেছন আমি। কাকু ধমকে উঠে বললেন, "তোকে কতক্ষণ বলেছিলাম আমি? বলেছিলাম না স্রেফ একঘণ্টা? ক'টা বাজে জানিস এখন?"

আমি একটু মুখটা বাড়িয়ে বাইরেটা দেখেই আঁতকে উঠলাম। ঘুটঘুটে অন্ধকার। কখন সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে টেরই পাইনি। এতক্ষণ আমায় দেখেনি কাকু। হঠাৎ চোখ পড়তেই চমকে উঠে বলল, "সে কী ,রাজা! তুই এখানে? ওদিকে তোদের পাড়ায় যে হুলুস্থুলু পড়ে গেছে। তোর মা হাসপাতালে। তোকে খুঁজে পাচ্ছে না কেউ। তোর বাবা, মামারা, পাড়াপড়শি যে যেদিকে পারছে হন্যে হয়ে গরু খোঁজা করছে তোকে আর তুই এখানে বসে বসে..." বলেই আমাকে আর মিনিকে শক্তহাতে আঁকড়ে ধরে জোর পায়ে হেঁটে চললেন আমাদের বাড়ির দিকে।

আমি ঘটনার আকস্মিকতায় এতটাই বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম যে, কিছুই মাথায় ঢুকছিল না। শুধু একটা কথাই মাথায় বার বার ঘা মারছিল, 'তোর মা হাসপাতালে'। সে সময় মোবাইল তো দূরের কথা কারও বাড়িতে একটা ল্যান্ডফোনও ছিল না সারা অঞ্চল জুড়ে। তাই আমাকে বাড়িতে জমা করে দিয়ে লোক মারফত খবর পাঠাতে লাগলেন কাকু। রাস্তায় দাঁড়িয়ে যাকে দেখছেন তাকেই বলছেন, "রাজাকে পাওয়া গেছে। ওদেরকে খবরটা পৌঁছে দাও যেমন করেই হোক।"

আস্তে আস্তে সবাই জড়ো হতে লাগল একটা সময়ের পরে। বাবা হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকে আমাকে কষিয়ে এক থাপ্পড় মারল। তারপর বুকে জড়িয়ে ধরল। ছোট দুই ভাই বোন আতঙ্কভরা চোখে তাকিয়ে রইল। ধরা গলায় জিজ্ঞেস করলাম, "মা? মা কোথায় বাবা?"

"আছে, হাসপাতালে। স্যালাইন চলছে একটা দেখে এসেছি। শেষ হলেই চলে আসতে বলেছি তোর ছোটমামাকে।"

আমার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। সব ক্ষোভ, অভিমান গিয়ে পড়ল মিনির ওপর। বাবার কাছ থেকে নিজেকে জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে কাকুর দিকে তাকিয়ে ভ্যাঁ করে কেঁদে দিলাম। তারপর একটু সামলে নিয়ে বললাম, "সব দোষ ওই মিনিটার, জানো কাকু! ও-ই আমাকে জোর করে নিয়ে গেল ডোন থেকে। আমি তো তখন মামাবাড়ি যাচ্ছিলাম।"

মিনির চোখমুখ থমথম করতে লাগল। দুই চোখে আগুন নিয়ে ধমকে উঠল, "অ্যাই রাজা, খবরদার, মিথ্যে বলবি না একদম বলে দিচ্ছি। আমি কখন তোকে নিয়ে গেলাম? আজ তো আমি খেলতেও যাই নি। আর তুই বলছিস..."

কাকু তখন মধ্যে পড়ে হাত তুলে বললেন, "দাঁড়া দাঁড়া। রাজা, কী বলছিলি তুই? মিনি তোকে ডেকে নিয়ে গেছে টুটনদের বাড়ি?"

"হ্যাঁ। ও-ই তো!"

"কিন্তু, ও তো আজ স্কুল থেকে ফিরে এসে বাড়িতেই ছিল শুনলাম। খেলতেও যায় নি। তারপর দুপুরের পর আমি নিজে ওকে টুটুনদের বাড়ি রেখে এলাম। সেই অব্দি তো সেখানেই ছিল। একটু আগে দু'চারজনকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম তুই নাকি মিনির আগেই ওবাড়িতে ঢুকেছিস।"

আমি হতভম্ব হয়ে একবার মিনির দিকে আর একবার কাকুর দিকে তাকালাম। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তেই আমার চুলগুলো খাড়া হয়ে গেল। এটা নির্ঘাত ওই গাবগাছের বুড়ির কাজ। আমার মাদুলি থাকাতে আমায় ছুঁতে না পেরে শেষে বুদ্ধি করে মিনির বেশ ধরে... আস্তে আস্তে আমার চারদিক অন্ধকার হয়ে এল।

চোখের পাতার ওপর ঠাণ্ডা একটা ঝাপটা খেয়েই জেগে উঠলাম আমি। কতক্ষণ বেহুঁশ ছিলাম জানি না। চোখ মেলে দেখি মা'র কোলে আমার মাথা। আমার সারা গা, মা'র কোল, শাড়ির আঁচল ভিজে সপসপে হয়ে আছে। আলুথালু বেশে অঝোরে কাঁদছে মা।

পরের দিন আমার কথামত গাবগাছটার কাছে ঝোপটার ভেতর হাত ঢুকিয়ে টিফিনের ব্যাগটা টিলার নীচে নিয়ে এল বড়োমামা। যাক একেবারে অক্ষত অবস্থাতেই আছে। ব্যাগ থেকে প্লাস্টিকে মুড়ে গিঁট দেওয়া অবিকল টিফিন বাটিটা বের করা হল। গিঁটটা মা ঠিক যেভাবে দিয়েছিল ঠিক সেভাবেই রয়ে গেছে। গিঁট খুলে আস্তে আস্তে বাটির ঢাকনাটা খোলা হল। ঢাকনা খুলে এবার অজ্ঞান হয়ে গেল বড়োমামা। কারণ, ঢাকনা খুলতেই দেখা গেল এই অ্যাত্তখানি বাঁধাকপি তরকারির মধ্যে আধা কাপের মতো মাত্র পড়ে আছে। বড়োমামার জন্য তাড়াতাড়ি একঘটি জল আনতে ছুটে গেল মা।

ছবিঃ অনুপম চক্রবর্তী

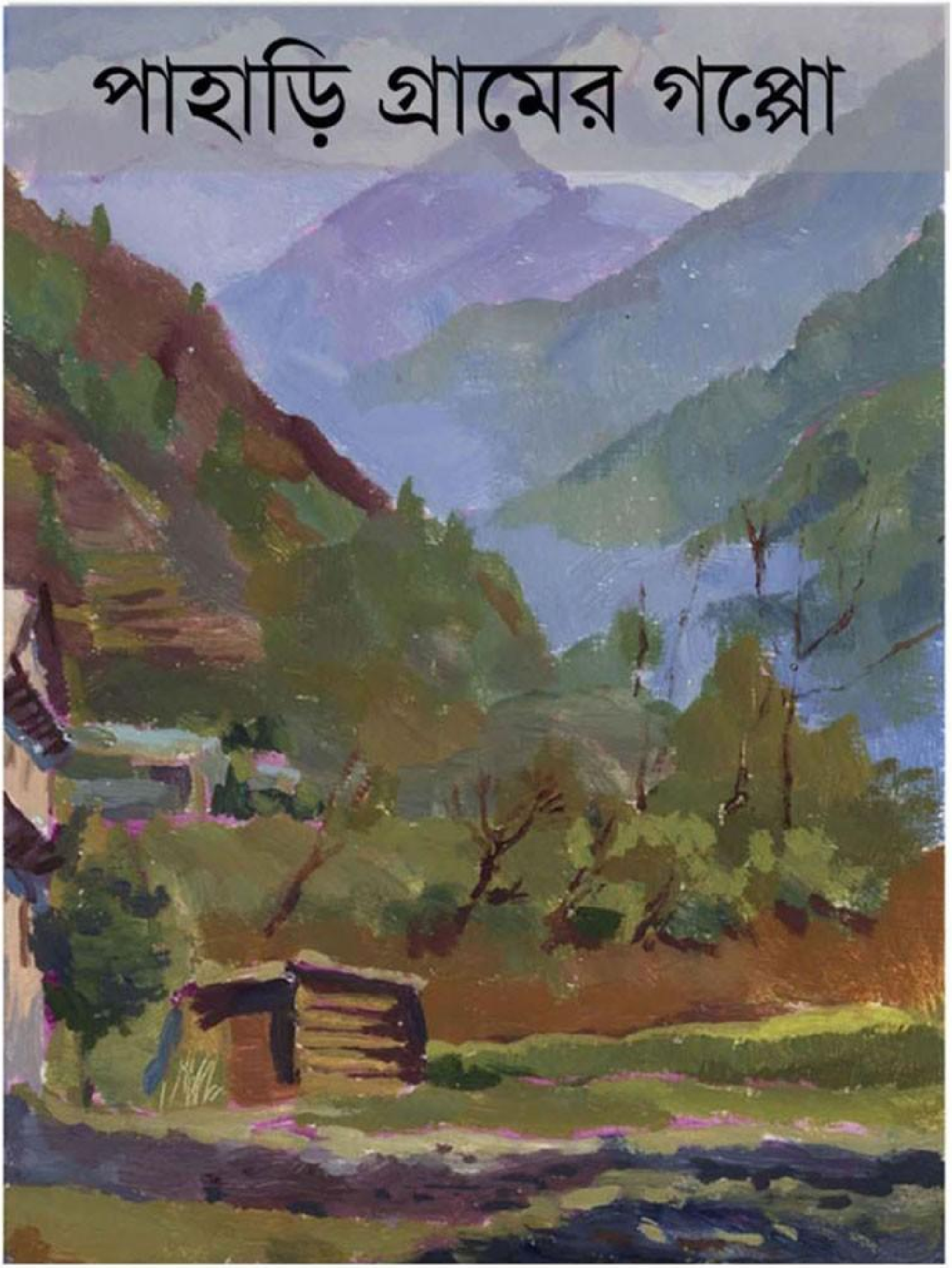

ইন্দ্রনাথ

আমাদের দেশের উত্তরদিকে যে বিরাট পাহাড়শ্রেণী সেটাই হিমালয়। এই হিমালয় পাহাড়ের গায়ে গাড়ি চলা রাস্তার ধারে কাছে, আনাচে কানাচে দূরে দূরে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য গ্রাম। কোনো কোনো গ্রামে পায়ে হেঁটে পৌঁছতে সারা দিন এমনকি দুদিন তিনদিনও লেগে যায়। ছবির মতো সুন্দর সেসব গ্রাম। আরো সুন্দর সেখানকার মানুষজন।

এরকমই বেশ কিছু গ্রামে যাবার সুযোগ ঘটেছে আমার, অনেকের সাথে, বেড়াতে বেড়াতে নেহাৎ এক দুদিনের জন্যে। কোনো গ্রামে একবার, কোনো গ্রামে একাধিকবার। উত্তরাখন্ডের এমন কয়েকটা গ্রাম বেড়ানোর সাদামাটা গল্পই শোনাব এবার। সেসব গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলা পাহাড়ি নদী, গভীর জঙ্গল, সবুজ পাহাড়ি ঢাল, পাহাড়ের চূড়ার মাথার সাদা বরফ, রঙ বেরঙের জানা অজানা ফুল, নানান প্রজাতির পাখি, যদি কখোনো দেখতে ইচ্ছে করে তোমাদের!

তোমাদেরই মতো আমার এক ছোট্ট বন্ধু আমাকে এমনি এক পাহাড়ি গ্রামের কাছে দাঁড়িয়ে বলেছিল, " জানো, আমাদের দেশটা এতো বড়ো আর এত সুন্দর......"

মার্তৌলি

লোকে বলে ভূতুড়ে গ্রাম। আসলে তেমন ভয়টয়ের ব্যাপার নেই। ভূত টুত থাকলেও তাদের আমরা দেখিনি। এমন নামকরণ হবার কারণটা সম্পূর্ণ অন্য। সে কথা বলছি। তার আগে অন্য একটা মজার কথা বলি। মার্তৌলি গ্রামের কাছে রিলকোট বলে একটা জায়গা আছে। শুনেছিলাম সেখানে নাকি বাতাস অফিস যায় ! বাতাস? অফিস? অদ্ভুত শোনাচ্ছে না ! আমিও কথাটার মানে একেবারেই ধরতে পারিনি, এ আবার কী কথা রে বাবা!

কিন্তু সেই রিলকোটেই যখন একবার গেলাম, সকালে ঠিক কাঁটায় কাঁটায় দশটায় শুরু হল প্রবল বাতাস। ঝোড়ো বাতাস। ঘরের বাইরে থাকা অথবা কোনো কাজ সারতে এদিক সেদিক যাওয়া মানে বাতাসের ওই প্রবল বেগের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে কাজ করা। বাতাস এক মুহূর্ত থেমে নেই।

আর ঠিক চারটেতে সব হাওয়া বাতাস গায়েব। দুব্বোঘাসের পাতাটি পর্যন্ত নড়ছে না, যেন বাতাস এতক্ষণ বইছিলই না। বেমালুম নেই। তাহলেই দ্যাখো, দশটা থেকে

চারটে প্রবল এলোপাথাড়ি হাওয়া। তার আগেও নয় পরেও নয়। তো অফিস যাওয়াই হল কি না !

মিলাম হিমবাহ, গঙ্গোত্রী হিমবাহের পর, লম্বায় ভারতের দ্বিতীয় দীর্ঘতম হিমবাহ। এই হিমবাহ যাবার পথেই পড়ে মার্তোলি গ্রাম। সেদিকের শেষ গ্রামটির নামও মিলাম। অনেককাল আগে যখন কুমায়ুন অঞ্চলের লোকেদের সঙ্গে তিব্বতিদের ব্যবসাবাণিজ্য চলত, জিনিসপত্রের আদানপ্রদান হত, লোকের যাতায়াত চালু ছিল, সে'সময় এই রাস্তা ছিল অন্যতম প্রধান যাতায়াতের পথ। উচ্চ হিমালয়ের গিরিপথ উনতাধুরা পেরিয়ে তিব্বত থেকে এপারে, আবার এপার থেকে ওপাশে তিব্বতে যাতায়াত চলত ব্যবসায়ীদের মালবাহকদের এবং তাদের বাহক প্রাণীগুলির।

তারপর যুদ্ধ বাধল চীন বনাম ভারত। বন্ধ হল পথ। দুই দেশেই ফরমান জারি করল যে যার সরকার। ব্যস বাণিজ্যপথ শুকিয়ে গেল। পথের ধারে ধারে গড়ে ওঠা অজস্র বর্ধিষ্ণু গ্রাম শুনশান হতে থাকল, জৌলুস হারিয়ে গেল সেসব গ্রামের। লোকেরা অন্যত্র গিয়ে বাসা বাঁধল। গ্রাম কে গ্রাম খালি হয়ে যেতে থাকল, কোথাও কোথাও সামান্য গুটিকতক বয়স্ক লোক পড়ে থাকল গ্রাম আগলে, ভূতুড়ে চেহারায় দাঁড়িয়ে রইল গ্রামগুলি। হবে না? মানুষেরাই যে নেই! মার্তোলি, বিলজু, বরফু, মিলাম কত এমন গ্রাম। মিলামও এখন এক পরিত্যক্ত গ্রাম, প্রায় মার্তোলিরই মতো। কেবল আইটিবিপি –র জওয়ানদের এক মস্তো ক্যাম্প রয়েছে। তাদের কাজ সীমান্ত রক্ষার। তাই নাম ইন্ডো টিবেটান বর্ডার পুলিশ। এই রাস্তা দিয়ে মূল যাতায়াতটা এখন তাদেরই। সীমান্তরেখা অবধি।

ভারতবর্ষের অনেক জায়গাতে বিশেষত উত্তরভারতে লোকের নামের সঙ্গে গ্রামের নামও জুড়ে দেবার একটা রেওয়াজ আছে। বিখ্যাত কয়েকজন এমন লোকের নামও আমরা জানি, যেমন আকবর ইলাহাবাদি, মজরু সুলতানপুরি ইত্যাদি। পাহাড়ের গ্রামেও এমন চল আছে। এখনও সেটা চালু কিনা সেটা অবশ্য আমার জানা নেই। তো যেকথা বলছিলাম, আমরাও এমন একজনের নাম শুনেছিলাম, দুর্গা সিং মার্তোলিয়া। তিনি পরোপকারী এবং গ্রামের মোড়ল গোছের মানুষ এবং বলাই বাহুল্য তিনি এই মার্তোলি গ্রামের।

তো গ্রামে পৌঁছে আমরা তো হাঁ। জিগ্যেস করব কাকে? দুপুরবেলা। গ্রামের মধ্যে ঢুকে এ বাড়ি সে বাড়ি এ গলি ও গলি এধার ওধার ওগো শুনছেন, কে আছেন, কেউ কি আছেন গো, শুনতে পাচ্ছেন ইত্যাদি খুব হাঁকডাকেও কারও সাড়া না পেয়ে আমরা গ্রামের বাইরে এসে একটা মাঠমতো জায়গায় তাঁবু ফেলব কি না ভাবছি, এসময় গ্রাম লাগোয়া ফসলের খেতে একজনকে দেখতে পেলাম। তিনি এক মনে কাজ করছিলেন। বয়স্কা মহিলা। তো আমরা তাঁকেই গিয়ে ধরে পড়লাম।

"দুর্গা সিং মার্তোলিয়াকে চেনেন?"

"হাঁ," হাসলেন ভদ্রমহিলা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে।

"কোথায় থাকেন তিনি?"

"ওই যে। উনি। আমার স্বামী।"

আমরা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি, কোট প্যান্ট পরা একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক হাতে লাঠি নিয়ে আমাদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন নিঃশব্দে। আমাদের নমস্কারের প্রত্যুত্তরে উনিও নমস্কার জানালেন।

এখন শীতের শুরু। ওঁরা এইবারে নেমে যাবেন। মার্তোলি গ্রামে গ্রীষ্মের শুরুতে চলে আসা ওঁদের অভ্যাস। দরকার নেই, তাও। মুন্সিয়ারির কাছে দিব্যি বাড়িঘর, মায় নীচে দেরাদুনে ছেলে বউ, নিদেন আলমোড়া, সেখানে ছোটো ছেলে, বড়ো মেয়ে, জামাই, সব সরকারি চাকুরে। সেখানে সকলেই পেড়াপিড়ি করে। তবু বুড়োবুড়ির মন পড়ে থাকে মার্তোলিতে। তাই গ্রীষ্মের শুরু থেকে শীতের শুরু সেই পুরোনো দিনের মতো গ্রামে এসে থাকা। খেতি বাড়ি, আলু, কপি। দরকার নেই তবু। অভ্যাস।

"কেউ আসে না। এই আমাদের মতো বুড়ো- বুড়ি এক দু'জন। আরও কেউ কেউ আলু চাষের জন্য।"

দুর্গা সিং-ই বললেন, "তোমরা তাঁবু কেন লাগাবে? যেকোনো বাড়িতে থেকে যাও। কোনো বাড়িতে তালা দেওয়া নেই। যেখানে খুশি একটু সাফসুতরো করে নাও। রসুই আছে, উনুন আছে। রাঁধো বাড়ো খাও দাও। ঘরের ভেতরটা গরমও থাকবে। কষ্ট হবে না।"

শুনেই তো আমার বন্ধুরা চন মন করে উঠল। বাড়ি দেখা শুরু হল তারপর। এ বাড়ি সে বাড়ি দেখে গ্রামের পুব প্রান্তে একখানা দোতলা বাড়ি ঠিক হল। তার নিচের তলায় রান্নাঘর। ওপরের তলায় থাকা। ঘর ফাঁকাই। একটু সাফাই করে আমরা যে যার রাবার ম্যাট পেতে জিনিসপত্র নিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসলাম।

ততক্ষণে রান্নাবান্নার জোগাড় শুরু হয়ে গেছে। বাড়ির সামনে অনেকখানি সমতল জায়গা। উঠোন। একটু একটু ঘাসও আছে। এই উচ্চতায় তৃণ ও গুল্ম ছাড়া অন্য উদ্ভিদ থাকারও কথা নয়। দুর্গা সিংজি নিজের বাড়িতে চলে গেলেন। তাঁর বাড়িতেই গ্রামের পোস্ট অফিস। এখনও। উত্তর থেকে দক্ষিণে গ্রামের পূর্ব সীমানা দিয়ে একটি নদী প্রবাহিত রয়েছে। তার নাম লোয়া গাড (নালা)। গ্রাম ছাড়িয়ে সে গিয়ে পড়েছে নীচের গৌরীগঙ্গায়। গ্রামের খানিকটা ওপরে দেবী নন্দার মন্দির।

বিকেলের ম্লান আলোয় সামান্য চড়াই ভেঙে আমরা তার প্রাঙ্গণে গিয়ে হাজির হলাম। অসংখ্য ঘন্টা ঝুলছে মন্দির ঘিরে। পতাকা, লাল কমলা কাপড়, সিঁদুরের টিপ। গ্রামবাসীর মানত করা শ্রদ্ধার্ঘ।

পেছনের দিকে ফিরে দেখি, নীচে মার্তোলি গ্রাম। পুরোটাই চোখের সামনে ছবির মতো ছড়ানো। নীচ থেকে উঠে আসার সময় যে গ্রামকেই মৃত বলে বোধ হচ্ছিল, কী এক অজানা জাদুকাঠির ছোঁয়ায় এখন তাকে দারুণ গাম্ভীর্যপূর্ণ, অভিজাত পাহাড়ি জনপদ বলে মনে হচ্ছে। প্রাণের সাড়াও পাওয়া যাচ্ছে। আজ গ্রামে নতুন করে আমরা অন্তত দশটি লোক এসেছি। এ ছাড়া আরও জনা দশেকের এদিক সেদিক নড়াচড়া টের পাওয়া গেল। তারা আশেপাশেই ছিল, আমাদের সঙ্গে মোলাকাত হয়নি এই যা। গ্রাম ছাড়িয়ে ডাইনে পাহাড়ের গায়ে একটা নীল রঙের তাঁবু ফেলেছে কেউ। উপস্থিত আমরা যখন নন্দা মায়ের মন্দিরে, তাঁবুর বাসিন্দারা ধীরে ধীরে উঠে এলেন মন্দিরের দিকে। তাঁরা ইতালির বাসিন্দা। এসেছেন মিলাম হিমবাহ যাবেন বলে।

এ গ্রামের বাড়ির দরজাজানালার কড়িকাঠের ওপর কারুকাজ অপূর্ব। তিব্বতি শৈলীর ছাপ স্পষ্ট। তবে ঘরের দরজা উচ্চতায় বেশ খাটো। বেশিরভাগ বাড়িই দোতলা। নীচের তলায় গবাদি পশু, তাদের খাবার দাবার আর রান্নাঘর। ওপরের তলাতে থাকার ব্যবস্থা। সব বাড়িতেই মোটামুটি তাই। মার্তোলি থেকে উত্তর পূর্বে নন্দাদেবী শৃঙ্গ আরোহণের মূলশিবিরের পথ। দু দিন লাগে সেখানে যেতে।

সন্ধে নামতেই হাড়কাঁপানো শীত পড়ল। আমরাও কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ঢুকে এলাম। শুয়ে শুয়ে ভাবছি তুমুল বাণিজ্যের সময় কী শোরগোলটাই না হত! কত জনসমাগম, সবসময় সরগরম মার্তোলি গ্রাম। ওপার থেকে আসছে পশম, উল, এপাশ থেকে যাচ্ছে নুন। খচ্চরের পিঠে, গাধার পিঠে মাল চাপানো। পাশে পাশে ব্যবসায়ী। তার প্রাচীন পোশাক ও ঝোলা কাঁধে। আমার সঙ্গে যেন একজনের দেখা হল। তাঁর গালের চামড়া কোঁচকানো। বয়েসের ছাপ স্পষ্ট। আমাকে দেখে হাসলেন। সৌজন্য বিনিময় করলেন। অন্ধকার হয়ে এসেছে বলে গ্রামের বাইরে তাঁবু লাগানোর হুকুম দিলেন তাঁর কর্মচারীদের। তারপর পায়ে পায়ে আমার কাছে এগিয়ে এলেন।

"নমস্কার।"

"নমস্কার।"

"আজ এখানেই তাঁবু ফেলব। কাল নেমে যাবো জিমিঘাট হয়ে মুন্সিয়ারির পথে।"

"কালই পৌঁছে যাবেন?"

"হ্যাঁ। একবার আসুন না আমার তাঁবুতে।"

মোটা ক্যানভাসের তাঁবু। ভেতরে ভেড়ার লোমের মোটা কম্বলের গদি। লাল ঝালর লাগানো তাঁবুর মুখে। তাঁবুর মধ্যে মোমবাতির মৃদু আলোর পাশে ক্যানভাসের দেয়াল ঘেঁষে বসে পড়ি। গল্প হয়, কথা হয়। যাযাবর জীবনের সুখ ও স্বপ্নের কথা হয়। এর মধ্যে একটি মেয়ে তাঁবুর ভেতর এসে নমস্কার করে বসে। আমাদের শুকনো ভেড়ার মাংস খেতে দেয়। সরু করে কাটা মাংস লবন সহযোগে রোদে শুকোনো। ওদের প্রিয় খাবার, শীতের রসদও বটে।

"এ আমার ছোটো মেয়ে। কুমায়ুঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। শহরে থাকতে পারত। অথচ আমি আমার যাযাবর অভ্যাস ছাড়তে পারব না বলে, স্বেচ্ছায় এ জীবন বেছে নিয়েছে। মেয়েটি মুখ নীচু করে বসে ছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম না আমি কোন সময়ে আছি। এই এখন দু হাজার সালে না কি উনিশশো বাহান্ন সালে যখন ব্যবসা বাণিজ্যের জোয়ার চরমে পৌঁছে গেছে।

এই ধন্দ কাটার আগেই আমাকে কে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে দিল। তাকিয়ে দেখি, মার্তোলি গ্রামের সেই ঘর। আমার এক সঙ্গীর বাইরে যাবার খুবই প্রয়োজন। সে আমাকে ঠেলে তুলল। খুব ঠান্ডা, তবু সোয়েটার, চাদর ঢাকা দিয়ে বাইরে এলাম। কুপকুপে অন্ধকার। বাড়ির পেছনদিকে সে চলে গেল। আমি দরজায় দাঁড়িয়ে রইলাম। খানিকবাদে

তার হাঁকডাক শুনে তড়িঘড়ি গিয়ে দেখি, সে খুব উত্তেজিত হয়ে আমাকে পশ্চিম দিকের পাহাড়ে কিছু দেখতে বলছে। তাকিয়ে দেখি পাহাড়ের ঠিক ডগায় একটা মস্তো বড়ো লাল আলো জ্বলছে। ওই পাহাড়ের মাথায় বিরজেগঞ্জ ধুরা। ওদিক দিয়ে রালাম গ্রামে যাওয়া যায়। কিন্তু ওখানে আলো জ্বালালো কে? পাহাড়ের মাথায় আগুন জ্বালাবেই বা কেন? হালকা স্লেট রং- এর আকাশের গায়ে অমন উজ্জ্বল লাল, ঠিকরে পড়ছিল। ভালো করে তাকিয়ে দেখি, ও হো এ যে মঙ্গল। লাল গ্রহ। আকাশের গায়ে জ্বল জ্বল করছে তার রক্তচক্ষু। অবাক হয়ে খানিক তাকিয়ে রইলাম। ভোর হতে তখনও অনেক দেরি। ডেরায় ফিরে বাকিদের ডেকে তুলে দেখালাম সেই দৃশ্য।

অবাক হবার তখনও ঢের বাকি ছিল। সেটা অবশ্য বোঝা গেল সূর্যের আলোর প্রথম কিরণ পড়তেই। আশ্চর্য! সেই প্রথম আলো পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে সোজা এসে স্পর্শ করল নন্দা দেবীর মন্দিরের চূড়া। আমরা তখন গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে মন্দিরের দিকে এগোচ্ছি। ভোরের বাতাস আমাদের তিন চার থাক গরম কাপড়ে মোড়া শরীরে গিয়ে বিঁধছে। নাকের ডগা, হাতের আঙুল মনে হচ্ছে আর নেই। কিন্তু সেদিকে কারো ভ্রূক্ষেপও নেই। চড়াই ভাঙার সাথে সাথে ডান দিকের উঁচু পাহাড়ের ওপাশ থেকে একটা মস্তো বরফের ঢাল উঁকি দিচ্ছে। আর ক্রমাগত আমাদের উচ্চতা বাড়ার সাথে সাথে সেটাও আরো প্রকাশ হতে থাকল। বোঝা যাচ্ছিল সেটা একটা অনেক উঁচু পর্বতশৃঙ্গের গা। কিন্তু ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না, তিনি কে? অবশেষে মন্দিরের উচ্চতায় পৌঁছে পূব দিকে তাকাতেই চোখ ঝলসে গেল। নন্দাদেবী। তার মূল শৃঙ্গ বাঁদিকে ডানপাশে নন্দাদেবী পূর্ব শৃঙ্গ। মধ্যে ছুরির মতো ধারালো গিরিশিরা। অমন সৌন্দর্য বর্ণনা করবার ভাষা হয় না। এক অনন্য সাধারণ সৌন্দর্যে আমরা স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইলাম। গোটা মার্তোলি গ্রামের রূপ ওই চালচিত্রে ধরা রইল আমাদের মনের মণিকোঠায়।

অন্য ভ্রমণ

রাখী নাথ কর্মকার

ঘটনাটা ঘটল ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটটা টেক অফ করার ঠিক পরেই ! ‘ফাসন সিটবেল্ট' চিহ্নটা বন্ধ হয়ে যাবার খানিক পরেই ঠুমরিদের রো- এর ঠিক সামনের সিটের ভদ্রলোকটি উঠে দাঁড়িয়ে ওপরে ওভারহেড বিনসে রাখা তার ব্যাগটা থেকে কিছু বার করার চেষ্টা করছিলেন। খুব সম্ভবত ভদ্রলোকের চশমাটা। টারমিনালের ডিপারচার লাউঞ্জেই ভদ্রলোককে দেখেছিল ঠুমরি, সামনের দিকে বসে মন দিয়ে একটা পত্রিকা পড়ছিলেন। বেশ লম্বা চেহারা, মাথায় কোঁকড়ানো কালো চুল, গায়ের রংটা একটু চাপা, বাদামের মত মাঝারি চোখের সবুজ তারায় বেশ একটা নিশ্চিন্ত ভাব, গোলচে মুখ, ভাঙা চোয়াল, পরনে কালো বিজনেস স্যুট, চোখে সোনালি ফ্রেমের হাফ রিমলেস চশমা ।

সেই চশমাটা এখন ব্যাগ থেকে বার করতে গিয়েই বোধহয় যত বিপত্তি! ভদ্রলোকের টানাটানিতে ব্যাগের কোণ থেকে একটা ছোট্ট অথচ ভারী চামড়ার থলে মতন কীভাবে যেন গলে বেরিয়ে গিয়ে টুপ করে এসে পড়ল ঠুমরির পায়ের কাছে! থপ করে একটা আওয়াজও যেন শুনতে পেল ও। ভদ্রলোক বোধহয় খেয়াল করেন নি। ফের বসে পড়লেন হাতের পত্রিকাটা খুলে।

পাশের সিটেই মায়ের দিকে তাকিয়ে দেখল ও। টেনশনে ক্লান্ত মা সবে চোখটা একটু বুঁজেছেন। টেনশন তো হবেই, এভাবে সব্বাইকে ছেড়ে এত দূরে মা আর ও দুজনে- একা-- কোনদিন, কোত্থাও যায় নি। এখনো ওর চোখের কোণ জলের তিরতিরে ধারার ভেজা... দাদুন, দিদুন, মামা, দাদা, ঠাম্মা, ছোটপিসি... সব্বাইকে এয়ারপোর্টে ফেলে রেখে ওদের ফ্লাইটটা যখন মেঘের ওপর ডানা মেলল, তখনও দুঃখে বুকটা ফেটে যাচ্ছে ঠুমরির। অথচ চারমাস আগে অফিসের কাজে ইউ এস চলে যাওয়া বাবার সাথে কতদিন দেখা হয়নি বলে

গতকাল রাতেও মনটা দুমড়ে উঠেছে, কত তাড়াতাড়ি রাতটা ভোর হবে, কত তাড়াতাড়ি প্লেনে উঠবে, কত তাড়াতাড়ি ইউ এস পৌঁছে বাবার হাতটা ছুঁয়ে বলবে -- দেখেছো তো বাবা", আমি একদিন একটুও দুষ্টুমি করিনি, মাকে একটুও জ্বালাতন করিনি "!আর বাবা আদর করে ঠুমরির টোল পড়া গালটা টিপে দিয়ে কোলে তুলে নেবে ওর জন্য একটা রিমোট... কন্ট্রোল হেলিকপ্টার কিনে রাখবে বলেছে বাবা, ভালো হয়ে থাকলেই ওটা ওর পুরস্কার!

কিন্তু আজ সকাল থেকেই ওদের বাড়িতে এসে হাজির হওয়া দাদুন, দিদুন, মামার ফোঁসফাঁস ভাঙা গলার আওয়াজ, দাদা, ঠাম্মা, ছোটপিসির ছলছলে চোখ-- এতগুলো ভালোবাসার মানুষজনের জন্য যে এরকম দুমড়ানো- মুচড়ানো ভয়ানক কষ্ট হতে পারে, তাও কি আগে ও ভেবেছিল ছাই!

এক এক সময় মনে হচ্ছিল, কেন ওকে সবাইকে এখানে ফেলে রেখে চলে যেতে হবে ? স্কুলের বন্ধু তিয়াশা আর ওর মা কাল রাতে এসেছিল ওদের সাথে দেখা করতে- দুই বন্ধু ভেউভেউ করে কেঁদেছে। স্কুলের বন্ধুদের ছেড়ে, আঁকার স্কুলের বিল্টু, তান্নিদের ছেড়ে, কাজের মাসি দীপুমাসিকে ছেড়ে, পাড়ার বন্ধু টপ্পা, তিষ্কুদের ছেড়ে, প্যারিস পাড়ার এই চৌহদ্দি ছেড়ে, মোড়ের মাথায় লেজ নাড়ানো হ্যাংলা রকিকে ছেড়ে...ওকে কত্তদূরে চলে যেতে হবে!

মা তখন বুঝিয়েছিল, কাজই মানুষের পরিচিতি আর পরিবেশ তৈরি করে দেয়। বাবার চাকরির প্রয়োজনে ওদেরকে এই বদলটা মেনে নিতেই হবে। মেনে নিতে হবে এই সাংঘাতিক কষ্টটা যেটা ওর কাছে ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠছিল। দমফাটা ব্যাথার হাওয়াটাকে ও বালিশ চাপা দিয়ে দমিয়ে রাখতে চেয়েছিল যখন মা বলেছিল, ওর প্রিয়জনেরা সকলেই ওর কাছাকাছিই থাকবে, ওর মনের মাঝে, বাস্তবে তাঁদের ছুঁতে না পারলেও হৃদয়ের উষ্ণ গহ্বরে ওরা সব্বাই আগের মতই ভালবাসার মিঠে আবেশে ভরিয়ে রাখবে ওর প্রতিটি দিন!

আর এখন, এইমুহূর্তে কিন্তু চামড়ার থলিটার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না ঠুমরি । ওর সামনের সিটটার কোণার দিকে ঢুকে গেছে ওটা, সিটবেল্টটা খুলে নীচু হয়ে ঝুঁকে পড়ে হাত দিয়ে বার করতে গেল ওটা, পারল না । এবার প্রায় নীচে গড়িয়ে পড়েই এক নিঃশ্বাসে টেনে বার করল ও থলিটাকে। মা সচকিত হয়ে চেয়ে দেখছিলেন ওর কান্ড, ব্যাপারটা আন্দাজ করে বললেন" ,গুড। এবার যাও, যার জিনিস তাকে দিয়ে

এস।"

থলিটা হাতে নিয়ে ম্যাগাজিনে ডুবে থাকা ভদ্রলোকের সামনে ধরল ঠুমরি।

“ও মাই গড!! থ্যাঙ্কু ভেরি মাচ মাই চাইল্ড! তুমি জানো না তুমি আমার কী উপকার করেছ!" চোস্ত ইংরেজিতে ফেটে পড়লেন ভদ্রলোক, দু'চোখ উপচে পড়ছে কৃতজ্ঞতায়, এখনো বোধহয় বিশ্বাস করতে পারছেন না, অসাবধানে এমন একটা কান্ড ঘটে গেছে!

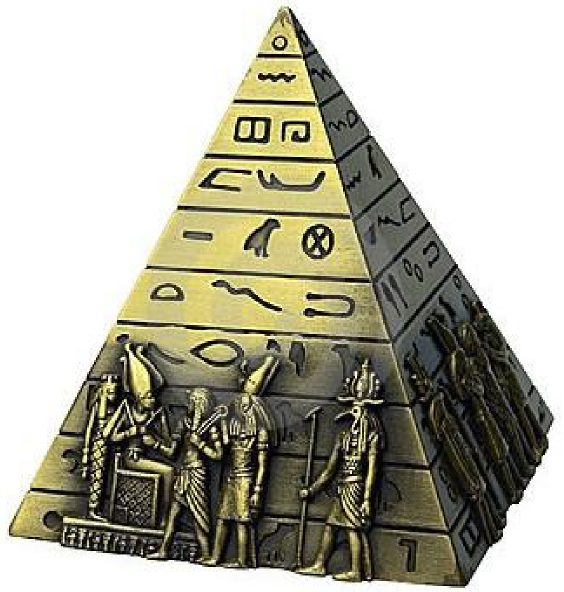

"সিট হিয়ার, মাই লি'ল এঞ্জেল!...এটা যে কী গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমি তোমায় কী করে বোঝাব।"

প্লেনটা অনেকটাই ফাঁকা, ভদ্রলোকের পাশের সিট দুটো ফাঁকাই পড়ে আছে, তার একটাতে হাত দিয়ে থাবড়ে ইশারা করলেন তিনি। এদিকওদিক তাকালেন ভদ্রলোক, আশেপাশে সবাই যে যার নিজের মত ব্যস্ত দেখে একটু যেন সামলে নিলেন নিজেকে । কোলের পত্রিকার মাঝে থলিটা রেখে চেনটা টেনে বার করলেন অদ্ভুত সুন্দর, চার-পাঁচ ইঞ্চির একটা ছোট্ট পিরামিডের মত বাক্স।

পিরামিড কী জিনিস তা স্কুলের সোশ্যাল স্টাডিজে একটুখানি জানা হয়েছে ঠুমরির। অসাধারণ কারুকাজ করা বাক্সটার গায়ে, নানা ধরনের মানুষের মূর্তি, পাখি, জন্তুর চেহারা ছাড়াও নানারকমের চিহ্ন খোদাই করা। একইরকম দেখতে বাক্সটার তিনটে দেওয়ালের একটায় কতগুলি মানুষের মূর্তির নির্দিষ্ট জায়গায় কম্পিউটারের কিবোর্ডে পাসওয়ার্ড দেওয়ার মত করে আঙুলগুলি চটাপট চালিয়ে চাপ দিলেন ভদ্রলোক, খট করে খুলে গেল পিরামিডের তিনকোণা ঢাকনাটা। পাশে বসে গোলগোল চোখ করে ঠুমরি গিলতে লাগল অজানা মুহূর্তের আকর্ষণ।

বাক্সের ভিতরে আঙুল গলিয়ে কয়েকটা কয়েন বার করে আনলেন ভদ্রলোক" ,এই যে বাক্সটা দেখছ, এটার বয়স নয় নয় করেও প্রায় পঁচাত্তর বছর হতে চলল। এবার আমার পরিচয়টা একটু দিয়ে নি, আমি এহসান সুলেমান শাহ, আর্কিওলজিস্ট। আর্কিওলজিস্ট কী জানো তো? যাঁরা পুরাতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা বা কাজ করেন। ইন্ডিয়ায় এসেছিলাম আমি একটি ব্যক্তিগত কাজে, এবার দিল্লি হয়ে ফিরে যাচ্ছি ইজিপ্ট। আমার প্রপিতামহ ছিলেন ইজিপ্টের মহম্মদ আলি রাজবংশের দশম রাজা ফারুকের অমাত্য অর্থাৎ সভাসদ। রাজা ফারুক এই বাক্সটা আমার দাদুকে দিয়েছিলেন তাঁর বিশ্বস্ততার পুরস্কার হিসেবে। ১৯৫২ সালে ইজিপশিয়ান রেভোলিউশনের সময় দাদু রাজাকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন, যদিও এক সময় রাজা সিংহাসনচ্যুত হন, রাজতন্ত্র

ধ্বংস করে ইজিপ্টে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

"সেসব গল্প থাক। শুধু এটুকু জেনে রাখ, বাক্সের মধ্যে অনেক তাবিজ, কবচ, স্মারকচিহ্ন রয়েছে যেগুলি নানা সময়ে আমার বাবা, কাকারা সংগ্রহ করেছিলেন বা পুরস্কার হিসেবে পেয়েছিলেন। এই কয়েনগুলি হল 'গুড লাক কয়েন' বা 'ম্যাজিক কয়েন'। এগুলিও রাজার কাছ থেকেই পাওয়া । দেখ, এই পিতলের কয়েনগুলির একদিকে ফারাওএর ছবি, তার চারিদিকে এগুলো হাইরোগ্লিফিক চিহ্ন-- জানো তো হাইরোগ্লিফিক কি? মিশরীয় চিত্রলিপিতে ব্যবহৃত বর্ণমালা, আর অন্য পিঠে বাঁদিকে মুখ করা স্ফিংক্সের ছবি, পিছনে চারটি পিরামিড যেগুলি ডানদিক থেকে বাঁদিকে ক্রমশ ছোট হয়ে গেছে, আর সেই সঙ্গে এদিকেও রয়েছে বেশ কিছু হাইরোগ্লিফিক চিহ্ন। এই যে দেখ, এটি ইজিপশিয়ান দামী রত্নবসানো গুবরে- পোকা, এছাড়াও এই বাক্সের মধ্যে রয়েছে বেশ কিছু ম্যাজিক্যাল পাথর, শুকনো শিকড়বাকড়--- এসবই বংশপরম্পরায় আমাদের রক্ষা করে আসছে। এগুলো থাকতে আমাদের কক্ষণো কোন ক্ষতি হবে না। তাছাড়া এগুলোর নানা অলৌকিক ক্ষমতাও আছে, যা অনেকেই বিশ্বাস করবে না। যেমন এই যে ইজিপশিয়ান দামী রত্নবসানো গুবরে- পোকা বা স্ক্যারেব বিটলটি দেখছ, যা ইজিপশিয়ান পৌরাণিক কাহিনীতে সূর্য, পুনর্জন্ম, সুরক্ষার চিহ্ন- এটি আমার প্রপিতামহ এক ক্ষমতাশালী পুরোহিতের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। আমার এক এপিগ্রাফার বন্ধু, যে বিভিন্ন এপিগ্রাফ, ইন্সক্রিপশনের অর্থাৎ প্রাচীন অভিলিখনের পাঠোদ্ধারের কাজ করে, কিছুদিনের জন্য এটি ধার নিয়েছিল এর উল্টোপিঠে খোদাই করা হাইরোগ্লিফিক লিপিটার মানে উদ্ধার করার জন্য। অবাক ব্যাপার যেদিনই ও এটি হাতে নিয়ে কাজ শুরু করার কথা ভেবেছে সেইদিনই কোন না কোন কারণে তা আর হয়ে ওঠেনি, উলটে নানা ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখে তিতিবিরক্ত হয়ে ও এটি আমাকে ফেরত দিয়ে যায়। কিন্তু এটি হাতে নিলে আমার শরীরে এক অলৌকিক ক্ষমতার সঞ্চার হয়, শরীরের যে কোন ক্ষত, যে কোন কষ্ট, যে কোন অসুস্থতা নিমেষে মিলিয়ে যায়। তাই এগুলি কোনভাবেই আমরা কাছ ছাড়া করিনা, বংশের একমাত্র বংশধর হিসেবে এগুলি এখন আমার জিম্মায়, তাছাড়া পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবেও এগুলির মূল্য এখন খুব একটা কম নয়। "

এবার তাঁর গলার ভিতরে আঙুল গলিয়ে চেনের সঙ্গে আটকানো একটা চোখের

মত দেখতে পেন্ডেন্ট বার করে আনলেন ভদ্রলোক , "এটি হল 'আই অফ হোরাস'। এই পেন্ডেন্টটিও রাজা ফারুকেরই দেওয়া । অত্যন্ত পবিত্র এই কবজটি রাজকীয় ক্ষমতা, সুস্থতা এবং সুরক্ষার প্রতীক। এই পবিত্র' চোখে' র ছয়টি অংশ আছে। প্রতিটি অংশ ছয়টি ইন্দ্রিয়ের সংগতি প্রকাশ করছে। তবে সবচেয়ে মজার ব্যাপার কী জানো, আমাদের বংশের দাদা, কাকা, বাবা বা আমি ছাড়া এই পিরামিড বাক্সটি খোলা কারোর পক্ষে সম্ভব নয়, আর এর ম্যাজিক্যাল ক্ষমতাও আমাদের সঙ্গ

ছাড়া পুরো ভোঁতা!"

এই বলে ভদ্রলোক নিশ্চিন্ত হয়ে সিটে ঠেস দিয়ে বসে এক গাল হাসলেন। তারপর ফের বললেন, "এই দেখেছো, এতক্ষণ ধরে খালি আমার কথাই বলে গেলাম, এবার তোমার কথা বল। তোমার নাম কী? মায়ের সঙ্গে কোথায় চলেছ?"

ইতিমধ্যেই মা একবার ঠুমরির খোঁজ নিতে উঁকি মেরে গেছেন, এহসান সুলেমান শাহ সাহেব ' আপনার মেয়ের সাথে একটু গল্প করার অনুমতি চেয়ে নিচ্ছি' বলায় মা -ও আর না করতে পারেননি।

ঠুমরির সঙ্গে ওর স্কুল, বন্ধুবান্ধব, পরিবারপরিজন, ওর ভালোলাগা, খারাপলাগা নিয়ে একপ্রস্থ বকবক করার পর যখন ভদ্রলোক শুনলেন, ওর সায়েন্স সাবজেক্টটা ভীষণ ভাল লাগে, কিন্তু ইতিহাস ভূগোল এক্কেবারেই পছন্দের নয়, এহসান সুলেমান শাহ সাহেব কেমন যেন অননুমোদনের ভঙ্গীতে মাথা নাড়লেন" ,কিন্তু অন্বেষা, ইতিহাস বা অতীতকে ঠিকভাবে না জানলে বিজ্ঞান তোমায় কোনভাবেই সাহায্য করতে পারবে না। ইজিপ্টের বিখ্যাত গিজার পিরামিডের নাম শুনেছ তুমি? গিজা সমাধিক্ষেত্রের প্রাচীনতম ও বৃহত্তম পিরামিডটি ইজিপ্টের ফ্যারাও খুফুর মৃত্যুর পর তার সমাধির ওপর নির্মিত হয়েছিল, খুব সম্ভবত ২৫৪০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। ৩৮০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এটিই ছিল মানুষের তৈরি উচ্চতম স্থাপত্যের নিদর্শন । এক অত্যাশ্চর্য অতীত ইঞ্জিনিয়ারিংএর নমুনা, যা তৈরি হয়েছিল ২, ৩০০, ০০০ চুনাপাথরের ব্লক দিয়ে যার একেকটির গড় ওজন ছিল প্রায় আড়াই টনের কাছাকাছি। পৃথিবীর প্রাচীন সপ্তম আশ্চর্যের মধ্যে এই একটিই এখনো টিঁকে আছে যার সুবিশাল আয়তন এবং সঙ্গতি এবং ভারসাম্যের নির্ভুলতা আজও বর্তমান টেকনোলজির কাছে প্রাচীন ইঞ্জিনিয়ারিংএর এক বিস্ময়! বর্তমান উন্নত টেকনোলোজির সাহায্যেও এখনো অবধি এর অনুরূপ কোনকিছু তৈরি করা সম্ভব হয়নি । "

খানিকক্ষণ দুজনের কারো মুখেই কোন কথা নেই। ঠুমরি অবাক হয়ে এইমাত্র

শোনা কথাগুলোই ভাবছিল। খানিক বাদে কী যেন একটা ভাবতে ভাবতে এহসান সুলেমান শাহ সাহেব বলে উঠলেন-- "হুঁমমম-- আমার এতবড়ো একটা উপকার করার জন্য তোমাকে একটা জিনিস আমি দিতে পারি। এটা অবশ্য তেমন স্মৃতিবিজড়িত নয় বা পুরোনোও নয়। আমার ছোটকাকার খুব কিউরিওর শখ ছিল, পুরোনো কায়রোর বড়বাজার থেকে এই ' আওয়ার গ্লাস' বা বালিঘড়িটি কিনেছিলেন তিনি। এটার বিশেষত্ব কী জানো? এটি আধ ঘন্টার মত প্যাসেজ অফ টাইম পরিমাপ করে, এবং এই আধ ঘন্টায় তুমি ঘুরে আসতে পার অতীতের যেকোন জায়গায়, যেকোন সময়ে

-- "

উত্তেজিত হয়ে ঠুমরি প্রশ্ন করে উঠল" ,টাইম ট্রাভেল? যেমনটি স্টিফেন স্পিলবার্গের ' ব্যাক টু দ্য ফিউচারে' ঘটেছিল?"

গত সপ্তাহেই মামাবাড়িতে ঐ সিনেমাটা দেখেছে ঠুমরি, আর তখন থেকেই ওই নিয়েই ভেবে চলেছে, হাজারো প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে চলেছে মা থেকে শুরু করে মামা অবধি সক্কলকে!

"না, ঠিক টাইম ট্রাভেল নয়, তবে অনেকটা ভার্চুয়াল টাইম ট্রাভেল বলতে পার। এই ' আওয়ার গ্লাস' টি হাতে নিয়ে তুমি যে সময়ের কথা চিন্তা করবে, তুমি পৌঁছে যাবে সেখানে! সশরীরে নয়, কিন্তু তুমি অনুভব করতে পারবে তোমার চারদিকের পরিবেশ বদলে গেছে, জগত বদলে গেছে, সময় বদলে গেছে, কাল- পাত্র সব বদলে গেছে-- তোমার চারপাশে ঘটে চলবে সেই অতীত ঘটনাবলীর রি- টেলিকাস্ট! না, তোমার কিন্তু তেমন কিচ্ছু করার থাকবে না, শুধু নীরব দর্শক হয়ে থাকা ছাড়া ! তবে এর কিছু সীমাবদ্ধতা তো আছেই । দুটো পয়েন্ট সবসময় মনে রাখবে, বাস্তবে যে জায়গায় থাকবে তুমি, কেবলমাত্র সেই স্থানেরই অতীতে পৌঁছতে পারবে, মানে কলকাতায় বসে তুমি ফিনল্যান্ডের অতীতে চলে যেতে পারবে না। আর বছরে মাত্র তিনবার তুমি এই ' আওয়ার গ্লাসে' র এই সুযোগটা নিতে পারবে, অন্য সময় এটি সাধারণ' আওয়ার গ্লাস' ছাড়া আর কিচ্ছু নয়। আসলে ' তিন' নম্বরটি কিন্তু এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নম্বর, গ্রীক গণিতজ্ঞ ও দার্শনিক পিথাগোরাসের মতে, ' তিন' হল পারফেক্ট নম্বর। ' তিন' হল কাল অর্থাৎ টাইমের দ্যোতক- অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ, বিভিন্ন ধর্মেই ' তিন' এক পবিত্র নম্বর, ' তিন' হল ম্যাজিক নাম্বার, ' তিন' হল প্রাইমারি কালার-- আর কত বলবো! মোদ্দা কথা ' তিনে' র মহিমা অপার! তবে একটা কথা তোমায় জানিয়ে রাখি, একবার আমি ' ভ্যালি অফ দ্য কিংস' এ ফ্যারাও তুতেনখামেনের সমাধির কাছে গিয়ে ১৩২৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তাঁর মৃত্যুর সময়ে ফিরে যাবার চেষ্টা করেছিলাম, আওয়ার গ্লাস তা পারেনি। খুব সম্ভবত বুঝেছি, ১৭- ১৮শতকের আগের কোন সময়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা এর নেই! তবে সাবধান, কাউকে জানাতে যেওনা এর ক্ষমতার কথা। একান্তে একাকী পরখ করে দেখতে পার এর কার্যকারিতা, আর হ্যাঁ, এটা মনে রাখবে ' আওয়ার গ্লাসে' র ওপরের প্রকোষ্ঠ পুরোপুরি খালি হওয়ার আগেই কিন্তু এটাকে উলটে দিতে হবে, তাহলেই তুমি থুড়ি তোমার আত্মা আবার বাস্তবে ফিরে আসবে। নাহলে কী হবে তা আমার জানা নেই। জানার চেষ্টাও করিনি কখনো । "

কথা বলতে বলতে কখন যেন অনেকখানি সময় ফুড়ুৎ করে বেপাত্তা হয়ে গেল। নিউদিল্লি ইন্দিরা গান্ধী ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে পৌঁছতে খুব বেশি একটা বাকি নেই। সিটবেল্ট বেঁধে নেওয়ার জন্য ঘোষণা শুরু হয়ে গেছে। পেন্সিল টর্চের মত ছোট্ট

' আওয়ার গ্লাস' টিকে জিন্‌সের পকেটে ঢুকিয়ে নিয়ে ভদ্রলোককে ধন্যবাদ এবং বিদায় জানিয়ে ঠুমরি এসে বসল মায়ের পাশে। সিটবেল্ট বেঁধে নিয়ে থিতু হওয়ার কিছু পরেপরেই ও বুঝতে পারল প্লেনটা এবার ধীরে ধীরে নীচের দিকে নামতে শুরু করেছে !

নিউদিল্লিতে প্লেন থেকে নেমে ভদ্রলোক কোনদিকে যে চলে গেলেন, ঠুমরি ঠিক খেয়াল করে উঠতে পারল না। মায়ের সঙ্গে অনেকগুলি চেকিংএর পর্ব শেষ করে যখন ওরা ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইটে করে চোদ্দ- পনেরো ঘন্টার একঘেয়ে জার্নির শেষে নিউ ইয়র্কের জে এফ কে এয়ারপোর্টে এসে পৌঁছল, ক্লান্তি আর টেনশনে মা মেয়ে দুজনেই তখন অনেকটা কাহিল। বাবা আর বাবার অফিসের রজতকাকু এয়ারপোর্টের ইন্টারন্যাশনাল অ্যারাইভ্যালে ওদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন...।পার্কিং লটে রাখা গাড়িতে বসে বাবার কাঁধে মাথা রেখে কখন যেন ও ঘুমিয়ে পড়েছিল কে জানে......।

ক্রমশ

পাটেরগাঁও

শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়

চল চলে যাই,   যাই চলে এক পাটেরগাঁও।
পাটেরগাঁও নামটা দিব্যি দেখেছি কোথাও।
কোথায় কোথায় মনে তো ঠিক আসছে না রে
কিন্তু সত্যি গিয়েছি তার ওপর দিয়ে
বাসে কিংবা হেঁটে নাকি অন্য কিছু
ঠিক মনে নেই আসছিল কেউ অমনি পিছু পিছু?
পাটেরগাঁও পাটেরগাঁও নামটা ভীষণ চেনা
কোনোমতেই যাচ্ছে না যে মনের মধ্যে আনা
আচ্ছা দেখি কবে কোথায় হুঁ হুঁ বাবা রোসো
একটুখানি সবুর করো একটুখানি বোসো
পড়বে ঠিক মনে পড়বেই আজ না হোক কাল
মনের মাঝে ভিড় করে সব আছে রে জঞ্জাল
পাটেরগাঁও পাটেরগাঁও পড়ছে তোমার মনে?
এখন কি প্রশ্ন করব,   কেবল জনে জনে?
আরেকটু সবুর করি ওফোঁড় হয়ে ভাবি
পড়তে তোকে হবেই মনে কোথায় বা আর যাবি?
ট্রেকপথে কি! অথবা, ইয়ে, জঙ্গলের এক গ্রামে
এমন গ্রামের নাম লেখাটা দেখেছি কোনখানে!
ভাবতে হবে ভাবতে ভাবতে দিন পেরিয়ে বিকেল
গাঁয়ের সঙ্গে পাটগাছটির আশ্চর্য মিশেল।
তবুও যে পড়েনা হায় মনের কেমন ধাঁধাঁ
আসছে আসছে তবুও যে রয়েই গেল বাধা
ও হো হোওওও হোওওও মনে পড়েছে
কদিন ধরেই রূপদাদাকেই মনে আসছে
ওর বাড়িরই পথে কেমন সবুজ গাছে ছাওয়া
পাকদন্ডী পথে কেবল পাহাড় বেয়ে যাওয়া
সেই পথেরই মাঝামাঝি নদীর পাড়ে এক
ছোট্টো হলুদ ফলক ঝোলে গাছের কোলে দ্যাখ
সেখানেই তো লেখা এই গ্রাম- পাটনির নাম
নামখানা তার অত্তোবড়ো, দু চারখানাই ধাম
যাকগে বাবা মনে পড়ল। এবার যখন যাবো
দূরের থেকে সে গ্রামটার পথখানা দেখাবো।

মারিয়ন ক্রফোর্ড
অনুবাদঃ ইন্দ্রশেখর

মাঝেমধ্যেই বস্তুটাকে আমি চিল্লাতে শুনি। আরে না না, আমি ভিতু নই। কল্পনাশক্তির দৌড়ও বেশি নয় আমার। সবচেয়ে বড়ো কথা আমি কখনো ভূতে বিশ্বাসটিশ্বাসও করিনি। অবশ্য এ বস্তুটা ভূত হলে অন্য কথা। তবে জিনিসটা যাই হোক না কেন এটা লিউক প্র্যাটকে যতোটা ঘেন্না করত আমাকেও ততটাই করে। আমায় দেখলেই চ্যাঁচায়।

বুঝলেন, কখনো ডিনার টেবিলে বসে কাউকে কোন ভয়ানক খুনের কায়দাটায়দার গল্প শোনাবেন না। কে বলতে পারে আপনার পাশের লোকটা তার বাড়ির লোকজনের ব্যাপারে কী মতলব ভাঁজছে। মিসেস প্র্যাটের মৃত্যুর জন্য যেমন আমি সবসময় নিজেকেই দুষি। আমি তো চাইতাম তিনি বুড়ো বয়েস অবধি সুখেশান্তিতে বেঁচেবর্তে থাকুন, কিন্তু সেদিন ডিনার টেবিলে কেন যে মরতে গল্পটা বলতে গেছিলাম। নইলে হয়ত—

মনে হয় সেইজন্যই বস্তুটা আমায় দেখলেই অমন চিৎকার জোরে। মহিলা বেশ নরমসরম ভালোমানুষগোছের ছিলেন। তবে একবার আমি তাঁকে চিৎকার করতে শুনেছিলাম। ঘরের ভেতর থেকে পিস্তলের ফাঁকা আওয়াজ পেয়ে ভেবেছিলেন বুঝি তাঁর ছোট্টো ছেলেটা গুলি চালিয়ে দিয়েছে। বস্তুটার চিৎকারের শব্দ অবিকল সেইরকম। শেষের দিকে একই রকম একটা তীক্ষ্ণ কাঁপুনি থাকে। কী বলছি বুঝতে পারছেন তো? এক্কেবারে একরকম।

আসল ব্যাপারটা হচ্ছে, ডাক্তার আর তার স্ত্রীর মধ্যে যে গন্ডগোল একটা চলছে আমি সেটা আগেভাগে একেবারে আঁচ করতে পারিনি। মাঝেমধ্যে একটু আধটু খিটিমিটি লেগে থাকত বটে, তখন মিসেস প্র্যাটের মুখটা লাল হয়ে উঠত আর লিউক বাজে বাজে কথা বলে ফেলত হড়বড় করে। তবে সে তো তার একেবারে ছোটোবেলার অভ্যেস। আমার জ্ঞাতিভাই। আমি তাকে ভালোই জানি। ইশকুলেও তো সেই একইরকম স্বভাব ছিল ওর। সত্যি বলতে কি সেই আত্মীয়তার সূত্রেই আমার এ বাড়ির মালিকানা পাওয়া। ওর মৃত্যু আর ওর ছেলে চার্লির দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রাণ হারাবার পর বংশে আর কেউ ছিল না তো! সম্পত্তিটা বেশ ভালোই। আমার মত একজন বুড়ো নাবিকের শেষের দিনগুলো বাগান করে কাটিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

লোকে দেখবেন নিজের বুদ্ধির কাজগুলোর থেকে নিজের ভুলভ্রান্তিগুলো বেশি পরিষ্কারভাবে মনে রাখে। আমি ব্যাপারটা প্রায়শই খেয়াল করি। একদিন প্র্যাটদের সাথে রাত্তিরের খাবার খেতে খেতে ওদের সেই গল্পটা বলেছিলাম। সে ছিল নভেম্বরের এক বৃষ্টিভেজা রাত। সমুদ্রটা গোঙাচ্ছিল-

-- এই-- এই–চুপ—কথা বলবেন না—চুপ করে শুনুন—এক্ষুণি শুনতে পাবেন—জোয়ার আসছে বুঝতে পাচ্ছেন তো? কেমন ভার করা শব্দ, তাই না? কেমন একটা—আরে—ওই তো—ওই যে হচ্ছে—ভয় পাবেন না, কোন ভয় নেই মশায়। আরে এ আপনাকে খেয়ে ফেলবে না—এ তো শুধু একটা চিৎকার—

যাক! আপনি যে চিৎকারটা শুনেছেন তাতেই আমি খুশি। নইলে লোকে ভাবে ও বুঝি বাতাসের আওয়াজ, কিংবা আমার কল্পনা, বা ওইরকম কিছু একটা। না না, আজ রাতে আর হবে না। এক রাতে একবারের বেশি এ কখনো চিল্লায় না।

বাঃ বেশ বেশ—আগুনে আরো দু একটা কাঠ গুঁজে দিন দেখি। আরেকটু পানীয় ঢেলে নিন। ব্লকলট নামের সেই বুড়ো ছুতোরকে মনে আছে আপনার? আরে ওই যে, ক্লন্টার্ফ নামের জাহাজটা ডুববার পর যে জার্মান জাহাজটা আমাদের উদ্ধার করে সেখানে কাজ করত। উপকূল থেকে শ পাঁচেক মাইল ভেতরে তুফানী দরিয়ার বুক থেকে আমাদের তুলে এনে ব্যাটা কেমন টলোমলো পায়ে গান ধরেছিল- "আহা দুবলাপাতলা খোকাগুলানকে পাড়ে লও—পাড়ে লও—" আমার মাঝেমধ্যেই এখন লোকটার কথা মনে পড়ে।

তা সে ছিল সেইরকমই একটা ঝড়ের রাত। আমি তখন কিছুদিন হল বাড়িতে আছি। অলিম্পিয়া জাহাজটার প্রথম সমুদ্রযাত্রায় যাবার অপেক্ষায়। এর পরের যাত্রাতেই তো অলিম্পিয়া রেকর্ড ভাঙল—মনে আছে? সেই যে বিরানব্বইয়ের—উম- নভেম্বর মাস, ঠিক ঠিক। মনে পড়েছে।

তা সে সন্ধেয় আকাশ বেশ মেঘলা ছিল। সঙ্গে একঘেয়ে বৃষ্টি। প্র্যাটের সেদিন মেজাজ গরম। রান্নাবান্না বেশ বাজে হয়েছে। তাতে প্র্যাটের মেজাজ আরো চড়েছে। তার ওপর আবার ঠাণ্ডাও পড়েছে জমিয়ে। সব মিলিয়ে প্র্যাটের মেজাজখানা সেদিন একেবারে বেজায় চড়া।

বেচারা বউটার অবস্থা তো বুঝতেই পারছেন। সে বসে বসে খালি একটা ওয়েলশ রেয়ারবিট বানিয়ে কাঁচা শালগম আর আধাসেদ্ধ মাংসের ভুলচুক ঢাকবার চেষ্টা করে যাচ্ছিল। প্র্যাটের সেদিন সম্ভবত কোন রোগী মারা গিয়েছে। বিশ্রি আবহাওয়া, বাজে খাবার, সারাদিনের খাটুনি সব মিলিয়ে তার মেজাজের থই পাওয়া ভার। বলে, "আমার বউ আমায় কেমন বিষ খাওয়াবার চেষ্টা করছে দেখছিস? কোনোদিন খাইয়েও দেবে হয়তো।"

খেয়াল করলাম কথাটা তার বউয়ের মনে বেজায় লেগেছে। ব্যাপারটাকে হালকা করে দেবার জন্য বললাম, "ধুস। মিসেস প্র্যাট বুদ্ধিমান মানুষ হয়ে অমন বোকার মতন কায়দায় খুন করতে যাবেন কেন?" তারপর আমি জাপানিদের সেই কাচতন্তু আর কুঁচিকুঁচি করা ঘোড়ার লোম দিয়ে বিষ খাওয়াবার সুক্ষ কায়দাটায়দার গল্প শুরু করে দিলাম।

প্র্যাট ডাক্তার। এসব ব্যাপারে ভালোই জ্ঞানগম্যি আছে। কিন্তু আমিও কম যাই নাকি? বলে ফেললাম আয়ারল্যান্ডের সেই মহিলার গল্প। তিনতিনবার বিধবা হয়েছিলেন। কেউ তাঁকে সন্দেহও করেনি।

গল্পটা শোনেন নি নাকি? চার নম্বরের বার তাঁর শিকার জেগে ছিল। সে-ই তাঁকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। মহিলার ফাঁসী হয়েছিল। খুন করবার কায়দাটা দারুণ ছিল মহিলার। শিকার ঘুমোলে সরু একটা ফানেল দিয়ে তিনি তার কানের ভেতর কয়েক ফোঁটা গরম সিসে ঢেলে দিতেন। বাইরে থেকে দেখে কিচ্ছুটি বোঝবার জো নেই—

--না না –ওটা হাওয়ার শব্দ মশায়। ঝড়টা ফের ঘুরে আসছে কি না! ও আমি শব্দ শুনেই ধরতে পারি। তাছাড়া চিৎকারটা তো বললামই এক সন্ধেয় একবারের বেশি আসে না--

তা সে ডিনারের কিছুকাল পর মিসেস প্র্যাট ঘুমের মধ্যে হঠাৎ করে মারা গেলেন। অলিম্পিয়ার পর যে স্টিমারটা ছেড়েছিল, তাদের কাছেই আমি নিউ ইয়র্কে বসে খবরটা পাই। সে বছর আপনি তো লিওফ্রিক নামের জাহাজে ছিলেন, তাই না? এই যে—এই পানীয়টা চেখে দেখুন দেখি একটু। একেবারে খাঁটি, পুরোনো হালসক্যাম্প মশাই। এ বাড়িটা যখন আমার হল তখন এর সেলারের মধ্যে বোতলটা খুঁজে পেয়েছিলাম। বোতলটা অবশ্য বছর পঁচিশেক আগে আমিই লিউককে কিনে এনে দিয়েছিলাম আমস্টারডাম থেকে। খুলেও দেখে নি কখনো। বেচারা বোধ হয় তার জন্য এখন ওপারে বসে একটু দুঃখ পায়।

হ্যাঁ, তা কত অবধি বলেছিলাম গল্পটা? মিসেস প্র্যাটের আকস্মিক মৃত্যু—হ্যাঁ। তার পর লিউক বোধ হয় এখানে একটু একা হয়ে গেছিল। মাঝেমধ্যে আমি এসে দেখা করে যেতাম। লিউককে বেজায় ক্লান্ত আর চিন্তিত দেখাত। বলত ডাক্তারিটা আর চালাতে পারছে না। তবে কোন অ্যাসিসট্যান্টও সে কিছুতেই রাখতে চায় না।

এইভাবে কয়েকটা বছর কেটে গেল। একদিন লিউকের ছেলেটা দক্ষিণ আফ্রিকায় মারা গেল। এরপর লিউক কেমন অদ্ভুত একটা হয়ে গেল। স্বাভাবিক মানুষের থেকে আলাদা। কিছু একটা যেন ভর করেছিল ওর ওপর। না না, পেশার ক্ষেত্রে কোন ভুলভ্রান্তি করত না তা ঠিক, কিন্তু ওই কীরকম একটা যেন আচরণ—মানে—বুঝতে পারছেন তো?

কমবয়সে লিউকের গায়ের রঙ বেজায় ফর্সা ছিল। মাথার চুল ছিল লাল। ছিপছিপে গড়ন।

মাঝবয়সে এসে সে কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। আর ছেলের মৃত্যুর পর বেচারা ক্রমশই রোগা হয়ে যাচ্ছিল। তার মাথাটা দেখে মনে হত একটা চামড়ায় মোড়া খুলি। চোখগুলো কেমন যেন চকচক করত সবসময়। দেখলে বুক কাঁপে।

মিসেস প্র্যাটের বাম্বল নামে পেয়ারের কুকুর ছিল একটা। এখন সেটা প্র্যাটের সঙ্গেসঙ্গে সবজায়গায় ঘুরত। ভারী ভালো স্বভাবের বুলডগ সেটা। মাঝেমধ্যে দাঁত খিঁচিয়ে অচেনা লোকজনকে একটু ভয় দেখাত শুধু। কখনো কখনো সন্ধেবেলা প্র্যাট আর বাম্বল একা একা চুপচাপ বসে একে অন্যের মুখের দিকে চেয়ে থাকত। হয়ত বসে বসে পুরোনোদিনের কথা ভাবত। মিসেস প্র্যাট যখন বেঁচে ছিলেন, বোধহয় সেই সময়গুলোর কথা। তখন এইরকম সন্ধেবেলায় তিনি বসে থাকতেন ওই যে—ওই—যে চেয়ারটায় আপনি বসে আছেন ওইটাতে। আর এই আমার চেয়ারটায় বসত প্র্যাট।

বসে থাকতে থাকতে বুড়ো মোটাসোটা কুকুরটা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়ত। লাফাতে তো পারে না আর, তাই, প্র্যাটের চেয়ারের পায়া বেয়েই ওপরে উঠে পড়বার জন্য সেকী আপ্রাণ চেষ্টা তার। প্র্যাট তখন তার কংকালের মত মাথার সামনে কয়লার টুকরোর মত জ্বলন্ত দুটো চোখ নিয়ে কুকুরটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকত। মিনিটপাঁচেক এইরকম চলবার পর হঠাৎ কুকুরটা থরথর করে কাঁপতে শুরু করত আর সেইসঙ্গে যেন গুলি খেয়েছে এইরকম করুণ আর্তনাদ বেরিয়ে আসত তার গলা থেকে। আর তারপর প্র্যাটের চেয়ার থেকে ছিটকে নেমে পড়ে চেয়ারের তলায় গিয়ে লুকিয়ে কুঁই কুঁই করে ডাকতে থাকত।

আমার কল্পনাশক্তি খুব কম, তবু আমি হলফ করে বলতে পারি সেই শেষের মাসগুলোতে প্র্যাটের মুখখানা দেখলে বহু দুর্বল হৃদয় মানুষই ভির্মি যেতেন। সেটার দিকে তাকালে একটা চামড়াঢাকা খুলি ছাড়া আর কিছু মনে হওয়া সম্ভব ছিল না।

এরপর পরের সংখ্যায়

বেঙ্গালুরুর টেরা ভেরা

বাড়িটাকে ভেঙে ফেলা হয়েছে গতবছর, মানে ২০১৪ সালে, কিন্তু তাকে নিয়ে গল্পের শেষ নেই। ১৯৩৪ সনে বেঙ্গালুরুর সেইন্ট মার্কস রোডে বাড়িটা বানিয়েছিলেন বম্বে হাইকোর্টের এক নামজাদা উকিল ই জে ভাজ। মৃত্যুর সময় তিনি বাড়ি দিয়ে যান তাঁর দুই অবিবাহিতা মেয়ে ডোলসে আর ভেরাকে। ভেরা ইংরিজির শিক্ষিকা ছিলেন। ডোলসে ছিলেন পিয়ানোর দিদিমণি।

এ বাড়ির ভূতকাহিনীর শুরু ৪ সেপ্টেম্বর ২০০২ সালের ভোররাতে। সেদিন এ বাড়িতে, বোন ভেরার চোখের সামনে ৭৫ বছরের বৃদ্ধা ডোলসে ভাজ নিষ্ঠুরভাবে খুন হন। খুনীর কোন সন্ধান মেলে নি। ডোলসেকে সে বাড়ির উঠোনেই কবর দেয়া হয়।বাড়ি ছেড়ে চলে যান ডোলসের দিদি ভেরা ভাজ। কোথায় গেছেন তিনি কেউ সঠিক জানে না। কেউ কেউ বলে ভেরা এখন অস্ট্রেলিয়ায় আছেন।

তারপর থেকে সে বাড়িতে আর কোন জনমনুষ্যের গতায়াত ছিল না। দরজা জানালা তার চোরে খুলে নিয়ে গেছে। ভেতরে ঝোপঝারজঙ্গল। গাড়িবারান্দায় একটা প্রাচীন হিলম্যান মিংক্স গাড়ি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জং ধরছিল শুধু। ভেতরে খাঁ খাঁ করত কিছু পুরোনো আসবাব আর ডোলসের পিয়ানোটা।

সে বাড়ির সামনে দিয়ে লোকজন দ্রুতপায়ে চলে যেতেন। ওখানে দাঁড়ালেও অশুভ নজর পড়ত নাকি তাঁদের ওপর। রাতে ভেতর থেকে কখনো কখনো ভেসে আসত পিয়ানোর বিষণ্ন সুর। কখনো কখনো জানালায় দেখা যেত এক বৃদ্ধার বিষণ্ন মুখটি।

ভূতগবেষকরা অনেকেই ও বাড়িতে রাতের বেলা গিয়েছেন। ফলও পাওয়া গেছে নাকি হাতেনাতে। সেখানে নাকি দানবীয় জাদুর লক্ষণ ছিল। উল্টোনো ক্রুশ, হাত ও মাথা ভাঙা যিশু ও মা মেরির মূর্তি দেখেছেন তাঁরা সেখানে। চারপাশে অদ্ভুত ব্যাখ্যাহীন সব হাড়জমানো শব্দ উঠেছে। প্রত্যেকের শুধু বারবার মনে হয়েছে কেউ যেন শীতল চোখে তাঁদের চলাফেরার ওপর নজর রাখছেন।

একবার এক চোর বলেছিল, সে নাকি এইখানে রাতের বেলা এসে ঢুকতে হাত পায়ে পোড়া ফোসকা পড়ে গেছিল তার। নিজেনিজেই। কেমন করে তা হল তা কেউ জানে না।

বেচারি ডোলসে। তার একেবারে ছোটো বোনটা সম্পত্তির লোভে তাদের দুই বোনকে জীবন্ত অবস্থায় অনেক জ্বালিয়েছে। তারপর দিদির চোখের সামনে খুন হয়েছে সে। তারপর, ভূত হয়েও যে নিজের বাড়িতে একটু শান্তিতে থাকবে তার জো-ও কি আর রেখেছে বাড়ি বানাবার ব্যবসায়ীরা? গতবছর বড়ো বড়ো যন্ত্র এনে বাড়িটাকে ঘা মেরে মেরে মাটিতে লুটিয়ে ধুলোয় মিশিয়ে দিল তারা। সুন্দর সেই বাড়ির জায়গায় এইবার হয়ত একটা ঝাঁ চকচক শপিং মল তৈরি হবে। হয়ত কখনো গভীর রাতে তার ফাঁকা দোকানঘরগুলো পরিষ্কার করতে করতে কোন সাফাইকর্মীর চোখে পড়বে দুটো বিষণ্ন চোখ—কে জানে-

মেছোভূত আর ইয়েলে

সংহিতা

একটা গল্প ছিল যে একটা লোক বর্ষার সন্ধ্যায় একটা মাছ কিনে বাড়ি ফিরছিল। পথে একটা ভূত তার পিছু নেয়। সমানে বলতে থাকে, “দেঁ না খাঁই, দেঁ না খাঁই, দেঁ না খাঁই, দেঁ না ......।”

লোকটা বাড়ি পৌঁছে তার গিন্নীকে মাছটা দিয়ে দিয়েছে। গিন্নী যখন রাঁধছে মাছ তখন রান্নাঘরের ছাদের চিমনি দিয়ে গলগল করে বেরোনো ধোঁয়ায় মাছে গন্ধ পেয়ে ভূতটা চিমনি দিয়ে গলে মাছ নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে। গিন্নী বলেন, “ওরে তুই নর্দমা দিয়ে হাতটা বাড়া দিচ্ছি তোকে গরম মাছ ভাজা।”

ভূতটা মহানন্দে যেই হাত বাড়িয়েছে অমনি গিন্নী ভূতের হাতের চেটোতে গরম ভাতের ফ্যান ঢেলে দিয়েছে। বেশ ভূতও অমনি কাঁই কাঁই করে চেঁচাতে চেঁচাতে পাঁই পাঁই দৌড়ে পগাড় পার।

এই ভূতটা মেছো ভূত। মাছ খেতে ভালোবাসে। থাকে পুকুর বা ঝিলের ধারে। মাছ ধরে খাবে বলে। তবে এরা মাছ চুরিও করে জেলেদের নৌকা থেকে কিংবা গেরস্তের রান্নাঘর থেকে। গল্পে যেমন বাজার ফেরত লোকটার পিছু নিয়েছিল সেরকম পিছু নিয়ে অনেক সময় মাছ কেড়ে নেয় ভয় দেখিয়ে বা আক্রমণ করে। আক্রমণের জন্য বেছে নেয় ঝিলের ধার বা বাঁশঝাড়।

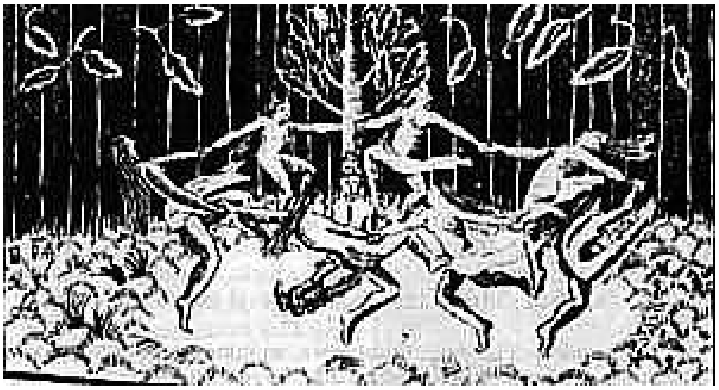

ইয়েলে রোমানিয়ার ভূত। এরা মেয়েভূত। ঝর্ণায় চান করে। ঘাস জমিতে আর গাছের মগডালে নাচে। নাচের সময় আদুর গা ঢাকে লম্বা চুলে। কখনও কখনও লোহার শেকলে বোনা ওভারকোটও পরে নাচার সময়ে। তবে নাচার সময় এদের কেউ দেখে ফেললে বা এদের চান করার ঝর্ণাতে অন্য কেউ চান করলে বা নাচের জায়গা অন্য কেউ তাদের কাজে ব্যবহার করলে এরা ভয়ানক খেপে যায়। তখন তারা প্রতিশোধ নেয়। তারা নাচতে নাচতে আক্রমণ করে আর পাগলের মতো ক্ষেপে গিয়ে আক্রান্ত ব্যক্তি ঘুরতে থাকে। তারপর মারা যায়। তখন মনে হয় তারা যেন আগুনে দগ্ধে মরে গেছে। যেখানে এরা নাচে সে ঘাসজমিটা পুড়ে যায়। সেখানে ঘাস গজালে তা বাদামি রঙের হয় যেন জ্বলে গেছে। যে গাছে মগডালে নাচে এরা, সে গাছও পুড়ে যায়। সে ঘাস বা গাছের ফল খেলে জীব জন্তুও মরে যায়। এদের থেকে বাঁচার উপায় হলো কোমরে রসুন বেঁধে রাখা।

বোম ফেলেছে জাপানি: পর্ব ৩

দোয়েল বন্দ্যোপাধ্যায়

কো মানে কন্যে তোমাদের জন্যে!

তা বাপু তোমরা যে অ্যাদ্দিনে ঢের জাপানি শিখে ফেলেছ তা আর আমার বুঝতে বাকি নেই। এখন যদি জাপান থেকে আকিকো, সুমিকো আর মিচিকো এসে বলে 'ওগেন কি দেস কা' উত্তর দিতে পারবে তো?

ওই দেখো আবার হেঁচকি তোলে। ওরা কি আর সত্যি আসছে? আমি তো মিছিমিছি পরীক্ষা করছিলুম, যে তোমরা সত্যিই কিছু শিখেছ কিনা। কী বলছ? আকিকো, সুমিকো এরা ছেলে না মেয়ে কী করে বুঝবে?

শিখে রাখো জাপানিদের নামের শেষে কো থাকলে সেটা মেয়েদের নাম না হয়ে যায়না। এমনিতে জাপানিতে 'কো'(子) শব্দের অর্থ ছোট বা infant । আমাদের দেশে যেমন বোশেখ মাসে জন্মালে মেয়েদের নাম হয় বৈশাখী, চৈত্র মাসে জন্মালে নাম হয় চৈতালি, পৌষ মাসে জন্মালে নাম হয় পৌষালী, জাপান দেশেও ঠিক তাই। কারও নাম আকিকো হলে বুঝে নিতে হবে সে মেয়ে নির্ঘাত হেমন্তকালে জন্মেছে। কারণ আকি(秋) শব্দের অর্থ হল হেমন্ত বা autumn। একই ভাবে কোনও ছেলে হেমন্তকালে জন্মালে তার নাম হতে পারে আকিহিতো। জানই তো ওদেশের সম্রাটেরও তাই নাম। আকি ছাড়াও জাপানের বাকি তিন ঋতু হল নাতসু (গ্রীষ্মকাল বা summer 夏) , ফুয়ু(শীতকাল বা winter 冬) এবং হারু (বসন্তকাল বা spring 春) । হুঁহুঁ দেখলে তো কেমন বুদ্ধি করে ঋতুর নামগুলোও শিখিয়ে দিলুম।

প্রশ্ন করলে 'কা'

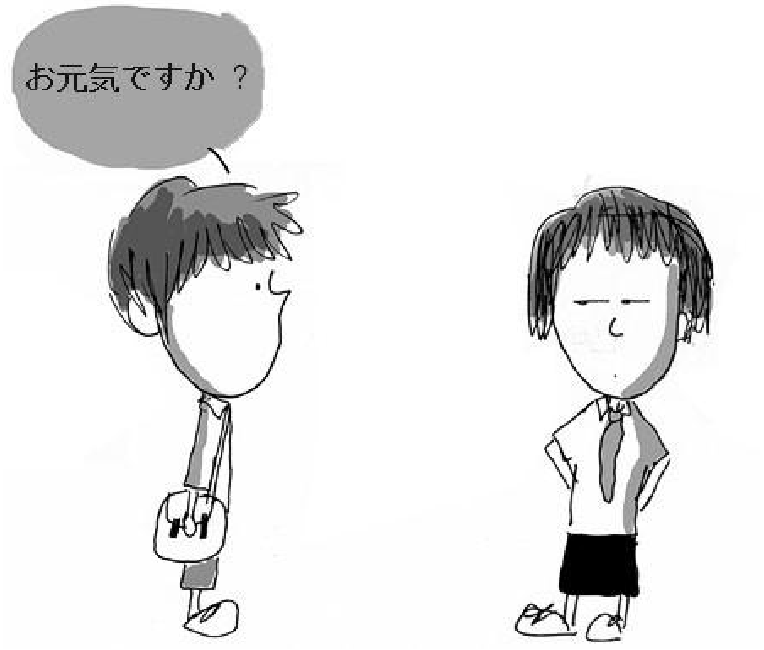

একটু আগেই যেটা বললুম, সেই 'ওগেন কি দেস কা (お元氣ですか) বাক্যের মনে হল কেমন আছেন বা আছ। মনে রেখো 'কা' হল একটি প্রশ্নবাচক শব্দ। বাক্যের শেষে কা থাকলেই ধরে নিতে হবে কোনও একটা প্রশ্ন করা হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হাইতে মো ই দেস কা(ভিতরে আসতে পারি?) বা মিজু ও নন্দে মো ই দেস কা(জল খেতে পারি?) ইত্যাদি। কা লিখলে ? চিহ্ন দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আচ্ছা কেউ যদি তোমাকে ভালমানুষি করে কেমন আছো জানতে চায়, তার তো একটা উত্তরও দিতে হয় নাকি? ওই দেখো, শিখছে জাপানি এদিকে বাংলায় ভাল আছি বলে দিব্যি গটমট করে চলে যাচ্ছে! জাপানিতে উত্তর দিতে হলে বলবে 'ওকাগে সামাদে গেনকি দেস'। মানে হল ঈশ্বরের কৃপায় আমি ভাল আছি। আবিশ্যি তুমি যদি মস্ত মানুষ হও আর বেজায় ব্যস্ত থাক তাহলে এত বড় কথা না বললেও চলে। তখন ছোট্ট করে বলবে 'গেনকি দেস'। মানে ভাল।

আতারাশি

তা জাপানি যখন শেখা শুরুই করেছ নতুন- নতুন শব্দ না শিখলে কি চলে? তাই এই পর্ব থেকে আমরা কিছু- কিছু নতুন শব্দ শিখবো। জাপানিতে একে বলে আতারাশি (atarashii: 新しい>নতুন) কোতোবা (kotoba: 言葉>শব্দ)। শুরু করা যাক পরিবার দিয়ে।

বাবা- চিচি(Chichi: 父) নিজের বাবার কথা বলার সময় চিচি ব্যবহৃত হবে। অন্য কারও বাবার কথা বলতে গেলে ওতোসান শব্দটি ব্যবহার হবে।

তোমার বাড়িতে কে কে আছে?

১) ওয়াতাশি নো চিচি ওয়া সেনসেই দেস(watashi no chichi wa sensei desu) : আমার বাবা একজন শিক্ষক।

২) আনাতানো ওতোসান ওয়া নানি ও সুরু নো দেশো কা(anata no otousan wa nani o suru no deshou ka) : তোমার/আপনার বাবা কী করেন?

মা- হাহা (Haha: 母) বাবার মতই মার ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। অন্যের মার কথা বলার সময় ওকাসান (Okaasan) বলতে হবে।

বড় দাদা- আনিসান:Anisan(兄さん)

বড় দিদি- আনেসান:Anesan(姉さん)

ছোট ভাই- ওতোতো :Ototo(弟) > প্রথম তো এর পর সামান্য লম্বা টান দেবে যেমন ওতো-ও- তো।

ছোট বোন- ইমোতো: Imoto(妹)

দাদু- সোফু(sofu: 祖父)

দিদা/ঠাকুমা- সোবো(Sobo: 祖母)

কাকু/জেঠু- ওজিসান(Ojisan: 叔父)

কাকি/জেঠি/পিসি- ওবাসান(ওবাসান:叔母)

আইসাতসু

পরিবারের কথা যখন উঠলই তখন জিজ্ঞেস করি তোমরা যা লক্ষীসোনা ছেলে- মেয়ে, সক্কাল- সক্কাল উঠে বাবা- মাকে নিশ্চয়ই গুডমর্নিং বলে থাক? এইবার চুপিচুপি আমার কাছ থেকে জাপানিতে কয়েকটা গ্রীটিংস শিখে নাও। জাপানিরা সৌজন্যকে বলে আইসাতসু। এই আইসাতসুর ব্যপারে জাপানিরা একদম পাক্কা। কোনও অবস্থাতেই তারা এগুলো জানাতে ভোলে না। তাহলে? শুভস্য শীঘ্রম। তোমরাও কয়েকটা আইসাতসু শিখে নাও ঝটপট।

Good Morning: ওহায়োগোজাইমাস (ohayogozaimasu) জ এর উচ্চারণ হবে ইংরিজি জেডএর মত। গোজাইমাস শব্দটি ভেরি(very) অর্থে বোঝায়। তোমার থেকে যাঁরা বয়সে বড় তারা তোমায় শুধু ওহায়ো বললে কোনও দোষের নেই।
Good Evening: কোমবানওয়া (Konbanwa)
Good Night : ওয়াসুমিনাসাই (oyasumi nasai)
Hallo/Hi: কোননিচিওয়া (Konni chi wa)
Thank You: আরিগাতো গোজাইমাস (ar i gat ou gozai masu)
Welcome: ধন্যবাদের প্রত্তুতরে বলবে। দোইতাশিমাসিতে (doi t ashi mashi t e)
Sorry : গোমেননাসাই (gomennasai)

Excuse Me: সুমিমাসেন (sumi masen)
Good Bye: সায়োনারা (sayonar a) উচ্চারণ হবে সায়ো- ও- নারা
Welcome Home: ওকায়েরিনাসাই (okaer i nasai)
Take Care: অসুস্থ মানুষকে বলবে ওদাইজিনি (odaijini) আর অন্যসময় বলবে ওগেনকিদে (ogenki de)
Congratulations: ওমেদেতো গোজাইমাস (omedet ou gozai masu)
I am home: তাদাইমা (tadaima) ইশকুল বা অফিস থেকে ফিরে পরিবারের লোকজনকে বলা যায়।
I am going: ইত্তেকিমাস

এগুলো ছাড়াও আরও অনেক আইসাতসু আছে সেগুলো আস্তে- আস্তে শিখবো। কী? এখুনি বলতে হবে? উফফ বাপরে বাপ। তোমাদের সঙ্গে বকবক করে আমার ঘুম পেয়ে গেল। মস্ত হাইও উঠছে দেখছি। সামনের পর্বে আমরা দিনখন সময়ের হিসেব কষব জাপানিতে। কীভাবে? উহু, সেটি এখন বলছিনা মোটেও। ঘুমুতে চললুম। ওয়াসুমিনাসাই!

এইবারে—
বলো তো কে কী বলছে?

ইতালির ইলিবিলি (২য় পর্ব)

অদিতি সরকার

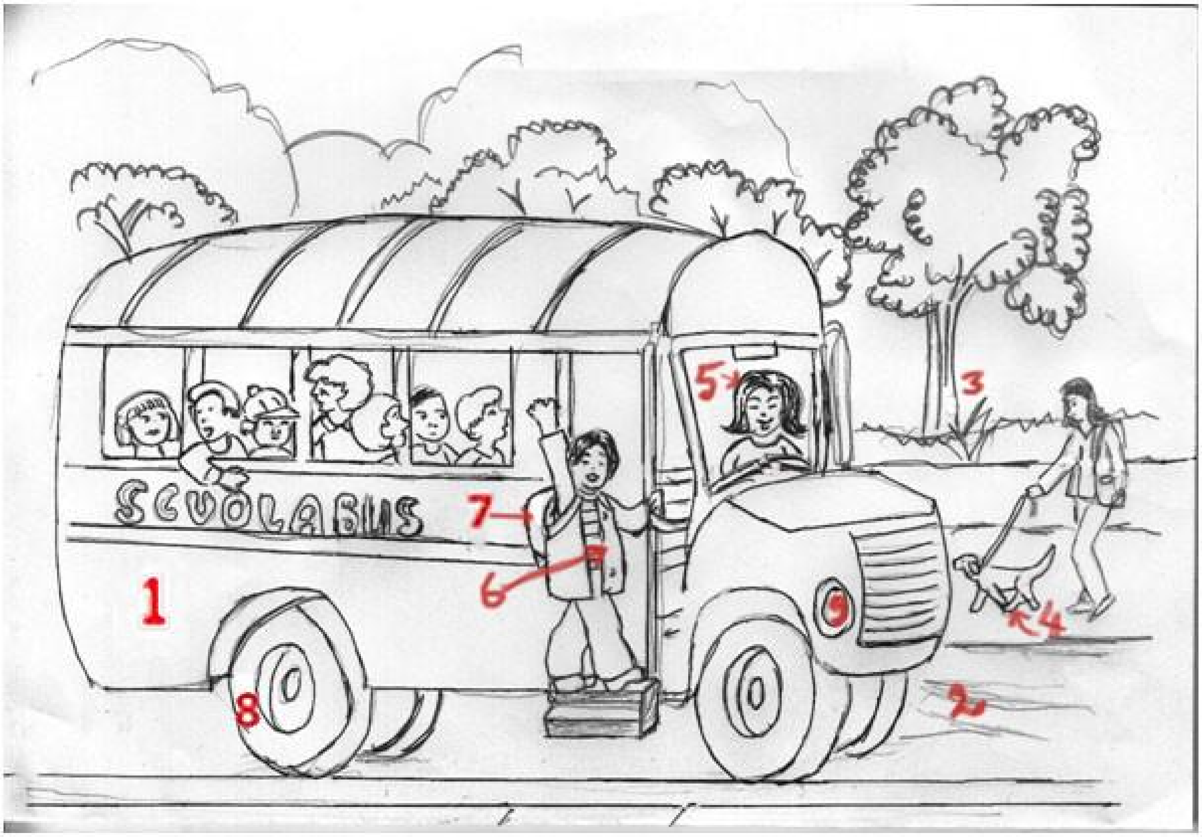

1:autobus; 2: strada; 3: albero; 4: cane; 5: autista; 6: ragazzo; 7: zaino; 8: pneumatico; 9: faro.

এই দেখ আবার এসে গেছি ইতালিয়ানের ঝাঁপি নিয়ে। আগের দিন যা যা হয়েছিল মনে আছে তো? সেই যে, ব্রেকফাস্ট টেবিলে লাত্তে আর কর্নফ্লেক্স?

তা তুমি তো মাম্মা আর পাপাকে আররিভেদের্চি বলে টলে পিঠে ৎসাইনো নিয়ে স্কুওলাবুসে উঠে পড়লে। আউতোবুস চালাচ্ছেন সিনিওরা কার্লা রোসিনি। মানে উনিই আজ তোমাদের স্কুওলাবুসের আউতিস্তা। অন্য দিন আউতিস্তা থাকেন সিনিওর পাউলো ব্রুনি। বয়স্ক ভদ্রলোক। আজ উনি আসেন নি। তা সিনিওরা রোসিনিকে বুওনজোর্নো বলা হল। তিনিও একগাল হেসে তোমায় বুওনজোর্নো ফিরিয়ে দিলেন। এবার তুমি ভেতরে গিয়ে বসলে তোমার বন্ধু ফাবিওর পাশটিতে। তার সঙ্গে তোমার কথাবার্তা হল এই রকম: (সেই আগের মতই কিছু কিছু জায়গায় ব্ল্যাংক রইল, তোমায় সেগুলো ভরতে হবে।)

তু: চাও ফাবিও, কোমে ভা? (_____ফাবিও, _____চলছে?)
ফাবিও: বেনোনে! স্তুদিও মোল্তো ইন কোয়েস্তি জোর্নি!(দারুণ! আজকাল অনেক পড়ছি!)
তু: দাই লেসামে দি মাতেমাতিকা লুনেদি? (অংক পরীক্ষা দেবে সোমবার?)

ফাবিও: সি, এ ও আংকোরা চেন্তোভেন্তি পাজিনে দা লেজ্জেরে! (_____, আর এখনও আরও ১২০ পাতা পড়তে হবে!)

তু: মি পিয়াচ্চোনো ই মিয়েই নুওভি ইনসেনিয়ান্তি।(আমাদের নতুন টিচারদের আমার ভালো লাগে।)

ফাবিও: কোয়ান্তি আন্নি আ ইল তুও নুওভো ইনসেনিয়ান্তে দি মাতেমাতিকা (তোমার নতুন টিচারের বয়েস কত?)

তু: নন লো সো। ফোর্সে কোয়ারান্তা। এ ব্রাভা!(জানি না। হয়তো চল্লিশ। উনি খুব ভালো!)

তোমার আর ফাবিওর এই সব কথাবার্তার মধ্যে সিনিওরা রোসিনি হঠাৎ হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লেন।

সিনিওরা রোসিনি: সি পার্লা বেনে ইতালিয়ানো, রাগাৎসো মিও!(তুমি ভাল ইতালিয়ান বল, মাই বয়!)

তু: গ্রাৎসিয়ে সিনিওরা রোসিনি। পার্লো পোকো মা কাপিস্কো দি পিউ।(________মিসেস রোসিনি। বলি কম তবে বুঝি বেশি।)

সিনিওরা রোসিনি: কোয়ান্তে লিংগুয়ে পার্লি?(কতগুলো ভাষা বল তুমি?)

তু: ত্রে, ইতালিয়ানো, ইঙ্গলেসে এ বেঙ্গালি।(______,______,ইংরেজি ও__________।)

সিনিওরা রোসিনি: এ কোয়াল এ লা তুয়া লিঙ্গুয়া মাদ্রে? (আর কোনটি তোমার মাতৃভাষা?)

তু: ইল বেঙ্গালি।(বাংলা)

এমনি করে গল্প করতে করতে আউতোবুস চলল স্কুওলার দিকে। স্ত্রাদা প্রায় ফাঁকা। সেই ফাঁকা রাস্তায় কেউ কেউ তাদের কানে- কে নিয়ে হাঁটতে বেরিয়েছে। আলবেরো- গুলো ভার্দে পাতায় ঢাকা। সত্যি, রোমা শহরটা খুবই সুন্দর।

তা বলি কি, যতক্ষণ স্কুওলায় না পৌঁছচ্ছ, এতক্ষণ যা যা কথা হল, তার থেকে কী বুঝলে তা নিয়ে একটু না হয় কুইজ হয়ে যাক। যেমন ধরো, তোমাদের দু জন আউতিস্তা আছেন, একজনকে বলছ সিনিওরা আর অন্য জনকে বলছ সিনিওর। কেন বল তো? ঠিক ধরেছ। মহিলা হলে সিনিওরা, আর ভদ্রলোক হলে সিনিওর।

আচ্ছা বেশ, তা হলে এবার বল দেখি, এই কথাগুলোর ইতালিয়ান কী হবে :**ইশকুল, বাস, রাস্তা, কুকুর, গাছ, সবুজ, ড্রাইভার ,নতুন,বয়, পৃষ্ঠাগুলো ,ব্যাকপ্যাক।**

আর এই ইতালিয়ান শব্দগুলোর মানেই বা কী :**কোমে, মাতেমাতিকা, পার্লা, পার্লো, পার্লি ,লিঙ্গুয়া, লিঙ্গুয়ে, ইনসেনিয়ান্তি, ইনসেনিয়ান্তে ,চেন্তো, ভেন্তি, কোয়ারান্তা ,মাদ্রে।**

সব ক্লু আজকের কথাবার্তার মধ্যেই আছে। একটু মন দিয়ে দেখলেই পাবে।

আজ তবে এই পর্যন্ত। দেখা হবে স্কুওলাতে। বুওনা জোর্নাতা ,চি ভেদিয়ামো (হ্যাভ আ নাইস ডে ,সি ইউ লেটার)

ও হ্যাঁ, ভুলেই গিয়েছিলাম। আগের বারের ধাঁধার উত্তর :**এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ**। কী বলছ, আজও একটা হবে নাকি? বেশ, তাহলে হয়েই যাক। উত্তর তো

জানই কোথায় পাঠাতে হবে। এই জয়ঢাকের দপ্তরে, আবার কোথায়। ভেবে বল দেখি ,এগুলো কী :

লুনেদি, মার্তেদি, মের্কোলেদি,জোভেদি,ভেনের্দি,সাবাতো, দোমেনিকা।

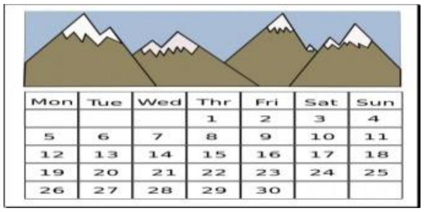

আর এই যে, আজকের কথাবার্তা, রোমান হরফে-

Tu : Ciao Fabio, come va?
Fabio :Benone! Studio molto in questi giorni!
Tu : Dai l’esame di matematica lunedi?
Fabio :Si, e o ancora centoventi pagine!
Tu : Mi piacciono I miei nuovi insegnanti.
Fabio :Quanti anni ha il tuo nuovo insegnante di matematica?
Tu : Non lo so. Forse quaranta. È brava!
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
Signora Rossini :Si parla bene italiano, ragazzo mio!
Tu :Grazie signora Rossini. Parlo poco ma capisco di più.
Signora Rossini :Quante lingue parli?
Tu :Tre, italiano, inglese e bengali.
Signora Rossini :E qual è la tua lingua madre?
Tu: Il Bengali.

চলবে

একটি ভদ্রতার প্রশ্ন

অমিত দেবনাথ

বাড়িটা পুরোন। এ পাড়ার সব বাড়িই তো পুরোন দেখছি। গেটটা ঠেলতেই ক্যাঁ-চ করে উঠল। শব্দটা বহুক্ষণ বাদে শুনলাম। আমার জুতোটা আর শব্দ করছে না। অনেকক্ষণ ধরেই করছে না অবশ্য। সেনসাসের কাজ করতে গেলে জুতোর শব্দ টব্দ খুব তাড়াতাড়িই উধাও হয়ে যায়।

গাড়িবারান্দা পেরিয়ে, সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠলাম। হয়রান হয়ে গেছি সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে। বেল বাজালাম। হয়রান হয়ে গেছি বেল বাজাতে বাজাতে। ভেতরে পায়ের আওয়াজ পেলাম। হয়রান হয়ে গেছি পায়ের আওয়াজ পেতে পেতে।

এক ব্যাপার, একই জিনিস- ভাবলাম আমি ঐ আসছে- আরেকখানা নাক।

সত্যি কথা, হয়রান হয়ে গেছি নাক গুনতে গুনতে।

আপনারা সমঝদার মানুষ, নিশ্চয়ই বুঝবেন ব্যাপারটা। সারাদিন হাঁটুন। বগলে নিন একখানা ভারি ব্যাগ। একই বোকা বোকা প্রশ্ন করে যান বারবার-শতবার। প্রশ্ন করা শেষ। কিন্তু শেষ করে কী হল? কী পেলেন আপনি? কোন ভ্যাকুয়াম ক্লিনার বেচলেন না। কোন চিরুনি বেচলেন না, কোন জুতোর ফিতে বেচলেন না। তাহলে কী হল ব্যাপারটা? কী করলেন আপনি? পেলেনই বা কী?

পেলেন চারখানা সেন্ট। সেনসাসের কাজে নাক গুনলেন, সেন্ট পেলেন চারখানা। আর উন্নতি? লবডঙ্কা। আঙ্কল স্যাম তো আর আপনাকে তাঁর অফিসে ডেকে পাঠাচ্ছেন

না। চেয়ারে বসিয়ে একখানা চুরুট এগিয়ে দিয়ে বলছেন না, "সাবাস ছোকরা! বাড়ি বাড়ি ঘোরার কাজটা বেশ ভালই করছ শুনলাম। আর তোমাকে ঘুরে ঘুরে কাজ করতে হবে না হে! তুমি এখন থেকে এখানে বসবে, এই ডেস্কটায়, বুঝলে! "

না স্যার, ওসব হওয়ার নয়। সারাদিন ঘুরে কাজ করার পরই আপনি পেয়ে যাবেন পরের দিনের লিস্ট, নাক গুনতির। নাক প্রতি চার সেন্ট, বড় নাক, ছোট নাক, বোঁচা নাক, খাঁদা নাক, লাল নাক, নীল নাক। নাক দেখতে দেখতে আর গুনতে গুনতে শেষটায় আপনার হয়ে যাবে নাকাতঙ্ক। ইচ্ছে হবে, দরজা খুলে আরেকটা নাক বেরোলেই সেই নাকে একখানা ঘুষি চালিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ার।

এখন অবশ্য আমি দাঁড়িয়ে আছি এই পুরোন বাড়িখানার দরজার সামনে, আরেকখানা নাক বেরোনর অপেক্ষায়। বেরোল একটা তীক্ষ্ণ চঞ্চু, তার সঙ্গে একটা অতিসাধারণ মুখ, তার সঙ্গে একখানা গিন্নিবান্নি চেহারা। অতি সাধারণ। নাকটা বাতাস শুঁকলো খানিকক্ষণ, যেন বুঝে নিতে চাইল ব্যাপারখানা কী।

" কী চাই?"

"আমি মার্কিন সরকারের থেকে আসছি ম্যাডাম। সেনসাসের কাজ করছি। জনগণনার। "

"ও, সেনসাস নিচ্ছেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, ম্যাডাম। ভেতরে এসে যদি দুয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতাম- "

সারাদিন ধরে চলছে এই এক বাঁধা বুলি। এক প্রশ্ন, শুধু লোকগুলোই পাল্টে যাচ্ছে, এই যা।

"আসুন। "

ভেতরটা অন্ধকার। একটা হলঘর। একটা বৈঠকখানা। একটা বাতি জ্বলে উঠল, যখন আমি ভারি পোর্টফোলিওটা টেবিলে রেখে ফর্মটা বার করলাম।

মহিলা দেখছিল আমার ভাবলেশহীন মুখ। আটপৌরে গিন্নির মুখ। যতই বাড়িতে সেলসম্যান আসুক এনসাইক্লোপিডিয়া বেচতে, বা বিল নিতে, একটা চোখ ঠিক লেগে থাকবে কিচেন স্টোভের দিকে। বাদ দাও। পঁয়তিরিশখানা প্রশ্ন করতে হবে এখন। বাঁধা বুলি। ফর্মখানা বাগিয়ে ধরলাম। টিক মেরে গেলাম স্ত্রী পুরুষ, জাতি ইত্যাদি সংক্রান্ত বক্সগুলোয়। ঠিকানা লিখলাম। তারপর শুরু করলাম বাঁধা বুলি।

"নাম?"

"লিজা রোরিনি। "

"বিয়ে করেছেন না একা?"

"একা। "

"বয়স?"

"চারশো সাত। "

"কত বললেন?"

"বললাম তো, চারশো সাত। "

ঠিকই আছে। সারাদিন ধরে ঘুরে বেড়ালে এইরকমই হবে তো। আমি আরেকবার তাকালাম মুখটার দিকে। সে মুখ একই রকম, ভাবলেশহীন। ঠিক আছে। তাড়াতাড়ি কর, পালা চুকিয়ে দাও ঝটপট।

"পেশা?"

"আমি একজন ডাইনি।"

"অ্যাঁ? কী বললেন?"

"বললামই তো। ডাইনিগিরি।"

চার সেন্ট মজুরিতে একাজ পোষায় না। আমি এমন ভান করলাম যেন উত্তরটা লিখে নিচ্ছি তারপর চলে গেলাম পরের প্রশ্নে।

"কাজটা করা হয় কার জন্য?"

"নিজের জন্যই করি। তবে মালিক আছে একজন।"

"মালিক?"

"শয়তান মেকরাট্রিগ। শয়তান।"

চার সেন্ট তো দূরের কথা। দশ সেন্টেও এ কাজ পোষাবে না। লিজা রোরিনি, বয়স চারশো সাত, পেশায় ডাইনি, কাজ করে শয়তানের অধীনে। না না, পঞ্চাশ সেন্টও একাজের জন্য যথেষ্ট নয়।

"ঠিক আছে। ধন্যবাদ। এইটুকুই জানার ছিল। চলি।"

মহিলা গা করল না মোটে। কাগজগুলো গুছিয়ে নিলাম, ভাঁজ করে ব্যাগে পুরলাম, টুপিটা নিলাম, উঠে দাঁড়ালাম, দরজার দিকে পা চালিয়ে দিলাম।

দরজাটা লোপাট।

কী করব বলুন। দরজাটা লোপাট। মানে নেই।

অথচ ছিল দরজাটা, মিনিটখানেক আগেও। সাদামাটা একটা দরজা, সাদামাটা বসার ঘরে যেরকম থাকে। একপাশে একখানা আর্মচেয়ার, আরেকপাশে একখানা টেবিল। তা, আর্মচেয়ার আর টেবিল দুটো দিব্যি আছে নিজেদের জায়গায়, কেবল মাঝখানের দরজাটাই নেই।

অন্যদিকটা দেখলাম। হয়তো ওদিকে আছে। কিন্তু ওদিকে নেই। ঘর আছে, কিন্তু দরজা নেই।

ঠিক আছে। এরকমই হবে তো। সারাদিন রোদ্দুরে রোদ্দুরে ঘোরা তো কারোর পক্ষেই ভাল নয়। ভাল যে নয় তার একটা প্রমাণ ঐ নাকাতঙ্ক। তারপর ভুলভাল উত্তর শোনা। তারপর ঘরের দরজা খুঁজে না পাওয়া। বোঝা গেছে ব্যাপারটা। আমি মহিলার দিকে ঘুরলাম।

"ম্যাডাম, দরজাটা যদি একটু দেখিয়ে দেন, আমার আরো কাজ আছে-

"দরজা তো নেই।"

আশ্চর্য! এতক্ষণ অবশ্য আমি ওর গলা খেয়াল করিনি। সে গলার আওয়াজ চাপা, কিন্তু তীক্ষ্ণ। উত্তাপহীন সে আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। কেমন যেন লাগছে। মজা করছে নাকি মহিলা আমার সঙ্গে?

"কিন্তু- "

"আমি চাই আপনি আরেকটু থেকে যান। আমার কপাল ভাল যে আপনি এসে পড়েছেন।"

আপনি এসে পড়েছেন! একটা ডাইনি বলছে এটা! কিন্তু ও তো ডাইনি নয়। ডাইনি বলে কিছু নেই।

কিন্তু এ ঘরে দরজাও যে নাই।

এতক্ষণ দেখিনি, এবার দেখতে পাচ্ছি ফায়ারপ্লেসটা। আমার পেছনে। দাউদাউ করে জ্বলছে তার শিখা। তার ওপরে একটা লোহার পাত্র বসানো আছে। মহিলা ঝুঁকে পড়েছে সেদিকে। দেয়ালে পড়েছে তার ছায়া।

বাপস্! কী বড়ো, আর কী কালো সেই ছায়া! এক মহিলার ছায়া, বিশাল আর কালো, গুঁড়ি মেরে এগোচ্ছে দেয়াল বেয়ে। আমি লিজা রোরিনির দিকে তাকালাম। এখনো ওকে এক আটপৌরে গিন্নির মতই লাগছে। কালো চুল, পাতা কাটা, মাঝখান দিয়ে সিঁথি। ছিপছিপে চেহারা, বয়সের ভারে ন্যুব্জ হয়নি।

চারশো সাত বছর বয়স-

চুলোয় যাক। ওর মুখটা আবার দেখলাম। তীক্ষ্ণ নাক, আটোসাঁটো মুখ, চেরা চোখ, কিন্তু একেবারে সাদামাটা। একেবারেই সাদামাটা শুধু ঐ অগ্নিকুন্ডের আলোতে ওর লালচে মুখে একটা চতুর ছাপ পড়েছে। শেয়ালের মত ধূর্ততার ছাপ। সেই লালচে মুখ এখন হাসছে, ঝুঁকে পড়েছে অগ্নিকুন্ডের ওপর, পাত্রটা তুলে আনার জন্য।

"এক কাপ চা খাও আমার সঙ্গে।"

"না না, এখন আর চা খাব না-"

"চা হয়ে গেছে। বসো, ভালোমানুষের ছেলে, বসো। পাত্রটা তুলে আনি আগুন থেকে।"

পাগল মহিলা। পাগল পুরো। আগেকার দিনে-মধ্যযুগে এইসব পাগলী বুড়িগুলোকেই খোঁটায় বেঁধে লোকজন পুড়িয়ে মারত। হাজার হাজার কুচ্ছিত বুড়িকে পোড়াত ওরা এইভাবে। সব পাগলা ছিল। সব। সুস্থ মস্তিষ্কের ছিল না কেউ। পাগল ভেবেই পুড়িয়ে মারত। ডাইনি বলে কিছু হয় না, কিচ্ছু না-

শুধু ভয় লাগছে কেমন যেন।

ও হাসছে আমার দিকে তাকিয়ে। একটা থাবা-মানে হাত আর কি-হাত বাড়িয়ে ধরে আছে কাপটা। বাদামি ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে সেই কাপ থেকে। ডাইনির চা। খেয়ে নাও, তারপর-

ধ্যাৎ! কী সব ভাবছি আমি! বোকার মত চিন্তাভাবনা সব। কী হবে কী ওই চা খেলে? যত্তসব।

চারধারটা দেখলাম একবার দরজাটা খোঁজার জন্য। নেই। চারিদিক অন্ধকার।

আগুন কিন্তু জ্বলছে। টকটকে লাল সেই আগুন। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি না বটে, কিন্তু আগুন জ্বলছে। গরম হয়ে গেছে ঘরের ভেতরটা। তাহলে চা-টা খেয়ে বেরিয়ে পড়া যাক।

ওর হাতেও অবশ্য কাপ রয়েছে একটা। চায়ের কাপ। তাহলে এতে বিষ নেই বোধহয়। ও বোধহয় কিছু মেশায়নি। ডাইনিরা কি মেশায়, অ্যাঁ? শেকড়বাকড়? ম্যাকবেথে পড়েছিলাম যেন। তখন ওরা এসবে বিশ্বাস করত। পাগলের দল।

তাহলে চা-টা খাওয়া যাক। হয়তো চা খাওয়া হয়ে গেলেই ও আমাকে দরজাটা দেখিয়ে দেবে। কথাবার্তা বলতে বলতে চা-টা খেয়ে নিই, তারপর বেরিয়ে পড়ি। সেটাই ভাল হবে।

"লোকজন বেশি আসে না এখানে," পাগলীটা বলল নরম সুরে। টেবিলের ওপাশে, আমি দেখতে পাচ্ছি, ও তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমি হাসি টেনে রাখলাম মুখে।

“আগে আসত । এখন ব্যাবসা খারাপ যাচ্ছে। ”

“ব্যাবসা?”

“ডাকিনিবিদ্যার ব্যাবসা। মায়াজাল। এখন আর এই ব্যাবসা চলছে না গো। কেউ এখন আর এসবে বিশ্বাসই করতে চায় না। কতদিন যে জাদু-পানীয় বানাইনি, কতদিন যে মায়াপুতুল বানাইনি। কত্তদিন। ”

“মায়াপুতুল?”

“মায়াপুতুল জান না? ছোট ছোট পুতুল গো, মোমের তৈরি। তোমার শত্তুর থাকলে তার নাম করে পিন ফুটিয়ে দাও, সে মরবে। কিন্তু মানুষ এখন আর কাউকে মারতেই চায়না। হিংসাই করে না কাউকে। কতদিন যে কাউকে পিন ফুটিয়ে মারিনি। ব্যাবসায় মন্দা যাচ্ছে খুব। ”

তা অবশ্য ঠিক। ব্যাবসায় মন্দা যাচ্ছে যখন, কারবার গুটিয়ে ফেললেই হয়। শুধু শুধু ঝাঁপ খুলে রেখে লাভ কি? উদ্যমী মহিলা, সন্দেহ নেই।

কিন্তু আমার হাতটা কাঁপছে যে? চা-টা পড়ে যেত আরেকটু হলেই।

“কত ভাল ভাল কায়দা কানুন জানতাম- কিন্তু তুমি চা-টা খাচ্ছ না যে?”

ফাঁসীর আসামীকে ব্রেকফাস্ট দেওয়া হয়েছে। খাও, খাও, কাজে দেবে।

“চা-টা খেয়ে নাও। ”

মুশকিলের ব্যাপার নয়? আমার মগজ বলছে চা-টা খেয়ে নিতে। না খেলে প্রমাণ হবে কী করে যে মহিলাটা পাগলা? না খেলে প্রমাণ হবে কী করে যে আমার মাথা ঠিকই আছে, ডাইনি-ফাইনি সব ফালতু, এটা খেলে আমার কিস্যু হবে না? কিন্তু মুশকিল

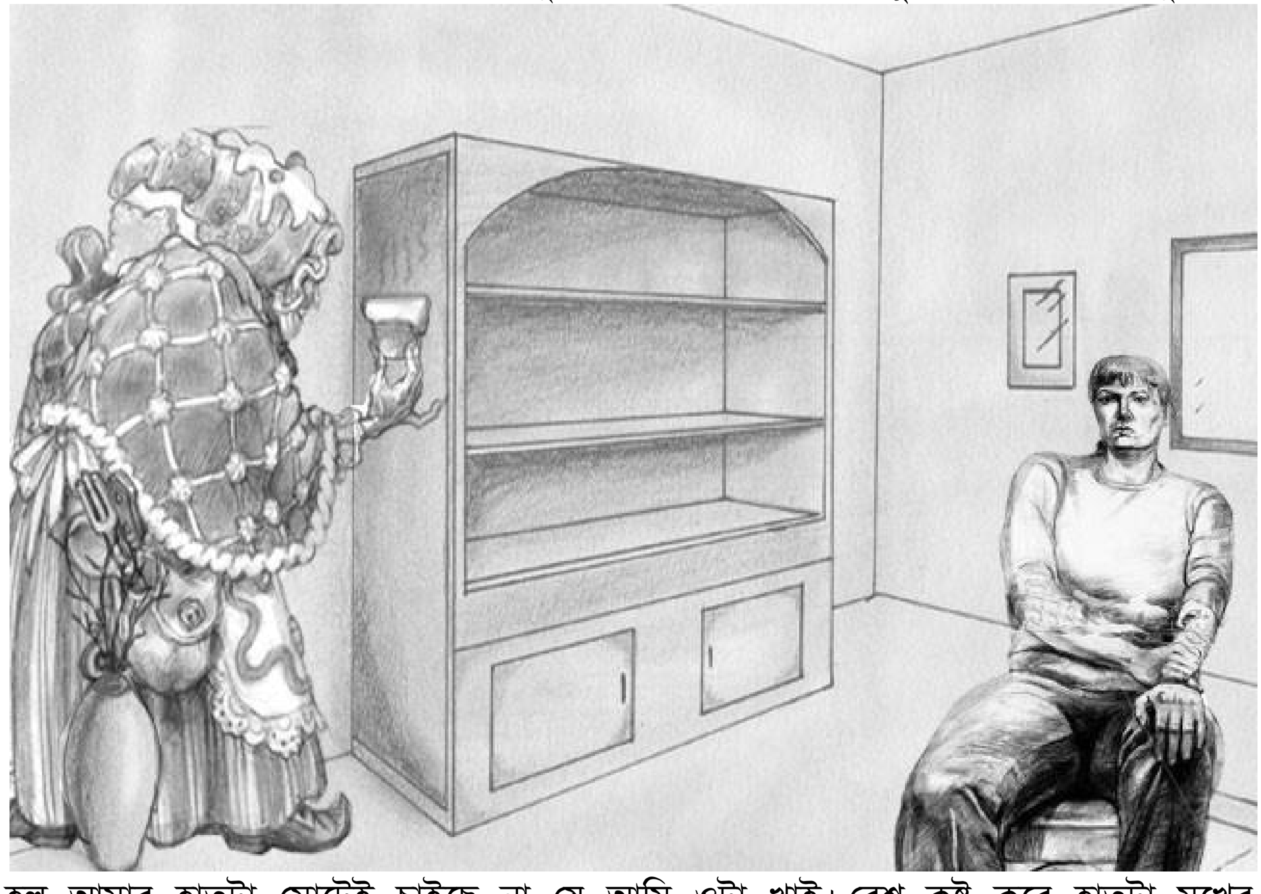

হল, আমার হাতটা মোটেই চাইছে না যে আমি ওটা খাই। বেশ কষ্ট করে হাতটা মুখের কাছে নিতে হল। মহিলা নজর রাখছে আমার ওপর, আমার চুমুক দেওয়ার ওপর।

চা-টা তেতো, বিস্বাদ, কিন্তু উষ্ণ। কোনদেশী চা কে জানে, তবে চিনা চা নয় নিশ্চয়ই। গলা দিয়ে চা-টা নামল স্বাভাবিকভাবেই, তবে একটা বিশ্রী স্বাদ-

"তুমি আমাকে অবাক করলে, ভালমানুষের ছেলে। আমি এতগুলো কথা বললাম, তোমার তো কোন আগ্রহই দেখছি না। এমন তো নয় যে তুমি রোজই একটা করে ডাইনি দেখছ।"

এরপর কিছু একটা না বললেই নয়।

"না না, আগ্রহ আছে বইকি," আমি বললাম, "তবে আরেকদিন। আজকে আমার অনেক কাজ আছে। আরো অনেকগুলো বাড়ি যেতে হবে। চায়ের জন্য ধন্যবাদ।"

বলছি আর খুঁজছি দরজাটা। আগুন জ্বলছে এখন ঘরের মধ্যে-তবে শুধু ঘরেই নয়, আগুন জ্বলছে আমার মাথাতেও। এটা সেই গরম চায়ের ধাক্কা কিনা বুঝতে পারছি না, লাল আগুনে ঘরের মধ্যে তৈরি হয়েছে অদ্ভুত ছায়ামায়া, আর তারা নাচছে সারা ঘর জুড়ে, সেই ছায়ামায়ার দল নাচন জুড়েছে আমার মাথায়, আমার চোখের সামনে, সেই ছায়ামায়ার দল অবরুদ্ধ করে রেখেছে দরজাটাকে আমার চোখের সামনে থেকে। চেষ্টা করলে এখনও দরজাটা খুঁজে বার করা যায়। দরজা আছে এঘরে, দরজা কখনও উধাও হয়ে যেতে পারে না। শুধু আমি এটা দেখতে পাচ্ছি না।

যদিও আমি ওকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। ঐ মহিলাকে। ওর আটপৌরে চেহারাটা এখন আরো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ওর মুখে হাসি। বয়সের ছাপহীন মুখে সেই হাসি জীবনমরণের সীমানা ছাড়িয়ে চলে গেছে আরো দূরে। এ হাসির সঙ্গে তুলনা করা যায় একমাত্র নরকরোটির-

এত কিছু দেখতে পাচ্ছি, শুধু দরজাটা ছাড়া-

"এবার আমাকে যেতেই হবে," বললাম আমি। ওর চোখ বোঁজা, যদিও সেই চোখে রয়েছে লাল আগুন আর কালো ছায়া।

আমি উঠে দাঁড়ালাম।

মানে ওঠার চেষ্টা করলাম।

একবার একটা পার্টিতে নয় বোতল ভদকা খেয়ে যখন বাড়ি যাওয়ার জন্য উঠেছিলাম দেখেছিলাম আমি মেঝেতে চিৎপাত হয়ে শুয়ে আছি। আর এখন আমি খেয়েছি মাত্র এক কাপ চা, আর তাতেই আমি যখন উঠলাম-

-দেখলাম আমি উঠছি।

মানে উ-ড়-ছি। ভাসছি হাওয়ায়। আমার পা মাটিতে নেই। তারা বাতাসে ভর করে রয়েছে, যে বাতাস তৈরি হয়েছে লাল আগুন আর কালো ছায়া দিয়ে। পানীয়র প্রভাবে আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চনমন করছে। সে পানীয় ভদকার থেকেও কড়া। কেউ যেন পিন ফোটাচ্ছে আমার সারা শরীরে।

"আমি-"

"এখন যেও না গো," নিরুত্তাপ গলা মহিলার, যেন আমার অবস্থা সে মোটেই খেয়াল করছে না। তার হাসিটা অবশ্য বুঝিয়ে দিচ্ছে সে বেশ ভালই খেয়াল করছে।

"এখন যেও না গো," বলছে লিজা রোরিনি, "আমার এখানে লোকজন বেশি আসে না। তোমাকে আমার সঙ্গে আজ রাত্তিরে একজায়গায় নিয়ে যাব।"

"আপনার সঙ্গে?"

"হ্যাঁ গো, এক জায়গায় যেতে হবে।"

“পার্টি আছে বুঝি?” আমার অবস্থাটা যেমনই হোক, উত্তরটা ঠিক বেরিয়ে এল আমার শক্ত হয়ে যাওয়া ঠোঁটের থেকে।

সে হাসল, ”তা বলতে পার। সেখানে আমার তোমাকে দরকার, ভদ্রতা রাখার জন্য। ”

ডাইনির ভদ্রতা! আমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? হাওয়ায় ভাসছি আর ডাইনির সঙ্গে ভদ্রতার কথা কইছি?

“দেখ, ” বলল লিজা রোরিনি, ”আমাদের কিছু নিয়ম মানতে হয়। তোমরা যেমন, ডিনার টেবিলে তেরোজন হলে বসবেই না। আমাদের আবার তেরোজন না হলে আসরই বসবে না। উনি পছন্দ করেন না। ”

“উনি?”

“শয়তান মেকরাট্রিগ। ” আবার হাসল সে।

বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল সেই কথা শুনে। অপেক্ষা করতে লাগলাম পরের কথাটার জন্য- যেভাবে কোন আসামী অপেক্ষা করে পরের চাবুকটা খাওয়ার জন্য।

“তোমাকে আমার সঙ্গে আজকের আসরে যেতে হবে, ” বলল লিজা রোরিনি।

“ডাইনির আসর ?”

“ঠিক। পাহাড়ের মাথায় বসবে। অনেকখানি রাস্তা যেতে হবে। তুমি তৈরি হয়ে নাও। ”

“উঁহু, আমি যাচ্ছি না। ”

বাতাসে ভাসছি আমি খলবল করতে করতে, আর বলছি আমি যাচ্ছি না। ঠিক যেমন তিন বছরের বাচ্চাকে তার মা বাবা ঘুম পাড়াতে পাঠালে সে বলে আমি যাব না। অবশ্য আমি বুঝতে পারছি আমার কী হবে। ওর হাসিতেই ধরা পড়ছে সেটা।

“তুমি যাচ্ছ। ম্যাগিট তোমাকে তৈরি করে দেবে। ”

ম্যাগিট এল। ঘরে কোন দরজা নেই, তবুও এল। ম্যাগিট জিনিসটা যে কী সেটা বুঝতে পারলাম না। হ্যাঁ, জিনিস। ছোটখাট, রোমশ চেহারা, খুব ছোট্ট ছোট্ট মানুষের মত হাতওয়ালা, আর একটা মুখ আছে। সেই মুখ মানুষের মত নয়, যদিও তাতে চোখ, কান, নাক, ঠোঁট সবই আছে। আর সেই মুখে আছে একটা হাসি আর নারকীয় ছাপ, যে ছাপ কোন মানুষ বা পশুর মুখেও দেখা যায় না।

মেঝের ওপর দিয়ে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে এল ম্যাগিট, বলল, “লিজা গিন্নীমা?” তীক্ষ্ণ সেই স্বর যেকোন মানুষের রক্ত জল করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

ম্যাগিট হচ্ছে- যা বুঝলাম, ডাইনির খাস চাকর। স্বয়ং শয়তান একে দিয়েছে ডাইনির কাজে সাহায্য করার জন্য। যদিও কোন বাস্তবতা দিয়েই একে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। দেখলাম, সেই কাল্পনিক জিনিসটা তুরতুর করে উঠে এল আমার গা বেয়ে, যদিও আমি এখনো হাওয়ায় ভাসছি। কল্পনার মধ্যেই দেখলাম, লিজা টেবিলের ওপরে রাখা একটা বয়াম থেকে বার করে দিল খানিকটা হলদেটে চটচটে বস্তু, ম্যাগিট দুটো ছোট থাবা দিয়ে সেটা আমার বুকে আর গলায় বেশ মালিশ করে দিল, মালিশ করে দিল আমার হাতে, পায়ে, সর্বাঙ্গে। দুঃস্বপ্নের মধ্যেই অনুভব করছিলাম আমার সারা শরীর জ্বলে যাচ্ছে সেই চটচটে বস্তুর প্রভাবে।

“ঐ হল উড়ুক্কু মলম, ”বলল লিজা রোরিনি। আমার শরীর কাঁপতে শুরু করল সেই কথা শুনে। “চল, এবার যাওয়া যাক। ”

এতক্ষণে খেয়াল করিনি, এইবার করলাম। লিজাও তার শরীরে মেখেছে উড়ুক্কু মলম। ওর শরীরে পোশাক নেই, তার বদলে আছে ওর মাথায় চুল, সারা শরীর ঢাকা পড়েছে বোরখার মত সেই চুলের আবরণে। ওর শরীরও এখন হাওয়ায় ভাসছে। এসে গেছে ঠিক আমার পাশটিতে।

সেই অবস্থাতেও আমার মাথায় একটা চিন্তা এল, যে ডাইনিরা নাকি ঝাঁটায় চড়ে উড়ে বেড়ায় বলে শুনেছিলাম, সেটা তাহলে কী? মনে পড়ে গেল, কোন একটা ম্যাগাজিনে একটা লেখা পড়েছিলাম, তার নাম ছিল "ওড়ার ভ্রান্তিবিলাস।" এই উড়ুক্কু মলমটা তাহলে বোধহয় সেই "ওড়ার ভ্রান্তিবিলাস।" সেই ব্যাপারটাই ঝাঁটায় এসে দাঁড়িয়েছে। পুরোটাই তাহলে কল্পনা নয়। এই মলমটা সত্যি। বাস্তব। কোন শক্তিশালী ওষুধ। অ্যাকোনাইট, বেলেডোনা বা ওইধরনের কোন কিছু দিয়ে তৈরি। এমন ওষুধ, যা কল্পনাশক্তিকে বাড়িয়ে দেয়। যেকোন কেমিস্টই এটা তৈরি করতে পারবে। তাহলে আজ রাত্তিরেই পাড়ার কোন দোকানে গিয়ে এটা তৈরি করতে দিলে হয়–

কিন্তু এখন আমার নেমে আসা দরকার।

পারছি না।

"আমার হাত ধর," সে আমার হাত ধরল শক্ত করে। যেন ইলেকট্রিক শক লাগল। এবার আমরা উঠছি। কোন দরজা নেই, তবুও তীব্র গতিতে বাইরে বেরিয়ে এলাম আমরা। ওর হাতে শক্ত করে ধরা আমার হাত। ম্যাগিট ভেসে চলেছে ওর সঙ্গেই। নীচে দেখা যাচ্ছে বাড়িটা। ডাইনির বাড়ি।

এবার আমরা ভেসে যেতে লাগলাম। শরীরে এখন আর কোন জ্বালা নেই। তীব্র বেগে বাতাস কেটে যাচ্ছে দুধারে। অনেক নিচে দেখা শহরের আলো। মিটমিট করে জ্বলছে সেই আলো, অন্ধকারকে দুরে সরিয়ে রাখার জন্য, যে অন্ধকারে শোনা যায় নেকড়ের গর্জন আর প্যাঁচার কর্কশ আওয়াজ, যে অন্ধকারে ঘুরে বেড়ায় মৃত অ-মৃতের দলবল।

কতক্ষণ উড়েছিলাম জানিনা, তারপর দেখলাম, আমরা নামছি। নামছি একটা পাহাড়ের মাথায়। একটা আগুন জ্বলছিল সেখানে। কতগুলো চেহারা গুঁড়ি মেরে বসেছিল সেখানে–কালো পাহাড়ের সামনে তাদের দেখাচ্ছে সাদা, আর আগুনের সামনে কালো। সংখ্যায় তারা এক, দুই, চার, ছয়, নয়, দশ, এগারো।

তার সঙ্গে আমি আর লিজা রোরিনি।

ডাইনিদের আসর।

তেরোজন।

অবশ্য আরেকটা জিনিসও ছিল। একটা কালো ছাগল। বলি দেওয়ার জন্য। বলির জন্য সেটাকে লিজা রোরিনিই টেনে নিয়ে গেল আগুনের সামনে একটা পাথরের কাছে। আরেকজন একটা ছুরি দিয়ে কেটে দিল সেটার গলাটা। আরেকজন একটা পাত্র ধরল তলায়। পাত্রটা যখন রক্তে বোঝাই হয়ে গেল, তখন সবাই মিলে সেই রক্ত খেল।

হ্যাঁ, বলছি তো, সবাই খেল। সব্বাই।

সারা গায়ে আবার শুরু হয়েছে সেই মলমের জ্বলুনি। মাথা থেকে পায়ের তলা পর্যন্ত। আমার দৌড়ে পালানো তো দূরের কথা, এই অগ্নিবৃত্তের সামনে থেকে নড়ার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই।

তারপর একটা ড্রাম বাজতে শুরু করল,আর সবাই মিলে সেই আগুনের চারপাশে ঘুরে ঘুরে নাচতে শুরু করল। ফাঁকা পাত্রটাতে গাদাগাদি করছিল সেই লোমশ জিনিসগুলো,প্রত্যেকের আলাদা আলাদা "ম্যাগিট",তাদের কিচিরমিচির শব্দ চাপা পড়ে যাচ্ছিল ড্রামের শব্দে,চিৎকারের শব্দে,কারণ নাচতে নাচতেই কাকে যেন ডাকছিল সবাই।

"লিজা আজ নতুন একজনকে এনেছিস দেখছি,"বলে উঠল একজন।

"মেগ আজ আসবে না। ওর জায়গায় এনেছি,"বলল লিজা রোরিনি।

এটা তাদের বলা শেষ বোধগম্য কথা,যেটা আমার কানে এল,কারণ তাদের চিৎকার এখন সপ্তমে উঠেছে,পালা দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে আগুনের শিখা।

অবশেষে তিনি এলেন।

কোন আলো জ্বলল না,কোন আগুনের শিখা তৈরি হল না,কোন নাটুকে ব্যাপারই নয়।

তিনি বেরিয়ে এলেন স্রেফ একটা পাথরের আড়াল থেকে,বগলে একখানা বড়ো খাতা,ঠিক ব্যাঙ্কের হিসেব পরীক্ষকদের কাছে যেরকম থাকে।

যদিও হিসেব পরীক্ষকরা এমন কালো হয় না। কোন কিছু দিয়েই এ কালোর তুলনা হয় না। চোখের তারা-কালো,আঙুলের ডগা কালো। তাঁর পোশাকটাও কালো,না একটা কালো ছায়া ঢেকে রয়েছে তাঁর শরীর,আমি বুঝতে পারলাম না। কিন্তু তিনি ঢুকতেই সবাই একবারে নিশ্চুপ হয়ে গেল। তিনি তাঁর খাতা খুললেন,সবাই তাঁকে ঘিরে দাঁড়াল। এবার তাদের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল। আমি গুঁড়ি মেরে বসেছিলাম একটা পাথরের সামনে। লিজা রোরিনি কথা বলছিল তাঁর সঙ্গে,আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছিল আমাকে। তিনি ঘাড়টাও ঘোরালেন না,কিন্তু আমি জানি,তিনি আমাকে দেখছেন। আমার দিকে তাকিয়ে হাসা,ঘাড় নাড়া বা হাত নাড়ানো-কোনটাই তিনি করেননি,কিন্তু আমি জানি,তিনি করেছেন।

তারপর কাজ শুরু হল। কাজ মানে আর কিছুই না,মিটিং। ব্যাবসার মিটিং। শয়তান অ্যান্ড কোম্পানির বোর্ড মিটিং হচ্ছে পাহাড়ের মাথায়। তিনি অর্ডার দেখছেন,শুনছেন সবার রিপোর্ট। কোথায় কটা আত্মা বিক্রি হল,কোথায় কী কী অশুভ কাজ হল-সব তিনি লিখে নিচ্ছেন তাঁর খাতায়। আমি কাঁপতে কাঁপতে দেখছিলাম সব কিছু,ছোট ছোট লোমশ জীবগুলো জড়ো হয়েছিল আমার পায়ের কাছে। যদিও কাঁপুনি লাগার মত কিছুই হচ্ছিল না,কারণ তাঁর কাজে ভয়ংকর কিছুই ছিল না,তিনি সব কিছুই করছিলেন নীরস,নিরুত্তাপভাবে। সেটাই আমার কাছে ভয়ংকর লাগছিল।

তারপর একটা ঘটনা ঘটল। সব সাদা মূর্তিগুলো চিৎকার করে উঠল কালো আকাশের দিকে তাকিয়ে,কারণ আমাদের মধ্যে উদয় হয়েছে আরো একজনের। আর সেটা হল-মেগ,যে ডাইনির আজ আসার কথা ছিল না। তাকে দেখেই এই সমস্বরে চিৎকার ,"মেগ! মেগ এসেছে!"

তারপর তিনি কথা বললেন। সেই কন্ঠস্বরের বর্ণনা দেব,এমন সাধ্য আমার নেই। ভয়াবহ বজ্রপাত,আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত,অতি তীব্র ঝড়ের শব্দ-কোন কিছু দিয়েই তুলনা চলে না সেই দানবিক স্বরের।

"আসরে আজ চোদ্দ জন।"

সবাই কাঁপতে শুরু করল সেই আওয়াজ শুনে। লিজা রোরিনি টলতে টলতে এগিয়ে এল আমার দিকে, আমাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল তাঁর দিকে, আমি বাধা দেওয়ার আগেই।

"আমি জানতাম মেগ আসছে না–"

"আসরে আজ চোদ্দ জন। চোদ্দ জন। "

কন্ঠস্বর বুঝিয়ে দিচ্ছিল তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন।

"কিন্তু আমি–"

"আমাদের একটা নিয়ম আছে। নিয়ম ভাঙলে শাস্তিও আছে। "প্রতিটি কথা কেটে কেটে মেপে মেপে বলা।

"ক্ষমা–"

ক্ষমা? ওঁর কাছে? আমি নিজের চোখেই দেখলাম। তিনি লিজার হাত ধরলেন, লিজা এক হাতে নিজের গলা চেপে ধরল। তারপর পাক খেয়ে পড়ে গেল মাটিতে, থরথর করে কাঁপতে লাগল খানিকক্ষণ শুলবিদ্ধ জন্তুর মত, তারপর স্থির হয়ে গেল।

তারপর তিনি আমার দিকে ঘুরলেন। তাঁর কালো চোখের কালো তারা স্থির হল আমার ওপর।

"তেরোজনই হতে হবে। ওই হল নিয়ম। কাজেই তুমি এখন লিজার জায়গা নিলে। সই কর। "

"আমি?"

অবশ্য তাঁকে প্রশ্ন করার মানেই হয় না।

তিনি তাঁর খাতাটা এগিয়ে দিলেন একজনের দিকে। সে আমার হাত ধরল। আরেকজন ধরল সেই পত্রটা। তারপর অনুভব করলাম ম্যাগিট উঠে আসছে আমার গা বেয়ে। তারপর সে আমার গালটা কামড়ে ধরল। ঝিরঝির করে রক্ত পড়তে লাগল পাত্রটার মধ্যে। সেই রক্তের মধ্যে ডোবান হল একটা তীক্ষ্ণ শলাকা। তারপর সেটা গুঁজে দেওয়া হল আমার হাতে।

"সই কর, "বজ্রনির্ঘোষ শোনা গেল তাঁর গলায়।

তারপর তিনি তাঁর কালো হাত বাড়িয়ে আমার হাত চেপে ধরলেন। তারপর একটা ঝড় বয়ে গেল আমার দেহের ওপর দিয়ে–

মাটিতে কে যেন একটা পড়ে আছে। কিন্তু এ তো লিজা রোরিনি নয়! চেনা চেনা লাগছে যেন শরীরটা। ও টা কি আমারই নাকি, অ্যাঁ?

"তোমার খ্রিষ্টধর্ম বাতিল করে দিলাম আমি–"বললেন তিনি।

ম্যাগিট কানের পাশে ফিসফিস করে বলল, ওড়ো এবার–"

ডাইনি লিজা রোরিনির বাড়িতেই ফিরলাম আমি। ঘুমোতে গেলাম দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে, যে ঘুম থেকে উঠলেই দেখব দুঃস্বপ্ন কেটে গেছে।

সকালে ঘুম ভাঙল।

আয়নার দিকে তাকালাম।

দেখলাম আয়নাতে লিজা রোরিনি, তাকিয়ে আছে আমার দিকেই।

ম্যাগিট কুটকুট করছে আমার পায়ের কাছে।

এ সবই এক সপ্তাহ আগের ঘটনা। এই এক সপ্তাহে ম্যাগিট আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। দেখিয়েছে লিজার খাতাপত্তর, তার শেকড়বাকড়। শিখিয়েছে কীভাবে মায়াপুতুল বানাতে হয়, কিভাবে শরীরকে বয়সের হাত থেকে মুক্ত রাখতে হয়, কিভাবে পানীয় বানাতে হয়, কিভাবে মলম বানাতে হয়। ম্যাগিট বলেছে আজ রাত্তিরে পাহাড়ের মাথায় আবার আসর বসবে।

প্রত্যেকটা জিনিসই আমার মনে পড়ে গেছে। এবার আমি বুঝতে পেরেছি ওই খাতায় সই করার সঙ্গে সঙ্গেই লিজা রোরিনির জায়গা নিয়েছি আমি। আমার আর মুক্তি নেই–

মুক্তি নেই, যদি না আমি লিজার পদ্ধতিটা প্রয়োগ করতে পারি। আর তা হল, আরেকজনকে ঐ আসরে নিয়ে যাওয়া–

এটাই একমাত্র রাস্তা।

আজ, ঠিক এক সপ্তাহ হল। সেনসাস অফিসের লোকেরা নিশ্চয়ই আমার খোঁজ করছে। ওরা নিশ্চয়ই অন্য লোক পাঠাবে, যে কাজ করবে আমার রাস্তাগুলোতেই। মনে হচ্ছে হার্ব জ্যাকসন দায়িত্বটা নেবে, কারণ ও এখানকার লোক। হয়তো আজ শেষ বিকেলেই ও এসে দরজায় ঠকঠক করবে, লিজা রোরিনির সঙ্গে কথা বলতে চাইবে।

ও যখন আসবে, আমাকে তৈরি থাকতে হবে।

তাহলে এখন জাদুপানীয়টা তৈরি করে ফেলা যাক।

[রবার্ট ব্লচ রচিত "এ কোশ্চেন অব এটিকেট" অবলম্বনে]

গ্রাফিক্সঃ শংখ করভৌমিক ও ইন্দ্রশেখর

সাদকো আর সাগর রাজকন্যা

আর্নল্ড শেপার্ডের ইংরিজি ভাষ্য
থেকে বাংলা রূপান্তর

দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

প্রাচীন ও মধ্যযুগের রাশিয়াতে "বিলিনি" নামের লোকগাথা ছিল একটা প্রচলিত গল্প বলার পদ্ধতি। বিলিনি শব্দটার অর্থ " আগে যা ছিল। " গায়করা গান করে করে শোনাতেন লোকগল্পের নায়কদের রোমাঞ্চে ভরা জীবনের কথা, তাদের অ্যাডভেঞ্চার, রাজারানিদের গল্প, রোমাঞ্চ , সমুদ্রযাত্রা আর যুদ্ধের রঙিন কল্পগল্প। এইসব বিলিনিদের মধ্যে সবসেরাদের একটা হল সাদকোর এই গল্প। সম্ভবত ১১৬৭ সালে নোভোগর্দ শহরের সবচেয়ে বড়ো গির্জাটার প্রতিষ্ঠা যিনি করেছিলেন সেই ব্যবসায়ী সোতকো সিতিনিচ- এর জীবন অবলম্বনেই এই গল্পের জন্ম। তবে সে সব কথা থাক। এসো গল্পটা শুনি।

অনেক অনেক দিন আগে নোভোগোর্দের বন্দর শহরে থাকত সাদকো নামে এক বাজনদার। প্রত্যেকদিন শহরের কোন না কোন রইস সাদকোর বাড়িতে নেমন্তন্ন করে পাঠাত, তাদের বাড়ির অনুষ্ঠানে তাকে গাইতে হবে। সাদকোও অমনি তার বারো তারের গুসলিটা হাতে

করে ছুট দিত রইসের বাড়ির দিকে। সেখানে তার তারের বাদ্য শুনে সব অতিথরা ভারী আনন্দে নাচ জুড়ত। তারপর, বাড়ির কর্তা তাকে পেট ভরে ভালোমন্দ খাইয়ে কয়েকটা রুবল গুঁজে দিত তার হাতে। সেইটুকু টাকাতেই সংসার চলত তার।

মাঝেমধ্যেই বন্ধুরা তাকে জিজ্ঞাসা করত, "অতটুকু আয়ে চলে কী করে তোর?"

"যাই বলিস ভাই ও টাকা আমার কাছে কম কিছু নয়," সাদকো জবাব দিত, "তাছাড়া রোজ রোজ ভোজসভায় খেতে পাওয়া, বাজনা বাজিয়ে অত লোককে আনন্দফুর্তি দেয়া, নাচানো—কজনের ভাগ্যে হয় বল?"

তার শহরকে নিয়ে সাদকোর গর্বের শেষ ছিল না। ভরভরন্ত বাজারের মধ্যে দিয়ে যখন হেঁটে যেত সে তখন সবসময় শুনতে পেত নানান দেশের কতরকম বুলি। তাতে নরওয়ে থেকে পারস্য সবজায়গার ভাষা আছে। বন্দরে গেলেই তার চোখে পড়ত, কাঠ, হাঁড়িকলসি, মশলা আর সোনারূপো নিয়ে পাল তুলে জাহাজেরা চলেছে পৃথিবীর কোণে কোণে। কখনো ভলকভ নদীর ওপরের বিরাট সেতুটা পেরোতে গেলে তার চোখে পড়ত দূরে সাদা সাদা গির্জাদের সোনালি চূড়ো রোদে চকচক করছে।

"এমন শহর দুনিয়ায় আর দুটো আছে নাকি?" নিজের মনেই বলত সে, "এমন ভালো জায়গায় ক'জন থাকতে পায়?"

তবু কখনো কখনো ভারী একলা লাগত সাদকোর। এ শহরে সবাই কত বড়োলোক। কোন মেয়েই যে তার দিকে ফিরে তাকায় না। তার বন্ধু নেই কোন।

একদিন এমনি একটা একলা একলা সন্ধেবেলা সাদকো ভলকভ নদীর ধারে ঘুরছিল। ঘুরতে ঘুরতে নিজের প্রিয় একটা জায়গায় এসে সে তার গুসলিটা হাতে করে বসল। সন্ধের হাওয়ায় নদীতে হালকা ঢেউ উঠছিল। চাঁদের আলোয় তার জল চিকচিক।

বসে থাকতে থাকতে সাদকো গুসলির একটা তারে সুর তুলল একটুখানি। প্রথমে দুঃখের সুর, তারপর শান্তির সুর, আর শেষকালে ভারী আনন্দের একখানা সুর। নদীর চাঁদ- ছলছল জলের ধারায় তার গুসলির সুর ভেসে ভেসে যাচ্ছিল।

হঠাৎ করেই নদী যেন জেগে উঠল। বড়ো বড়ো ঢেউ এসে আছড়ে পড়তে শুরু করল পাড়ের কাছে। তারপর তার মধ্যে থেকে একটা বিরাট লোক মাথা জাগাতে আরম্ভ করতে সাদকো ভয়ে চিৎকার করে উঠে চোখ বুঁজে ফেলল। চোখ খুলে সে দেখে তার সামনে একজন লম্বা চওড়া মানুষ দাঁড়িয়ে। তার গালে সমুদ্রশ্যাওলার লম্বা দাড়ি আর মাথায় মুক্তোর মুকুট।

"ওহে বাজিয়ে," বলে উঠল লোকটা, "আমি সমুদ্রের সম্রাট। এই নদীতে এসেছিলাম আমার এক মেয়ে, রাজকন্যা ভলকভার বাড়িতে। জলের তলা থেকে তোমার বাজনা শুনে ভারী পছন্দ হয়েছে আমাদের। "

"ধন্যবাদ মহারাজ," কোনমতে বলল সাদকো।

"আমি শিগগিরই আমার প্রাসাদে ফিরে যাব। আমি চাই তখন তুমি সেখানে একটা ভোজসভায় এসে বাজাও। "

"মহারাজের আদেশ শিরোধার্য," সাদকো জবাব দিল, "কিন্তু জায়গাটা কোথায়? যাবই বা কেমন করে?"

"সমুদ্রের তলায়। আর কোথায় হবে? আর রাস্তা তুমি ঠিকই খুঁজে নেবে। তবে বাজানোর পুরস্কারের জন্য অবশ্য তোমায় অপেক্ষা করতে হবে না। এই যে—"

বলতে বলতেই জল থেকে লাফ মেরে একটা সোনার আঁশওয়ালা মাছ এসে পড়ল সাদকোর পায়ের কাছে। তারপর তার চোখের সামনেই সেটা জমে গিয়ে একটা নীরেট সোনার মাছ হয়ে গেল।

"আপনি ভারী দয়ালু, মহারাজ।"

"অমন কথা বোলো না," সম্রাট জবাব দিলেন, "ভালো বাজনা সোনার চেয়েও দামি। দুনিয়াটা যদি ভালো হত তাহলে তুমি এতদিনে অনেক বড়োলোক হয়ে যেতে হে।" এই বলে সম্রাট এক লাফে জলের ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়ে হারিয়ে গেলেন।

পরদিন সক্কাল সক্কাল বাজারের দোকানপাট খুলতে না খুলতেই সাদকো সেখানে এসে হাজির। এক স্যাকরার দোকানে গিয়ে সে সোনার মাছটা বেচে দিল। তারপর টাকাপয়সা গুণে নিয়ে তাড়াতাড়ি বন্দরে এসে সেই দিনই নোভোগোর্দ থেকে রওনা হবার জন্যে জাহাজে একটা টিকিট কেটে ফেলল।

ভলকভের ভাঁটি বেয়ে জাহাজ তো চলল পাল খাটিয়ে। দেখতে দেখতে পেরিয়ে গেল লাদোগা হ্রদ, তারপর ফিনল্যান্ডের উপসাগর পেরিয়ে এসে পড়ল একেবারে বালটিক সাগরে। সমুদ্রের নীল জল কেটে তরতরিয়ে জাহাজ ছোটে আর সাদকো তার রেলিঙের পাশে দাঁড়িয়ে জলের দিকে তাকিয়ে থাকে।

দেখতে দেখতে হঠাৎ সে নিজের মনেই বলে, "এতবড়ো সমুদ্রটায় রাজপ্রাসাদ খুঁজে পাই কী করে?"

অমনি ছুটতে ছুটতে জাহাজ গেল এক্কেবারে থেমে। হাওয়ায় তার পালে টান লাগাচ্ছে, কিন্তু তাকে যেন কোন দৈত্য এসে চেপে ধরে আছে জলের সাথে। মোটেই সে নড়েনা একচুল। জাহাজের লোকজন তো ভয়েই অস্থির। এ আবার কী বিপত্তি হল। হঠাৎ ক্যাপ্টেন চিৎকার করে বলে, "এ নিশ্চয় সমুদ্র সসম্রাটের কাজ। বোধ হয় আমাদের মধ্যে কাউকে তিনি চান।"

"ভাববেন না ক্যাপ্টেন," হঠাৎ সাদকো বলে উঠল, "আমি জানি সম্রাট কাকে চান।" এই বলে গুসলিটা হাতে ধরে সে রেলিং বেয়ে উঠতে শুরু করল।

"ধরো ছোঁড়াকে," ক্যাপ্টেন হাঁক পাড়ল।

কিন্তু তাকে কেউ এসে ধরবার আগেই সাদকো রেলিঙের মাথায় উঠে ঝাঁপ মেরেছে সমুদ্রে, আর সঙ্গেসঙ্গেই তলিয়ে গেছে তার অতলে।

ডুবতে, ডুবতে,ডুবতে—সাদকো গিয়ে পৌঁছোল সমুদ্রের একেবারে তলায়। মাথার ওপর জলের ভেতর দিয়ে অনেক উঁচুতে সূর্যের হালকা লালচে আলো দেখা যায়, আর তার সামনে জলের নিচে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট এক পাথরের প্রাসাদ।

প্রবালের তৈরি তার সিংদরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে এল সাদকো। রাজপ্রাসাদের দরজার কাছে পৌঁছোতে নিজেনিজেই খুলে গেল সেই বিরাট দরজার পাল্লাদুটো। পেছনে তার এক হলঘর। সেখানে হাজারো অতিথ জড়ো হয়েছে। রয়েছে হেরিং, স্প্র্যাট, কড, ফ্লাউন্ডার, গবি, স্টিকলব্যাক, স্যান্ড ইল, সাগরবিছের দল। রয়েছে কাঁকড়া আর গলদা চিংড়ি, তারামাছ আর স্কুইড, সমুদ্র কাছিম আর বিরাট স্টার্জনেরাও।

সেই অতিথিদের মাঝখানে ভিড় করে ছিল নদীর জলকন্যার দল, তারা সব এ রাজ্যের রাজকুমারী। হলের একধারে ঝিনুকের বিরাট সিংহাসনে বসে ছিলেন সম্রাট আর সাম্রাজ্ঞি।

"একেবারে ঠিক সময়ে এসে পৌঁছে গেছ হে," সম্রাট তাকে দেখে বলে উঠলেন, "এসো এসো, আমার পাশে বোসো দেখি। নাচ শুরু হোক।"

সাদকো জুত করে বসে গুসলিতে ধরল এক মজাদার সুর। তার তালে তালে সব অতিথি মাছের দল নেচে নেচে সাঁতার জুড়ল তার চারপাশে। তাদের রূপ বলে বোঝানো যাবে না। সাগরতলের বালিতে যাদের বাস তারাও মেঝের ওপর নাচ জুড়ে দিয়েছে ততক্ষণে। আর তালে তালে তুড়ুক লাফে পাক খাচ্ছে রাজকুমারী জলকন্যারা।

"চমৎকার সুর তো রে," বলতে বলতে এইবার সম্রাট উঠে নাচের দলে ভিড়ে গেলেন। হাত দুলিয়ে, চুল উড়িয়ে, রাজপোশাক ফাঁপিয়ে পা ঠুকে ঠুকে সে কী নাচ তাঁর।

"আরো তাড়াতাড়ি" সম্রাট বলে উঠলেন এবারে, "বাজাও বাজাও হে—"

অমনি সাদকো বাজনার তাল দিল দুগুণ করে। তারপর তাল বাড়াল চারগুণ –আটগুণ গতিতে। সম্রাটের নাচের গতিও বেড়ে উঠল সেই সঙ্গেসঙ্গে। আরো জোরে জোরে লাফ দিয়ে , পাক খেয়ে তিনি নেচে চলেছেন। বাকি সবাই তখন নাচ থামিয়ে তাই দেখছে শুধু হাঁ করে।

হঠাৎ সাম্রাজ্ঞি কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, "বাজনা থামাও বাজনদার। ভাবছ বুঝে সম্রাট শুধু এইখানেই নাচছেন? ও নাচের তালে তালে বাইরের সমুদ্রে তুফান উঠেছে। বড়ো বড়ো রাক্ষুসে ঢেউ খেলনার মত লোফালুফি করছে মানুষদের জাহাজ নিয়ে। পাড়ে আছড়ে পড়ছে পাহাড়ের মতন সব ঢেউ। "

ভয় পেয়ে সাদকো করল কি , গুসলির একটা তার ধরে এমন জোরে টানল যে সেটা গেল পটাং করে ছিঁড়ে। সে তখন মুখটা করুণ করে বলে, "সম্রাট, আমার যন্ত্রের তার ছিঁড়ে গেছে। "

"ভারী লজ্জার কথা," নাচ থামাতে থামাতে রাজা বলে উঠলেন, "এমন বাজনা হলে আমি দিনের পর দিন একটানা নেচে যেতে পারি, বুঝলে? তবে তুমি বড়ো ভালো ছেলে হে সাদকো। ভাবছি আমার একটা মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়ে এইখানেই রেখে দেব তোমাকে। "

"সম্রাট," সাদকো সাবধানে বলল, "জলের নীচে আপনার কথাই আইন। কিন্তু এ তো আমার নিজের দেশ নয়। আমি তো আমার নোভোগোর্দকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি। "

"ও কথা আর মোটেই মুখে এনো না," বললেন সম্রাট, "এখন মনের মত একটা কনে বেছে ফেলো দেখি বাপু। কই হে আমার রাজকন্যেরা, একটু এগিয়ে এসো দেখি এদিকে। "

অমনি নদীর জলকন্যারা সাদকোর সামনে এসে হাজির। তাদের একজনের চেয়ে আরেকজন বেশি সুন্দর। রূপের ঝলকে চোখ ঝলসায়। কিন্তু সাদকো কেবল মুখ গোমড়া অরে বসে থাকে। কারো দিকে চোখটি তুলে তাকায় না।

"কী হল হে বাজনদার?" রাজা হাসিহাসি মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, "কনে বাছা ভারী কঠিন ঠেকছে নাকি? তাহলে আমি আমার যে কন্যেটি তোমায় পছন্দ করে তার সাথেই তোমার বিয়েটা দিই , কী বলো? এই যে তাকিয়ে দেখো দেখি—এ হল রাজকন্যা ভলকভা। "

অমনি রাজকন্যার ভিড় থেকে সবচেয়ে সুন্দরটি বের হয়ে এল সামনে। তার সবুজ চোখে পান্নার ঝিলিক। মিষ্টি হেসে বলল, "তুমি যখন নদীর ধারে বসে বাজাও, আমি তখন কতদিন জলে ভেসে ভেসে তোমার বাজনা শুনেছি তুমি জানো? এইবারে আমরা একসঙ্গে থাকব। "

সাদকো তার দিকে চোখ তুলে তাকাল। রূপের বন্যা বইছে রাজকন্যার অঙ্গে। খানিক বাদে কথা খুঁজে পেয়ে সে বলে, "ভলকভা। তুমি তোমার নদীর মতই সুন্দর। "

সাম্রাজ্ঞি তখন সাদকোর কাছে মুখ ঝুঁকিয়ে নরম গলায় বললেন, "তুমি বড়ো ভালো ছেলে সাদকো। তাই তোমায় আগেভাগেই বলে দিই, একবার তুমি যদি রাজকন্যাকে ছোঁও, তাহলে আর কোনোদিন কিন্তু তোমার মাটির দেশে আর ফিরতে পারবে না এই জলের দেশ ছেড়ে। "

সেদিন রাতে সাগর শ্যাওলার বিছানায় শুয়ে শুয়ে সাদকো ভাবছিল, "আমার স্বপ্নের মতন সুন্দর রাজকন্যা-- "

কিন্তু তক্ষুণি তার মনের ভেতর ফিরে এল সাম্রাজ্ঞির সেই সাবধানবাণী। আর ভয়ে তার বুকের ভেতরটা জমে বরফ হয়ে গেল যেন।

ঠিক তক্ষুণি রাজকন্যা এসে তার পাশটিতে বসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "মুক্তোর বাগানে ঘুরতে যাবে না আমার হাত ধরে?"

"না গো," নিজের হাতটা তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিয়ে মাথা নাড়ল সাদকো, "আমার দেশের নিয়ম হল বিয়ের আগে মুক্তোর বাগান দেখা যাবে না। "

"তবে তুমি আর কোনদিন সে বাগান দেখতে পাবে না," দুঃখু দুঃখু গলায় এই কথা বলে রাজকন্যা চলে গেল।

সকালবেলা ঘুম ভেঙে সাদকো দেখে তার মুখে রোদ পড়েছে এসে। চোখ খুলে দেখে কোথায় রাজকন্যা? ভলকভ নদীটাই বয়ে চলেছে তার পাশ দিয়ে। আর, পেছনে সকালের আলোয় হাসছে তার প্রিয় নোভোগোর্দ শহর।

"আমার নিজের বাড়ি," বলতে বলতে বাড়ি ফেরার সুখে, রাজকন্যাকে হারানোর দুঃখে সাদকোর চোখে জল এল।

এরপর সাদকোর জীবনে আর বেশি দুঃখকষ্ট রইল না। সোনার মাছ বেচে যত টাকা পেয়েছিল সে তাই দিয়ে একটা জাহাজ কিনে সে হয়ে উঠল নামজাদা এক ব্যবসায়ি। কালে কালে সাদকোই হয়ে গেল নোভোগোর্দের সবচেয়ে বড়ো রইস। বিয়ে করল। ফুটফুটে ছেলেমেয়ে হল অনেকগুলো। আর, প্রতি রাত্রেই সে বড়ো বড়ো ভোজ দিত আর সেখানে তার গুসলিটা বাজিয়ে শোনাত সকলকে।

তবু মাঝে মাঝে কোন এক শান্ত সন্ধেবেলা একলা একলা ভলকভ নদীর ধারে যখন হাঁটতে যেত সে, তখন একলা একলা নদীর পাড়ে বসে তার গুসলিতে মিঠে সুর তুলে ছড়িয়ে দিত

ভলকভের ছুটন্ত জলের ওপর দিয়ে। কখনো হয়ত তার চোখে পড়ত, ভারী সুন্দর ফুলের মতন একটা মুখ জল থেকে বের হয়ে এসে সেই বাজনা শুনছে প্রাণ ভরে। সে কি সত্যিই কারো মুখ ছিলো, নাকি শুধুই ছিল জলের বুকে চাঁদের আলোর ঝলক? কে জানে।

ইয়েডোর ওটোকোডেটের গল্প

(গোমপাচি ও কোমুরাসাকির গল্পের একটি পরিশিষ্ট)

সংহিতা

চতুর্থ পর্ব

এই সময়ে ইয়ামাতো প্রদেশে এক দাইমিও থাকতেন, নাম তাঁর হন্ডা দাইনাইকি। একদিন অনুচরপরিবৃত অবস্থায় তিনি একটি তলোয়ার বের করলেন এবং বাজি ধরলেন যে তলোয়ারের ফলা দেখে কেউ বলতে পারবে না যে কোন কামারশালাতে সেটা তৈরি হয়েছিল।

“আমার মনে হয় এটা মাসামুনে তলোয়ার।” বললেন ফুওয়া বানজায়েমন।

“না”, বললেন নাগোয়া সানজা। তলোয়ারের ফলাটা খুঁটিয়ে দেখে বললেন, “এটা মুরামাসা না হয়ে যায় না।”

তাকাগি উমানোজো নামে আরেকজন সামুরাই বলে বসলেন যে ফলাটা শিডজু কানেজির বানানো। যেহেতু তাঁরা কেউই সহমত হলেন না ব্যাপারটায় এবং নিজের নিজের বিচারে অটল রইলেন সেহেতু তাঁদের প্রভু এক বিশেষজ্ঞকে ডেকে পাঠালেন। বিশেষজ্ঞের রায়ে প্রমাণ হয়ে গেল, যেমন সানজা বলেছিলেন, যে ঐ তলোয়ারের ফলাটা একটা আসল মুরামাসা। সানজা তো রায়ে যারপরনাই খুশি হলেন। কিন্তু বাকি দুজন বিষণ্ন মনে বাড়ি ফিরে গেলেন। উমানোজো যদিও তর্কে হেরে নাস্তানাবুদ হয়েছিল, তবু তার মনে কোনো খেদ ছিল না, কোনো খারাপ ইচ্ছে জাগে নি তার মনে। কিন্তু বানজায়েমনের ব্যক্তিত্ব ছিল উদ্ধত। তার আত্মশ্লাঘামথিত মনে সানজার প্রতি গভীর ঘৃণা জন্মালো। সে তক্কে তক্কে রইল একটা সুযোগের যাতে সানজাকে মহা অপদস্থ করা যায়। শেষে একদিন তার প্রতিশোধস্পৃহা এমন চরমে পৌঁছলো যে সে রাজপুত্রের দরবারে উপস্থিত হয়ে প্রার্থনা করল, “হে সর্বময়কর্তা, সানজার অসিচালনা এক দর্শনীয় বিষয়। আপনার একবার দেখা উচিৎ। আমি তার তুলনায় কিছুই না। তবু আপনার মর্জি হলে আমি একবার তার সাথে একপ্রস্থ অসিযুদ্ধের মহড়া দিতে পারি।”

রাজপুত্র তখন সদ্য যুবা। তিনি ভাবলেন একটা জমাটি খেলা দেখা যাবে। তক্ষুণি সানজাকে ডেকে পাঠিয়ে বানজায়েমনের সাথে অসিযুদ্ধে নামার হুকুম দিলেন।

তারা দুজনে হাতে কাঠের তলোয়ার নিয়ে বাগানে উপস্থিত হলেন। এদিকে বানজায়েমনের কিন্তু মনে মনে নিজের অসিচালনা নিয়ে মহা গর্বই ছিল। সে ভাবত অসিচালনায় সে সেরা। তাই

সে মনে মনে প্রস্তুত হয়েই ছিল যে সানজার সাথে অসিচালনায় সে সহজে জিতে যাবে আর তারপর তাকে তুলোধোনা পিটবে যাতে তলোয়ারের ফলা নিয়ে তর্কে হেরে সে যে মনোবেদনা পেয়েছে তা সেরে যায়।

কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে, সে সানজার ক্ষমতাকে যথার্থ মান দেয় নি। সানজা যখন দেখল যে তার প্রতিপক্ষ অভব্যের মতো খেলার নিয়মের বাইরে গিয়ে তাকে আঘাত করছে তখন সে সোৎসাহে এমন এক দ্রুত আঘাত হানল বানজায়েমনের কব্জিতে যে তার হাত থেকে তলোয়ার ছিটকে পড়ল। সেটা বানজায়েমন মাটি থেকে হাতে তুলে নিতে পারার আগেই তার কাঁধে সানজা এমন আঘাত করল যে সে ধুলোর ওপর গড়াগড়ি খেতে লাগল। যতো সেনানায়ক সেখানে উপস্থিত ছিলেন সব্বাই সানজার তলোয়ার চালানোর খুব প্রশংসা করতে লাগলেন। এতে বানজায়েমন এতো লজ্জা পেল যে সে এক দৌড়ে বাড়ি ফিরে গেল আর সেখানেই লুকিয়ে রইল।

এই ঘটনায় সানজা রাজানুগ্রহে প্রচুর সম্মান পেল। আর বানজায়েমন আগের থেকেও বেশি হিংসে করতে লাগল সানজাকে। সে নিজেই নিজের অ- সুখের জালে আটকে পড়তে লাগল আর বাড়িতে বসে মনে মনে সানজাকে ধ্বংস করার ছক কষতে লাগল।

এরপর রাজপুত্র নিজে মুরামাসা ফলা নিজের তলোয়ারে লাগাতে চাইলেন আর সানজাকে ডেকে সেই দায়িত্ব দিলেন যাতে সানজা সবচেয়ে বুদ্ধিমান কামারকে দিয়ে তলোয়ার মোড়ার খাপ আর তার সজ্জা বানায়। ফলাটা তৈরি হলে পর সানজা সেটা এনে নিজের বাড়িতে এনে যত্নে সরিয়ে রাখল। এই খবরটা শুনে বানজায়েমন আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠল। কারণ সে মনে করল যে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার উপযুক্ত সময় দেখা দিয়েছে।

বানজায়েমন পণ করল যে সে দরকার পড়লে সানজাকে প্রাণে মারতেও পিছপা হবে না, কিন্তু তলোয়ারটা তাকে চুরি করতেই হবে। ওটার রক্ষণাবেক্ষণের গুরুদায়িত্ব রাজপুত্র বিশ্বাস করে সানজাকেই দিয়েছেন এবং সেহেতু তলোয়ারটা খোয়া গেলে সানজা আর তার পরিবার পথে বসবে। স্ত্রী কিংবা সন্তানাদি না থাকায় একলা মানুষ বানজায়েমন নিজের সমস্ত আসবাব বেচে দিয়ে, নিজের তাবৎ স্থাবর সম্পত্তিকে টাকা করে নিয়ে দেশ ছেড়ে পালানোর প্রস্তুতি নিল। প্রস্তুতি শেষ হলে পর এক মধ্যরাত্রে সে চুপি চুপি ঢোকার চেষ্টা করল সানজার বাড়িতে। কিন্তু দরজা জানলা সব ভেতর থেকে ছিটকিনি এঁটে বন্ধ করা ছিল। এমন কোনো ফাঁকফোকরও ছিলনা যেখান দিয়ে বানজায়েমন সিঁদ কেটে ঢুকতে পারে। সব কিছু নিঃস্পন্দ যেন। নিশ্চিতভাবেই বাড়ির বাসিন্দারা ঘুমেই পড়েছে অনেকক্ষণ আগে। তাই বানজায়েমন দেওয়াল বেয়ে দোতলায় পৌঁছোল আর একটা জানলার পাল্লা যাহোক কায়দা করে খুলে ফেলল। অবশেষে সে ঢুকে পড়ল সানজার বাড়িতে। বিড়ালের মত হালকা পায়ে চলে সে নেমে এলো একতলায়। তারপর এঘরে ওঘরে উঁকি মেরে দেখতে পেল একটা ঘরে সানজা ঘুমিয়ে আছে মাদুরের ওপর, মধ্যিখানে

লেপের মধ্যে গুটিশুটি মেরে ঘুমিয়ে আছে তাদের তের বছরের ছেলে কোসানজা। রাতবাতির শিখা তখন প্রায় নিবু নিবু। কিন্তু সেই আধো অন্ধকারেও বানজায়েমন দেখতে পেল যে ঘরের উঁচু অংশে তলোয়ার রাখার তাকের ওপর রাখা রয়েছে রাজপুত্রের অহঙ্কার মুরামাসা তলোয়ারখানা। সে নিঃশব্দে হামাগুড়ি দিয়ে পৌঁছে গেল তলোয়ারটার কাছে আর সেটা পুরে নিল নিজের কোমরবন্ধে। তারপর সানজার কাছে এসে, তার ঘুমন্ত শরীরের দুপাশে নিজের দু পা রেখে তলোয়ারটা ঘুরিয়ে এক কোপ বসাল সানজার গলাতে। কিন্তু উত্তেজনায় বানজায়েমনের হাত কেঁপে গেল। ফলে সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো এবং সানজার গায়ে একটা আঁচড়মাত্র পড়ল। সানজা চমকে জেগে উঠল আর লাফিয়ে ওঠার চেষ্টা করল। তাতে সে টের পেল যে কেউ তাকে নীচে চেপে রেখে তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। হাত বাড়িয়ে শত্রুর সাথে কুস্তি করার সময় যখন এল, তখন পিছু হটে, রাতবাতি উল্টে, জানলার পাল্লা খুলে বাগান দিয়ে বানজায়েমন পালাল। ছোঁ মেরে নিজের তলোয়ারটা বাগিয়ে তার পিছু নিল সানজা। তার বউ একটা লন্ঠন জ্বেলে, একটা কুড়ুল গাঁথা বর্শা হাতে চলল কর্তাকে সাহায্য করতে। সঙ্গে রইল তার ছেলে, হাতে ছোরা নিয়ে।

বানজায়েমন লুকিয়ে ছিল একটা বড়ো পাইন গাছের আড়ালে। লন্ঠন দেখে ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে সেই একটা পাথর তুলে ছুঁড়ল লন্ঠন তাক করে যদি সেটা ভেঙে গিয়ে আলোটা নিভে যায়; আর হলও তাই। সেই সুযোগে সে চম্পট দিল বেড়া ডিঙিয়ে। অনেকক্ষণ বাগানের আনাচেকানাচে ব্যর্থ খোঁজাখুঁজির পর ঘরে ফিরল সানজা। তারপর তার চোটটাকে পরীক্ষা করে দেখল সে যে সেটা তেমন কিছু নয়। তখন সে নজর দিল চোরে কিছু নিয়ে গেছে কিনা ঘর থেকে তাই খোঁজাতে। তাকের ওপর যেখানে মুরামাসা তলোয়ারখানা ছিল সেখানে চোখ পড়তেই দেখল যে সেটা নেই। সে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখল, কিন্তু কোথাও পেল না সেটা। যে মহার্ঘ ফলাখানা তাকে বিশ্বাস করে রাজপুত্র রাখতে দিয়েছিলেন সেটা চুরি গেছে, তার দায় বড়ো ভারি হয়েই চাপবে তার কাঁধে। বেদনায়, লজ্জায়, বড়ো দুশ্চিন্তায় রাত ভোর হলো সানজা আর তার স্ত্রীর এবং তাদের পুত্রের। তারপর সে রাজপুত্রের এক পারিষদকে সম্পূর্ণ ঘটনা জানিয়ে একান্তে অপেক্ষায় রইল রাজপুত্রের আদেশের।

খুব শিগগির জানা গেল যে দেশছাড়া বানজায়েমনই চোর। পারিষদরা সেই মতো জানালেনও রাজপুত্রকে। রাজপুত্র বানজায়েমনের হীন কাজের জন্য তার প্রতি নিজের প্রবল অপছন্দের কথা স্বীকার করলেও সানজাকে তার দায়িত্বপালনের অক্ষমতার দোষ থেকেও মাপ করলেন না কারণ সানজা আরও সাবধান হতে পারত রাজপুত্রের তলোয়ারের মহার্ঘ মুরামাসা ফলাখানা নিজের কাছে রাখার সময়। তাই এই সিদ্ধান্ত হলো যে সানজাকে তার পদ থেকে বরখাস্ত করা হবে আর তার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে এই শর্তে যে সে যদি বানজায়েমনকে খুঁজে বার করে মুরামাসা ফলাখানা উদ্ধার করতে পারে, তাহলে তাকে তার পদে পুনর্বহাল করা হবে।

শুরুর থেকেই সানজা তৈরি ছিল কঠিন শাস্তির জন্য, তাই বিনা বাক্যব্যয়ে সে রাজাজ্ঞা মেনে নিল। স্ত্রী-পুত্রকে আত্মীয়দের কাছে রেখে প্রস্তুত হলো রনিন হয়ে দেশ ছাড়ার আর বানজায়েমনকে খুঁজে বার করার জন্য।

চলবে

বৈজ্ঞানিক

কুটক মানে হামানদিস্তা। আর্যভট (আর্যভট্ট নয়। ভুলটা ধরিয়ে দেবার জন্য ডঃ কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ। কেন তা নয় জানতে এ সংখ্যার চিঠিপত্র বিভাগ দেখো।) হামানদিস্তার আবিষ্কারক ছিলেন বললে কেমন শোনাবে?

কথাটা কিন্তু সত্যি। হামানদিস্তায় কী হয় জানো তো? একটা শক্ত জিনিসকে তার মধ্যে ফেলে একটা লোহার ডাঁটি দিয়ে তাকে কোটা হয়। এক এক ঘায়ে সেটা ভেঙে ছোটো থেকে আরো ছোটো টুকরো হতে হতে শেষে একেবারে গুঁড়ো হয়ে যায়।

আর্যভট অংকের জন্যে এইরকম একটা হামানদিস্তা বানিয়ে রেখে গেছেন। তার নাম কুটক পদ্ধতি। জিনিসটা রয়েছে আর্যভটীয় পুঁথির গণিতপদ অধ্যায়ে।

ধরো একটা সমীকরণ আছে এইরকমঃ

$ax+by=c$

প্রশ্ন হল, দুটো অজানা রাশি আর একটা সমীকরণ –সেক্ষেত্রে কিন্তু এর বহু উত্তর সম্ভব।

কীভাবে?

এই দেখোঃ

ax+by=c {এখানে a, b, c হল ধ্রুব সংখ্যা। (যেমন ধরো , ২,৪,১ বা (-২),৫, ৭ বা ১/২, ৩/৪,২/৫ এইরকম)}, আর x, y হল অজানা রাশি । a, b, c- র কোন নির্দিষ্ট তিনটে মানের জন্য সেই অজানা রাশিদুটোর মান বের করতে হবে।

- ➔ x= (c-by) / a
- ➔ ধরো a, b, cর মান যথাক্রমে ৩,২ ও ৫
- ➔ তাহলে সমীকরণটা হবে 3x+2y=5
- ➔ x= (5-2y) / 3

এবারে y এর একেকটা মান ধরলে তার জন্য x এর একেকটা মান বেরোবে।

যেমন ধরো y=1 ; তাহলে x=1 । ধরো y=2 ; তাহলে x=1/3—এইরকম অগণিত মান হতে পারে (x, y) এর।

এইখানে একটা মজা হল, a, b, c এদের মধ্যে a, b, র গসাগু দিয়ে যদি c বিভাজ্য হয় একমাত্র তাহলেই x, y এর পূর্ণসংখ্যার মান হওয়া সম্ভব। জিনিসটা তোমরা পরীক্ষা করে দেখতে পার।

এবারে ধরো সমীকরণটা আছে এইরকম-

৩৫ক+ ৪৩খ=৩৮

এখানে ৩৫ আর ৪৩ এর গসাগু হল ১। সেটা দিয়ে ৩৮ বিভাজ্য। অতএব এইক্ষেত্রে 'ক' ও 'খ' এর অসংখ্য জোড়া মানের মধ্যে একখানা জুটি থাকবে যেখানে ক আর খ দুটোর মানই হবে পূর্ণসংখ্যা। চেষ্টা করে দেখো দেখি সেইটে বের করতে পারো কি না? বেজায় ঝামেলা হবে সেইটে করতে গেলে। সমীকরণটাকে ক= (৩৮ - ৪৩খ)/৩৫ এইভাবে লিখে তারপর খ এর বিভিন্ন মান লিখে লিখে চেষ্টা করে চলতে হবে যতক্ষণ না কপাল খোলে।

কোন বহুরাশিক (পলিনোমিয়াল) সমীকরণ, যাতে যতগুলো অজানা রাশি তার চেয়ে কম সংখ্যক সমীকরণ আছে এবং যার অজানা রাশিদের পূর্ণসংখ্যার সমাধানই খোঁজা হচ্ছে শুধু তাদের অংকের ভাষায় ডায়োফান্টেন সমীকরণ বলে। তৃতীয় শতাব্দিতে আলেকজান্দ্রিয়ার ডায়োফ্যান্টাস নামে এক গণিতজ্ঞ এই ধরনের সমীকরণের ওপরে গবেষণা করেছিলেন। তাঁর নামেই এ ধরনের সমস্যার এই নাম।

এখনকার যুগে ক্রিপটোগ্রাফি, নাম্বার থিওরি এইসব এলাকায় এর প্রয়োগ হয়।

ডায়োফ্যান্টাসের অনেক আগে থেকেই, প্রাচীনকালের ভারতবর্ষে যজ্ঞবেদি তৈরির জ্যামিতিতে, জ্যোতির্বিদ্যায় এই সমীকরণদের পূর্ণসংখ্যার সমাধান জরুরি হত। বুঝতেই পারছ, কতো খুঁজে খুঁজে সেইসব মান উদ্ধার করতে হত তখন একেকজন অংকওয়ালাকে। যদি বুঝতে না পারো তাহলে ৩৫ক+ ৪৩খ=৩৮ এই সমীকরণটার পূর্ণসংখ্যার মানদুটো খুঁজে বের করবার চেষ্টা করো, তাহলেই টের পাবে।

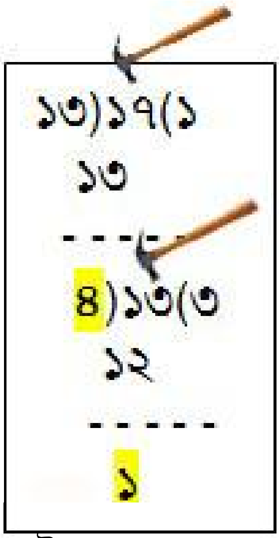

এই ঝামেলার কাজটাকে সহজ করবার জন্যই আর্যভট তাঁর আর্যভটীয় পুঁথিতে ঐ হামানদিস্তার আবিষ্কার করেছিলেন।

ধরো সমীকরণটা হল ২৬ক + ৩৪খ = ২৪
ক ও খ এর মান নির্ণয় করতে হবে।
২৬ ও ৩৪ এর গসাগু২=
২ দিয়ে দুপাশে ভাগ করে দিলে পাইঃ ১৩ক + ১৭খ = ১২
এবারে ১৩ আর ১৭র গসাগু বের করবার মতন করে ক্রমাগত ভাগ করে চল যতক্ষণ না ভাগশেষ ১ আসে।
এইবারে শেষ ভাগের ভাজক আর অবশিষ্টকে দিয়ে সমীকরণটাকে ফের লেখো - ৪গ + ১ঘ = ১২
মূল সমীকরণটা থেকে এটা অনেক সোজা। এর থেকে মুখে মুখে গ আর ঘ এর মান পাবে ধরো গ =২ আর ঘ = ৪
তাহলে কী করা হল? একটা বড়ো অংক, যাতে দুখানা অজানা রাশি রয়েছে , সেটাকে সরাসরি আক্রমণ না করে তার বড়ো রাশিগুলোকে ক্রমাগত ভাগের হাতুড়ি মেরে ভেঙে ভেঙে ছোটো করে একটা সহজ সমীকরণ বানানো হল।
এইবারে দেখো এই সহজ উত্তরটাকে ধরে পিছু হেঁটে কেমন কঠিন অংকের উত্তর খুঁজতে যাওয়া হয়।

কীভাবে? এই দেখো→

৪গ + ১ঘ = ১২
মুখে মুখে এর একটা সমাধান হয় গ =২ আর ঘ = ৪
তাহলে, ৪ x ২ + ১ x ৪ = ১২
বা, (১৭- ১৩) x ২ + (১৭ – ১৩) x ১ = ১২
বা, ১৭ (২ + ১) + ১৩ (- ২ - ১) = ১২
বা ১৭ x(৩) +১৩x(- ৩) =১২
মূল সমীকরণের (একই নীল রঙে রয়েছে ওপরে) সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে ক, খ এর মান পাবে - ৩, ৩

আবার ধরো ৪গ + ১ঘ = ১২ এর মুখে মুখে আর একটা সমাধান হয় গ= ১ আর ঘ= ৮।
তাহলে ৪ x ১ + ১ x ৮ = ১২
বা, (১৭- ১৩) x ১ + (১৭ – ১৩) x ২ = ১২
বা, ১৭ (২ + ১) + ১৩ (- ২ - ১) = ১২
বা ১৭ x(৩) +১৩x(- ৩) =১২
মূল সমীকরণের (একই নীল রঙে রয়েছে ওপরে) সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে ক, খ এর মান পাবে - ৩, ৩

আবার ধরো ৪গ + ১ঘ = ১২ এর মুখে মুখে আর একটা সমাধান হয় গ= ৫ আর ঘ= (- ৮)।
তাহলে ৪ x ৫ + ১ x (- ৮) = ১২
বা, (১৭- ১৩) x ৫ + (১৭ – ১৩) x (- ২) = ১২
বা, ১৭ (৫ - ২) + ১৩ (- ৫ + ২) = ১২
বা ১৭ x(৩) +১৩x(- ৩) =১২
মূল সমীকরণের (একই নীল রঙে রয়েছে ওপরে) সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে ক, খ এর মান পাবে - ৩, ৩ ।

এইভাবে, মূল সমীকরণটার পূর্ণসংখ্যার সমাধান খুঁজে বের করা সম্ভব হল আর্যভটের হামানদিস্তা দিয়ে বড়ো সংখ্যাগুলোকে ভেঙে গুঁড়িয়ে একেবারে ছোটো চেহারায় নিয়ে এসে।

আর্যভটের পরবর্তী যুগে তাঁর আবিষ্কৃত এই কুট্টক বা হামানদিস্তার পদ্ধতিকে ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্কর-১ ও বারংবার উল্লেখ করেছেন। আর্যভট মাত্রই কয়েকটা শ্লোকে পদ্ধতিটার কথা বলেছিলেন ‘আর্যভটীয়’র গণিতপাদ অধ্যায়ে। ভাস্কর - ১ পরবর্তীকালে তার ওপর অনেক ব্যাখ্যাট্যাখ্যা লিখেছিলেন যা থেকে আজকের গণিতবিদরা আর্যভটের পদ্ধতিটার কথা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছেন।

ডায়োফান্টেন শ্রেণীর সমীকরণ সমাধান করবার জন্য এই ক্রমাগত বিভাজনের যে পদ্ধতি তৈরি করেছিলেন আর্যভট, তার ব্যবহার করে পরবর্তীকালে ভারতীয় গণিতবিদরা বেশ কিছু আকর্ষণীয় সমস্যার সমাধান করেছিলেন। তেমন দুটো সমস্যা এখানে উল্লেখ করলাম। সমাধান দেবো না। সেইটে তোমাদের বুদ্ধির খেলার জন্য রইল -

ভাস্কর-১ → ২, ৩, ৪, ৫, ৬ দিয়ে ভাগ করলে প্রত্যেকবার ১ অবশিষ্ট থাকে কিন্তু ৭ দিয়ে বিভাজ্য এমন ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটা কত?

(উত্তর ৩০১)

মহাবীর (খৃ ৮৫০) → পাঁচ ঝুড়ি ফলের সঙ্গে দুটো ফল জুড়ে তা নজন পরিব্রাজককে সমানভাবে ভাগ করে দেয়া হল । ছয় ঝুড়ি ফলের সঙ্গে চারটে ফল জুড়ে তা আটজন পরিব্রাজককে সমানভাবে ভাগ করে দেয়া হল । চার ঝুড়ি ফলের সঙ্গে একটা ফল জুড়ে তা সাতজন পরিব্রাজককে সমানভাবে ভাগ করে দেয়া হল। একেক ঝুড়িতে সবচেয়ে কম কতগুলো ফল আছে?

আর্যভটের বহু শতাব্দি বাদে ইউরোপে ১৬২১ সালে এই পদ্ধতির পুনরাবিষ্কার করেন ব্যাচেট। তারপর ১৭৩৫ সালে ফের তা আরেকবার নতুন করে তৈরি করেল অয়লার। ফার্মা, উচ্চতর সূচকের ডায়োফান্টেন সমীকরণের ($ax^2+by^2=c$, বা $ax^3+by^3+cz^3=d$ এই

জাতীয় সমীকরণ) সমাধান সম্ভব কিনা তা প্রমাণ করতে গিয়ে বিখ্যাত ইনফাইনাইট ডিসেন্ট পদ্ধতির প্রমাণের ক্ষেত্রেও এই কুটক পদ্ধতির প্রয়োগ করেছিলেন।

ইনফাইনাইট ডিসেন্ট পদ্ধতির কথা

(এইটে ক্লাস ইলেভেন টুয়েলভে যারা পড়ো তাদের জন্য)

ইনফাইনাইট ডিসেন্ট হল অঙ্কশাস্ত্রের একটা বিশেষ ধরনের প্রমাণ পদ্ধতি। এ কায়দাটা দিয়ে যা করা হয় সেটা ভারী মজার।

কোন একটা সমীকরণ দেয়া হল ধরো। এখন দেখতে হবে তার কোন সমাধান সম্ভব কি না যাতে তার উত্তরগুলো হবে ন্যাচরাল নাম্বার, মানে ১,২,৩,৪, এইরকম রাশিগুলো।

এইখানে একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বোঝাই।

ধরো সমীকরণটা হল $\sqrt{2} =$ ক/খ। প্রশ্ন হল, এই সমীকরণটার এমন কোন সমাধান কি সম্ভব যাতে ক আর খ দুটো পূর্ণসংখ্যা? আমরা জানি যে $\sqrt{2}$ একটা অমূলদ সংখ্যা। একে দুটো পূর্ণসংখ্যার অনুপাতে প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু যদি বলি একে যে দুটো পূর্ণসংখ্যার অনুপাতে প্রকাশ করা যায় না তার প্রমাণ করো?

ফার্মার পদ্ধতিটায় সমীকরণটাকে ধরে প্রথমে ধরা হয় যে হ্যাঁ এর একটা সমাধান সম্ভব যাতে উত্তরগুলো ন্যাচরাল নম্বরের জুটি। তারপর পরীক্ষা করা হয় যে এ সমীকরণটার ক্ষেত্রে এই সমাধানটা সম্ভব হলে এর চেয়েও ছোট দুটো পূর্ণসংখ্যার সমাধান সম্ভব হবে কিনা।

যদি পরীক্ষায় সেটা প্রমাণিত হয় যে হ্যাঁ তা সম্ভব, তাহলে, তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে সেই দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতর সমাধান জুটি থাকলে তার চেয়েও কোন ছোটো পূর্ণসংখ্যার জুটি থাকবে।

এক কথায় তার অর্থ দাঁড়াবে যে এই সমীকরণের ক্ষেত্রে এইরকম ক্রমাগত ছোটো থেকে আরো ছোটো পূর্ণসংখ্যার অসীম সংখ্যক জুটি থাকবে। কিন্তু যেহেতু ন্যাচারাল সংখ্যা ১- এ এসে শেষ হয়ে যায়, অতএব বাস্তবে সেই ক্রমাগত ছোটো থেকে আরো ছোটো ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যার জুটি থাকা সম্ভব নয়।

অর্থাৎ সমীকরণটার এইজাতের সমাধান সম্ভব ধরে নিলে তার থেকে একটা অসম্ভব সিদ্ধান্তে পৌঁছোচ্ছি আমরা। তার মানে গোড়ার সিদ্ধান্তটা ভুল, মানে এই সমীকরণের কোন পূর্ণসংখ্যার জুটির সমাধান সম্ভব নয়। অর্থাৎ $\sqrt{2}$কে দুটো পূর্ণসংখ্যার অনুপাত দিয়ে প্রকাশ করা যাবে না, বা এটি একটি অমূলদ সংখ্যা।

ডায়াফন্টেন সমীকরণের সমাধানের বাস্তব প্রয়োগের একটা উদাহরণ দিয়ে এবারের মত শেষ করি। এটা একটা গোয়েন্দা গল্প।

ধরো তুমি ভারতের গুপ্তচর। শত্রুদেশ ভারতে একজন খুনিকে পাঠিয়েছে। তার নাম খুঁজতে অন্যদেশে গিয়ে তুমি জানলে তার নাম 'জো'। এই JO শব্দটা তুমি এমনভাবে সাংকেতিক লিপিতে ভারতে পাঠাবে যাতে শত্রুরা সেটা ধরতে না পারে।

তুমি করলে কী, প্রথমে JO শব্দটাকে লিখলে 10, 15 (মানে বর্ণমালার দশম ও পনেরো নং অক্ষর)

এইবার তুমি একটা সমীকরণ বানালে ৩৭ক+৫২খ =১১৫০। এই সমীকরণটার বাঁদিকের রাশিদুটোর গসাগু ১, যা দিয়ে ডানদিকের রাশিটাকে ভাগ করা যায়। অতএব এর একটা পূর্ণসংখ্যার সমাধান সম্ভব। সমাধানটা করলে উত্তর আসবে ওই ১০,১৫, মানে JO.

এইবার তুমি আরো কয়েকটা সমীকরণ বানাও—

৩৮ক+১৯খ=২৫০০, ৪০ক+১৮খ =৩৭৯১ , ৩ক+৯খ=২৫।

তারপর তুমি একটা চিঠি লেখ। ধরো তোমার বোনকে লিখছ→

প্রিয় মিষ্টু,

শুনলাম তুমি ক্লাস সেভেনে উঠেছ। অ্যালজেব্রার অঙ্কও শিখেছ। দেখি তুমি কেমন অ্যালজেব্রা শিখেছ। তলায় কয়েকটা অঙ্ক দিলাম।

তুমি তাদের উত্তর বের করে আমাকে চিঠি লিখবে। তাহলে আমি দেশে ফেরার সময় তোমার জন্য দারুণ একটা খেলনা নিয়ে যাব।

৩৮ক+১৯খ=২৫০০,

৪০ক+১৮খ =৩৭৯১

৩৭ক+৫২খ =১১৫০

৩ক+৯খ=২৫

ইতি,

দাদা

শত্রুদেশ তো আর জানে না তুমি কীভাবে সংকেত বানিয়েছ। তারা ওর থেকে কিছুই বুঝবে না। কিন্তু তোমার দেশের সাংকেতিক লিপির পাঠ উদ্ধার করবার লোকজনকে তুমি আগেই বলে গেছ কী কায়দায় তুমি সংকেতটা পাঠাবে। তাই সমীকরণগুলোকে দেখে তারা প্রথমে খুঁজবে ওর কোনটার পূর্ণসংখ্যার সমাধান হয়। তারা দেখবে সেটা হয় তিন নম্বর সমীকরণটার ক্ষেত্রে। তখন কুটক পদ্ধতিতে সেটা সমাধান করলেই কেল্লা ফতে। খুনির নাম তারা জেনে যাবে JO. এইবার তাকে খুঁজে বের করতে আর সমস্যা থাকবে না।

ক্রমশ

মাথে মে ট্রিকস্

অঙ্করঙ্গ ধাঁধা

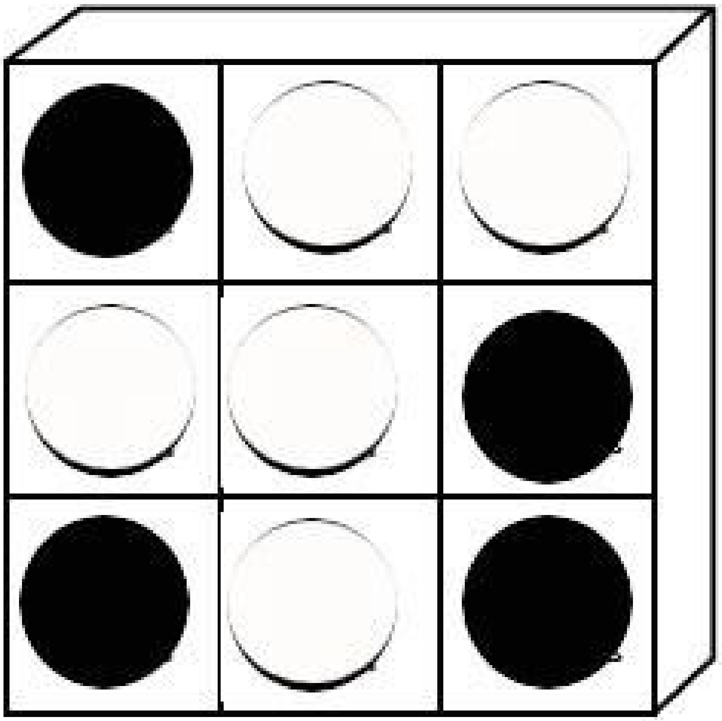

সূর্যনাথ ভট্টাচার্য

১। (ক) একটা ব্যাগে অনেকগুলো সাদা আর কালো বল আছে। দু'টো যে কোনও একই রঙের (সাদা অথবা কালো) বল পেতে হলে না দেখে ঐ ব্যাগ থেকে অধিকতম ক'টা বল তুলতে হবে? তিনটে একই রঙের বল পেতেই বা ক'টা বল তুলতে হবে?

(খ) ঐ ব্যাগে যদি তিন রকম রঙের, ধরা যাক সাদা, কালো আর লাল বল থাকে তাহলে দু'টো যে কোনও একই রঙের (সাদা, কালো অথবা লাল) বল পেতে হলে না দেখে ঐ ব্যাগ থেকে অধিকতম ক'টা বল তুলতে হবে? তিনটে একই রঙের বল পেতেই বা ক'টা বল তুলতে হবে? ঐ ব্যাগে লাল বলের সংখ্যা একটাই হলে, তিনটি একই রঙের বল পেতে অধিকতম ক'টা বল তুলতে হবে?

২। তিনটি পাঁচ টাকার আর তিনটি দশ টাকার মুদ্রা তিনটে বাক্সে ভাগ করে রাখা হল, বাক্সপ্রতি দু'টি করে মুদ্রা। বাক্সগুলোর ওপরে লেখা আছে ১০/- , ১৫/- এবং ২০/- , কিন্তু কোনটার মধ্যেই লিখিত রাশির সমান টাকা নেই। যে কোনও একটা বাক্স থেকে একটা মাত্র মুদ্রা বার করে দেখে

বলতে হবে কোন বাক্সে কত টাকা আছে। মুদ্রার আকার বা মাপের কোনও তফাৎ নেই ধরে নিতে হবে।

৩। সেনবাবু ও তাঁর স্ত্রীকে তিনটে কাজ করতে হবে— ঘর সাফ করা, কাপড় কাচা ও বাচ্চাকে খাওয়ানো। প্রতিটা কাজ করতে লাগে এক ঘন্টা করে। বাড়িতে একটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার আর একটাই ওয়াশিং মেশিন আছে। সেনবাবুরা দুইজনে মিলে কত কম সময়ে তিনটি কাজ শেষ করতে পারেন?

৪। প্রফেসর ট্যাঞ্জেন্টের পোষ্যদের মধ্যে দুটি ছাড়া আর সব কুকুর, দুটি ছাড়া আর সব বিড়াল এবং দুটি বাদে আর সবই টিয়াপাখি। প্রফেসর ট্যাঞ্জেন্টের মোট ক'টি পোষ্য?

৫। মেডিক্যাল স্টোরে একটা ওষুধ ভুল সরবরাহ হয়েছে। জানা গেছে দশ শিশির এক কার্টনে একটা শিশি আছে যার বড়িগুলো দশ গ্রাম করে বেশি ওজনের। ধরা যাক প্রতিটা শিশিতে ৩০০ করে বড়ি আছে, প্রতি বড়ির সঠিক ওজন দশ গ্রাম করে । দশটা শিশিকেই ওজন করে ফেললে অবশ্য বেশি ওজনের শিশিটা বার করে ফেলা যায়। ভাগ্য ভাল থাকলে আরও কম সংখ্যক ওজন করেও কাজটা হতে পারে, কিন্তু শুধুমাত্র একবার ওজন করেই সঠিক বার করা যায় কি কোন শিশিতে বেশি ওজনের বড়িগুলো আছে?

৬। ক- বাবু পুরো জানুয়ারি মাসের জন্যে এক হোটেল বুক করলেন। হোটেলের ভাড়া দৈনিক এক হাজার টাকা। আর হোটেলের নিয়ম অনুযায়ী ক- বাবুকে রোজকার রুমরেন্ট রোজ দিতে হবে। ক- বাবুর কাছে নগদ টাকা যথেষ্ট নেই, কিন্তু একটা সোনার চেন আছে। চেনটাতে ৩১টা রিং আছে, প্রত্যেকটার মূল্য হাজার টাকা। যেহেতু ভাড়া রোজ দিতে হবে, তাই ক- বাবু ঠিক করলেন চেনটাকে কাটবেন। রিংগুলো দিয়ে ঘরভাড়া দেবেন। কিন্তু দামি চেন। কত কম সংখ্যক রিং কেটে ক- বাবু পুরো মাস হোটেলে থাকতে পারবেন?

সমাধান।

১। এগুলো সবই গণিতশাস্ত্রের 'কবুতরখানা' নীতির একেবারে প্রাথমিক স্তরের প্রশ্ন। কবুতরখানা নীতি শক্ত কিছুই নয়। সোজা কথায় পায়রার খোপের চেয়ে পায়রার সংখ্যা যদি বেশি হয়, তাহলে অন্তত একটা খোপে একাধিক পায়রা থাকবেই। আর কম হলে অন্তত একটা খোপ খালি থাকবেই। এই সহজবোধ্য ব্যাপারটার ওপরেই নির্ভরশীল কবুতরখানা নীতির সিদ্ধান্তগুলি।

(ক) ব্যাগ থেকে প্রথম বলটা সাদা অথবা কালো যা হোক হতে পারে, ধরা যাক সাদা। পরের বলটা যদি সাদা হয় তাহলে আমরা দু'টো একই রঙের বল পেয়ে গেলাম। কিন্তু তা নাও হতে পারে। ধরা যাক এবার কালো বল এল। তাহলে একটা সাদা আর একটা কালো বল পাওয়া গেল। এখন তৃতীয় বলটা যাই হোক না কেন দু'টো একই রঙের বল পাওয়া হয়ে গেল। উত্তরঃ তিন। একটু ভেবেই পাওয়া যায় তিনটি একই রঙের বল পেতে বড়জোর পাঁচটা বল তুলতে হবে, কেননা চারবারেও 'সাফল্য' না আসতে পারে, দুই রঙের দুটি করে বল এলে।

(খ) এক্ষেত্রে দীর্ঘতম ‘অসফল’ প্রচেষ্টা কী হতে পারে দেখা যাক। প্রথম তিনটে বলই তিন আলাদা রঙের হওয়া সম্ভব (না হলে তো দু’টো এক রঙের বল পাওয়া ‘সফল’)। চতুর্থ ড্র- তে কিন্তু যে রঙের বলই আসুক, সেই রঙের একটা বল ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। সুতরাং উত্তরঃ চার। একইভাবে তিনটি একই রঙের বল পেতে বড়জোর সাতটা বল তুলতে হবে।
লাল বলের সংখ্যা এক হলে সেটা তিনটে পাওয়া সম্ভব নয়। একটু ভেবে দেখলেই পাওয়া যাবে, এক্ষেত্রে ‘অসফল’ প্রচেষ্টা হতে পারে পাঁচবার, দু’টি করে সাদা আর কালো বল ও ঐ লাল বলটা। সুতরাং ষষ্ঠবারে পাওয়া যাবে হয় সাদা নয় কালো বল। উত্তরঃ ছয়।
২। বাক্সগুলোর কোনটায় কি আছে জানা নেই কিন্তু সম্ভাবনাগুলো বেশি নয়। বাক্সগুলোর একটায় দুটো পাঁচ টাকা অর্থাৎ মোট দশ টাকা, আর একটায় দুটো দশ টাকা অর্থাৎ মোট কুড়ি টাকা আর তৃতীয়টায় একটা পাঁচ ও একটা দশ টাকার মুদ্রা অর্থাৎ মোট পনের টাকা আছে। যেহেতু ওপরে যা লেখা আছে ভেতরে তা নেই, সুতরাং ১৫/- লেখা বাক্সে হয় দশ নয়তো কুড়ি টাকা আছে। অর্থাৎ পাঁচ বা দশ টাকার দুটি করে মুদ্রা আছে। এই বাক্স থেকে একটা মুদ্রা তুলে সেটা দেখে নিলেই জানা যাবে কোথায় কী আছে। পাঁচ পাওয়া গেলে এই বাক্সে দশ টাকা আছে (দুটো পাঁচ), আর দশ পাওয়া গেলে কুড়ি (দুটো দশ)। সেই অনুযায়ী ১০/- (অথবা ২০/-) লেখা বাক্সে পনের টাকা আর ২০/- (অথবা ১০/-) লেখা বাক্সে দশ (অথবা কুড়ি) টাকা থাকবে।
৩। মনে হতে পারে শ্রী ও শ্রীমতী সেন দুটি কাজ একসাথে করে একঘন্টা বাঁচিয়ে মোট দুই ঘন্টায় তিনটি কাজ শেষ করতে পারেন। কিন্তু আরও আধঘন্টা সাশ্রয়ের সুযোগ আছে।
ধরা যাক সেনবাবু ওয়াশিং মেশিনে কাপড় কাচা ও শ্রীমতী সেন বাচ্চাকে খাওয়াতে শুরু করলেন। আধঘন্টা পরে সেনবাবু কাপড় কাচা ছেড়ে ঘর সাফ করা শুরু করে দিলেন। আরও আধঘন্টা পরে শ্রীমতী সেন বাচ্চাকে খাওয়ানো শেষ করলেন। তখনও সেনবাবুর ঘর সাফ করার আধঘন্টা বাকি। সেই আধঘন্টায় শ্রীমতী সেন অসমাপ্ত কাপড় কাচার কাজটি শেষ করে ফেললেন। তাহলে মোট সময় লাগল দেড় ঘন্টা।
গণিতে সমীকরণের সহগের বিভিন্ন সমবায়ে চলরাশির লঘিষ্ঠ বা গরিষ্ঠ মান নির্ণয়ের পদ্ধতিকে বলা হয় লিনিয়ার প্রোগ্রামিং যা অপারেশন রিসার্চের এক বিশিষ্ট অঙ্গ।
৪। এখানে ‘আর সব’ বাক্যাংশটাই বিভ্রান্তি ঘটায়, নয়তো প্রশ্নটি অতি সাধারণ সমীকরণ সমাধানের। ‘আর সব’ বলতে যে এক হওয়াও সম্ভব এইটা প্রথমত মনে আসে না।
পোষা কুকুর, বিড়াল ও টিয়াপাখীর সংখ্যা যথাক্রমে x, y, z হলে প্রদত্ত সমীকরণগুলি হল,
$n-2=x,\quad n-2=y$ এবং $n-2=z,$ যেখানে, $n=x+y+z$।
সমীকরণগুলি খুব সহজেই সমাধান করে পাওয়া যায়, প্রফেসর ট্যাঞ্জেন্টের একটি করে কুকুর, বিড়াল ও টিয়াপাখি আছে।
৫। প্রথমে শিশিগুলোতে ১,২,৩,...,৯,১০ এইভাবে নম্বর লাগিয়ে দেওয়া হল। এইবার প্রথম শিশি থেকে একটা গুলি, দ্বিতীয় শিশি থেকে দু’টো, তৃতীয় থেকে তিনটে এইভাবে মোট ৫৫টা গুলি সংগ্রহ করে ওজন করা হবে। ওজন ৫৫০ গ্রামের চেয়ে যত বেশি হবে, তাকে ১০ দিয়ে ভাগ দিলেই পাওয়া যাবে ত্রুটিপূর্ণ শিশিটির সংখ্যা।
৬। সব রিং খুলে নিলে তো কাজ হয়েই যায়। তা করা চলবে না। ক- বাবুর উদ্দেশ্য হল ঐ ৩১ রিঙের চেনকে এমনভাবে কয়েক টুকরো করতে হবে যাতে ১ থেকে ৩১ সংখ্যক রিং আদান-প্রদানের মাধ্যমে তিনি হোটেলে দিতে পারেন। দ্বিঘাতীয় বীজগণিত জানা থাকলে আর কোনও

সমস্যা নেই। চেনটিকে এমনভাবে টুকরো করতে হবে যাতে প্রতিটিতে রিঙের সংখ্যা ২এর ঘাতের ক্রমে থাকে। অর্থাৎ মোট পাঁচটা টুকরো করতে হবে, যাতে রিং থাকবে যথাক্রমে ১, ২, ৪, ৮ ও ১৬ টি। পরীক্ষা করলেই দেখা যাবে এর দ্বারা ১ থেকে ৩১ যেকোনো সংখ্যক রিং তিনি হোটেলে জমা করতে পারবেন। (অর্থাৎ, প্রথমদিন তিনি একটা রিং দেবেন। দ্বিতীয়দিন দুটো রিঙের টুকরোটা দিয়ে আগের দিনের একটা রিং ফেরৎ নেবেন। তৃতীয়দিন ফের ওই একটা রিং দেবেন। চতুর্থদিন চারটে রিঙের টুকরোটা দিয়ে আগে দেয়া তিনখানা রিং ফেরত নেবেন এইভাবে।)

গল্পে বিজ্ঞান

ঠান্ডা করার সহজ উপায়

রবি সোম

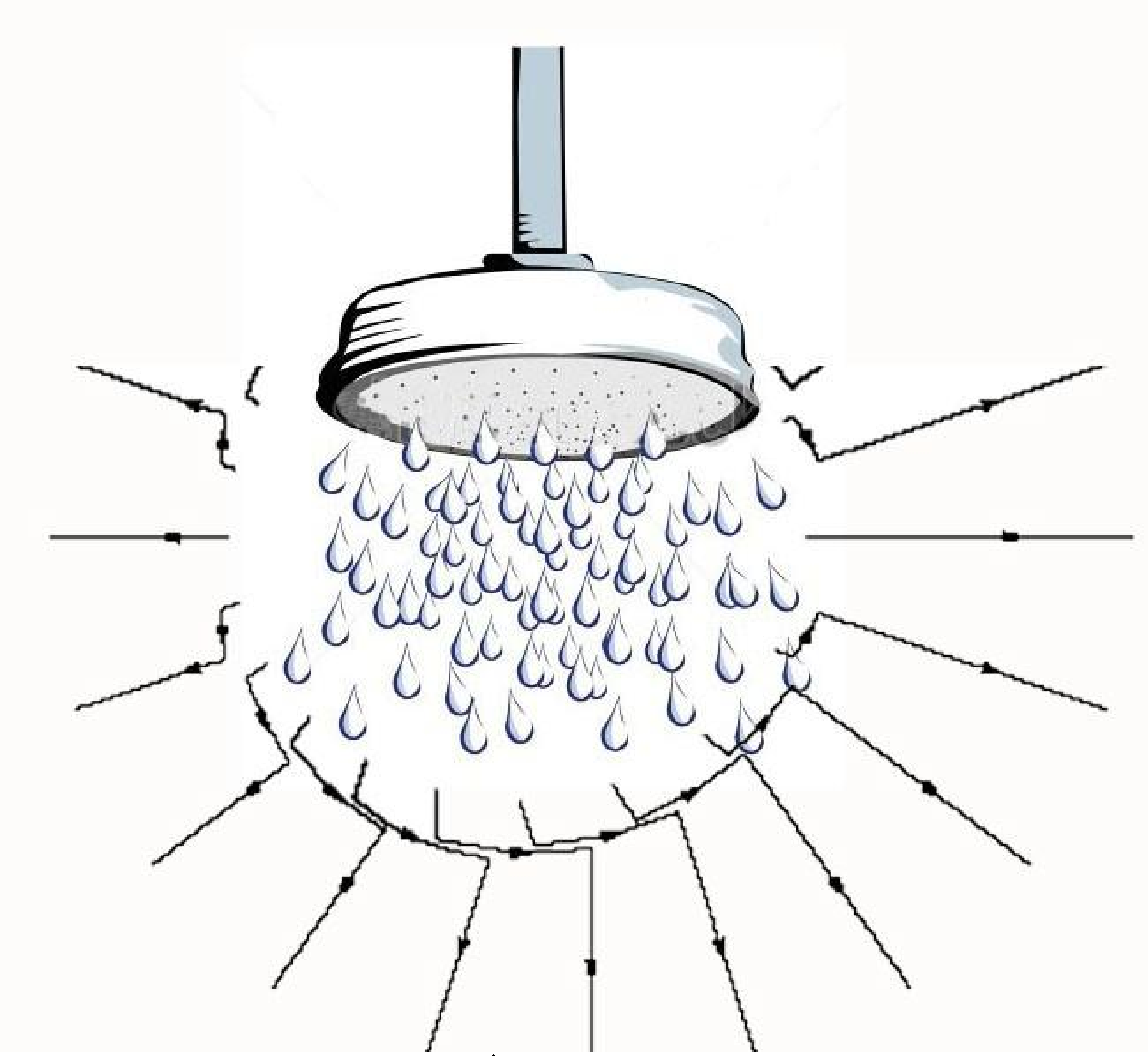

দর্জিলদার অদ্ভুত কাণ্ড দেখে (ঠিকভাবে বলতে গেলে , অনুভব করে) সুজিত ও আমার দু'জনেই মনে হল , এটা নির্ঘাত ম্যাজিক! আমি মুখ ফসকে কথাটা বলতেই হো হো করে হেসে উঠল দর্জিলদা। পরে হাসি- টাসি থামিয়ে বলল , "দূর বোকা , ম্যাজিক আসলে তো হাতের বা যন্ত্রপাতির কারসাজি কিংবা দৃষ্টিবিভ্রম। সেসব কিস্‌সু নয় , এটা ঘোরতর বিজ্ঞান ! 'ঘোরতর' কথাটা শুনে আবার ঘাবড়ে যাস না। হার্ড সায়েন্স- এর বাংলা হিসেবেই কথাটা বললাম। খবরের কাগজ বা টিভির বিজ্ঞাপনে প্রায়ই দেখিস না, মানুষের ওপর গ্রহ- নক্ষত্রের প্রভাবের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যানের নানারকম অপচেষ্টা। এটা কিন্তু সেরকম জোড়াতালির ব্যাপার নয়, হান্ড্রেড পারসেন্ট খাঁটি বিজ্ঞান। এর পেছনে আছে যে সায়েন্স , সেটা বোঝা মোটেই শক্ত নয়।"

এরপর বিজ্ঞানের মেধাবী ছাত্র দর্জিলদা আমাদের মতো বিজ্ঞান-না-জানা বেচারাদের সুবিধের জন্য পুরো বিষয়টা জলের মতো সহজ করে বুঝিয়ে দিয়েছিল। তবে সেসব জানানোর আগে 'অদ্ভুত কাণ্ড' কী ছিল সেটা খোলসা করা দরকার।

* * * * * * *

আমরা থাকি বেঙ্গালুরুতে। এখানকার আবহাওয়া বেশ মনোরম। এই কারণে 'এয়ার কন্ডিশন্ড সিটি অব ইন্ডিয়া' খেতাবটাও জুটে গিয়েছে শহরটার। সমুদ্রতল থেকে উচ্চতা এবং ভৌগোলিক অবস্থিতির দরুনই এটা হয়েছে সম্ভব ।

কলকাতার প্যাচপ্যেচে গরমের থেকে মুক্তি পেয়ে আমরা পরমানন্দে বিচরণ করছিলাম বেঙ্গালুরুতে। কিন্তু তাল কেটেছিল গত বছর। কেননা গ্রীষ্মকালে পড়েছিল ভালোরকম গরম। আমাদের বাড়ির ছাদে দুটো সাতশো লিটারের কালো রঙের প্লাসটিকের ট্যাঙ্ক বসানো রয়েছে। একটা বরাদ্দ ভাড়াটের (মানে, আমাদের) জন্য, অন্যটা ব্যবহার করেন গৃহস্বামী ও তাঁর পরিবার। রোদের তাপে কংক্রিটের তুলনায় প্লাসটিক ট্যাঙ্কের জল তাড়াতাড়ি গরম হয়। অফিসের দিন সকাল আটটার আগেই স্নানপর্ব সারতে হয়, তাই অসুবিধে হত না। গোল বাঁধতো শনি, রবি আর ছুটিছাটার দিনগুলোয়। বেলা দশটার পর জল বেশ গরম হয়ে উঠতো। গরমের দিনে কে আর উষ্ণ জলে চান করতে চায়? তাই বালতিতে জল রেখে সেই জল মোটামুটি ঠান্ডা হওয়ার পরই স্নান করতে হত সেই দিনগুলোয়। অদ্ভুত কাণ্ডটা ঘটেছিল এরকমই এক দিনে।

সেদিন ছিল শনিবার। সকাল দশটা নাগাদ দর্জিলদা হঠাৎ আমাদের ফ্ল্যাটে বিনা নোটিশে হাজির হল। এসেই গড়গড় করে বলে গেল সারাদিনের প্রস্তাবিত কর্মসূচি। চান-টান করে রেডি হয়ে এখুনি বেরিয়ে পড়তে হবে। গন্তব্য বিশ্বেশ্বরাইয়া মিউজিয়াম। বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিষয়ক এই প্রদর্শশালা আকারে নাকি বেশ বঙ্ঘধ। অনেকগুলো ফ্লোর। চটপট এক্সিবিটগুলো দেখলেও ঘন্টাকয়েক তো লাগবেই। দুপুর দুটো নাগাদ মিউজিয়াম দেখে কোশী'জ রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ সারা হবে। এরপর সিনেমা দেখে কফিশপে ঢুঁ মেরে অবশেষে ফেরা হবে বাড়ি ।

সুজিত দর্জিলদাকে বলল, "প্রোগ্রামটা জব্বর। তবে কাল রাতে জানালেই ভালো করতে। চান-টান করে রেডি থাকতাম। ট্যাঙ্কের জল এতক্ষণে গরম হয়ে উঠেছে। এখুনি চান করা যাবে না। বালতিতে ভরে কিছু সময় ফেলে রাখতে হবে। ঠান্ডা হলে তবেই গায়ে ঢালা যাবে।"

জল-ঘটিত সমস্যায় দিনের কর্মসূচি ভেস্তে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছে দেখেও দর্জিলদা একটুও বিচলিত হল না। রীতিমতো কনফিডেন্সের সাথে ঘোষণা করল, "নো প্রবলেম ! চানের জলের টেম্পারেচার চটজলদি কয়েক ডিগ্রি কমিয়ে ফেলার কায়দা আমার জানা আছে। ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। কলঘরে চল।"

সুজিত ও দর্জিলদা চলল কলঘরের দিকে। কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে আমিও ভিড়ে গেলাম ওদের দলে।

কলঘরে ঢুকে প্রথমেই দর্জিলদা কল খুলে আঁজলা করে হাতে জল নিয়ে টেম্পারেচার আঁচ করার চেষ্টা করল। দেখাদেখি আমরাও জলে হাত দিলাম। বেশ গরম ঠেকল।

কলঘরের কোনায় রাখা প্লাসটিকের গামলাটা দেখে দর্জিলদা বেজায় খুশি হয়ে বলল, "যাক, পাওয়া গেছে। এরকম একটা চওড়া পাত্রই চাইছিলাম।"

সুজিত ও আমি মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। জামা-কাপড় কাচার সময় গামলাটা আমরা ব্যবহার করি। সাদামাটা প্লাসটিকের গামলা দেখে দর্জিলদা কেন এত পুলকিত সেটা আমরা আন্দাজ করতে পারলাম না।

গামলাটা শাওয়ারের নীচে বসিয়ে পুরোদমে জল চালিয়ে দিল দর্জিলদা। গামলাটা ভরে উঠতে শাওয়ার বন্ধ করল। এরপর দর্জিলদা গামলার জলে হাত ডুবিয়ে মুচকি হেসে সুজিতকে বলল, "আশা করি সুজিতবাবু এই জলে স্নান করলে মোটেই কাবু হবেন না !"

গামলায় হাত ডুবিয়ে আমরা তো অবাক ! গামলার রাখা শাওয়ারের জল কলের জলের তুলনায় অনেক ঠান্ডা। এই জলে স্নান করতে কারোরই অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।

* * * * * * *

এর পরের ঘটনা শুরুতেই জানিয়েছি। সেটা আর নতুন করে বলব না। তবে জল ঠান্ডা হওয়ার কারণ নিয়ে দর্জিলদা যা বলেছিল তা ছোট্ট করে জানিয়ে দিচ্ছি।

ফ্রিজের আগমনের আগে গরমের সময় মাটির কুঁজোয় জল রাখার চল ছিল। মাটির কুঁজোয় জল ঠান্ডা হওয়ার কারণ কুঁজোর সছিদ্রতা। কুঁজোর দেওয়ালের সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে আসা ক্ষুদ্র জলবিন্দুগুলো চটপট উবে যায় , মানে বাষ্পীভূত হয়। জল থেকে বাষ্প বনতে তাপ লাগে যেটা মূলত আসে কুঁজোর জল থেকে। কোনো জিনিসে তাপ ঢুকলে সেটা গরম হয় , আর ঠান্ডা হয় তাপ হারালে । তাপ হারায় বলেই ঠান্ডা হয় মাটির কুঁজোয় রাখা জল।

শাওয়ারের জলেও এই রকমের উবে যাওয়ার ব্যাপার ঘটে থাকে। কুঁজোর দেওয়াল দিয়ে বেরিয়ে-আসা জলকণার মতো শাওয়ার-নির্গত জলবিন্দুগুলোও আকারে ছোটো হওয়ায় চায় চটপট উবে যেতে । তবে শাওয়ার থেকে বেরিয়ে কলঘরের মেঝে ছুঁতে যে অল্প সময় লাগে সেটুকু সময়ে এরা পুরোপুরি উবে যাওয়ার সুযোগ পায় না। মানে , ফোঁটার বাষ্পীভবন হয় আংশিক । এর জন্য যে তাপ লাগে সেটা আসে জলবিন্দু থেকেই। কাজেই শাওয়ারের জলের ফোঁটা যত নীচে পড়ে ততই ঠান্ডা হতে থাকে। মজার কথা, শাওয়ারের জল মাথায় পড়ে যে উষ্ণতায়, পায়ের পাতায় পড়ে তার চেয়ে কয়েক ডিগ্রি কম উষ্ণতায় ! শাওয়ারের জল আঁজলা করে ধরে ধীরে ধীরে হাতদুটো উঁচু থেকে নীচে নামালে টেম্পারেচার কমার ব্যাপারটা সহজেই মালুম হয়।

আসলে, বিজ্ঞান-জানা দর্জিলদা 'উবে গেলে শীতল হয়' এই বৈজ্ঞানিক তথ্যকে ব্যবহার করেই আমাদের দিয়েছিল তাক লাগিয়ে !

মহাবিশ্বে মহাকাশে

গ্রহে গ্রহে নানা বিস্ময়

কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

বুধের আকাশে সূর্যোদয়ঃ

বুধ সূর্যের সবচেয়ে কাছের গ্রহ। ছোট্ট গ্রহটা সূর্যের চারপাশে ঘুরপাক খায় একটা ছোট্ট উপবৃত্তাকার কক্ষপথে। মজার কথা সূর্য বুধের কক্ষপথের মাঝখানে নেই। আছে একটা ধারে। ফলে ঘুরপাক খাবার সময় বুধ কখনো সূর্যের কাছে চলে যায়, আবার কখনো অনেকটা দূরে সরে আসে। গ্রহটি যখন সূর্যের কাছে থাকে তখন সূর্য থেকে এর দূরত্ব থাকে ৪ কোটি ৬০ লক্ষ কিলোমিটার। আর যখন দূরে থাকে তখন সূর্য থেকে এর দূরত্ব দাঁড়ায় ৬ কোটি ৯৮ লক্ষ কিলোমিটার। ফলে এর আবর্তনের গতিবেগেও হেরফের হয়। কাছে থাকার সময় এর গতিবেগ থাকে সেকেন্ডে ৩৭ কিলোমিটারের মত, আর দূরে গেলে সেটাই দাঁড়ায় সেকেন্ডে ৫৬ কিলোমিটারের মত। সূর্যের চারপাশে ঘুরতে বুধের যত উৎসাহ নিজের অক্ষের চারপাশে ঘুরতে ততটাই আলস্য। পৃথিবীর হিসাবে সূর্যকে এক পাক দিতে বুধ সময় নেয় মাত্র ৮৮ দিন। সেখানে নিজের অক্ষের চারপাশে একবার ঘুরতে গ্রহটি সময় নেয় ৫৯ দিন। বুধের অক্ষ নিজের কক্ষপথের সঙ্গে ২° হেলানো অবস্থায় আছে। শুধু তাই নয় সূর্য অক্ষের মাঝ বরাবর নেই, আছে একটা ধার ঘেঁষে। এরফলে বুধের আকাশে সূর্যোদয় অদ্ভুতভাবে হয়। প্রথমে দিগন্তরেখায় সূর্য দেখা দেয়। প্রভাত শেষ হতে না হতেই সে আবার লুকিয়ে পড়ে। কিছু সময় পরে আবার সে পূব আকাশে দেখা দেয়। এবারে সে ধীরে ধীরে পৌঁছায় মধ্য গগনে। সেখানে খানিক বিশ্রামের পর সূর্য আট দিন ধরে পিছোতে থাকে। হঠাৎ- ই কী মনে করে আবার সে এগোতে থাকে। চলে আসে মধ্য আকাশে। এরপর ধীরে ধীরে নেমে যায় দিগন্তরেখার দিকে। সন্ধ্যার পর নেমে আসে রাত। আরও একটা মজার ঘটনা ঘটে। পরবর্তী সূর্যোদয়ের ফাঁকে বুধ সূর্যকে দু’বার পাক খেয়ে ফেলে। অর্থাৎ, পৃথিবীর হিসাবে বলা যায় বুধ গ্রহে একটা দিন (এক সূর্যোদয় থেকে অপর সূর্যোদয় পর্যন্ত) হতে দু’টো বছর পেরিয়ে যায়।

<u>(সম্পাদকীয় সংযোজনঃ</u> *কেমন দেখতে হয় বুধের আকাশের সূর্যের এই বিচিত্র গতিকে? বিজ্ঞানিরা যন্ত্র দিয়ে তার এক অসামান্য ভিডিও বানিয়েছেন। সেইসঙ্গে উপরি পাওনা হল, পৃথিবী যদি অমন করে ঘুরতো তাহলে আমাদের*

আকাশের সূর্যের সেই বিচিত্র নাচ কেমন লাগতো দেখতে তারও একটা চলচ্ছবি রয়েছে এই ভিডিওতে। সঙ্গে লিংক দেয় থাকল। দেখে নাও। দারুণ মজারঃ https://www.youtube.com/watch?v=nPprOO2u1gk)

যেখানে বছরে দু'বার সূর্যোদয় হয়ঃ

সূর্য থেকে দূরত্বের বিচারে শুক্র হল দ্বিতীয় গ্রহ। সন্ধ্যায় এবং ভোরে পশ্চিম এবং পূর্ব আকাশে যে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কটিকে আমরা দেখতে পাই সেটাই হল শুক্রগ্রহ। যদিও ভুল করে আমরা 'সন্ধ্যাতারা' এবং 'শুকতারা' বলে থাকি। আসলে আর কোনো গ্রহকে পৃথিবী থেকে এত উজ্জ্বল দেখায় না। এই গ্রহটি আকারে আকৃতিতে প্রায় পৃথিবীর মত। তাই পৃথিবী এবং শুক্রকে যমজ বোন বা সিস্টার প্ল্যানেট (Sister Planet) বলা হয়। পৃথিবী বড়, শুক্র ছোট। দুটি গ্রহের মধ্যে ব্যাসের তফাৎ মাত্র ৬৫২ কিলোমিটার। দুটি গ্রহের মধ্যে মিল যেমন আছে তেমন কিছু কিছু অমিলও আছে। যেমন পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘোরে। তাই আমরা সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত দেখতে পাই যথাক্রমে পূর্ব এবং পশ্চিম দিগন্তে। শুক্রের ক্ষেত্রে ঠিক উল্টোটা অর্থাৎ, গ্রহটি পূর্ব থেকে পশ্চিমে ঘোরে। তাই এখানে সূর্যোদয় হয় পশ্চিম দিগন্তে আর অস্ত পূর্ব দিগন্তে। সৌরজগতে একমাত্র এই গ্রহটিই নিজের অক্ষের চারপাশে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে ঘোরে। কেন? এখনও জানা যায়নি। পৃথিবী নিজের অক্ষের চারপাশে বন বন করে ঘোরে। চব্বিশ ঘন্টায় একটা পাক দেয়। শুক্রের নিজের চারপাশে একটা পাক দিতে সময় লেগে যায় ২৪৩ দিনের মতো। এর কারণ গ্রহটি ২. ৭° হেলানো অবস্থায় সূর্যের চারপাশে ঘোরে। এই কারণে শুক্রগ্রহের কোনো অঞ্চলে একবার সূর্যোদয় হওয়ার পর ১১৭ দিনের মাথায় পুনরায় সূর্যোদয় হয়। তাই বলা যায় শুক্রগ্রহে বছরে দু'বার সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয়। সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে গ্রহটির সময় লাগে ২২৫ দিনের মতো। একটা মজার কথা বলি। শুক্রগ্রহ নিজের অক্ষের চারপাশে ধীর গতিতে ঘুরলেও এর উপরের বায়ুমণ্ডল বন্ বন্ করে ঘুরছে। প্রতি চারদিনে পূর্ব থেকে পশ্চিমে একবার পাক খাচ্ছে। কেন? সে রহস্য এখনও জানা যায়নি।

মঙ্গলে সবুজঃ

মঙ্গলগ্রহকে আমরা লাল গ্রহ বলেই চিনি। খালি চোখে একে একটু লালচে দেখায়। তবে শক্তিশালী দূরবীক্ষণের সাহায্যে দেখলে এর কিছু কিছু অঞ্চলে সবুজের রেখা দেখতে পাওয়া যায়। ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে এই রঙ পাল্টাতে থাকে। শীতে কিছুটা ফ্যাকাসে হয়ে যায়। বসন্ত এলে আবার গাঢ় সবুজ রঙ ফিরে আসে। কিন্তু গরম পড়লেই রঙটা কালচে হয়ে যায়। গ্রীষ্মের শেষে হলদে বা ধূসর। এই ভাবে প্রতি বছরই চক্রাকারে ঐ বিশেষ এলাকার রঙের পরিবর্তন হতে থাকে। সবুজ রঙের রহস্য ব্যাখ্যায় বিজ্ঞানী মহলে তিন ধরনের মতবাদ আছেঃ-

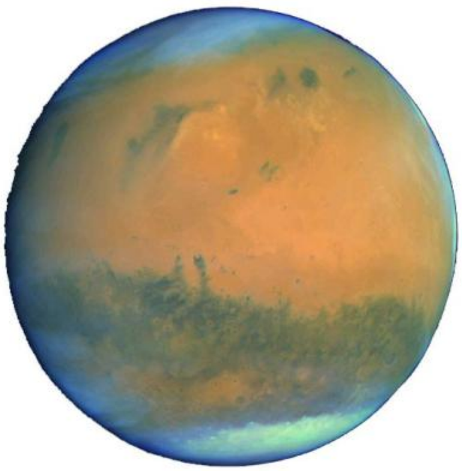

১) ঐ অঞ্চলে জল আছে। তাতে আলোর প্রতিফলন ও প্রতিসরনের জন্য সবুজ রঙের সৃষ্টি

২) শ্যাওলা বা লাইকেন জাতীয় উদ্ভিদ আছে। বসন্ত কালে সামান্য জল ও অক্সিজেন পেয়ে সজীব হয়ে ওঠে। তখন ঐ এলাকা গাঢ় সবুজ দেখায়।

৩) কোনোটাই নয়। সবটাই চোখের ভুল।

বৃহস্পতির লাল চোখঃ

বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গল- সৌরজগতের এই চারটি গ্রহ কঠিন বস্তু দিয়ে তৈরি। এর পর গ্রহাণুদের বিস্তীর্ণ এলাকা পেরিয়ে গেলে প্রথম যে গ্রহটির সঙ্গে দেখা হবে সেটা হল বৃহস্পতি। সৌরজগতের সবচেয়ে বড় গ্রহ। তবে এর কঠিন কেন্দ্রীয় অংশটি তুলনায় খুবই ছোট। বাকিটা সবই গ্যাসীয়। কেন্দ্র অঞ্চলটি ছোট হলেও এর ভর ও মাধ্যাকর্ষণ শক্তি পৃথিবীর তুলনায় অনেক গুণ বেশি। ফলে গ্রহটিতে হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের মত হাল্কা গ্যাস বাঁধা পড়ে আছে। গ্রহটির উপরিতল বলে কিছু নেই। উপরের গ্যাসীয় অংশ সর্বদাই অস্থির। যেন সর্বক্ষণ ঝড় বইছে। পূর্ব থেকে পশ্চিমে ধেয়ে চলা এই ঝড় কয়েক দশক থেকে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত এক নাগাড়ে হতে থাকে। গ্রহটিতে কোনো পাহাড়- পর্বত না থাকায় ঝড়ের কোনো দিক পরিবর্তন হয় না। এই অস্থিরতার দরুন গ্রহটির উপরিভাগের লক্ষণ ও চিহ্নগুলি অনবরত পাল্টাতে থাকে।

তবে কিছু কিছু চিহ্ন কখনই পালটায় না। এরকমই একটা চিহ্ন আছে বৃহস্পতির দক্ষিণ গোলার্ধে। প্রকান্ড আকারের এই লাল দাগটি পৃথিবীর মানুষ গত একশ বছর ধরে একই জায়গায় দেখে আসছে। এটা কত বড় বোঝাতে গেলে বলতে হয় যে এর মধ্যে তিনটে পৃথিবী

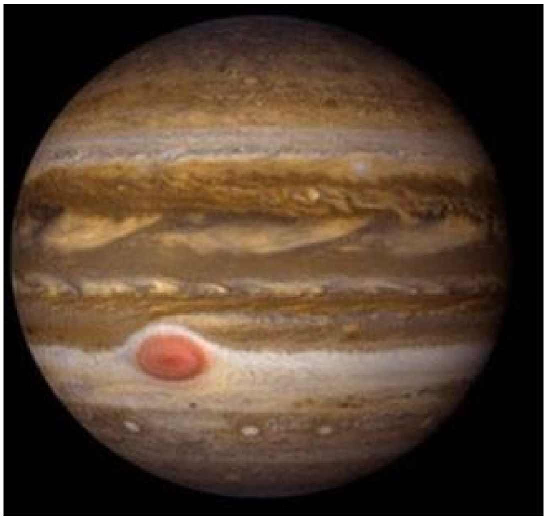

স্বচ্ছন্দে ঢুকে যেতে পারে। এই দাগটাকেই বলা হয় বৃহস্পতির লাল চোখ। এই বিরাট লাল চোখের উৎপত্তির কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা বলছেন, গত একশ বছরেরও বেশি সময় ধরে এখানে বয়ে চলেছে বিপরীতমুখী এক প্রলয়ঙ্কর ঘূর্ণি ঝড়। কবে থামবে জানা নেই। কারণ কোনো ঝড়কে দুর্বল করে দেবার মত ঘর্ষণবল গ্রহটিতে নেই। বৃহস্পতির চোখের রঙ মূলত লাল হলেও মাঝেমাঝে এই রঙের পরিবর্তন ঘটে- কখনো কখনো হাল্কা গোলাপি বর্ণ ধারণ করে। এই লাল রঙের কারণ এখনও রহস্যে ঘেরা।

রহস্যে ঘেরা শনি

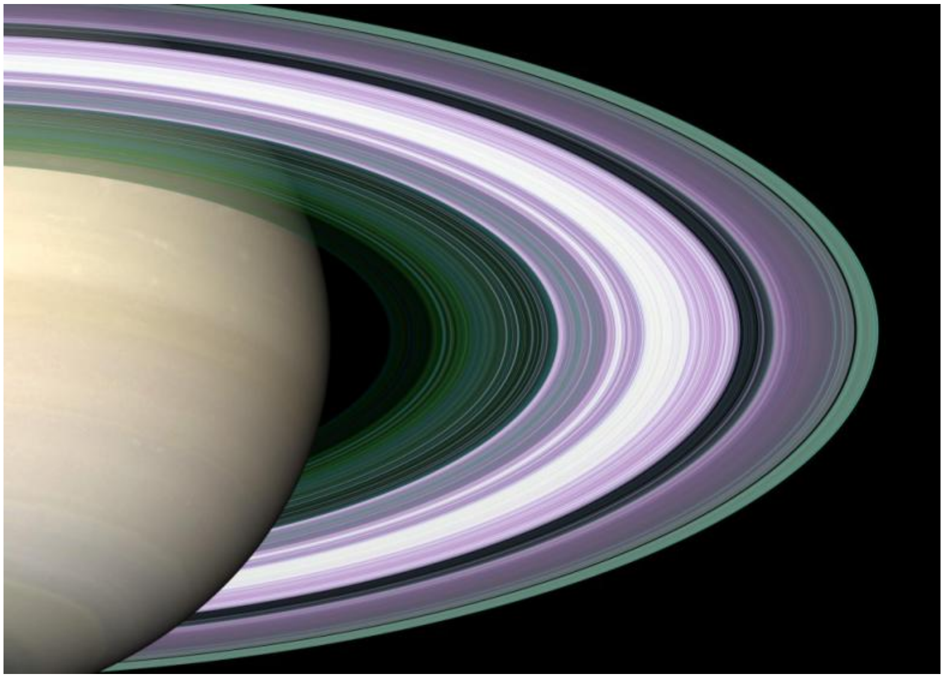

সৌরজগতে যে কটা গ্রহকে পৃথিবী থেকে খালি চোখে দেখা যায় তাদের মধ্যে দূরতম গ্রহ হল শনি। আকৃতিগত বৈচিত্র্যের জন্য শনি প্রাচীনকাল থেকেই মানুষকে আকর্ষণ করে আসছে রহস্যে ঘেরা এই গ্রহটি সৌরজগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহ। যুগ যুগ ধরে একে ঘিরে মানুষের মনে রয়েছে নানা সংস্কার, কুসংস্কার

ও ভীতি। পৃথিবী থেকে শনির দূরত্ব ১৬০ কোটি কিলোমিটার। গ্রহটি কত বড় জান? একটা দুটো নয়, প্রায় ৭০০ পৃথিবী এর পেটের মধ্যে ঢুকে যেতে পারে। এই বিরাট গ্রহটার ভর তাহলে বিশাল হওয়া উচিত? কিন্তু ঠিক উল্টো, পৃথিবীর ভরের মাত্র ৯৫ গুণ। তাই বিজ্ঞানীরা ঠাট্টা করে বলেন, যদি শনিকে ভাসিয়ে দেবার মত বিরাট একটা সমুদ্র পাওয়া যায়, তাহলে শনি তাতে ভাসতে থাকবে। শনির আকাশে পৃথিবীর মতই মেঘমন্ডল আছে। সেখানে আর আছে প্রচুর হাইড্রোজেন, তুলনায় কম হিলিয়াম, কিছু অ্যামোনিয়া এবং মিথেন।

আর্য ঋষিরা এই বিশাল গ্রহটার নাম দিয়েছিলেন 'শর্পৈশ্চর'। শর্পৈ শর্পৈ অর্থাৎ ধীরে ধীরে গমন করে বলেই গ্রহটির ওই নামকরণ করা হয়েছিল। এর গতিবেগ কত, শুনলে অবাক হয়ে যাবে। পৃথিবীর গতিবেগের তিন ভাগের এক ভাগ। শনি সূর্যকে ধীর গতিতে প্রদক্ষিণ করলেও নিজের অক্ষের চারপাশে ওই বিশাল বপু নিয়ে লাট্টুর মত ঘোরে। আমাদের যেখানে দিন- রাত্রি হয় ১২ ঘন্টা ব্যবধানে সেখানে শনির কোনো অঞ্চলের দিন- রাত্রি হয় মাত্র ৫ ঘন্টা ব্যবধানে। হিমশীতল(- ১৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস) এই গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব একরকম অসম্ভব বলেই মনে করেন বিজ্ঞানীরা। মজার কথা হল এই যে গ্রহটি সূর্য থেকে যে পরিমাণ তাপশক্তি গ্রহণ করে তার প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ শক্তির বিকিরণ ঘটায়।

শনির সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ হল তার বলয়। পৃথিবী থেকে মাত্র তিনটে বলয় দেখতে পাওয়া যায়। ১৬৬৬ সালে ডাচ্ পদার্থবিজ্ঞানী ক্রিশ্চিয়ান হাইজেনস্(১৬২৯- ১৬৯৫) প্রথম বুঝতে পারেন যে একটি বিশাল বলয় শনিকে ঘিরে রয়েছে। হাইজেনস্ একটি মাত্র বলয় দেখতে পেয়েছিলেন। এরপর উইলিয়াম হার্শেল আবিষ্কার করেন যে একটি নয়, শনির দুটি বলয় আছে। ইতালির জ্যোতির্বিজ্ঞানী গিয়ান ডোমিনিকো ক্যাসিনি(১৬২৫- ১৭১২) বললেন যে এই বলয় দুটির মাঝখানে একটা ব্যবধান(gap) আছে। ক্যাসিনির নামানুসারে এই ব্যবধানকে বলা হয় ক্যাসিনি ডিভিসন। শনির তৃতীয় বলয়টি আবিষ্কার করেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী বন্ড।

'শনির তিনটি বলয়'- বিজ্ঞানীদের এই ধারণা উল্টেপাল্টে দিল ভয়েজার- ১ মহাকাশযান। শনির কাছে গিয়ে উঁকি মেরে ক্যামেরায় ধরে ফেলল বলয়ের ছবি। তারপর সেই ছবি পাঠিয়ে দিল পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের কাছে। ছবি দেখে বিজ্ঞানীরা অবাক। কোথায় শনির তিনটে বলয়? এ যে হাজারেরও বেশি। শুধু তাই নয়, বলয়গুলির মধ্যবর্তী যে অঞ্চলগুলি ফাঁকা বলে মনে হচ্ছিল, সেখানে রয়েছে একগুচ্ছ(৫০ টির মত) সরু সরু বলয়। সবকটি বলয়ই অমসৃণ এবড়োখেবড়ো কঠিন পদার্থ দিয়ে তৈরি।

এখন প্রশ্ন হল, এই বলয়গুলি তৈরি হল কী ভাবে? কোনো উপগ্রহকে সুশৃঙ্খল ভাবে মহাকাশে বিচরণ করতে হলে তাকে গ্রহটি থেকে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বের বাইরে থাকতে হবে। এই দূরত্বের পরিমাপ হল উপগ্রহটির আড়াই গুণ। এই দূরত্বের মাপকে 'রখের সীমা' (Roches limit) বলা হয়। কোনো কারণে উপগ্রহটি এই সীমা লঙ্ঘন করে যদি গ্রহটির দিকে এগিয়ে আসে তা হলেই দুম্ ফটাস্। বিশেষজ্ঞদের ধারণা শনির কোনো একটি উপগ্রহের এরকমই দশা হয়েছিল। শনির বলয় বলে যা আমরা এখন দেখতে পাই সেগুলি হতভাগ্য উপগ্রহটির দেহাবশেষ। উপগ্রহটা তো ভেঙে গেল। টুকরোগুলির কী হল? সেগুলি শনি এবং গ্রহটির অন্যান্য চাঁদের অভিকর্ষ বলে আটকে গিয়ে শনির চারপাশে উপবৃত্তাকার পথে অনন্তকাল ধরে ঘুরতে থাকল। শনি ছাড়াও বৃহস্পতি এবং ইউরেনাসেরও বলয়ের খোঁজ পাওয়া গেছে। তবে শনির মত এত সুন্দর বলয় সৌরজগতে আর কোনো গ্রহের নেই।

অপরূপ বলয়গুলির জন্যই শনির এত শোভা। এগুলি উবে যাক নিশ্চয়ই আমরা চাইনা। কিন্তু মহাকাশযান ক্যাসিনির পাঠানো ছবিগুলি থেকে বিজ্ঞানীরা যে তথ্য পেয়েছেন তা বেশ উদ্বেগের। শনির বলয় নাকি ধীরে ধীরে উবে যাচ্ছে। আর বলয়কে ঘিরে গড়ে উঠছে জমাট বাঁধা অক্সিজেনের ভান্ডার।

শুয়ে শুয়ে পাক খায় নীলচে সবুজ গ্রহ 'ইউরেনাস'-

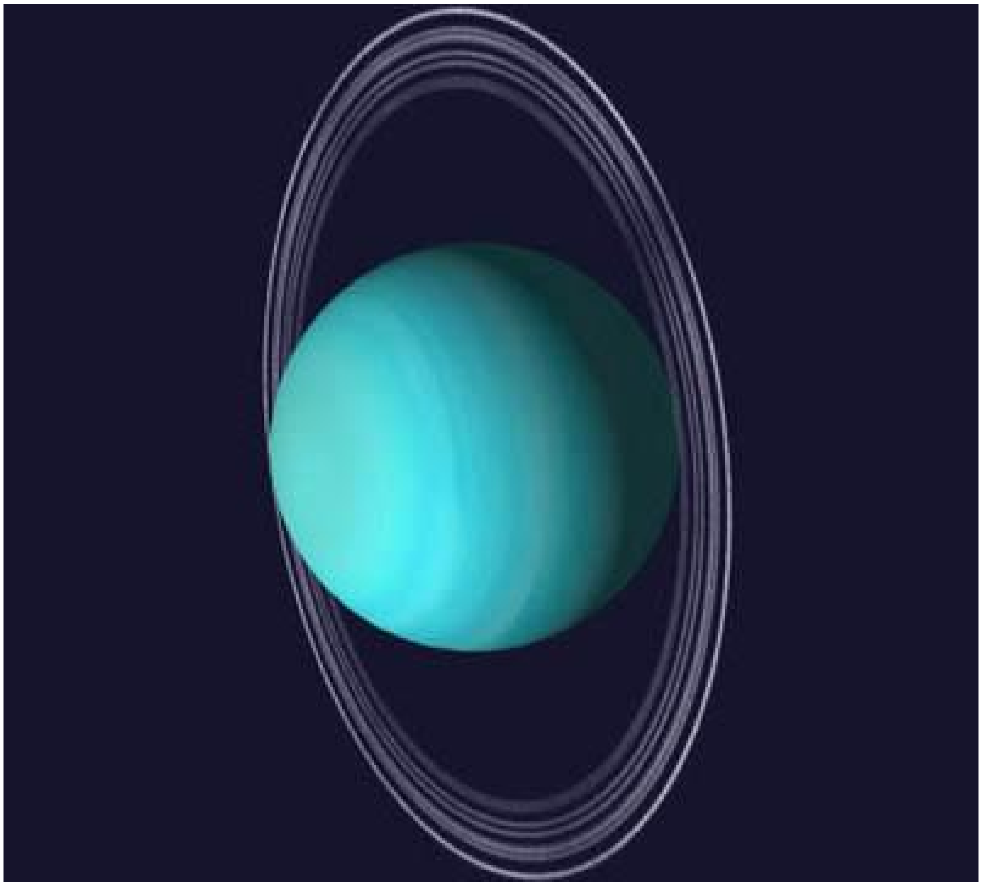

সৌরজগতের তৃতীয় বৃহত্তম গ্রহ ইউরেনাসও বৃহস্পতি ও শনির মত গ্যাসের গোলক। তাই এই গ্রহেরও উপরিতলে কোনো মানুষের পক্ষে দাঁড়ানো সম্ভব নয়। গ্রহটি খুব ধীর গতিতে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবী যে গতিতে ঘোরে ইউরেনাস ঘোরে তার ১/৫ ভাগ গতিতে। আরও একটা মজার কথা হল গ্রহটির অক্ষ তার কক্ষতলের সঙ্গে প্রায় ৯৭. ৮৬ ডিগ্রি হেলে আছে। অর্থাৎ বলা যায় ইউরেনাস যেন শুয়ে শুয়ে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। সৌরজগতের আর কোনো গ্রহের অক্ষ তার কক্ষতলের সঙ্গে এতটা হেলে নেই। এতটা হেলে থাকার ফলে একটা মজার ঘটনা ঘটে। পৃথিবীতে সূর্যকিরণ সবচেয়ে কম পড়ে দুই মেরু অঞ্চলে। ইউরেনাসে ঘটে ঠিক উল্টোটা। এখানে সূর্যকিরণের প্রায় সবটুকুই পড়ে দুই মেরু অঞ্চলে। নিরক্ষীয় অঞ্চলে পড়ে সামান্য। তাই এখানে দিন রাত হয় মূলত মেরু অঞ্চলে। উত্তর মেরুতে দিন শুরু হলে তা চলে টানা ২১ বছর ধরে। তখন দক্ষিণ মেরুতে ঐ একই সময় ধরে চলে রাত। এর পরে সেটা ঘুরে যায়। অর্থাৎ দক্ষিণ মেরুতে দিন এবং উত্তর মেরুতে রাত- ঐ ২১ বছর ধরে। পৃথিবী থেকে ইউরেনাসের নিরক্ষীয় অঞ্চলটি নিয়মিতভাবে দেখা গেলেও মেরু অঞ্চল দুটি পর্যায়ক্রমে দেখা যায় ৪২ বছর অন্তর।

নেপচুনে কালো চোখঃ

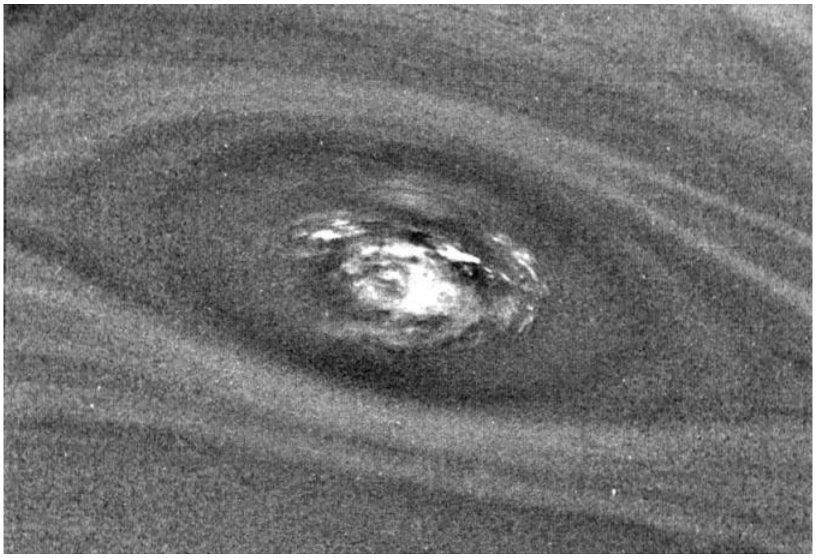

সৌরজগতের চতুর্থ বৃহত্তম গ্রহ নেপচুন ইউরেনাসের থেকে সামান্য ছোট। পুরো গ্রহটাই বরফে ঢাকা। তাই একে বলা হয় বরফের দৈত্য (ice giant)। এখানে সূর্যের আলো পৌঁছায় না বললেই চলে। তাই গ্রহটি অন্ধকারে মিলেমিশে আছে। নেপচুনের দক্ষিণ গোলার্ধে বৃহস্পতির মত একটি বিশাল আকারের চোখ রয়েছে। তবে এটার রঙ লাল নয়, কালো। বৃহস্পতির লাল চোখের আয়তন গ্রহটির আয়তনের সঙ্গে যে অনুপাতে আছে নেপচুনের কালো দাগের আয়তনও গ্রহটির আয়তনের সঙ্গে প্রায় সেই একই অনুপাতে আছে। এটা একটা উচ্চ- চাপযুক্ত এলাকা এবং ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘুরছে।

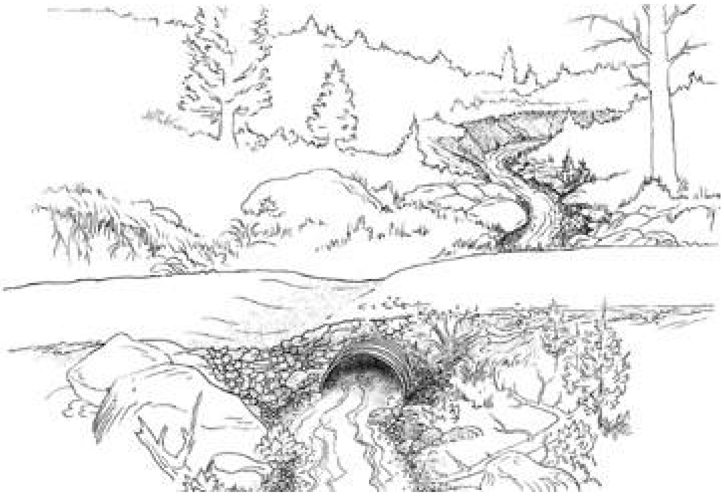

পথের শেষ কোথায়

কিশোর ঘোষাল

সরুগলি থেকে রাজপথ, পথের রকমসকম যাই হোক না কেন, যে কোন পথ আমাদের কোন না কোন লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। আর এই লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্যেই মানব সভ্যতার শুরু থেকেই পথেরও শুরু। আমাদের জীবনে পথ এতটাই গুরুত্বপূর্ণ, কোন রকম বিপদে পড়লেও আমরা পথের সন্ধান করি, সে পথ বিপদ থেকে বেরিয়ে আসার উপায়। মানুষের সভ্যতায় লক্ষ্য যত বেড়েছে, পথের দৈর্ঘ্য ততই বেড়েছে এবং আজও বেড়ে চলেছে। মানুষের এই অবিরাম পথচলাও এক আশ্চর্য বিজ্ঞান।

পাহাড়ের গুহা ছেড়ে, সমতলে জঙ্গল কেটে মানুষ যখন চাষবাস শিখে ফেলল, তখন থেকেই গড়ে উঠতে লাগল গ্রাম। গ্রাম শুরুর সঙ্গে সঙ্গে জরুরি হয়ে উঠল পথ। নির্দিষ্ট একটি সীমার মধ্যে দিয়ে গ্রামের সব লোকের যাওয়া আসার রেখা ধরে শুরু হল পথচলা। এই পথ ধরে কাজের মানুষেরা গ্রাম থেকে মাঠে যেত চাষবাস করতে। ফসল পেকে গেলে, মাঠ থেকে এই পথ ধরেই ফসল কেটে গ্রামে আনত। রাখালেরা সকালবেলা এই পথ ধরেই গ্রামের গরু, মোষ, ছাগল, ভেড়া মাঠে চরাতে নিয়ে যেত, আবার দিনান্তে এই পথ ধরেই তারা ফিরে আসত তাদের নিজের ঘরে। এই সদর পথের সঙ্গে জুড়ে থাকত এক একটা পাড়া, এক একটা বাড়ি। ঘরের লোকের মাঠ থেকে ফিরতে দেরি হলে, সেদিনও পথের দিকে তাকিয়ে, চিন্তা ব্যাকুল মেয়েরা ঘরের দরজায় বসে থাকত।

প্রথম দিন থেকেই এই পথের মালিক গ্রামের জনসাধারণ, কোন একজন মানুষ নয়। শুরু থেকে পথের কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা জরুরি ছিল। পাশের জমি জিরেত থেকে পথ একটু উঁচু হলে ভালো হয়। জলাজমি, খানাখন্দ এড়িয়ে; চাষের জমি, লোকের বাড়ির সীমানা এড়িয়ে, পথ এগিয়ে চলবে বিনা বাধায়। যতটা সম্ভব সমতল এবং সহজ হবে পথচলা। আজকাল পথঘাটের অনেক উন্নতি হলেও পথের এই মূল বৈশিষ্ট্যগুলি কিন্তু একই আছে।

প্রথম দিকের পথগুলি, স্বাভাবিকভাবেই মাটির ছিল। আজও দূরের গ্রামে গেলে যে মেঠো পথ দেখত পাও, একদম সেরকমই। বছরের অন্যান্য সময় মোটামুটি ঠিকঠাক থাকলেও, বর্ষার চার/পাঁচ মাস তার অবস্থা নিদারুণ হয়ে উঠত। বর্ষার পর আবার মাটি ফেলে, বালি ফেলে অথবা ভাঙা ইটের টুকরো ফেলে সেই পথকে আবার পোক্ত বানাতে হত প্রত্যেক বছর। প্রথম দিকে এই মাটির পথ পায়ে চলার মতো সরু ছিল। কিন্তু চাকা আবিষ্কারের পর যখন থেকে গরু, মোষ বা ঘোড়ায় টানা গাড়ি চালু হল, পথ নিয়ে চিন্তাভাবনাও শুরু হয়ে গেল সর্বত্র।

গাড়ির গতি অনেকটাই নির্ভর করে পথের অবস্থার উপর। একটা গাড়ি, কোথাও দুটো গাড়ি চলার মতো চওড়া হয়ে উঠতে লাগল পথ। পথ যত শক্তপোক্ত আর সমতল হবে, গাড়ির

গতি ততই দ্রুত হবে, মালপত্র বইতে সুবিধে হবে। সুবিধে হবে যাওয়া আসার। অতএব, আশেপাশের জমি থেকে রাস্তা আরো উঁচু হয়ে উঠল, বর্ষার জল যাতে কম ক্ষতি করতে পারে। পোড়া ইটের টুকরো ফেলে, পাথরের কিংবা লোহার দুরমুশ দিয়ে ভালো করে পিটিয়ে মুরাম মেশানো মাটি দিয়ে সে পথ পাকা হয়ে উঠত। আজও লক্ষ্য করে দেখবে, যে গ্রামে রাঙা মাটির পথ আছে, সে পথের অবস্থা, কাদামাটি দিয়ে বানানো অন্যান্য পথের থেকে অনেক ভালো অবস্থায় থাকে।

হরপ্পা- মহেঞ্জোদরো সভ্যতার নাম নিশ্চয়ই শুনেছ। পৃথিবীতে সবচেয়ে পুরোনো রাস্তার

খোঁজ পাওয়া গেছে, প্রাচীন এই শহরগুলিতে। যিশুখ্রিষ্টের জন্মের প্রায় চার থেকে সাড়ে তিন হাজার বছর আগে এই শহরগুলির জমজমাট অস্তিত্ব ছিল। সিন্ধু নদ, ঘাঘরা- হাকরা ও সরস্বতী নদীর অববাহিকায় গড়ে ওঠা এই শহরগুলি পাকিস্তান- আফগানিস্তানের সীমানা থেকে আমাদের দেশের গুজরাট, রাজস্থান, জম্মু- কাশ্মীর পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল। এখনো পর্যন্ত এই অঞ্চলে সিন্ধু সভ্যতার সমসাময়িক ১০৫২টি শহরের হদিশ পাওয়া গেছে। শহরের ভিতরে এবং এক শহর থেকে অন্য শহরে যাওয়া আসার জন্যে কত পথ বানাতে হয়েছিল বুঝতেই পারছো। এই পথগুলি ব্যবসা বাণিজ্যের জন্যে বহুল ব্যবহৃত হত। ব্যবসা বাণিজ্য মানেই গরু- মোষ- গাধায় টানা গাড়িতে বোঝাই জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়া আসা।

গুজরাটের আমেদাবাদ শহর থেকে ৮৫ কিমি দূরে সেইসময়কার একটি বন্দর শহরের সন্ধান পাওয়া গেছে, যার নাম লোথাল। এই বন্দর শহর থেকে সমুদ্রপথে সুদূর মিশর, মেসোপটেমিয়ার মতো শহরের সঙ্গে নিত্য বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। বিভিন্ন শহর থেকে তামা, ব্রোঞ্জ, সিসা, টিনের জিনিসপত্র, এই বন্দর শহরের বিশাল গুদামঘরে এসে জমা হতো। লোথালের কাছাকাছি গ্রামে তৈরি হত চিনামাটি ও পোড়ামাটির পাত্র, সোনা, শাঁখ, দামি পাথর বসানো গয়না, হাতির দাঁতের জিনিসপত্র। লোথাল থেকে পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন শহরে এই সব

জিনিসপত্র রওনা হতো সমুদ্রপথে। পথের পরিকাঠামো যথেষ্ট উন্নত না হলে, এত সুন্দর বাণিজ্য পরিচালনা সম্ভব হতো না।

পাকা রাস্তা যেভাবেই বানানো হোক না কেন, বর্ষার প্রকোপে কিংবা ভারি জিনিষপত্র বওয়া গরুর গাড়ির চাকার চাপে প্রায়ই ভেঙে যেত কিংবা বসে গিয়ে অসমান হয়ে যেত। আরো উন্নততর পথের ভাবনা থেকে এসে গেল পাথরে বাঁধানো (paved) পথ। শহরের ভিতরে যেখানে বাণিজ্যিক ব্যস্ততা সবচেয়ে বেশি, সেইসব এলাকায় পথ বানিয়ে তোলা হত পাথরের ছোট বড়ো ব্লক (block) বসিয়ে অথবা পাতলা স্ল্যাব (slab) বসিয়ে। এই পাথর ছেঁটে খুব মসৃণ করা হতো না, বরং একটু খসখসে (rough) রাখা হত, কারণ তাতে গাড়ির চাকা পিছলে যাবার সম্ভাবনা কমে যেত। শহরের, মধ্যে বিশেষ করে, রাজারাজড়ারা যে সব অঞ্চলে থাকতেন, সেই সব রাজপথ ও অন্যান্য পথ, এই সেদিন পর্যন্ত, এরকমই পাথর বাঁধানো হত। আমাদের রামায়ণ মহাভারতের যুগেও প্রধান শহরের রাজপথগুলি এই ভাবেই বানানো হতো। এইসব রাজপথেই রাজারা রানিদের সঙ্গে নিয়ে ছুটে চলতেন ঘোড়ায় টানা দু চাকা কিংবা চারচাকার রথে। মোটামুটি একই সময়ে ইউরোপের গ্রিস ও রোমেও এই

রকম পাথরে বাঁধানো পথের নিদর্শন অনেক পাওয়া গেছে।

আগেই বলেছি চাকা এবং গাড়ির উন্নতির সঙ্গে পথের উন্নতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অতএব ঘোড়ার গাড়ির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উন্নত পথের ভাবনাও চলতেই লাগল। যে পথ সহজে খারাপ হবে না। বৃষ্টিতে চট করে নষ্ট হবে না। অথচ গাড়ি চলবে মসৃণ গতিতে।

স্কটল্যাণ্ডের এক পথপ্রযুক্তিবিদ জন লাউডন ম্যাকাডামকে আধুনিক পথের জনক বলা হয়। রাস্তার চওড়া অনুযায়ী, বেশ কিছুটা মাটি কেটে ফেলে সরিয়ে ফেলে, তার মধ্যে বিছিয়ে দিলেন একটু বড় আকারের (৭৫ মিমি) ভাঙা পাথরের বোল্ডার। তার ওপরে বিছিয়ে দিলেন ছোট আকারের (২০মিমি) পাথরকুচি। তারপর বড়ো পাথরের মধ্যে রয়ে যাওয়া ফাঁকগুলো ভরাট করে দিলেন আরো ছোট পাথর কুচি, পাথরের গুঁড়ো, বালি অথবা ভালো মাটি দিয়ে। ম্যাকাডাম সাহেব পথের মাঝখানটা সমতল না রেখে, মাঝখানটা একটু উঁচু করে দুধারে ঢালু করে দিলেন, যাতে

বৃষ্টির জল গড়িয়ে পড়ে যায় রাস্তার দুধারে। ১৮২০ সালে আমেরিকায় এবং ১৮৩০ সাল নাগাদ ইউরোপের সবদেশেই ম্যাকাডাম সায়েবের এই পদ্ধতিতে নতুন পথ বানানোর কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল।

তাঁর নাম অনুসারে এই পদ্ধতির পথকে ম্যাকাডাম পথ (Macadam road) বলা হয়।

এই পথ ঘোড়ায় টানা গাড়ির পক্ষে খুব উপযুক্ত হলেও, অনেকগুলো অসুবিধেও ছিল। যেমন এই পথে ভীষণ ধুলো হত। তাছাড়া অল্পস্বল্প বৃষ্টিতে বড়ো ক্ষতি না হলেও একটানা ভারী বৃষ্টিতে এই রাস্তাও খারাপ হয়ে যেত। এরপর ১৮৮৬ সালে যখন প্রথম মোটরগাড়ি পথে নেমে পড়ল, তখন পথের আরো উন্নতি জরুরি হয়ে পড়ল। আর সেই ভাবনা থেকেই এসে গেল পিচের পথ (pitch road)। ম্যাকাডাম পদ্ধতিতেই পথ বানিয়ে তার ওপরে বিছিয়ে দেওয়া হল বালি ও পিচের ঘন আস্তরণ। বৃষ্টির জল পিচের তেমন ক্ষতি করতে পারে না, অতএব পিচের এই স্তর পাথরের মধ্যে জল ঢোকা আটকে দিল। আর পাথরের স্তরটাকে চেপে ধরে থাকার জন্যে পাথরের কুচি সরে গিয়ে পথ বসে যাওয়ার সম্ভাবনাও কমে গেল।

মাটির গভীর থেকে যে তেল ওঠানো হয়, তাকে বলে অপরিশোধিত (crude) পেট্রোলিয়াম। পেট্রোলিয়াম পরিশোধনের জটিল প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায় থেকে উৎপন্ন হয় পেট্রল, ডিজেল, কেরোসিন, রান্নারগ্যাস, ইঞ্জিনের তেল, অ্যাসফল্ট, টার ইত্যাদি। এই টার আর অ্যাসফল্ট থেকেই পিচ পাওয়া যায়। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই জ্বালানি তেলের চাহিদা বেড়ে গেল বহুগুণ। প্রায় গোটা ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান, রাশিয়া সর্বত্র উড়োজাহাজ, যুদ্ধের ট্যাংক, কামান, সৈন্যদের বড়ো বড়ো ট্রাক, ভ্যান চলতে লাগল হাজারে হাজারে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছিল সাধারণ মোটরগাড়ির ব্যবহার।

অতএব, দেশে দেশে পেট্রোলিয়ামের পরিশোধন বাড়াতে হল বহুগুণ, যাতে গাড়ি চালানোর জন্যে যথেষ্ট জ্বালানি তেল পাওয়া যায় এবং তার ফলে উৎপন্ন হতে লাগল প্রচুর অ্যাসফল্ট আর টার। এদিকে নানান যানবাহনের অত্যন্ত চাপ বাড়ার জন্যে পিচ-পথের থেকেও শক্তপোক্ত আর মসৃণ বড়ো বড়ো সড়ক পথ বানানোর ভাবনা চিন্তা শুরু হয়ে গেল। ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্যে অন্যদিকে আবিষ্কার হতে লাগল, পথনির্মাণ শিল্পের জন্যে নানান ধরনের যন্ত্রপাতি। মাটি কাটার জন্যে এক্সক্যাভেটার (excavator), মাটি কিংবা পাথর বিছিয়ে পোক্ত করার জন্যে রোড রোলার (road roller), পথের ওপর পিচ বা অ্যাসফল্টের আস্তর বিছানোর জন্যে পেভার (paver) ইত্যাদি নানান রকম। যার ফলে, দারুণ পোক্ত বড়ো বড়ো পথের কাজ চটপট সেরে ফেলা অনেক সহজ হয়ে গেল।

এইসময়, পথের সংজ্ঞাও বদলে ফেলতে হল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহরের যোগাযোগের জন্যে যে সড়ক পথ, তার নাম হল হাইওয়ে। মাঝখানে তৈরি করে দেওয়া হল বিভাজক (di vi der) । বিভাজকের একদিকে গাড়ি যাবে, অন্যদিক দিয়ে গাড়ি আসবে। এইবার এক এক দিকে কতগুলি করে গাড়ি পাশাপাশি যেতে পারবে সেই হিসেবে, পথের নাম হতে লাগল, চার লেন, ছয় লেন বা তার চেয়েও বেশি। চার লেন মানে, রাস্তার বিভাজনের দুপাশে দুটো করে গাড়ি যেতে কিংবা আসতে পারবে। এইভাবে ছয় লেন মানে দুদিকে তিনটি করে লেন। এক লেন- পথ সাধারণতঃ ৩.৭৫ মি চওড়া হয়, আর একাধিক লেনের সড়কপথের প্রত্যেকটি লেন কমপক্ষে ৩.৫ মি হতেই হবে।

হাইওয়ের থেকেও দ্রুত বাধাহীন চলার জন্যে এখন তৈরি হচ্ছে এক্সপ্রেসওয়ে। এই এক্সপ্রেসওয়ের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য এবং শর্ত আছে। যেমন, এই সড়কপথের দুইধার বরাবর বেড়া থাকতে হবে, যাতে কোন লোকজন কিংবা প্রাণী কোনভাবেই চলার পথে না আসতে পারে। অন্য কোন ছোট রাস্তার সঙ্গেও এই রাস্তার সরাসরি কোন যোগাযোগ কিংবা মোড় রাখা চলবে না। এক্সপ্রেসওয়েতে কোন ধীর গতির গাড়ি, যেমন সাইকেল, রিক্‌শ, ভ্যান, স্কুটার, বাইক ঢুকতে দেওয়া হয় না। এক কথায়, এক্সপ্রেসওয়েতে গাড়ির চলা শুরু হলে, কোন কারণেই গাড়ির গতি কমাতে হবে না বা কোন বাধার জন্যে দাঁড়াতে হবে না।

ভারতের প্রথম এক্সপ্রেসওয়ে মুম্বাই- পুণে এক্সপ্রেসওয়ে। ছয় লেনের এই সড়কপথে মুম্বাই থেকে পুণের ৯৩ কিমি দূরত্ব দুই থেকে আড়াই ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাওয়া যায়। আগে এই

পথ পাড়ি দিতে সময় লাগত পাঁচ ঘন্টা বা তারও বেশি। ২০০২ সালে এই এক্সপ্রেসওয়ে চালু হয়ে আজ ভারতের সবচেয়ে ব্যস্ত সড়কপথ হিসেবে খুবই সফল হয়েছে। আমেদাবাদ- বরোদা এক্সপ্রেসওয়েটি ৯৫ কিমি দীর্ঘ। ভারতের প্রথম চার লেনের এই এক্সপ্রেসওয়ে চালু হয়েছিল ২০০৪ সালে আমেদাবাদ থেকে বরোদার মধ্যে, এই সড়কপথের দূরত্ব ৯৫ কিমি।

ভারতে এছাড়াও অনেক এক্সপ্রেসওয়ে চালু হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেগুলির অধিকাংশই এক্সপ্রেসওয়ের প্রধান শর্ত ও বৈশিষ্ট্যগুলি পুরোপুরি না মেনে তৈরি। সেই কারণে নিরাপত্তা কম এবং প্রায়ই মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে যায়।

গুরুত্ব অনুযায়ী এক্সপ্রেসওয়ে বা হাইওয়ে অনেক সময় কংক্রিটের ঢালাই দিয়ে তৈরি করা হয়। এই পদ্ধতিতে খরচ অত্যন্ত বেশি হলেও, অনেকবেশি ভার, তীব্রগতি, বর্ষা কিংবা তীব্র রোদ সহ্য করার ক্ষমতাও অনেক বেশি। ম্যাকাডাম পদ্ধতিতেই এই সড়ক পথের ভিত তৈরি করে, খুব উচ্চশক্তির ঢালাই করে দেওয়া হয়। তারপর ঢালাইয়ের উপর বিছিয়ে দেওয়া হয় বিশেষ ধরনের অ্যাসফল্ট বা টার। এই অ্যাসফল্টের স্তরের স্থিতিস্থাপকতা বড়ো বড়ো ভারবাহী গাড়ির চাকার প্রচণ্ড চাপ থেকে ঢালাইয়ের স্ল্যাবকে অনেকটাই রক্ষা করে। মুম্বাই- পুণে এক্সপ্রেসওয়ের অনেকটাই কংক্রিটের ঢালাই দিয়ে তৈরি।

এক্সপ্রেসওয়ে ও হাইওয়ের থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ সড়কপথের নাম রাজ্য উচ্চপথ (State highway)। এই সড়ক পথ গুরুত্ব অনুযায়ী বিভাজক দিয়ে দু লেনের বানানো হয় কিংবা বিভাজক না দিয়ে দুটি গাড়ি যাবার মতো চওড়া করা হয়। এই ধরনের সড়কপথে গাড়ির গতি বেশ কমে যায়। সামনের গাড়িকে চট করে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার মতো জায়গা থাকেনা। তাছাড়াও স্থানীয় ছোট গাড়ি, অটো, রিকশ, ভ্যানের জন্যেও পথ চলায় বিঘ্ন ঘটে।

রাজ্য উচ্চপথের চেয়েও কম গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা হল জেলা উচ্চপথ(district highway) এই সড়ক পথ ৪ থেকে ৪.৫ মি চওড়া হয়। উল্টো দিক থেকে বড়ো গাড়ি এলে গতি কমিয়ে রাস্তার ধারে সরে যেতে হয়, কিংবা দাঁড়িয়েই পড়তে হয়।

এর চেয়েও কম গুরুত্বপূর্ণ পথ হল গ্রামের পথ (Rural Road)। ভারতের প্রত্যন্ত গ্রামেও পিচবাঁধানো পাকা রাস্তা তৈরি করে দেবার প্রকল্প নিয়ে, ২০০০ সালের ২৫ শে ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় সরকার "প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা"(PMGSY) প্রকল্প শুরু করেছিলেন। চোদ্দ বছর পরেও সে পথ নির্মাণের গতি খুবই ধীর এবং অধিকাংশ পথই আবার, মেরামতির অভাবে নষ্ট হবার পথে।

তোমাদের মধ্যে অনেকেই মুম্বাই- পুণে এক্সপ্রেসওয়ের অত্যাধুনিক রাস্তা পার হয়ে, সেই দশহাজার বছরের পুরোনো প্রযুক্তির রাঙামাটির পথ ধরেই হয়তো আজও ঘরে ফেরো। পথের শেষ কোথায়, বলতে পারো?

আবহাওয়াবিদ আন্না মনি

সংহিতা

আন্না মনির জন্ম ১৯১৮ সালে। ত্রিবাঙ্কুর মানে এখনকার থিরুভানান্তপুরম জেলার পিরুমেদুতে এক ধনী পরিবারে। বাবা ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। একাধিক এলাচ বাগানের মালিক এই পরিবারের আট ভাইবোনের মধ্যে সাত নম্বর সন্তান আন্নামনি পড়াশোনায় শুরুতে খুব বেশি উৎসাহ পান নি পরিবার থেকে।

কিন্তু আন্না মনি পড়াশোনা করতে ভালোবাসতেন। স্থানীয় পাবলিক লাইব্রেরির যত মালয়ালাম বই ছিল সে সব তাঁর শেষ হয়ে গেল আট বছর বয়সে। বারো বছর বয়সের মধ্যে সেখানকার সমস্ত ইংরিজি বইও পড়া শেষ।

আট বছরের জন্মদিনে বাবা এনে দিয়েছিলেন একজোড়া হিরের দুল। আন্না কিন্তু বেঁকে বসেছিলেন। সে উপহার তিনি নেবেন না। তার বদলে চেয়ে বসলেন এক সেট এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা।

এই আট বছর বয়সটা আন্না মনির জীবনে খুব গুরুত্বের ছিল আরো একটা কারণেও। সে বছরই , মানে ১৯২৫ সালে গান্ধিজি এলেন ভৈকম- এ তাঁর জাতীয়তাবাদি আন্দোলনের সূত্রে। নিচুজাতের মানুষদের মন্দিরে প্রবেশাধিকার দেবার জন্য সত্যাগ্রহ আন্দোলনের স্লোগান উঠল, "এক জাত, এক ধর্ম, এক ঈশ্বর"।

সেই যে মাতৃভূমি আর গান্ধিজির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা তৈরি হল আন্না মনির মনে, সারাজীবন তাকে তিনি বজায় রেখেছেন। খাদি ছাড়া আর কোন পোশাক পরেন নি জীবনে।

মনে ভেবেছিলেন ডাক্তার হবেন। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞান পড়ার পর আর কিছুতেই চিকিৎসাশাস্ত্র পড়তে তাঁর ইচ্ছে করে নি। ১৯৩৯ সালে তখনকার মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বিএসসি পাশ করেছিলেন তিনি। সাম্মানিক ডিগ্রি পেয়েছিলেন পদার্থবিজ্ঞান আর রসায়নে। ১৯৪০ সালে সদ্য গ্র্যাজুয়েট আন্না মণি হিরে আর চুনির মধ্যে দিয়ে আলোর গমনাগমন নিয়ে গবেষণায় বুঁদ হলেন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স- এ অধ্যাপক ডঃ সি ভি রমনের তত্ত্বাবধানে। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ এর মধ্যে পাঁচটি গবেষণাপত্র প্রকাশ পেল তাঁর। এর পরেও ১৯৪৫ সালে যখন তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর গবেষণাপত্র জমা দিলেন পিএইচডি ডিগ্রির জন্য তখন তাঁকে সে ডক্টরেট ডিগ্রি দেওয়া হয় নি কারণ পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর এমএসসি ডিগ্রি ছিল না। তার বদলে তিনি পেলেন ইংল্যান্ডে গিয়ে পড়াশোনা করবার জন্য একটা স্কলারশিপ।

কাজেই আন্না মণি পদার্থবিজ্ঞান পড়ার জন্য বিলেতে পাড়ি দিলেন। কিন্তু শেষে তিনি আবহাওয়া বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত পড়াশোনা করেছিলেন লন্ডনের ইম্পেরিয়াল কলেজ থেকে। ১৯৪৮ সালে দেশে ফিরে যোগ দেন আবহাওয়া দপ্তরের পুণে শাখায়। অসংখ্য গবেষণা পত্রে ঋদ্ধ করেছিলেন আবহাওয়া বিজ্ঞানের যন্ত্রানুসঙ্গ। ১৯৭৬ সালে অবসর নেওয়া পর্যন্ত উন্নীত হয়েছিলেন দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল পদ অবধি। ১৯৮০ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর লেখা

বই, দ্য হ্যান্ডবুক ফর সোলার রেডিয়েশন ডাটা ফর ইন্ডিয়া। ১৯৮১ সালেও প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর লেখা ভারতের সূর্য বিকিরণ সংক্রান্ত তথ্য সম্বলিত বই সোলার রেডিয়েশন ওভার ইন্ডিয়া।

১৯৮৭ সালে কে আর রামনাথন পদক পেয়েছিলেন তিনি। ২০০১ সালে জীবনাবসান ঘটে তাঁর। ব্যাঙ্গালোরের রমন রিসার্চ ইনস্টিটিউটে আজও আন্না মনির সেই পিএইচ ডি না পাওয়া গবেষণাপত্রটা সযত্নে রক্ষিত রয়েছে।

লক্ষ করি পক্ষীকে

প্যাঁচা কয় প্যাঁচানি, খাসা তোর চ্যাঁচানি

মনস্বিনী ঘোষাল

কাক, শালিক, পায়রা, চড়াই...... এই পাখিগুলি ছাড়া কলকাতা শহরের আশেপাশে আর কোন পাখি সেভাবে কোনদিন চোখেই পড়েনি কিংবা চোখে পড়লেও মনে রাখিনি।

তখন পড়তাম ক্লাস টেনে। ঘুম থেকে উঠে ঘুমের রেশ মাখা ঢুলু ঢুলু চোখে দাঁত মাজতে গেলাম। মুখে ব্রাশ নিয়েই বারান্দায় বেরিয়ে এলাম, জানালার বাইরে থেকে আসা কাকেদের কা কা আর তাদের কাঁই-কিঁচির শুনে। দেখি একদল কাক ভিড় করে "কা-কা" করে চলেছে, সামনের বাড়ির জানলার কার্নিশে বসে। পাশ থেকে আসা একটা 'খ্যাস খ্যাস' শব্দে তাকিয়ে দেখতেই বুঝতে পারলাম কাকগুলোর উত্তেজনার কারণ। একটি প্যাঁচা!

প্রথমবার দেখলেও চিনতে অসুবিধে হয়নি। কলকাতা শহরে তার আগে পাখিটির দেখা না মিললেও ছোটবেলার রঙিন বইয়ে এবং মা লক্ষ্মীর বাহন রূপে পাখিটি বেশ পরিচিত।

মাকে ডেকে দেখাতে মা বললেন, "পেঁচা রাতের পাখি। বেচারা কোন কারণে রাতের মধ্যে বাসায় ফিরতে পারেনি, তাই বিপাকে পড়ে গেছে। দিনের বেলা পেঁচা ভালো দেখতে পায় না। কাকেরা এখন জোট বেঁধে ওকে বিরক্ত করবে।" আমি ভয় পেয়ে বললাম, "তাহলে কী হবে, কাকেরা ওকে ঠুকরে দেবে?"

মা বললেন, "না, না, অতটা সাহস করবে না, কারণ পেঁচার নখের আর ঠোঁটের শক্তির খবর কাকেদের জানা। পেঁচাটা এইখানেই হয়তো সারাদিন চুপটি করে বসে থাকবে, তারপর সন্ধে হলে উড়ে যাবে অন্য কোথাও।"

কলকাতায় রোজ দেখা পাখিগুলোর বাইরে এই প্রথম একটি অন্যরকম পাখি দেখলাম এবং সেই থেকেই একটু-একটু আগ্রহ শুরু হল পাখি-দেখার এবং পাখি-চেনার। ওইদিন ওই পাখি এবং তার ছবি থেকেই আমার Bird watching(পাখি-দেখার শখ)-এর ক্যামেরাখড়ি। ইংরেজিতে এই পাখির নাম Barn Owl, বাংলায় 'লক্ষ্মী প্যাঁচা'।

ফটোগ্রাফিঃ লেখক

লাউডগা

পল্লব চট্টোপাধ্যায়

ছোটবেলায় আমরা থাকতাম বিহারের একটি সুন্দর ছোট শহরে। পাকাবাড়ি, বাঁধানো রাস্তাঘাট, ইলেক্ট্রিকের আলো- পাখা আর বাজার- হাট- ক্লাব- হাসপাতাল- কারখানা ছিল বলেই শহর, তা নইলে প্রকৃতি ও নির্জন পরিবেশের দিক দিয়ে দেখতে গেলে তাকে গ্রাম বলাই ভাল। সে শহরে যেমন ছিল সার ও সিমেন্টের নামকরা কারখানা, ভাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, তেমনি ছিল একদিক দিয়ে কুলুকুলু করে বয়ে চলা দামোদর নদ, অজস্র মাঠ, পুকুর ও গাছপালা- ঝোপঝাড়।

পুটুস বলে একরকম খুব ছোট- ছোট ফল ফুটে থাকত বাগানের বেড়ার গায়ে গায়ে, পাকলে ওগুলো কালো হয়ে যেত আর কী মিষ্টি লাগত খেতে! অবশ্য বাবা- মাকে লুকিয়ে খেতে হত, কারণ তাঁদের মতে ওগুলো ছিল অখাদ্য নিষিদ্ধ ফল। এছাড়া গোপাল বলে নলখাগড়া জাতীয় একরকমের অসংখ্য আগাছা ছিল চারপাশে। কারো কোনও কাজে না লাগলেও আমরা তার নরম অথচ মজবুত ডাল ভেঙে গোবর- ডান্ডা বলে একরকমের খেলা খেলতাম। মোটকথা নাম- কে- ওয়াস্তে শহরে বাস করলেও পুকুর- মাঠ- নদী- গাছপালা এরাও ছিল আমাদের খেলাধুলার অন্যতম সঙ্গী।

আমরা কারখানার অফিসার কলোনিতে থাকতাম। প্রত্যেককে বাগান করার জন্যে যথেষ্ট জমি দেওয়া হয়েছিল কোয়ার্টারের লাগোয়া। অনেকে তাতে করতেন ফুলের চাষ, কেউ বা সুন্দর ঘাসের লন। আমাদের বাসার সামনের দিকে ফুল ও লন থাকলেও বাগানের পেছন দিকে

ছিল বেশ কিছু বড়ো গাছ, যেমন সজনে, আম, পেয়ারা আর টোপাকুল। বলা বাহুল্য, আমাদের ছোটবেলাটা মাটিতে কম আর গাছে গাছেই বেশি কেটেছে। আমার এক পিসতুত দাদা খোদনদা ডাক্তারি পড়ত, মাঝে মাঝে বেড়াতে এলেই শাসিয়ে যেত। বলত, জানিস, ডারউইন সাহেব বলেছেন মানুষ আগে বাঁদর ছিল, গাছে গাছে ঘুরে বেড়াত। তারপর যখন সভ্য হয়ে গাছ থেকে নেমে এল, অমনি লেজ পড়ল খসে, ওরা মানুষ হয়ে গেল।

আমার তাই শুনে একটাই ভয় হত। মাঝে মাঝে পেছনে হাত দিয়ে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে নিতাম কি জানি অজান্তে লেজ বেরিয়ে গেল কিনা।

ছিল পেয়ারাগাছ। কুলগাছের কথাও বলেছি, কিন্তু কাঁটা ছিল বলে তাতে চড়া যেত না, তাই আমি আর গণেশ ঢিল ছুঁড়েই কুল পাড়তাম। সেদিকে ছিল আর এক বিপদ। ঢিল প্রায়ই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পেছনের নিন্নিদের বাসায় চলে যেত আর নিন্নি এসে রেগেমেগে পাঞ্জাবি ভাষায় ঝগড়া করত। তাই বিশাল পেয়ারাগাছটাই ছিল আমাদের বন্ধুদের দলের শীতের দুপুরের আড্ডা। আমাদের গাছটাতে প্রায় সারাবছরই মিষ্টি পেয়ারা ফলত, তবে গরমকালে তার স্বাদই হত আলাদা। পাকা পেয়ারার লোভে উড়ে এসে জুড়ে বসত যতরাজ্যের টিয়াপাখি। আমাদের কম্পিটিশন ছিল তাদের সাথে। আর ছিল শুঁয়োপোকা, গায়ে লাগলে আর রক্ষে নেই, জ্বালিয়ে মেরে দেবে। আবার তারা কদিন পরেই ছোট্ট কাঠের টুকরোর মত বাক্স বানিয়ে তার ভেতর ঢুকে পড়ত, আমরা জানতাম, ছ'মাস পরে তারা বেরিয়ে আসবে সুন্দর সুন্দর রংচঙে প্রজাপতি বা মথ হয়ে।

তবে সেই পেয়ারাগাছেই ছিল আরেকজাতের অতিথি, যাদেরকে প্রায় দেখাই যেত না, অথচ তাদের উপস্থিতি দস্তুরমত টের পেয়েছিলাম একবার। আসছি সে কথায়।

দেখা যেত না শুনে কি তোমরা ভাবছ ভূত? আরে না না। দেখা না যাওয়ার আরেকটা প্রাকৃতিক কারণ আছে যাকে ইংরেজিতে বলে 'ক্যামুফ্লেজ' (camouflage)। জন্তু-জানোয়ারদের শত্রুর হাত থেকে বাঁচার জন্যে বা শিকার ধরার সুবিধের জন্যে এটা একটা প্রকৃতির দেওয়া বিশেষ সুবিধা। যেমন বাঘের হলুদ- কালো ডোরা ঝোপেঝাড়ের রঙের সাথে খাপ খাওয়ায় বাঘ সবার সামনে থেকেও লুকিয়ে থাকতে পারে। বহুরূপী গিরগিটিরা তো পরিবেশের রঙের সাযুজ্যে নিজের গায়ের রঙই বদলাতে থাকে তাই তাদের chameleon বলা হয় ইংরেজিতে।

তা এতসব আগে জানা থাকলে কি এরকম হত সেদিন আমার সাথে? অন্যদিনের মতো পেয়ারাগাছে চাপার পর দেখি উপরের ডালে মস্ত একটা ডাঁশা!

পেয়ারার গুণগ্রাহীরা জানবে সত্যিকারের ডাঁশা পেয়ারার স্বাদ পেতে দেবতারাও মানুষ হয়ে জন্ম নিতে চায় । অগত্যা আমিও তরতরিয়ে উপরের ডালে উঠতে থাকলাম । পেয়ারার ডালের বিশেষত্ব এই যে ওগুলো চিমড়ে হলেও বেশ শক্ত হয়, একটা সরু ডালের উপরও উঠে দাঁড়ান যায়, ভেঙে পড়ে না চট করে।

কিন্তু বিপদ এলো অন্য দিক থেকে। হঠাৎ যেন একটা সবুজ বিদ্যুৎ মগডাল থেকে উড়ে এসে চোখের উপর ঝলসে উঠল, আর তার পরেই বাঁ হাতের কব্জির ওপর অসহ্য ব্যথা । গাছের উপর থেকে কোনও মতে পড়ে যাওয়া থেকে সামলে নিয়ে ওই সবুজ বস্তুটা নিয়েই তরতরিয়ে নেমে এলাম। তখন চোখে পড়ল জিনিসটা। গাছের ডালের সাথে রং এমন ভাবে মিলিয়ে ছিল যে এত কাছে থেকেও চোখে পড়ে নি । একটা লাউডগা সাপ! ব্যস, মুহূর্তেই আমি অজ্ঞান।

বন্ধুরা তো ভাবল আমি মরেই গেছি। ভাগ্যিস সেই সময় খোদনদা গরমের ছুটিতে এসেছিল, এক বন্ধু বুদ্ধি করে তাকেই ডেকে নিয়ে এল। সাপটাকে ততক্ষণে সাহসী বন্ধুরা মেরে ফেলেছে। দেখে খোদনদা ভ্রূ কুঁচকে বলল, “ও, Vine snake. চিন্তার কিছু নেই, কিছু হবেনা। না, না, বাঁধন দেওয়ারও দরকার নেই। স্পিরিট দিয়ে ধুয়ে দিচ্ছি, আর এককাপ গরম দুধ- ওতেই সেরে যাবে। আহা, তোরা নিরীহ সাপটাকে মেরে ফেললি? আরে ওদের বিষ থাকে না। দাঁড়া তোদের একদিন food chain আর ecological balance system টা বোঝাতে হবে, তবে যদি কিছুটা শিক্ষা হয়!”

“তাহলে ও অজ্ঞান হয়ে গেছল কেন খোদনদা?” তোতোন জিগ্যেস করল।

“সে তো ভয়ে, যখন বুঝতে পারল ওকে সাপে কামড়েছে। কী রে, ঠিক বলি নি?” শেষ প্রশ্নটা আমাকে, ততক্ষণে উঠে বসেছি।

“আর যদি বিষ থাকতোই, তোদের ঐ বাঁধনে কাজ হত কচু।”

“কেন আমরা তো কামড়ের জায়গার দু- তিন ইঞ্চি ওপরেই বাঁধছিলাম,” একজন উত্তর দিল।

“দূর বোকা, বাঁধন যদি শিরায় চেপে না বসে কী লাভ তাতে। কবজি থেকে কনুই পর্যন্ত এক জোড়া হাড় গেছে, তাদের নাম ulna আর radius, বিষাক্ত রক্তের শিরার অবস্থান যদি ও দুটোর মাঝে থাকে, তবে যত চেপেই বাঁধো, শিরায় চাপ পড়বেনা কিছুতেই।

“তাহলে হাতে বিষাক্ত সাপ কামড়ালে কী উপায়?”

“উপায় আছে। কনুই থেকে কাঁধ পর্যন্ত গেছে একটি মাত্র হাড়, humerus, অতএব সেখানে বাঁধন দিলে হাতের যে কোনও শিরায় চাপ পড়তে বাধ্য। যাক্ গে সাপ মরল, লাঠিও ভাঙল না, কিন্তু আমার ফি কে দেবে?”

“আমার কাছে তো পয়সা নেই, বাবাকে বলব।”

“ওরে বাবা, মামার কাছে চাইবি আমার ফি? তুই আমার মামাবাড়ি আসা বন্ধ করবি দেখছি। যা, যেটা দেখেছিলি, ওই পেয়ারাটা পেড়ে এনে আমায় খাওয়া, তাহলেই হবে।”

“আবার চাপব গাছে?” আমি ভয়ে ভয়ে শুধোলাম।

“আলবাত চাপবি, একশোবার চাপবি...দেখলি তো লাউডগা সাপের কোনও বিষ নেই। তাছাড়া ওই কবিতাটা আছে না, 'কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে...' , তারপরের লাইনটা কী যেন? কই, বলনা রে!”

কে বলবে? আমি তো ততক্ষণে গাছের মগডালে!

সুপারি

অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়

সুপারির ব্যবহার নেই এমন বাড়ি প্রায় পাওয়া যায় না। সুপারি খাওয়ার অভ্যাসের ইতিহাস দীর্ঘ দিনের। খাবার পর মুখশুদ্ধি হিসাবে সুপারির টুকরো মুখে রাখেন অনেকে। যারা পান খান তাঁরা পানের সঙ্গে সুপারি ব্যবহার করেন। তাছাড়া পূজায় সুপারির ব্যবহার আছে বিশেষ করে হোম এবং অন্য অনুষ্ঠানে।

পূর্বে বণিকেরা জলযানে করে এই ফলটি নিয়ে যেতেন বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশ সমূহে বাণিজ্যের জন্য। তাই তাঁদের সফর সঙ্গীর নাম হয়েছিল ‘সফরী’। এই শব্দ থেকেই আজকের সুপারি নামটি এসেছে। এমনটাই মনে করেন আয়ুর্বেদাচার্য শিবকালী ভট্টাচার্য। আমাদের দেশে সুপারিকে গুয়া, পূগ ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয়।

ভারতবর্ষের পার্বত্য অঞ্চল বাদে সর্বত্র সুপারির চাষ হয়। বঙ্গদেশে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ এবং অধুনা বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে এই গাছের চাষ করা হয়। এছাড়া এশিয়া মহাদেশের অনেক দেশেই সুপারির চাষ হয়।

সুপারি একবীজপত্রী উদ্ভিদ। এই গাছ সরু, লম্বা এবং শক্ত। কাণ্ড শাখা প্রশাখাহীন। গাছের উচ্চতা সাধারণত ২০- ৩০ ফুট, তবে এর চেয়ে আরও লম্বা গাছ দেখা যায়। সুপারি গাছের পত্রের অবস্থান পরস্পরের বিপরীত। লম্বা পত্রদন্ডের প্রান্তভাগে পাতার ফলকটি থাকে। পাতা লম্বা, শক্ত মধ্যশিরা যুক্ত। মধ্যশিরার দুই পাশ থেকে লম্বা লম্বা পাতা (পত্র ফলক) বের হয়।

পুস্পদন্ডে বহু শাখাপ্রশাখা রয়েছে। গ্রামের মানুষেরা একে কাঁদি বলে। কাঁদিতে প্রচুর ফল ধরে। ফলগুলি কাঁচা অবস্থায় সবুজ, পাকলে হলুদ, লাল বা কমলালেবু রঙের হয়ে যায়। ফলগুলি খোসাযুক্ত। আকারে গোলাকার অথবা ডিম্বাকৃতি। খোসা ছাড়ালে শক্ত সুপারি দেখতে পাওয়া যায়। সুপারি গাছের বৈজ্ঞানিক নাম Ar eca cat echu । গাছটি ‘এরেকেসি’ পরিবারভুক্ত।

বর্ষার সময় বীজ পুঁতে সুপারি গাছের চারা তৈয়ারি করা হয়। সুপারির চাষ একটি লাভজনক ব্যাবসা।

ভেষজ হিসাবে ব্যবহার্য অংশ

ফল, ফুল, কাণ্ডের খোসা এবং শিকড়।

সুপারি গাছে প্রাপ্ত রাসায়নিক

সুপারি গাছ থেকে বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক পাওয়া যায়, এর মধ্যে এরেকলিন এবং এরেকাইডিন উল্লেখযোগ্য।

সুপারি খাওয়ার সুফল এবং কুফল

সুপারির এলকলয়েড দেহে এড্রেনেলিন ক্ষরণ করে, এর ফলে সুপারি খাওয়ার পর মনে তৃপ্তির ভাব আসে। সুপারিতে এরেকলিন থাকার সুবাদে অতিরিক্ত সুপারির ব্যবহার মুখের ক্যান্সারের অন্যতম কারণ বলে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন।

আয়ুর্বেদ/ ভেষজ ব্যবহার

ক) কুচো ক্রিমি দমনে এবং ক্রিমি সংক্রমণের উপসর্গ চিকিৎসায়

খ) রক্তআমাশয় চিকিৎসায়

গ) অজীর্ণে

ঘ) ঘায়ে

ঙ) সংক্রমণজনিত দন্তরোগে

চ) দাঁতের পায়রিয়া রোগ দমনে এবং দাঁতের মাড়ি থেকে রক্ত পড়া বন্ধে

(দ্বিতীয় পর্ব)

কেম্যাজিকেশ্বরের আবির্ভাব

ছায়ার মুখ দিয়ে হাতে একটা কমন্ডলু নিয়ে মন্ত্র পড়তে পড়তে হলঘরে ঢুকছেন জাদুকর। কমণ্ডলু থেকে গঙ্গাজল হাতে নিয়ে মেঝেতে জল ছিটিয়ে আসছেন। তাঁর পেছনে পেছনে আসছেন দুই শাগরেদ। একজনের হাতে সিঁদুরের ফোঁটা লাগানো আর গাঁদাফুলের মালা পরানো একটা নারকেল, আর আরেক হাতে একটা ডম্বরু। ঘণ্টার "টিলি লিং টিলি লিং" আর ডম্বরুর "ডুগ ডুগ ডুগ ডুগ" শব্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নারকেলটাকে প্রায় মাথার ওপর উঠিয়ে নাচের ছন্দে ছন্দে প্রথম শাগরেদ পরম ভক্তিভরে টেবিলের ওপরে একটা উলটো করে রাখা ত্রিপদীর ওপর নারকেলটা বসিয়ে দিলেন। এদিকে ঘন্টা আর ডম্বরুর শব্দ উচ্চগ্রামে বাজছে। এমন সময় হঠাৎই জাদুকর "ব্যোম্ ব্যোম্ ব্যোম্ ব্যোম্- বোলে ব্যোম্ ব্যোম্ ব্যোম্" বলতে বলতে কমন্ডলু থেকে হাতে জল নিয়ে দু- তিনবার দর্শকের ওপর ছিটিয়ে দিলেন। দর্শকদের মধ্যে হুলুস্থুল লেগে গেল।

আরম্ভ হল জাদুকরের কান্ডকারখানা। "জয় বাবা কেম্যাজিকেশ্বর" বলে বলে নারকেল রাখা টেবিলের চারপাশে ঘুরতে আরম্ভ করলেন। এইরকম করতে করতে হঠাৎই "হে বাবা কেম্যাজিকশ্বর", তুমি এখানে আবির্ভূত হও, তুমি এখানে এসে অধিষ্ঠান কর"- ইত্যাদি বলতে বলতে কমন্ডলু থেকে জল হাতে নিয়ে নারকেলটার ওপর ছিটিয়ে দিতে শুরু করলেন। আধা মিনিটের মতন সময়ের পরই দেখা গেল যে নারকেলের মাথায়

দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। “জয় বাবা কেম্যাজিকেশ্বর, জয় বাবা কেম্যাজিকেশ্বর” বলে নারকেলে জ্বলতে থাকা আগুনের দিকে হাতজোড় করে মাথা নুইয়ে তিনজনই প্রণামের ভঙ্গি করলেন। এদিকে ঘণ্টা আর ডম্বরুর উচ্চগ্রামে বেজে চলার ফাঁকে দর্শকের হাততালি আর হল্লায় পুরো হলঘর গমগম করছে।

আগুনের রহস্যটা কোথায়?

একটা শুকনো নারকেলের মাথার দিকের খোসাকে দা কিংবা কাটারি দিয়ে হাঁ করিয়ে বেশ এবড়োখেবড়ো করে দেওয়া হল। খেয়াল রাখতে হবে যে ছোবড়াগুলি যাতে মাথা থেকে সম্পূর্ণ সরে না যায়। শুধু ফাঁক ফাঁক করে এলোমেলো করে তারপর তাকে ভালো করে রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। জাদু দেখানোর পূর্বমুহূর্তে ধাতব সোডিয়ামের ছোট ছোট আট- দশটা টুকরো কেরোসিনের তলা থেকে উঠিয়ে ফটাফট “ব্লটিং পেপার্”- এ শুকিয়ে ওই ছোবড়ার মধ্যে জায়গায় জায়গায় গুঁজে দিয়ে টেবিলে আনা হয়েছে।

এ ম্যাজিকটাকে বুঝতে হলে একটু বিজ্ঞান জানা দরকার। ব্যাপারখানা বলি।

যে কোন মৌলিক পদার্থ তৈরি হয় সে পদার্থের সবচেয়ে ছোটো বস্তু ‘পরমাণু’ দিয়ে।

এই পরমাণুর মাঝখানে থাকে কয়েকটা ছোটো ছোটো ভারী জিনিস। তাদের বলে নিউট্রন আর প্রোটন। নিউট্রন আলাভোলা লোক। তার কোন ইলেকট্রিক চার্জ নেই। কিন্তু প্রোটনের মধ্যে ইলেকট্রিক চার্জ আছে। পজিটিভ ইলেকট্রিক চার্জ।

কিন্তু তাহলে যে কোন বস্তুকে ধরলেই তাতে ইলেকট্রিক শক লাগে না কেন? কারণটা মজার। পরমাণুর এই ভেতরের এলাকাটাকে ঘিরে কয়েকটা কক্ষপথে গ্রহের মতন ঘুরতে থাকে একরকমের হালকা কণা। তাদের নাম ইলেকট্রন। একেকটা ইলেকট্রনের মধ্যে থাকে একেকটা প্রোটনের সমান পরিমাণ ইলেকট্রিক চার্জ, তবে সেটা হয় উলটো , মানে নেগেটিভ চার্জ।

একটা পরমাণুতে যতগুলো প্রোটন থাকে ঠিক ততগুলো ইলেকট্রন থাকে। ফলে তাতে মোট পজিটিভ চার্জ আর তার উলটো মোট নেগেটিভ চার্জ সমান হয়ে যায়। এই দুজন একে অন্যকে কাবু করে রাখে, তাই যে কোন বস্তুকে ছুঁলে আমাদের ইলেকট্রিক শক লাগে না।

প্রকৃতির আরেকটা উদ্ভট নিয়ম হল, ইলেকট্রনের ওইসব কক্ষপথের একেকটায় সবচেয়ে বেশি কটা করে ইলেকট্রন থাকতে পারবে তার সংখ্যাটা একেবারে বাঁধা। যেমন ধরো সবচেয়ে ভেতরের কক্ষতে সবচে বেশি দু খানা ইলেকট্রন থাকতে পাবে। তার বাইরের কক্ষপথে খুব বেশি হলে আটখানা, তার বাইরের কক্ষ খুব বেশি হলে ১৮খানা—তার বাইরের কক্ষ হলে বড়োজোর ৩২টা এইরকম।

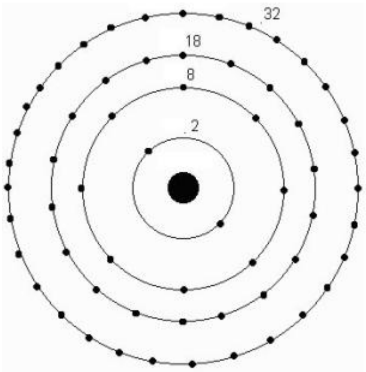

এইবারে ধরো কোন বস্তুর পরমাণুতে চোদ্দখানা প্রোটন আছে।(এই বস্তুটার নাম হল সিলিকন। বালিতে থাকে) তাহলে তার ইলেকট্রনও থাকবে চোদ্দখানা। সেক্ষেত্রে তার একেবারে

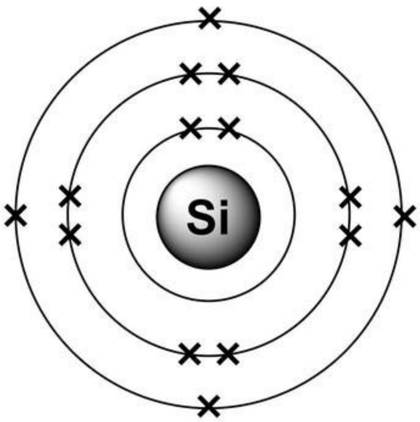

ভেতরের কক্ষপথে ইলেকট্রন হবে দুটো। তার বাইরের কক্ষপথে ইলেকট্রন হবে আটটা। তার বাইরের কক্ষপথে ইলেকট্রন থাকবে অবশিষ্ট চারখানা।(মানে ওখানে আঠারোখানা থাকতে পারে বটে, কিন্তু বেচারার হাতে তো আর মোটে চারখানাই বাকি আছে। তাই সে আর কী করে? সেই চারখানাকেই বাইরের কক্ষে সাজিয়ে বসে আছে।)

তবে মজা আছে একখানা। পদার্থদের জগতে কিছু মৌলিক পদার্থ আছে, যারা হল গিয়ে মহান টাইপ। যাদের সবচেয়ে বাইরের কক্ষপথে প্রকৃতির অংক অনুযায়ী ওই ২, ৮, ১৮, ৩২ সংখ্যার ইলেকট্রন থাকে তারা হয় মহান মৌল। এরা চুপচাপ একা একা থাকে। অন্যদের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়াটিক্রিয়া কিছু করে না।

এইবার মজা হল, যারা মহান নয়, সেইসব পদার্থের পরমাণুরা সবসময় মহান মৌলদের মতন হতে চায়। সে অবশ্য ভালো কথা। ভালো হতে কে না চায় জগতে? কিন্তু প্রশ্ন হল কীভাবে?

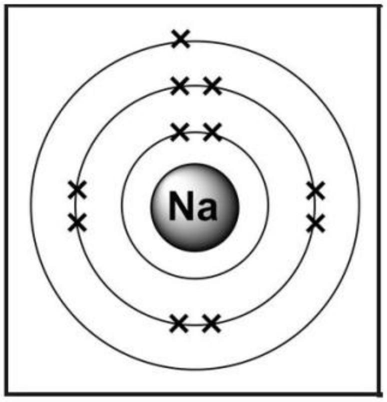

বলছি শোন। সোডিয়াম মৌলটার প্রোটনের সংখ্যা হল গিয়ে ১১। ফলে তার ইলেকট্রন সজ্জাটা হবে এইরকম--

এখন সে বেচারা ভাবে, আহা, আমার বাইরের ওই একখানা ইলেকট্রন যদি কাউকে দান করতে পারতাম তাহলে তখন আমার যে সবচেয়ে বাইরের কক্ষটা হত তাতে ইলেকট্রন হত আটখানা। সেইটে হল ম্যাজিক নম্বরদের একটা। তাহলেই আমি মহান হব।

সে তখন করে কি, বেজায় ব্যস্ত হয়ে চারপাশে খুঁজতে থাকে কে এমন আছে যাকে সে তার ওই একখানা ইলেকট্রন গছাতে পারে।

তখন যদি তার কাছে একটু জল আনো,(H_2O), তাহলে সোডিয়াম থেকে পাবার মতো ইলেকট্রনটা দেখেই জল তার অণু থেকে একটা "প্রোটন" ($H+$) ছেড়ে দেয়। আর এই প্রোটনটা ইলেকট্রনটিকে কপ করে গিলে একটা প্রশম (Neutral) হাইড্রোজেন পরমাণুতে রূপান্তরিত হয়ে পড়ে। তোমরা তো জানই যে হাইড্রোজেন পরমাণু একটা একা একা থাকতে পারে না, মানে সুস্থির নয়। তাই এধরনের দুটো হাইড্রোজেন পরমাণু জুড়ে গিয়ে অণুতে (Molecule) পর্যবসিত হয়।

এই কথাগুলি বলতে আমাদের অনেক সময় লাগলো, কিন্তু বিক্রিয়াটা ঘটে দ্রুত আর বেজায় তাপ তৈরি হয়। হাইড্রোজেন গ্যাসটা অতিশয় দাহ্যও(Inflammable) । এই হাইড্রোজেন গ্যাস বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শে এসে বিক্রিয়াজাত তাপের সাহায্যে সঙ্গে সঙ্গে জ্বলতে শুরু করে দেয়। অবশিষ্ট সোডিয়ামও, আগুনের এই তাপে বাতাসের অক্সিজেন পেয়ে পুড়তে শুরু করে আগুনের প্রাবল্য বাড়িয়ে দেয়। এরসঙ্গে জ্বলার জন্যে নারকেলের শুকনো ছোবড়া তো আছেই।

অতএব দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে লাগলো।

$2Na+2H_2O \rightarrow H_2+2[Na^+ + OH^-]$+তাপ

$2H_2+O_2$(বাতাস) তাপ...$2H_2O$+আগুন

$4Na+O_2$(বাতাস) $\xrightarrow{\text{তাপ}}$ $2Na_2O$+আগুন

সাবধানতা

ধাতব সোডিয়াম সবসময় কেরোসিনের নীচে রাখতে হবে। একখানা ইলেকট্রনকে তাড়াবার লোভে সুযোগ পেলেই বাতাসে থাকা অক্সিজেন ও জলবাষ্পের সঙ্গে এটা বিক্রিয়া ঘটায়।

শরীরের সংস্পর্শে কোনোভাবেই সোডিয়ামকে আসতে দেবে না।এটা ভয়ঙ্কর রকমের ক্ষয়কারী(Corrosive) বস্তু।

জাদু দেখানোর ঠিক পূর্বমুহূর্তে সোডিয়ামকে নারকেলের ছোবড়ায় সংস্থাপন করতে হবে।

নারকেলের ছোবড়া খুব ভালো রকমে শুকিয়ে নিতে হবে। দর্শকদের দিকে জাদুকর যে জল ছিটিয়ে দিয়েছিলেন, তারও একটা উদ্দেশ্য আছে। এতে করে তাদের বোঝানো হল যে কমণ্ডলুতে নির্ভেজাল জল ছাড়া আর কিছুই নেই।

ক্রমশ

রসায়ন ৩

অমিতাভ প্রামাণিক

বোরন কেন যে ফোড়ন কাটে রে, সবাইকে শুধু জ্বালাতে !
আলু মিনিমাম না জুটলে চলে অ্যালুমিনিয়াম থালাতে?
গালে আম নিয়ে গ্যালিয়াম ভাবে, কীসেতে ইন্ডিয়াম?
ইন্দ্রের থালে আম যদি থাকে, তা কি নয় থ্যালিয়াম?
এদের বাচন নেহাৎই পাঁচন, এরা নয় মোটে হীন
গ্রুপ থ্রিতে এরা ভিড় করে আছে, যোজ্যতা তাই তিন।
এই থিকে থ্রিএ বলা হয় -, আর থ্রি বিতে রয়েছে অন্য -
মেটালেরা, থ্রিএ গ্রুপ থার্টিন বলা হয় তারই জন্য। -
সবচে' দূরের কক্ষে এদের তিনটে ইলেকট্রন –
দুটো এসএ থাকে -, একখানা পিতে -, ঘুরে চলে বনবন।
চারখানা ধাতু, বোরন অধাতু, সবাই কঠিন হলে
মন্দ হত না, তবে গ্যালিয়াম এমনি থাকে তরলে।
তিন যোজ্যতা, তা নিয়ে বোরন কারো কাছে কাছে ঘোরেন !
তিনটে এইচ জুড়ে গিয়ে তাতে পরিণত হয় বোরেন।
কিন্তু তাতে তো ঝামেলা মেটেনা, বাঁধেনা যে ভালো গাঁট –
তিনে তিনে হয় ছ'ইলেকট্রন, ভালো হতে লাগে আট।
এই কারণেই বোরেনেরা সব জুড়ে নিজেদের মাঝে
ডাই -, ট্রাইএই জাতীয় বোরেন হয়ে - বেশ জোড়া সাজে।
বোরিক অ্যাসিড হয় জুড়ে তিন হাইড্রক্সিল ধাগা
সোডিয়াম টেট্রাবোরেট হল সোনার সেই 'সোহাগা'!
বোরোদিয়ে যত ক্রিম মাখো -, যথা বোরোলীন, বোরোপ্লাস
বোরন যৌগ জীবাণু মারায় ওতে তুরুপের তাস।
ল্যাবরেটরিতে অথবা কিচেনে 'বোরোসিল' গ্লাস দেখে

ঘাবড়ে যেওনা, বোরোসিলিকেটকেই - সংক্ষেপে লেখে।
অ্যালুমিনিয়াম সবচেয়ে বেশি সহজলভ্য ধাতু।
বাসনপত্রে ব্যবহার ভারি, বাটিভরা খাও ছাতু !
পলিমাটি যত, যাতে চাষ হয়, নদীনালাদের পেট
ভরে থাকা মাটি অধিকাংশই অ্যালুমিনোসিলিকেট। -
হালকা এবং সহজেই মেলে, তড়িৎচালক ভারি,
ইলেকট্রিকের তারে তাই এর ব্যবহার জোরদারই।
সাজগোজ কারো সম্পূর্ণ কি জেমস্টোন পরা বিনা?
রুবি স্যাফায়ার -– জেনে রেখো এরা কেলাসিত অ্যালুমিনা।
রুবিতে কিছুটা ক্রোমিয়াম থাকে, তাই চুনি হয় রাঙা
স্যাফায়ার নীল, আয়রন আর টাইটানিয়ামে চাঙা।
বেরিলিয়াম অ্যালুমিনোসিলিকেট হল এমেরাল্ড, গ্রিন
এটাই যখন নীলরঙা, তার নাম অ্যাকোয়ামেরিন।
অ্যালাম মানে তো ফটকিরি, জানো, লাগে জলশুদ্ধিতে।
অ্যালুমিনিয়াম আর এক মেটাল সালফেট এতে মিতে।
বাকি যে মেটাল, তাদের ব্যাপারে বড়ো হয়ে জেনে নিও।
রসায়ন খুবই মজার জিনিস, অবশ্যপঠনীয়। -

ভালু

স্বপ্না লাহিড়ী

পাহাড়ের কোলে জঙ্গলের গা ঘেঁসে জানমতির কুঁড়েঘরটি দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে এখন সে একাই থাকে। মাটির দেয়াল আর টিনের চাল, চালের ওপর জানমতি নিজেই শুকনো পাতা ডালপালা দিয়ে ঘরটিকে গ্রীষ্মের দাবদাহ , বর্ষার জল আর ঠাণ্ডা থেকে বাঁচায়। দরজার সামনে ছোট্ট দাওয়াটি তার রান্নাঘর। মাটির ঘর আর উঠোনটিকে সে গোবর মাটি দিয়ে নিকিয়ে সেখানে পরম যত্নে তুলি ছুঁইয়ে মাটির ওপর লাল কালো মাটির রঙ দিয়ে ফুল, লতাপাতা, মানুষ, পাখি, জন্তুজানোয়ার আঁকে। উঠোন ঘিরে তার ছোট্ট বাগানে গাঁদা করবী জবা বেল টগর ফুটে থাকে, আর থাকে শিম বেগুন লঙ্কা কুমড়ো লাউ যা তার যৎসামান্য প্রয়োজনীয় সবজির জোগান দেয়। জঙ্গলের মধ্যে একটি তুররা (ঝর্না)। তার জল কলকল করে বয়ে যায় গোটা বছর। সক্কালবেলা জানমতি তুররার জলে স্নানাদি সেরে ঘড়ায় করে জল নিয়ে এসে আগে বাগানের পরিচর্যা করে, তারপর খড়কুটো জ্বালিয়ে দুটো ভাত ফুটিয়ে নেয়। যেদিন তার কিচ্ছুটি করতে ভালো লাগে না, সেদিন সে দাওয়ায় বসে ভাবে পুরনো দিনের কথা ।

জানমতির মনে হয় সে কতকাল আগের কথা, যখন এ জায়গাটা লোকজনে গমগম করত। জঙ্গল কেটে সাফ করে কয়লা খাদানের শ্রমিকরা এখানে বসতি, যাকে এরা দফাই বলে, শুরু করেছিল। সেই দলে জানমতি, তার ছেলে সমরু, ছেলের বউ আর দুটি ছোট ছোট নাতিনাতনিও ছিল। সামান্যই মাইনে পেত তারা, কিন্তু যা পেত তাতেই তাদের দু"বেলার ভাত আর পরনের কাপড়ের জোগাড় হয়ে যেতো। বড়ো আনন্দে ছিল তারা। দিন গেলে সন্ধেবেলা দেয়ালের খুঁটি থেকে মাদল নামিয়ে তার ছেলে সমরু যখন বাজাতে বসত, আশপাশের পুরুষ মেয়েরা দল বেঁধে এসে জুটত তার উঠোনে। শুরু হত তাদের নাচ আর গান, কখনো করমা, কখনো বা সুয়া, সইলা। মাদলের থাপ আর নাচে গানে ঝমঝম করে উঠত রাতের আকাশ চাঁদ নক্ষত্র। রাত বাড়লে মহুয়ার রসে টইটুম্বুর হয়ে ঢলে পড়তো নিদ্রাদেবীর কোলে।

মাঝে মাঝেই কানাঘুষোয় শোনা যাচ্ছিল, খাদান বন্ধ হয়ে যাবে। বিশ্বাস করতে মন চাইছিল না কারো। একটা থমথমে ভাব চারদিকে। তারপর, একদিন এলো সেই ভয়ঙ্কর

দুঃসংবাদ। খাদান সত্যিসত্যিই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাই কারো চাকরি যাবে, কেউবা বদলি হয়ে যাবে অন্য খাদানে।

এক এক করে সবাই চলে গেল। সমরু বদলি হয়ে চলে গেল অনেক দূরে সেই চার্চায়। থেকে গেল একা জানমতি। সমরুর শত অনুনয় বিনয়েও সে তার নিজের হাতে গড়া ঘরটি ছেড়ে যেতে চাইল না।

মাঝে মাঝে সমরু এসে তাকে দেখে যায়, টাকাপয়সা, চালডাল, সংসারের দরকারি জিনিসপত্র দিয়ে যায়। প্রথম দিকে বউবাচ্চা নিয়ে আসত, এখন বাচ্চারা বড়ো হয়ে গেছে। স্কুলে পড়ে, তাই আর আসতে পারে না, সমরু একাই আসে। বাচ্চাদুটোর জন্যে মন কেমন করে জানমতির, কিন্তু কী আর করা যায়, পড়াশোনা তো আগে!

যে অরণ্য কেটে সাফ করে জনমানুষের বসতি বসেছিল, তারা চলে যেতে অরণ্য সেখানে নিজের জনপদ বিস্তার করতে থাকলো ফের। এখন জানমতির কুঁড়েঘরের চারদিকে শাল মহুয়া শিমুল পলাশ বাসা বেঁধেছে। সকাল সন্ধে কতরকম পাখি ঝাঁক বেঁধে আসে সেখানে, সারাদিন অবিশ্রাম কিচিরমিচির ডাক আর হুটোপুটি চলে। জঙ্গল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার বাসিন্দাদেরও আনাগোনা বেড়েছে। তাই অন্ধকার নামলেই জানমতি ঘরে ঢুকে দোর দেয়, আর হায়নার হাসি, শেয়ালদের ঐকতান, নিশাচর পাখির আওয়াজ শুনতে শুনতে সে কখন ঘুমিয়ে পড়ে। ভোরের পাখিরা গান গেয়ে তার ঘুম ভাঙায়। মাঝে মাঝে সে টের পায় তেন্দুয়া, ভালুকের চলাফেরা, কিন্তু বন্ধ দোরের পেছনে কোনও ভয় নেই তার।

এমনি করেই দিন কেটে যাচ্ছিলো জানমতির। কিন্তু সেদিন একটা ব্যাপার হল। সকালে তুররা যাবে, ঘড়া নিয়ে দাওয়া থেকে নামতেই চোখে পড়ল বেড়ার পাশের শাল গাছটার নীচে একটা ছোট্টো ভালুকছানা অঘোরে ঘুমুচ্ছে। থমকে দাঁড়াল সে, ভালো করে দেখে নিল চারধারটা। বাচ্চা যখন আছে, তার মা- ও নিশ্চয় আছে ধারেপাশে কোথাও! ভালুকরা খুব হিংস্র হয় এই সময়। সাবধানে থাকাই ভালো। অথচ তাকে যেতে তো হবেই তুররাতে! হাতে একটা ডাণ্ডা নিয়ে বেরিয়ে গেলো সে জঙ্গলের পথে। ফেরার পথে পা টিপে টিপে এসে দেখে ভালুক বাচ্চাটা তেমনই ঘুমুচ্ছে তখনও, মা ভালুকের পাত্তা নেই।

বাগানের গাছগুলিতে জল দিয়ে দাওয়ার উনুনে কাঠকুটো জ্বেলে একটু কালো চা বানিয়ে ভাতের জল চাপিয়েছে এমন সময়ে একটা আওয়াজ হতে ত্রস্তে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখে বাচ্চাটা কখন উঠোন পেরিয়ে দাওয়ার নীচে এসে বসেছে। জানমতি ভাবল, আহা রে, খিদে পেয়েছে বোধ হয়, মা'টা যে কোথায় গেল!

উঠে গিয়ে ঘরের ভেতর থেকে কয়েকটা শুকনো মহুয়া, পেয়ারা আর চার এনে দিলো । ভালুক বাচ্চাটা একটু শুঁকে চুপ করে বসে থাকল, খেল না। ভারি রাগ হল জানমতির ভালুক মায়ের ওপর। এতটুকু বাচ্চা ছেড়ে কোনও মা যায়! সস্নেহে বাচ্চাটাকে সে বলল, "ভালু তোর খিদে পেয়েছে? দাঁড়া ভাত নামিয়ে তোকে ভাত দিচ্ছি।"

খানিক বাদে একটা শালপাতায় করে ভাত মেখে ভালুর সামনে ধরল সে। বাচ্চাটা একটু শুঁকে একটু একটু করে খেয়ে নিল ভাতটা, তারপর আবার সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ল। খানিক বাদে ঘুম থেকে উঠে একটু এদিকওদিক ঘুরে আবার এসে বসল দাওয়ার নীচটিতে।

এদিকে বেলা গড়িয়ে এলো। ভালুর মায়ের পাত্তা নেই। চিন্তা হোল জানমতির, এতটুকু বাচ্চা বাইরে থাকলে শেয়াল, হায়নারা তাকে ছিঁড়ে খাবে যে! শেষে অনেক ভেবেচিন্তে ভালুকে কোলে করে ঘরে নিয়ে এলো জানমতি। নিজের বিছানার পাশে কাঁথা পেতে তাকে শুইয়ে দিল। ভালুও পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল।

বেশ ক'দিন চলে গেল, ভালুর মা আর আসে না। কেউ হয়ত মেরে ফেলেছে তাকে, নইলে এতটুকু বাচ্চা ছেড়ে কোন মা থাকে?

জানমতি তার সমস্ত স্নেহ দিয়ে ভালুকে বড়ো করতে থাকল। ভালু একটু একটু করে বড়ো হয়। কিন্তু জানমতির সঙ্গ ছাড়ে না। তুররাতে জল নিতে, জঙ্গলে কাঠকুটো কুড়োতে, ফলফুল তুলতে, সব জায়গায় সে চলে জানমতির পিছুপিছু। নদীর জলে দুজন মিলে খেলে বেড়ায়। জানমতি ভালুকে মাছ ধরতে শেখায়, জঙ্গলে গাছ চড়তে শেখায়, শেখায় তার ফল খেতে। সারাদিন তার কাটে ভালুর সঙ্গে। বড় আনন্দে আছে জানমতি। ভালুকে পেয়ে সে যেন তার শৈশব ফিরে পেয়েছে।

ভালু একটু একটু করে বড় হচ্ছে।এখন সে আর আগের মতো ঘরের ভেতর শুতে চায় না। শোয় দাওয়ার একপাশে বা শালগাছটার গোড়ায়, যেখানে সে সেই ছোট্টবেলায় এসে ঘুমিয়েছিল। মাঝে মাঝে সারাটা দিন জঙ্গলে গায়েব হয়ে যায়। ফিরে আসে সন্ধের মুখে। প্রথম প্রথম ভয় পেত জানমতি। চিন্তা করত, তারপর ভাবত ভালুরও তো বন্ধু চাই, সঙ্গী চাই। প্রথম যখন সমরু এসে ছোট্ট ভালুকে দেখেছিল, মাকে বলেছিল, "একটু বড়ো হলে ভালুকটাকে জঙ্গলে ছেড়ে দিও। তুমি একা থাকো, ওর মা যদি এসে যায়, তোমাকে আস্ত রাখবে না। জানমতি সস্নেহে ভালুর দিকে তাকিয়ে হেসে বলেছিল, "আমিই তো ওর মা রে, তুই চিন্তা করিস না।"

দেখতে দেখতে মাথায় জানমতিকে ছাড়িয়ে গেল ভালু, কিন্তু মাকে না হলে তার চলে না, ফিরে ফিরে আসে ঘরে। এরই মধ্যে একদিন সমরু এসে চিন্তিত মুখে মাকে জানাল, তার বদলি হয়ে গেছে আরও দূরে সিংরৌলিতে। এখন আর সে আগের মত ঘন ঘন আসতে পারবে না, তাই মা চলুক তার সঙ্গে। জানমতি বলল, ভালুকে ছেড়ে কোথায় যাবে সে? ও এখানেই থাকবে তার সঙ্গে। সমরু যেন চিন্তা না করে। সমরু তার মাকে জানত, তাই আর জেদ না করে পাশের গ্রামে তার মামাকে বলে গেল ওর মায়ের দেখাশোনা করবার জন্যে।

****

এই ভাবে কেটে যায় মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। জানমতির বয়েস হয়েছে এখন। গায়ে শক্তি কমে গেছে। আগের মতো জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে আর কাঠকুটো কুড়িয়ে আনতে পারেনা, তুররা থেকে জল বয়ে আনতে কষ্ট হয় তার। হাঁপিয়ে যায় সে। অযত্নে গাছপালাগুলো মরে যাচ্ছে। কতদিন হয়ে গেছে উঠোন ঘর নিকিয়ে ফুল লতা পাতা আঁকতে পারে নি সে। চোখের জলে বুক ভেসে যায় তার। চুপচাপ দাওয়ায় বসে থাকে, পাশে তার গা ঘেঁসে বসে থাকে তার ভালু। ভালুও বোধহয় জানমতির কষ্ট বোঝে, তাই বেশিক্ষণ আর সে জঙ্গলে থাকে না, ফিরে আসে।

দিন যায়, শীত আসে। এবার ঠাণ্ডাটা খুব জাঁকিয়ে পড়েছে। অনেকদিন ছেলে সমরু আসেনি। ঘরে চাল ডাল বাড়ন্ত। শরীরটাও বেশ খারাপ চলছে কিছুদিন ধরে। জঙ্গলে যাবার ক্ষমতা নেই। ঠাণ্ডায়, অনাহারে, অর্ধাহারে জানমতি শেষে একদিন বিছানা নিল। ভালু চুপ করে বসে থাকে তার মাথার কাছে, কখনও কিছু ফল এনে রাখে হাতের পাশে, নিজের ভাষায় কিছু বলে। মিনতি করে হয়তো, খেয়ে নাও মা! নিঝুম হয়ে আসছিল জানমতি।

কিছুদিন পরে, এক সকালে সমরু এসে থমকে দাঁড়ায় তার মায়ের খোলা দরজার কিছুটা দূরে। অবাক বিস্ময়ে দেখে তার মায়ের মাথার কাছে চুপ করে বসে আছে ভালু মাথা নীচু করে। সমরুর পায়ের আওয়াজে ভালু আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে জঙ্গলে ঢুকে গেল। জানমতির শেষ সময়ে তার ভালু তার শিয়রে বসেছিল। আর একবার মাতৃহারা হল সে। ভালুকে আর দেখা যায় নি কোনোদিন।

ভারতের মানুষ ও না মানুষদের গল্প

জন লকউড কিপলিং

অনুবাদঃ পিয়ালী চক্রবর্তী

চিলঃ

সাদা মাথা, বুক, ঘন চকোলেট রঙের শরীর, আর যার হাবভাব কিছুটা ঈগলের কিছুটা কাকের মত, গলার স্বর তীক্ষ্ণ, ছিপছিপে চেহারা, ঠিক ধরেছ, এটা চিল। এমনকি পুরনো দিনে মুসলমান সেনারা তাদের মাথার ওপর চিল ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখলে এটা মনে করত যে যুদ্ধে তাদের জয় অবধারিত। চিলকে ওরা খুব শুভ গণ্য করত।

চিল অনেকটা ডাকেও কাকের মত। ভুলেও যদি ছাদ থেকে কিছু খাবারের টুকরো নিচে ফেলেছ, তো একেবারে দস্যুর মত তার ওপর হানা দেবে সবাই মিলে। সে এক অদ্ভুত শিল্প।

একের পর এক চিল এসে ছোঁ মেরে নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু কারুর সাথে কারুর ধাক্কাধাক্কি লাগছে না। আর যেই বৃষ্টি নামে, সাদা সাদা, মোটা কীটগুলো জন্মায়, ব্যাস আর দেখে কে? চিলের দল জমা হয়ে, মজা করে চড়ুইভাতি করে আর একটার পর একটা মুখে পোকা নিয়ে সারি বেঁধে উড়ে চলে যায়। সে এক আশ্চর্য দৃশ্য।

এরকমটা মনে করা হয় যে পরশ পাথর, মানে লোহাকে সোনা বানিয়ে দেয়া সেই মূল্যবান পাথর নাকি চিলের বাসাতেই পাওয়া যায়। মুসলমান রমণীদের মধ্যে এমনটাই প্রচলিত যে চিলের বাচ্চারা বাসায় সোনা না দেখা অব্দি দেখতেই শেখে না। কোন মানুষ যদি সারাদিন টইটই করে ঘোরে আর কিছুতেই বাড়িতে থাকতে না পারে, তাকে বলা হয় চিলের স্বভাব।

চিল একটি বদমাশ চোর। খাবারদাবার চোখের নিমেষে ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। আর পলকে তার উড়ে আসা, ছোঁ মেরে নিয়ে উড়ে যাওয়া, ধরে ফেলার কোন জায়গাই নেই। যেমন মিষ্টির দোকানে ধর মিষ্টি তৈরি করার পর দোকানে নিয়ে আসা হচ্ছে, ব্যাস চিলের হামলা। অথবা কসাইয়ের দোকানে, কিম্বা খোদ পোস্টমাস্টারের হাত থেকে টাকা নিয়ে পালানো। একবার দুটো নিরীহ পোষ্যকে থালা থেকে খাওয়াচ্ছিলাম, ব্যাস হানা দিল চিল। খাবার নিয়ে, প্লেট ভেঙে একাকার কান্ড।

এক স্যাকরা চিলের এই ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে দুষ্টুবুদ্ধি বার করেছিল শোন। একদিন চার স্যাকরার মধ্যে কথা হচ্ছিল। এক উজির তাদের কথা কান পেতে শুনছিল। একজন বলল, " আমি সোনার গয়নায় প্রতি এক টাকায় সোনার মজুরি সমেত ২৫ পয়সা লাভ করি" , একজন বলল সে আট আনা, আর একজন ৭৫ পয়সা। শেষের জন বলল " দূর তোমরা বোকা, আমি তো পুরোটাই লাভ করি।"

এই শুনে উজির তো গিয়ে বলল রাজাকে। রাজা তখন সেই শেষের কারিগরকে ডেকে সোনার হার বানাতে বলল। কারিগর যে বারান্দায় বানাতে বসল, চুপিসাড়ে সে সেখানে কাঠের রেলিঙে একটা ছোট গর্ত মত করে সেখানে কয়েকটা মাংসের টুকরো রেখে দিয়েছিল। যথারীতি চিল উড়ে এসে বসল সেখানে। এরপর দিনের শেষে সে সোনার হারের মত একই পিতলের হার বানিয়ে সেটাকে অ্যাসিডের পাত্রে রেখে দিল। পরের দিন এসে সে অ্যাসিডের পাত্র থেকে হারটাকে তুলে টাঙিয়ে রাখল ওই রেলিঙের ওপর শুকোনোর জন্য আর সোনার হারটাকে অ্যাসিডের পাত্রে। এবার রাজাকে দেখাল ওই পিতলের হার। রাজার সাথে কথা বলতে বলতেই চিল এসে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল পিতলের হার। তখন কারিগর কাঁদতে থাকল হারের শোকে। রাজা দেখল সত্যিই তো পাখি নিয়ে পালাল হার, তখন সে আবার সোনা দিল কারিগরকে। পরেরদিন কারিগর আসল সোনার হারটা অ্যাসিডের পাত্র থেকে তুলে দিয়ে দিল রাজাকে। কারিগর এমন কাজ প্রায়ই করত এবং সে তা শেষমেষ স্বীকারও করে উজিরের কাছে। তার প্রখর বুদ্ধিতে খুশি হয়ে রাজা তাকে পুরস্কৃত করেন।

সারস ও বকঃ

সারস পাখিকে একটা বিশেষ কারণে পারস্পরিক বিশ্বস্ততার প্রতীক বলা হয়। কারণ এটা বিশ্বাস করা হয় যে এদের জুটির একটি পাখিকে যদি কেউ মারে, অন্যটি আকুল হয়ে ওঠে এবং কখনও আর কারো সাথে জুটি বাধে না।

একটা স্প্যানিশ প্রবাদ অনুযায়ী সারস নাকি ঘোড়ার সাথে নাচ করেছিল কোন

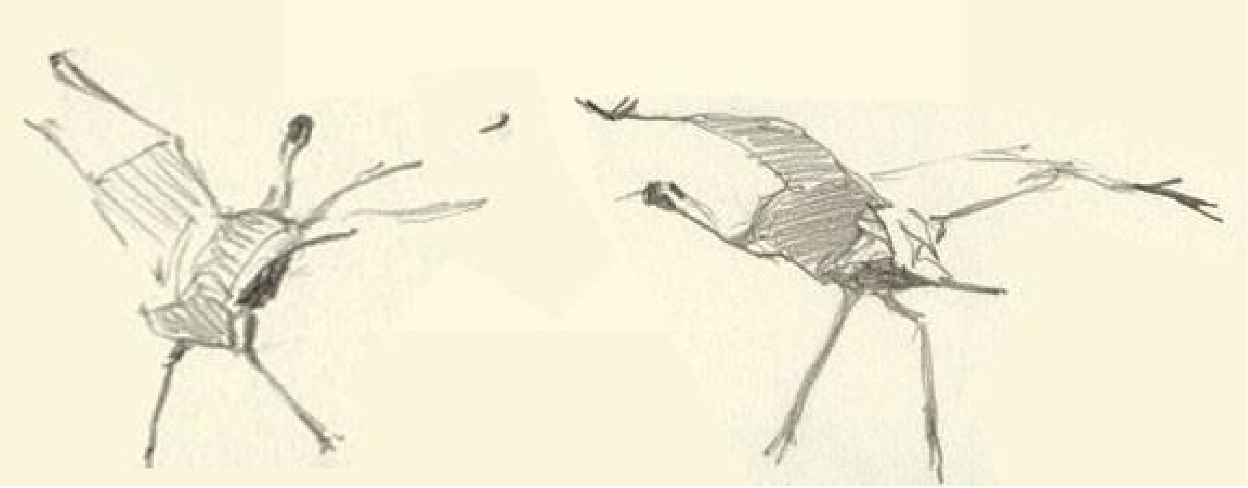

একসময়, তাই তার একটা পা ভাঙা। কিন্তু এইসব লম্বা পায়ের পাখিদের নাচ কিন্তু কখনও ভারতে সেভাবে চর্চা হয়না। যদিও এইসব পাখিদের বাগানে রাখা হয়- ইউরোপিয়ানরা এদের পোষ্য হিসাবে রাখে। আর এদের ব্যবহার আর ভঙ্গিমা? দারুণ সুন্দর। আর সেগুলোকে দারুণ সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে আমেরিকান উপন্যাস ‘ইস্ট এঞ্জেলস’এ।

কিন্তু এই নাচের মধ্যেও যে অদ্ভুত শয়তানি থাকে, সে ব্যাপারে হাড়গিলে পাখির সাথে কারুর তুলনা হয়না। এমনকি ডন কুইক্সোট বা মালভোলিও এই নাচের পাশে অর্ধেক জাঁকজমকপূর্ণ নয়। যদি বয়স্ক, লম্বা একেবারেই অচপল মহিলাদের অনেক শ্যাম্পেন খাইয়ে, ব্যালে নাচ শেখানো হয়, তাহলে যে’রকম অবস্থা হবে, সেই থেকে হাড়গিলের নাচের একটা সামান্য ধারণা পাওয়া যায়। কলকাতাতে একসময় এই হাড়গিলেদের খুব দেখা যেত, স্থানীয় মানুষ বলেন, ওরা আবর্জনাপূর্ণ জায়গায় জোট বাঁধে আর নাচের অভ্যাস করে।

একটা বেশ মজার ভারতীয় প্রবাদ আছে “বকধার্মিক”। বক কী করে জান? নদীর একটা নির্জন কোণায় এক পা তুলে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকে। ঠিক যেন হিন্দুদের সাধু বা মুসলমান ফকিরটি। ভাবখানা এমন যেন কী পবিত্র সাধনা সে করছে, আসলে সে অপেক্ষা করে কখন একটা মাছ বা ব্যাং এসে পড়বে কাছাকাছি আর সে গপাত করে গিলে নেবে।

পোলট্রি বা হাঁস-মুরগির খামারঃ

ইউরোপে এইসব খামারের গন্ধকে সেখানকার মানুষ "ব্রহ্মা গন্ধ" বলেন, কারণ ওইসব খামার বড়ো অপরিচ্ছন্ন থাকে। হিন্দুরা কিন্তু এই ব্রহ্মা নামটাকে খুব শ্রদ্ধা করে। যদিও ভারতে ব্রহ্মার মন্দির খুবই কম আছে। হিন্দুরা নিয়ম মেনে ঘরের মধ্যে কখনও পোলট্রি রাখে না। একটা কারণ তো অপরিচ্ছন্নতা, দ্বিতীয় হল উঁচু বর্ণের মানুষরা ডিম খায়না।

কিন্তু রাজপুতরা আবার মোরগ লড়াইয়ের খুব ভক্ত। এইসব লড়াই অবিরাম চলতে থাকে, আর পাখিদুটো বারবার একে-ওকে আঘাত করতে করতে কখনও অন্ধ হয়ে যায়, রক্তপাত ঘটায়। শেষে তারা এতই ক্লান্ত হয়ে পড়ে যে একে অন্যকে ধাক্কা মারার শক্তিও থাকে না। আর যে খেলা পরিচালনা করে সে একজনের মাথা, আরেকজনের মুখের ভিতর ঢুকিয়ে দেয়।

গোয়ানিজ বা পর্তুগীজ, হিন্দু, মুসলিম সকলেই এই খেলায় অংশ নেয়, আর প্রতিদিন এই খেলার জন্য তারা মোটা টাকা ব্যয় করে।

প্রফেসর উইলসন, একজন খ্রিস্টান কবি, এই মোরগ-লড়াইয়ের ব্যাপারে বেশ সাগ্রহে লেখালিখি করেছেন। এই মৃত পাখিগুলোর ছবি পর্যন্ত লণ্ডনের দোকানগুলোয় টাঙানো থাকে, অন্যান্য খেলার ছবির সাথে। স্যার টমাস মোর সম্পর্কেও জানা যায় যে তিনি এই নিকৃষ্ট খেলাটার ভক্ত ছিলেন, এবং একটা মোরগকে ল্যাম্পপোস্টের সাথে ঝুলিয়ে দিয়ে তার দিকে লাঠি ছুঁড়ে মারতেন।

মোরগ নিয়ে নানান গল্পসল্প আছে। একবার এক মালিকের পাতে তার চাকর একটি এক পা ওয়ালা পাখির রোস্ট দিল। তা মালিক আপত্তি জানিয়ে বলল, "এর একটা পা কেন?" চাকর বলল যে এক বিশেষ প্রজাতির পাখির নাকি এমন একটাই পা থাকে। এই বলে সে তার মালিককে একটা পাখি দেখালো, যে একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে। মালিক তাকে দেখেই যেই "শূ শূ"বলে চিৎকার করেছে, অমনি সে আর এক পা বের করে, উড়ে পালালো। অমনি চাকরটা বলে উঠলো, "যাহ! তুমি পাতের পাখিটাকেও একবার শূ বলতে পারতে!"

মুরগি নিয়ে অনেক প্রবাদ প্রচলিত আছে। যেমন "মুরগি শুধু শস্যের স্বপ্ন দেখে"। কোনো স্বার্থপর, নীচ মানুষকে বোঝাতে হলে এই কথাটা বলা হয়।

হিন্দুরা কাউকে অপমান করতে চাইলে তাকে "হাঁসমুরগিওয়ালা"বলে সম্বোধন করে। আবার আরেকটা বাংলা প্রবাদ বলে, জমির মালিকেরা তাদের কৃষকদের মুরগির মত করে ব্যবহার করে, ভালো করে খাইয়ে শেষে যাদের মারা হয়। দুষ্টু বাচ্চাদের শাসন করতে গিয়ে অনেকে বলে পশুশাবকরা মুরগির লাথিতে মরে না।

যে কোনো খামারের পশুদের খুব নিষ্ঠুরভাবে মারা হয় বাজারে বিক্রির জন্য। এরা ভাবেও না যে এইসব পাখিদের কতখানি কষ্ট হয়। টার্কিদের সারাদিন রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে রাখা হয়,

যাতে করে তাদের মাংস কেটে কেটে নেওয়া যায়। একজন হিন্দুকে এইরকম ব্যবহার কোনো টিয়ার সাথে করতে বললে সে খুব দু: খ পাবে, কিন্তু হাঁস- মুরগিদের জন্য যেন কারুর কোনো দায় নেই।

হংসীঃ

এই পাখিটি তার পূর্ব পরিচিতি অনেকটাই হারিয়েছে। একসময়ে হিন্দু আর বৌদ্ধ ধর্মে একে পবিত্র স্থান দেওয়া হয়েছিল। পরে আধুনিক যুগে সে তার জায়গা অনেকটাই হারিয়েছে।

একসময় হাঁস ছিল ব্রহ্মার বাহন। এরপর সে শিবের অভিশাপে তার স্থান হারায়। রাজহংস আর হংসী, হাতি আর তিতিরের পরেই তাদের সুন্দর চেহারা নিয়ে কথা হয়। এমনকি সুন্দর আর তন্বী মেয়েদের হংসীর সাথে তুলনা করা হয়।

পাতিহাঁস

একটা পাখি যাদের বেশিরভাগ সময় একসাথে দেখা যায়, তারা হল হাঁস। তাই এরা বারবার ভালবাসার কবিতায় ঘুরে ফিরে এসেছে, যদিও এদের বিচ্ছিন্ন প্রেমিক- প্রেমিকা রূপে দেখান হয়। রোজ রাতে নাকি নদীর ধারে পুরুষ হাঁস চীৎকার করে ডাকে “চখী আমি আসব?” অমনি মেয়েটি বলে ওঠে “না চখা”। আবার একইভাবে মেয়েটি ডাকলে “চখা আমি কি আসব?” ছেলেটি বলে ওঠে “না চখী।”

প্রতি রাতে এরা এভাবে আলাদা হয়ে যায়। এমনকি খাঁচাতেও নাকি এদের আত্মারা একে অন্যের থেকে আলাদা হয়ে থাকে। এই ব্যাপারটা কবিতার দিক থেকে বেশ রোমাঞ্চকর, এবং এগুলো ভারতীয়রা এখনও ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু এটা ইংরেজদের কানে একটু বিচিত্র শোনায়।

ময়ূরঃ

ময়ূর হল যুদ্ধের দেবতা কার্তিকের বাহন এবং খুব পূজিত। গুজরাট, পুরো রাজপুতানা, কেন্দ্রীয় এবং উত্তর- পশ্চিমের অনেকটা অংশ জুড়ে ময়ূর দেখা যায়। একটি প্রবাদে বলে হরিণ, বাঁদর, তিতির আর ময়ূর চারজনেই চোর। কিন্তু চুরি করার জন্য কখনোই তাদের শাস্তি দেওয়া হয়না। কখনও তাদের জীবন্ত

জঙ্গল থেকে ধরে যখন বাজারে নিয়ে আসে, ওদেরই পালকের বোঁটা দিয়ে ওদের চোখদুটো সেলাই করা থাকে, যাতে ওরা ছটফট করে নিজেদের পালকগুলো না নষ্ট করতে পারে।

তবে ময়ূরের পেখম যেমন সুন্দর, তেমনই বিশ্রি ওদের পা। অনেকে বলে ময়ূর ভারি সুন্দর নাচে, তবে নাচতে নাচতে যখনই সে নিজের পা দেখতে পায়, সে নাচ থামিয়ে দেয়, লজ্জা পায় আর খুব কাঁদে। আসলে এর পিছনে একটা গল্প আছে। একসময় নাকি ময়ূরের পা দুটো খুব সুন্দর ছিল। সে ময়না, তিতিরের সাথে একসাথে নাচছিল, তিতির বলল, "তোমার তো ভাই এত সুন্দর পেখম আছে, তুমি এমনিতেই ভাল নাচ, তা তোমার সুন্দর পা দুটো আমায় ধার দাওনা, আর আমারটা তুমি নাও।" ময়ূর তো খুশিমনেই নিজের পা দুটি দিল, কিন্তু যেই নাচ শেষ হল, অমনি তিতির করল কী, ফেরত দেওয়ার বদলে সেই পা দুটো নিয়ে পালাল।

তবে ময়ূরের পেখম তো বরাবরই কবিতার বিষয়, আর ময়ূরের গলার তো অন্যরকম সৌন্দর্য, তাকে সুন্দরী মহিলাদের সাথে তুলনা করা হয়।

ময়ূর হল সাপের সবচেয়ে বড় শত্রু। একবার ধরলে না মেরে ছাড়ে না। কিন্তু খুব বিষাক্ত কেউটে সাপ, সেও তো সহজে হার মানতে চায়না। তাই এই দুজনের লড়াই চলে অনেকক্ষণ, এমনকি ময়ূরকে নাচতে নাচতে সাপের চারপাশে ঘুরতেও দেখা যায়। ভারত, ইংল্যান্ড দু জায়গাতেই পাখিরা সাপেদের সবচেয়ে বড় শত্রু হয়। এই ব্যাপারটা ভাল করে দেখান হয়েছিল Mrs. J. A. Owen এর On Surrey Hills বইতে।

বৃষ্টি এলেই দুজনের মন খুব নেচে ওঠে- ময়ূর আর ব্যাং। ইউরোপে পাখির কান্না মানে তো বৃষ্টি আসার সময় হল।

লন্ডনে কোন বাড়ির বসার ঘরে ময়ূরের পালক লাগানো থাকে না, কারণ একে অপয়া মনে করা হয়। তেমনই আবার উল্টোটা হয় ভারতে। এখানে একটি লোককে পায়ে ময়ূরের পালক বেঁধে রাখতে দেখা গেছিল, জিজ্ঞেস করাতে বলেছিল যে তার খুব পায়ে যন্ত্রণা হয়, তাই ভাল হওয়ার জন্য এই উপায়। তবে এটাও ঠিক যে এর সাথে মন্ত্র- তন্ত্র বেঁধে রাখা থাকে। তাউস ময়ূরের আরব নাম, যেমন হিন্দীতে "মোর"। একটি গিটারকে ময়ূরের মত রঙ করে, তার মত আকৃতি দিলে, তাকেও "তাউস" বলে।

ক্রমশ

পূর্ব হিমালয় বায়োডায়ভার্সিটি হট স্পট

পূর্ব হিমালয় বায়োডায়ভার্সিটি হটস্পট বলতে যে এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে তাতে ভারতের তিনটি রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও অরুণাচল প্রদেশ অবস্থিত। তা বাদে রয়েছে নেপাল আর ভুটান। তবে নেপালের কেবল মধ্য ও পূর্বাঞ্চল এই জীববৈচিত্র অঞ্চলের আওতায় পড়ে।

এই অঞ্চলে হিমালয়ের সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ এভারেস্ট যেমন আছে তেমনই আছে শিবালিকের মত নিচু পাহাড়ও। উত্তর থেকে দক্ষিণে ক্রমশ উচ্চতায় কমতে থাকা পাহাড়গুলোর বিস্তার খুব সরু এলাকায়, অল্প জমিতে। ফলে উচ্চতার পরিবর্তন এখানে আকস্মিক। বলাবাহুল্য এই কারণে নদীর স্রোতের গতি, পলি জমার পরিমাণ থেকে নানা ধরণের গাছপালার ও জীবজন্তুর বসতি এখানে পরিবর্তিত হয় আকস্মিকভাবেই।

আবার ক্রমশ পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে বিস্তীর্ণ এলাকায় কমতে থাকা উচ্চতার জন্য আবহাওয়ায় অর্থাৎ তাপমান ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণে ক্রমিক পরিবর্তন ঘটে। এই ক্রমিক পরিবর্তনের ছাপ দেখা যায় গাছপালার ও জীবজন্তুর রকম বদলের মধ্যেও। সুতরাং পূর্ব হিমালয় বায়োডায়ভার্সিটি হট স্পটে জীববৈচিত্র উত্তর থেকে দক্ষিণে যত আকস্মিকতায় বদলায় পশ্চিম থেকে পূর্বে তেমনভাবে বদলায় না।

তাছাড়া পশ্চিম কিংবা মধ্য হিমালয়ের তুলনায় পূর্ব হিমালয় নিরক্ষরেখার অপেক্ষাকৃত কাছে থাকার জন্যে এখানে জলহাওয়া অনেক বেশি আর্দ্র। তাই মধ্য বা পশ্চিমের শুষ্ক বনের তুলনায় এখানে আর্দ্র বনের পরিমাণ বেশি। বৃক্ষরেখাও অপেক্ষাকৃত বেশি উচ্চতায় অবস্থিত। ফলে এখানে জীববৈচিত্র্য বিকাশের জন্য আবহাওয়া বেশ অনুকূল। কিন্তু এই এলাকা নির্মীয়মাণ হিমালয় পর্বতের কোলে। ফলে ক্রমাগত ভূকম্পে শিবালিকের শিথিলতর পলি দিয়ে গড়া

পাহাড়গুলো হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। পাহাড় ভেঙে গেলে উলটে যায় পাহাড়ের গায়ে জমা মাটি। ভেঙে পড়ে মাটিতে থাকা গাছ। পাথর, মাটি, পলি আর গাছ চাপা পড়ে মৃত্যু হয় পশুপাখির। তাছাড়া শিবালিকের শিথিল পলি ক্রান্তীয় প্রবল বর্ষায় জল শুষে প্রায়ই ফুলে ওঠে আর পিছলে নেমে আসে কঠিনতর পাথরের গা বেয়ে। একে বলে ধস নামা। ধসের কারণেও ধ্বংস হয় গাছ আর প্রাণীর জীবন।

সুতরাং পূর্ব হিমালয়ের প্রাকৃতিক অবস্থাই বেশ নড়বড়ে। তার ওপর এই এলাকায় চায়ের চাষ শুরু হওয়ার পর শুরু হয়েছিল ক্রিপ্টোমেরিয়া জাপোনিকা নামের কাষ্ঠল গাছের বাগান করা। কারণ চায়ের ব্যাবসায়িক উৎপাদন ও নিষ্কাষণের মূল লক্ষ্য ছিল সারা পৃথিবীতে চা রপ্তানি করা। রপ্তানি করার জন্য চা পাতাকে বাক্স বন্দি করার দরকার ছিল। সেই বাক্স বানানোর জন্য সবচেয়ে উপযোগী কাঠ পাওয়া যায় ক্রিপ্টোমেরিয়া জাপোনিকা গাছের থেকে। ফলে চায়ের চাষ করার জন্য আর চায়ের রপ্তানির ব্যবসার জন্য দরকারি বাক্স বানানোর কাঠ জোগাতে পারে এমন গাছের বাগান করার জন্য ধ্বংস করা হয়েছিল এই এলাকার প্রাকৃতিক বন।

তাছাড়া দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য এলাকার মতো পূর্ব হিমালয়েও জনবসতি প্রচণ্ড ঘন। ফলে পাহাড়ের ঢালের বাঁশ, ঘাস বা অন্যান্য গাছ তুলে ফেলে সেখানে বসতবাড়ি তোলা হয়। তার থেকেও বেশি হয় পাহাড়ের গায়ে ধাপ কেটে শ্রেণীজ চাষের কাজ। ফলে পূর্ব হিমালয়ের শিথিল পলিতে জমাট ঠুনকো পাহাড়ের ওপর মানুষের জীবনের ও জীবিকার চাপটা বেশ বাড়াবাড়ি রকম। হালে এই এলাকায় গাছ কেটে ফেলার ঘটনাও বেড়ে গেছে ভীষণ রকম। ফলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে নানান প্রাণীর উপযুক্ত বসতি এলাকা।

বসতি নষ্ট হলে পূর্ব হিমালয়ের প্রাণীরা পশ্চিম থেকে পুবে বা পুব থেকে পশ্চিমে সরে যেতে পারে। কিন্তু উত্তর-দক্ষিণে তাদের জন্য বাসস্থানের প্রাকৃতিক ব্যবস্থাই নেই। ফলে জনবসতি বাড়ায়, বাণিজ্য আর কৃষি বাড়ায় প্রাণীদের অস্তিত্ব সংকট দেখা দিয়েছে। বিপন্ন অস্তিত্বের প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ১৬৩। এই সব প্রজাতির মধ্যে যেমন আছে এক শিং-ওয়ালা গন্ডার, তেমনই আছে জলার মোষ। সব মিলিয়ে ছত্রিশটা প্রজাতির গাছপালা, তিন প্রজাতির অমেরুদণ্ডী, বারো প্রজাতির উভচর, সতেরো প্রজাতির সরীসৃপ, পঞ্চাশ প্রজাতির পাখি আর পঁয়তাল্লিশ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণীর অস্তিত্ব বিপন্ন।

এই অঞ্চলে সব মিলিয়ে প্রায় দশ হাজার প্রজাতির গাছপালার সন্ধান পাওয়া গেছে। এই সব গাছেদের মধ্যে তিনশ প্রজাতির গাছই এই এলাকায় সীমাবদ্ধ। পৃথিবীর আর কোথাও এদের দেখা পাওয়া যায় না। সেরকমই এই অঞ্চলের স্তন্যপায়ীদের প্রজাতির সংখ্যা প্রায় তিনশ হলেও তার মধ্য হাতে গোণা কয়েকটাই এই এলাকায় সীমাবদ্ধ। এই এলাকায় সীমাবদ্ধ যে সব প্রজাতির প্রাণী তার মধ্যে অন্যতম রেলিক্ট ড্র্যাগন ফ্লাই এবং নামাধাপা জাতীয় উদ্যানের উড়ুক্কু কাঠবেড়ালি। তা বাদে টাকিন, হিমালয়ান তাহ্র, পিগমি হগ, গোল্ডেন লাঙ্গুর, লাঙ্গুর, এশীয় বুনো কুকুর, গাউর, মুনজ্যাক, স্লথ বিয়ার, ব্ল্যাক বিয়ার, স্নো লেপার্ড, ব্লু শিপ, জলের মোষ, সোয়াম্প ডিয়ার আর গ্যানজেটিক ডলফিন এই সব প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণীরাও পূর্ব হিমালয়ের বায়োডাইভার্সিটি হট স্পটে আবদ্ধ।

আগামী পর্যায়গুলোতে এই অঞ্চলের সংরক্ষিত বনগুলোর কথা আরও বিশদে জানব আমরা।

আশ্চর্য খবরঃ

রেলিক্টরা হিমালয়ের বাসিন্দা। ১৮০০ থেকে তিন হাজার মিটার উচ্চতায় ছুটন্ত জলধারায় এদের প্রজনন হয়। রেলিক্ট ড্র্যাগনফ্লাইয়ের শূককীটের পরিণত হতে পাঁচ ছ বছর সময় লাগে। দুনিয়ায় এদের পরিবারের আর একটিই সদস্য আছে। তার বাসা জাপানে।

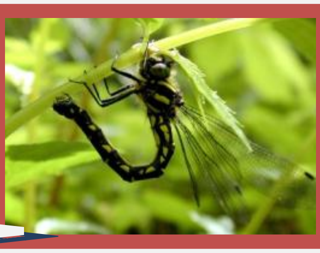

ছুতোর আর সিন্ধুঘোটক

মূলঃ দা ওয়ালরাস অ্যান্ড দা কার্পেন্টারঃ লুই ক্যারল

অনুবাদঃ আবু হোসেন

সমুদ্রে সূর্যের রোদ ঝকমক
মহাতেজে রূপোহেন করে আলোপাত
ঢেউয়ের মাথায় রোদ হাসে চকাচক
যদিও তখন ছিল মহাঘোর রাত

চাঁদ ভারী রেগে ছিল আকাশের কোণে
দিন শেষ। মাঝরাতে কেন ফিরে আসা
হতভাগা সূর্যটা কথা তো না শোনে
মজাটাই মাটি করে দিল ব্যাটা চাষা

সমুদ্র ছিল ভারী নোনাজলে ভেজা
বালুভরা বেলাভূমি জলহীন ড্রাই
আকশে মেঘের কেউ পাবে না তো দেখা
কারণ সহজ, সেথা কোন মেঘ নাই।
মাথার ওপরে পাখি যায়নাকো উড়ে
অতরাতে বল আর পাখি কোথা পাই?

সিন্ধুঘোটক আর একটি ছুতার
হাতে হাতে রেখে তারা হাঁটে তালে তাল
এত বালি দেখে দোঁহে জলভরা চোখে
ভাবে কেবা করে সাফ এতো জঞ্জাল

"বলো দেখি ঝাঁটা হাতে সাতটি চাকর
যদি ঝাঁট দিয়ে যায় অর্ধেক সাল, "
সিন্ধুঘোটক বলে, " বলো হে ছুতার
সাফ হবে কিগো তাতে এত জঞ্জাল?"
"সন্দেহ আছে ভাই" বলেই ছুতার
চোখে জল এনে জোড়ে মহা চিৎকার

"এসো হে ঝিনুককূল, হাঁটি একসাথে"
জল পানে চেয়ে ডাকে সিন্ধুঘোটক
"মিঠে চলা মিঠে বলা নোনা বেলাভূমে
চার হাতে নিতে পারি চারজন তক"

মাথা নেড়ে চোখ মেরে বৃদ্ধ ঝিনুক
ইশারায় বলে দিল বাসাখানি ছেড়ে
ছুতারের সাথে যদি সিন্ধুঘোটক
তার সাথে হাওয়া খেতে যাবে আর কে রে?

কিন্তু দেশের যত তরুণ ঝিনুক
তেড়েফুঁড়ে আসে ছেড়ে পাথুরে বালিশ
বর্মেরা চকাচক, মুখেতে সাবুন
পায়ের জুতায় মাখে নতুন পালিশ
যদিও অসম্ভব, জানো তো কারণ?
ঝিনুকের একটাও ঠ্যাং নাই, ইশ!

চারটি ঝিনুক, পিছে আসে আরো চার
তার পিছে চারে চারে হাজার ঝিনুক
নোনা জল ছেড়ে আসে দিয়ে লাফে লাফ
ঝিনুকের ভিড়ে ঢাকে সাগরের মুখ

সিন্ধুঘোটক আর বন্ধু ছুতার
বেলাভূমে দুই ক্রোশ পথ দিয়ে পাড়ি
বসে এসে নিচু এক পাথরের পাশে
বেলাভূমে খাড়া থাকে ঝিনুকের সারি

সিন্ধুঘোটক বলে "এবারে সময়
আসিয়াছে, তত্ত্বের হোক আলোচনা
জুতা ও জাহাজ আর মোমবাতি গালা
বাঁধাকপি, রাজাগজা, জানে কোন জনা?
গ্লোবাল ওয়ার্মিং কী কারণে হয়
শুয়ারেরা ওড়ে কেন? জানো নিশ্চয়?"

"একটু দাঁড়ান প্রভু" ঝিনুকেরা হাঁকে,
"একটুকু দেরি হোক আলোচনাটার
হেঁটে হেঁটে পায়ে ব্যথা হয়েছে অনেক
আমরা যে মোটাসোটা গা' গতরে ভার
"তাই হোক, " মাথা নাড়ে সিন্ধুঘোটক
ঝিনুকেরা হেঁকে বলে, " থ্যাংক ইউ সার"

"চাই শুধু এইবারে গুটিকয় রুটি
গোলমরিচের গুঁড়া, থোরা ভিনিগার
সাথে যদি যায় মিলে বেরে হয় তবে
ডিনার টেবিলে তবে চাই কী বা আর?"
"প্রিয় ঝিনুকের দল, প্রস্তুতি শেষ

এইবারে শুরু হোক রাতের আহার"

"সেকী কথা প্রভুগণ,   অবশেষে এই?"
ঝিনুকেরা হাঁকে ভয়ে বুক ধুকপুক
"এত ভালোবাসা তবে সবই বুঝি ফাঁকি
ও হৃদয়ে দয়ামায়া নাই এতটুক?"
"কী মধুর রাত, "   বলে সিন্ধুঘোটক,
দেখে তোমাদের প্রাণে জাগেনা কি সুখ?

"দয়া করে এতখণ এলি সাথে সাথে
তোরা ভারী ভালোছেলে সেটা তো জানিস?"
ছুতোর হঠাৎ বলে,   " সিন্ধুঘোটক,
আমাকেও রুটি কেটে দিবি এক পিস।
কালা নাকি? কানে খোল? চেয়েছি দুবার,
এইবারে কথা ছেড়ে রুটিটা কাটিস"
"লজ্জার কথা ভারী , " সিন্ধুঘোটক
জলভরা চোখে ছাড়ে ভারী নিঃশ্বাস,
"কত মেহনত করে ছুটে এল সাথে
আমাদের করেছিলো কত বিশ্বাস
ছুতোর জবাবে বলে "রুটিতে মাখন
পুরু কেন? একটুকু পাতলা মাখাস"

"তোদের ব্যাথায় আমি কেঁদে কেঁদে সারা"
সিন্ধুঘোটক বলে,   " দুখে ভাঙে বুক"
কাঁদে আর খুঁজেপেতে তুলে তুলে আনে
দেখে বেছে মোটাসোটা একশো ঝিনুক
রুমালের কোণটিতে ঘনঘন মোছে
দুখে ভাঙা লাজে রাঙা জলে ভেজা মুখ।

"শোন হে ঝিনুকগণ" হাঁকিল ছুতার
"বড়ো সুখে বেলাভূমে এলে হেঁটে হেঁটে
এবারে কি ফের তবে ফিরে যাবি ঘরে?"
জবাব এলো না তার,   রাত গেল কেটে।
কে দেবে জবাব তার ঘুমায় সবাই
সিন্ধুঘোটক আর ছুতারের পেটে

ছবির উৎসঃ ডেভিয়েন্ট আর্ট

শব্দের খোঁজে

- অচিন্ত্য সুরাল

রিকশার প্যাঁক প্যাঁক
গাড়িগুলো পিঁপ পিঁপ
মেঘ ডাকে কড় কড়
বৃষ্টির টিপ টিপ
বাজারের দরদাম
গুঁতোগুঁতি চলাচল
ঝগড়াটে লোকজন
কী বিকট কোলাহল
হাওয়া লেগে প্লাস্টিকে
একটানা খস খস
ঠ্যালা হাঁকে হৈ হৈ
আমি রেগে গস গস
তারই মাঝে একজন
বসে গেছে রাস্তায়
নেড়ি এক কুকুরের
ঠিক ডান পাশটায়ে
নেই তার সম্বিৎ
বিগলিত চোখমুখ
দেখে জ্বলে হাড়গোড়
এমনই সে উজবুক
চাপা দিয়ে এক কান
উঁচু করে একহাত
গান ধরে দাদরায়
পাগলই সে নির্ঘাত
এই ওঠ পথ ছাড়
রেগে করি হাঁকডাক
বলে কিনা চুপ চুপ
সুর ঘোরে ঝাঁকঝাঁক
চোপরাও, সুর নয়
বলি এ তো গোলমাল
বলে নাগো এইসব
শব্দের ফাঁকতাল
বেয়ে কত সুর ঘোরে
ছেঁকে নিয়ে সেই সুর
জীবনের গান গাই
মনে ভাসে রোদ্দুর
বিস্ময়ে বলি, হ্যাঁ হে
কথাটা কি সত্যি
হেসে বলে শব্দের
খোঁজে সুর ভর্তি
পেলে তার সন্ধান
ভুলে যাবে সব দুখ
ছেঁকে নাও সেই সুর
থাকবে না পেটে ভুখ
বসে পড়ে বলি ভাই
দাও দাও ওই কান
দাও শুনি একবার
জীবনের জয়গান

ছবিঃ সঙ্ঘমিত্রা

জোড়াছড়া

প্রকল্প ভট্টাচার্য

ঘুর্ঘুটি

মিশকালো রাত, ঘুর্ঘুটি,
জানলাতে কার ভিরকুটি!!
ওরে, কে আছিস, দৌড়ে আয়,
পড়ে গেছি দাঁত ছরকুটি!!
আন গোটা কয় ডেয়ারি মিল্ক,
কেন নিয়ে এলি জলপটি!!

লালকমল আর নীলকমল

লালকমল আর নীলকমল!
ঘুরতে গেল শপিং মল।
এসকালেটর দেখেই অবাক,
এ আবার কী আজব কল!
মানুষরা সব দাঁড়িয়ে ঠায়
নিজের মতো সিঁড়িই যায়
ওপর নীচে, যেমন তেমন,
থেমে গেলেই গণ্ডগোল!
চাদ্দিকে কী দোকানপাট!
রোশনাই আর বাজারহাট!
দোকানেতে লোক বেশি নেই
বাইরে মেলা হট্টগোল!
জামার দোকান, উরিব্বাস!
কুচকুচে, কী সর্বনাশ!
নির্ঘাত সেই রাক্ষসটা
লুকিয়ে আছে, পালটে ভোল!
বার করে তাই তরোয়াল
ঢুকল দু'জন-সব সামাল!
হাঁউ মাউ খাঁউ রাক্ষসটা
লুকিয়ে আছে কোথায় বল!
তাপ্পরে খুব ভিড় হলো,
রাক্ষস তো খুব মলো,
কান মুলে ফের রাস্তাতে
আসলো দু'জন, ফের বিফল,
লালকমল আর নীলকমল!

ছবিঃ সঙ্ঘমিত্রা

ভুতের ছড়া

তরুণকুমার সরখেল

পুকুরপাড়ে যেই না গেছি ভোরবেলাতে,
গিয়েই দেখি তিনটে ভূতে জোর খেলাতে
মন দিয়েছে। আমায় দেখে ফোঁকলা দাঁতে,
মুচকি হেসে কাছে এসে হাতে হাতে
ধরিয়ে দিল তিনটি ঠাসা পেয়ারা এনে
মনে হল ভূতগুলো সব আমায়ে চেনে।
অভয় পেয়ে বলে উঠি, পেয়ারা খেলে
শুনছি নাকি সেরে ওঠে বে- আক্কেলে
রোগগুলো সব। বের হয়ে যায় মাথা থেকে-
ছড়া লেখার বিদঘুটে রোগ একে একে!
এমন সময় গান বাজলো মোবাইলে,
দেবুবাবু বলল, তরুণ ঘুমাচ্ছিলে?
ভূত সংখ্যায় পাঠাও ছড়া জ্যান্ত ভূতের
পাঠাচ্ছি কাল বলেই আমি গেলাম শুতে।

ছবিঃ অন্তরা

বাঘুমকে চিঠি

রতনতনু ঘাটী

বাঘুম, তুমি নও কি বাঘ
দেখাও কেন অমন রাগ?
বাঘ- বাঘুমে গুলিয়ে ফেলে
ভয়েই এখন ঘামছি।

বললে মাথা করবে হেঁট
ভয় পেত জিম করবেট
আমায় দেখে, আর কিছু না---
সে গল্প নয়, থামছি।

গল্প তুমি বলবে কী যে
বলতে পারি আমিই নিজে।
করবেটজি বাড়ি আসত
বন্ধু ভীষণ দাদুর।

সে'সব কথা বইতে লেখা
গড়ের মাঠে দু'জন দেখা
বাঘকে দেখে আদর করে
চেঁচিয়ে বলত 'আদুর।'

বাঘুম বলে, ক্যায়সে বাতে
হেঁটে গিয়ে চম্পাওয়াতে
গাছের টঙে বসে ছিলেন
করবেটসা'ব একাই

বাঘুম তুমি এতই জানো
লেখা আছে, চাই প্রমাণও?
বিল্টু এবং বিশুদেরকে
বইটা খুলে দেখাই?

সে বই লেখা ব্যাঘ্রলিপি
বুঝবে কী হে? পিঁপির পিঁপি
বাঘুম ছাড়া পড়বে তুমি?
বইটা জানি ছাপা নেই

আমি এখন ক্লাস ফাইভে
আচার চাখি আলতো জিভে
লেখাপড়ায় কমতি বটে
এ নিয়ে কুছ হ্যাপা নেই।

করবেটজি বীর শিকারী
এই কথাটা মানতে পারি
আমায় দেখে হেসে বলত
বাঘুম রে, তুই বাঘ না?

চিঠির উপর 'বাঘুম' লিখে
পাঠিয়ে দিচ্ছি চারিদিকে
কেয়ার অফ- এ লিখে দিলাম
'বাঘের পুঁচকে ভাগনা'

প্রথম ধাঁধা

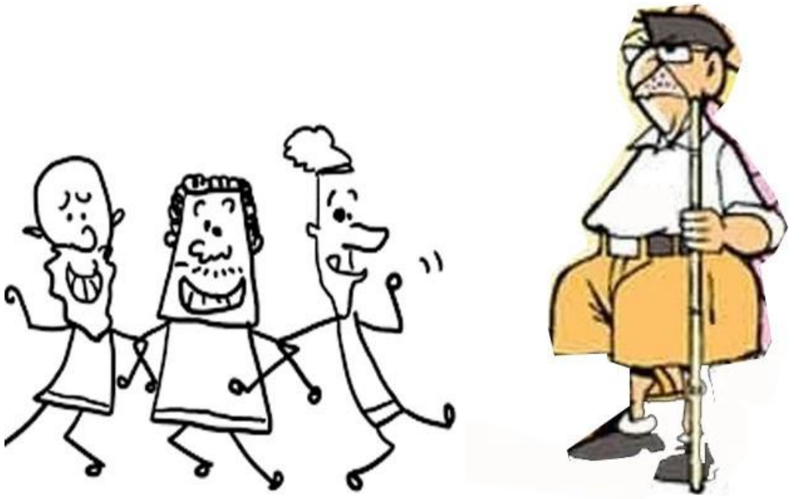

এক দ্বীপের লোকজনের মধ্যে যারা সাঁতার জানে তারা সর্বদাই সত্যিকথা বলে থাকে, আর যারা তা জানে না তারা সর্বক্ষণ মিথ্যেকথা বলে। তুমি সে দ্বীপে গিয়ে তিনজন দ্বীপবাসীর সঙ্গে দেখা। প্রথমজনকে তুমি জিজ্ঞাসা করলে, “ওহে, তুমি কি সাঁতারু?”
সে যে কী বলল, তা তুমি ঠিক শুনতে পেলে না।
দ্বিতীয়জনকে তুমি জিজ্ঞাসা করলে, “ ও কী বলল হে?”
সে বলল, “ও বলেছে, ‘হ্যাঁ’।”
তিন নম্বরজন শুনে বলে, “দাদা,আমিও কিন্তু সাঁতারু। আর, ওরা দুজন মিথ্যে বলছে। ”
বলো দেখি লোকগুলোর মধ্যে সাঁতারু কে/কারা আর সাঁতারু নয় কে/কারা?

দ্বিতীয় ধাঁধা

দুটো জাদু দরজা আছে। তার একটা সত্যবাদির শহরের পথ দেখায়। সে সত্যবাদি। অন্যটা মিথ্যেবাদিদের শহরে যায়। সেটা মিথ্যেবাদি। তুমি সত্যবাদির শহরে যেতে চাও। এদের একজনকে একটামাত্র প্রশ্ন করে উত্তরটা বুঝে নিতে হবে।
প্রশ্নটা কী হবে?

তৃতীয় ধাঁধা

আগেরটা বেশ সহজ ও প্রচলিত। কিন্তু এইবারে একটু নতুন সমস্যা। নতুন শর্তটা হল, তোমার প্রশ্নের উত্তরে তারা যে দরজাটা দেখিয়ে দেবে সেই দরজাটা দিয়েই ঢুকতে হবে তোমায়। তাহলে তুমি কী প্রশ্ন করবে?

কুইজ

১।সৌরজগত যে গ্যালাক্সিতে রয়েছে সেটা কী জাতের গ্যালাক্সি?
২।আকাশগঙ্গা গ্যালাক্সির সবচেয়ে কাছে যে বামন গ্যালাক্সিটা রয়েছে তার নাম কী?
৩।আকাশগঙ্গা বা মিল্কি ওয়েতে কত তারা আছে?
৪।আকাশগঙ্গার মোট ভরের বেশির ভাগটা কী দিয়ে তৈরি?
৫।আকাশগঙ্গার কেন্দ্রে একটা অতিকায় ব্ল্যাক হোল রয়েছে। সেটার নাম কী?
৬।বাড়ে'স উইন্ডো কী
৭।আকাশগঙ্গার কেন্দ্রিয় অঞ্চল থেকে সৌরজগত কত দূরে রয়েছে?
৮।পঞ্চাশটা কাছাকাছি গ্যালাক্সির যে পাড়াটায় আকাশগঙ্গা রয়েছে সে পাড়ার নাম কী দেয়া হয়েছে?
৯।আকাশগঙ্গার বয়েস কতো?
১০।পাড়ার পরে জেলা। গ্যালাক্সিদের জেলাকে বলে সুপারক্লাস্টার। আকাশগঙ্গা যে সুপারক্লাস্টারে রয়েছে তার নাম কী?

মগজ ধোলাই

রনিত পাল

১। ১৯২৯ সালে,পূর্ণচন্দ্র ঘোষ এবং নিত্যগোপাল সরকারের উদ্যোগে, ‘শ্রী কৃষ্ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার’ থেকে এই জিনিসটার পথ চলা শুরু। তৈরির জায়গার নাম অনুসারে নয় বিক্রির জায়গার নাম ,অনুসারে এটির নাম হয়েছে। বর্তমানে এই জিনিসটি প্রচুর পারিমাণে নকল হওয়ায় এর আসল নির্মাতারা জি আই ট্যাগের আবেদন করেছেন। কোন জিনিসটার কথা বলছি ?

২। ফেলুদা→ সিধুজ্যাঠাঃ ঃ শার্লক হোমস→????

৩। **১৯১১** সালে ইয়র্কশায়ার রেজিমেন্টের সাথে মোহনবাগানের ঐতিহাসিক আইএফএ শিল্ড ফাইনাল দেখতে ছদ্মবেশে মাঠে এসেছিলেন এক বিখ্যাত বাঙালি। তিনি কে?

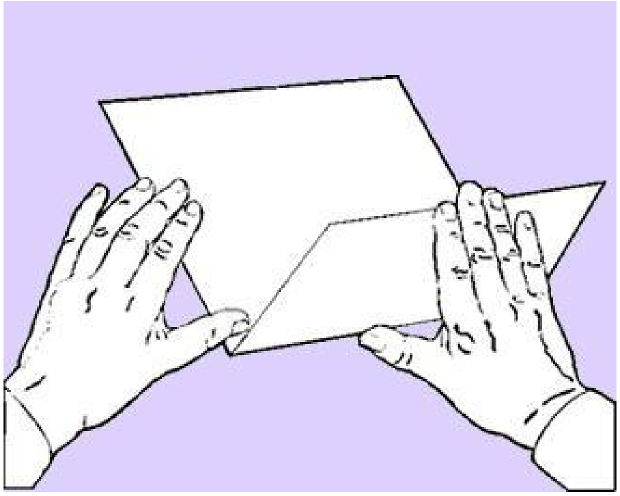

৪। যেকোন মাপের একটি কাগজকে সবচেয়ে বেশি কতবার ভাঁজ করা যায়?

৫। সম্প্রতি ফ্লিপকার্ট কর্তৃপক্ষ পরিষেবা আরো ভালো করবার জন্য এদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছেন। যুবরাজ চার্লস নিজের বিয়েতে এদের নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। বর্তমানে এরাবিভিন্ন আইআইটি ও আইআইএম- এ টাইম ম্যানেজমেন্টের ক্লাশ নিতে যাচ্ছেন। কারা?

৬। কাদের ট্যাগলাইন? “১৮৯৯ থেকে কোলকাতার বাতিওয়ালা”

৭। বেশি তেলমশলাযুক্ত রান্না হলে মোগল বাদশারা এটা দিয়ে হাত মুছতেন। বর্তমানে এটা একটা স্বীকৃত খাবার। কীসের কথা বলছি ?

৮। **১৯৬৬** সালে ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ চলাকালিন ইংরেজ রেফারি কেন অ্যাশটন একটা ম্যাচ খেলাতে ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে আসছিলেন। রাস্তায় ট্রাফিক সিগনালে তাঁর গাড়ি প্রায় ঘণ্টাখানেক আটকে পড়ে। এইসময় তার মাথায় একটা নতুন ভাবনা আসে যা তিনি ১৯৭০ এর বিশ্বকাপ থেকে চালু করেন। ভাবনাটা কী?

৯। ভারতের কোন রাজনৈতিক দলের প্রতীক চিহ্ন তীর ও ধনুক?

১০। আমি প্রথম সাক্ষাতে নিজের পরিচয় দিয়েছিলাম অতুলচন্দ্র মিত্র নামে। আমি দৈনিক কালকেতু– ’র নিয়মিত পাঠক।আমি কে?

জানো কী?

১। আমরা যে আকাশগঙ্গা গ্যালাক্সিতে থাকি সেটার ব্যাস হল ১,২০,০০০ আলোকবর্ষ, মানে তার এ মুড়ো থেকে ও মুড়োয় যেতে আলোর সময় লাগে অতগুলো বছর।

২। আকাশগঙ্গা গ্যালাক্সির দু দিকে বড়ো আর ছোটো ম্যাজিলানিক মেঘ নামের দুখানা তুলনায় ছোটো গ্যালাক্সি ঘোরে। তাদের টানাপোড়েণে আকাশগঙ্গার চেহারাটা অনেকটা ইংরিজি আট এর মতো দেখায়। বিজ্ঞানীদের তৈরি মডেল দেখাচ্ছে তারা যখন আকাশগঙ্গাকে ঘিরে ঘোরে তখন তাদের পরিবর্তনশীল টানে আকাশগঙ্গা হালকা নড়াচড়া করতে থাকে, ঠিক যেন পাখা ঝাপটাচ্ছে।

৩। দেবতাদের মাথায় বেশ একটা জ্যোতি দেখা যায়। আকাশগঙ্গার চারধারেও তেমনই একটা জ্যোতি আছে। তফাত হল, সে জ্যোতিকে চোখে দেখা যায় না। আলো, রেডিও তরঙ্গ কিছুই তার সঙ্গে কোন ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া করে না। আকাশগঙ্গার মোট ভরের শতকরা নব্বই ভাগই ওই জ্যোতির ভর। সে জ্যোতি তৈরি হয় অদৃশ্য বস্তু ডার্ক ম্যাটার দিয়ে। একমাত্র তার মহাকর্ষীয় প্রভাব থেকে তার অস্তিত্ব আন্দাজ করা যায়।

৪।মিল্কি ওয়েতে তারা আছে দশ হাজার কোটিরও বেশি। গোটা ব্রহ্মাণ্ডের যতটা দেখা যায়, অর্থাৎ দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডে তারা আছে আনুমানিক ১০ সিক্সটিলিয়ন (মানে একের পিঠে ২২টা শূন্য) গোটা ব্রহ্মাণ্ডে তারা আছে আনুমানিক ১০ অক্টিলিয়ন (মানে ১ এর পিঠে ২৯টা শূন্য)। তার মধ্যে গভীরতম অন্ধকার রাতের আকাশে খালি চোখে পৃথিবীর দুই গোলার্ধের সব জায়গা থেকে নিরীক্ষণ ধরলে খালি চোখে দেখা যায় মাত্র ৯০৯৬টা। একটা ১৫ ইঞ্চি টেলিস্কোপ দিয়ে দেখা যায় ৩৮ কোটি তারা।

৫। আরেকটা মজার খবর হল , একজন সাধারণ চেহারার মানুষের শরীরে পরমাণুর সংখ্যা গোটা ব্রহ্মাণ্ডের মোট তারার সংখ্যার দশ ভাগের এক ভাগ আর দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের মোট তারার সংখ্যার ১০ লক্ষগুণ বেশি, মানে ১ এর পিঠে ২৮ টা শূন্য। তার মানে , দশটা মানুষের শরীরে যত পরমাণূ আছে, সেটা ব্রহ্মাণ্ডের সব তারার আনুমানিক সংখ্যার সমান।

ড্রুডল

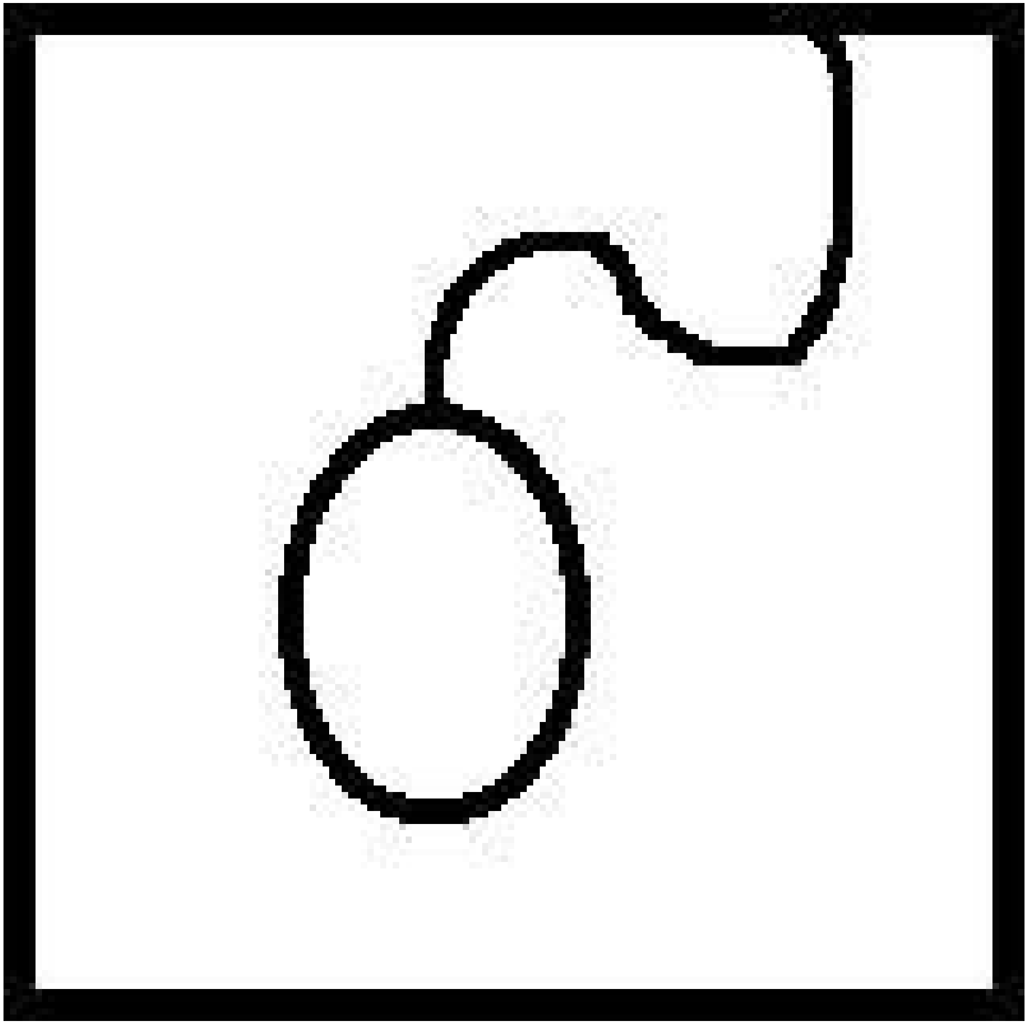

কীসের ফটো

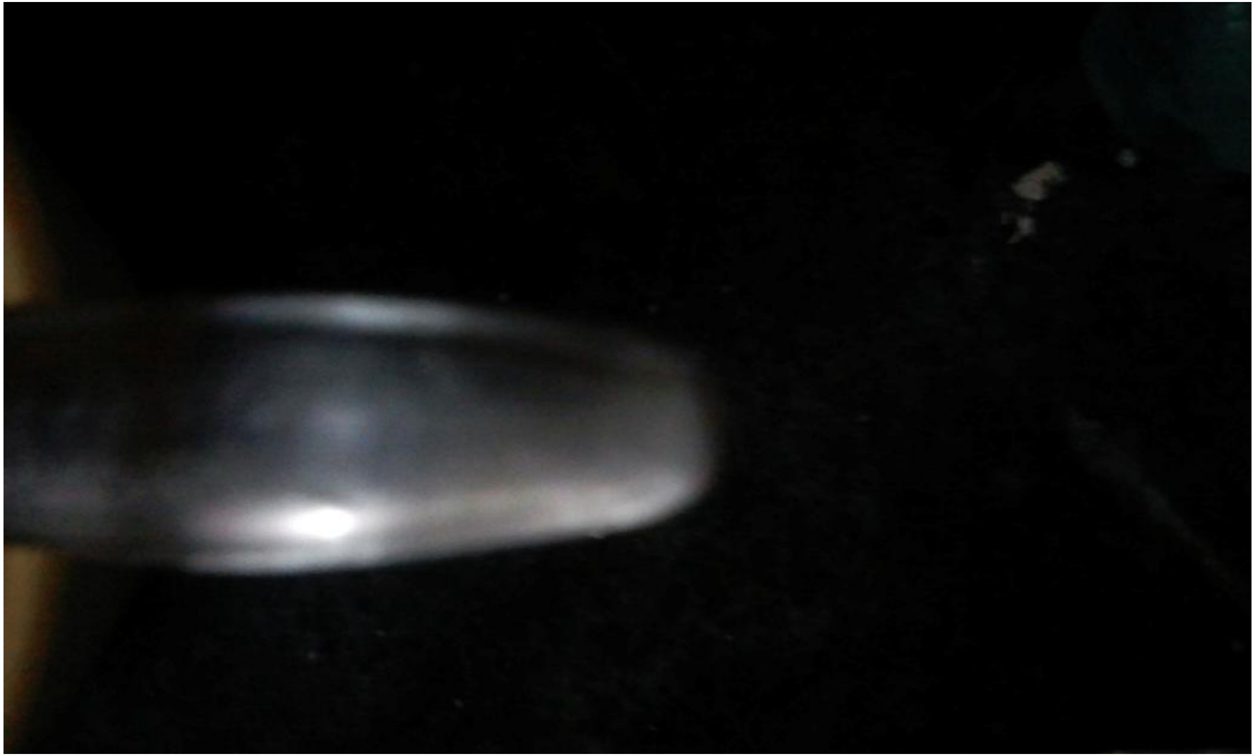

আশ্চর্য উলকি

অবিশ্বাস্য

গত সংখ্যার উত্তর

ধাঁধার উত্তর
প্রথম ধাঁধাঃ পাপোষ,
দ্বিতীয় ধাঁধাঃ স্মার্টফোন,
তৃতীয় ধাঁধাঃ ফোনকল

কুইজের উত্তর
১। অরোরা অস্ট্রালিস ২। মডুলেটর ডিমডুলেটর ৩। ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিকাল ইউনিয়ন। ৪। রামায়ণ। ৫। ষোলো কিলোমিটার। ৬। অ্যারাকনোফোবিয়া ৭। পার্লামেন্ট ৮। অস্ট্রেলিয়া ৯। হামিং বার্ড ১০। পূর্ব,পশ্চিম,উত্তর,দক্ষিণ,ঈশান,অগ্নি,নৈঋত,বায়ু,ঊর্ধ্ব,অধঃ

ড্রুডলের উত্তরঃ
টুপি পরে রোদে বসে ওমলেট ভাজা হচ্ছে।

মুখের ওপর হালকা ছোঁয়াটা পেতেই তাড়াতাড়ি চোখ মেললেন প্রফেসর বোস। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। দুচোখের মাঝখানে তাক করা লেজার বন্দুকের মাথার লেনসটা চকচক করছিল পেছন থেকে আসা একটা আলোর রেখার স্পর্শ পেয়ে। আলোটা তাঁর মুখের দিকে সরাসরি ধরা।

"নড়বার চেষ্টা করবেন না প্রফেসর বোস অথবা যে-ই হন আপনি," আলোর রেখার পেছনে দাঁড়ানো অতিকায় অন্ধকারের স্তূপটার থেকে মৃদু গলায় একটা সাবধানবাণী বের হয়ে এল, "আমি এ যন্ত্রটার ব্যবহার জানি।"

অন্য একজন মানুষ তখন দক্ষভাবে তাঁকে বেঁধে ফেলছে। এইবার হাতে ধরা আলোটা গুহার ছাদের দিকে মুখ করে মেঝেতে নামিয়ে রাখল মানুষটা। মৃদু, অনুজ্জ্বল একটা আলো ছড়িয়ে গেল গোটা গুহা জুড়ে। সেই আলোয় সামনে দাঁড়ানো মানুষটাকে মনে মনে জরিপ করে নিচ্ছিলেন প্রফেসর।

"জিষ্ণু- আমার ছেলে- তাকে- "

আলোটা হঠাৎ ঘুরে গেল একপাশে। সেখানে বালিশে মাথা রেখে অঘোরে ঘুমোচ্ছে জিষ্ণু। গভীর নিঃশ্বাসের তালে তালে তার বুকের ওঠাপড়া পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল।

"ওকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। আমাদের ছত্রাক কোন স্থায়ী ক্ষতি করে না। ঘন্টাকয়েক পড়ে ওর ঘুম ভাঙবে। ততক্ষণে আমার কিছু প্রয়োজনীয় কথা জানবার আছে আপনার কাছ থেকে।"

মানুষটার মুখের পরিশিলীত বাংলার মধ্যে একটা হালকা অচেনা টান ছিল। প্রফেসর চুপ করে রইলেন। ঘরের মধ্যেটা এইবারে বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। টর্চ ও দেয়ালের ছত্রাকের মিলিত আলোয় চোখ সয়ে এসেছে ততক্ষণে প্রফেসরের।

সামনে দাঁড়ানো মানুষটার বয়স চল্লিশের আশপাশে হবে। গায়ের তাপনিয়ন্ত্রক পোশাকটা পুরোনো, কিন্তু শক্তপোক্ত। একমনে সে হাতে ধরা প্রফেসরের লেজার অস্ত্রটিকে দেখছিল।

"হুম। মডেল এক্স্ ৮। প্রতিরক্ষা বিভাগের একেবারে আনকোরা নতুন আবিষ্কার। একবার চার্জ করে নিলে সাত হাজারবার ফায়ার করা যায়। বাজারে এর এক একটার জন্য সমান ওজনের হিরের চেয়েও বেশি দাম দিতে রাজি খদ্দেরের অভাব নেই। আপনার আর ওই বাচ্চাটার কাছে দেখছি দু দুখানা রয়েছে। পেলেন কার থেকে? কত পড়ল বলুন তো?"

বলতেবলতেই প্রফেসরের মুখে আটকানো আঠালো কাগজের টুকরোটা একটা হ্যাঁচকা টানে খুলে দিল মানুষটি।

"এ যন্ত্রটা বাজারে বিক্রি হয় না। "

"কী যে বলেন প্রফেসর! বাজারে সবকিছুই বিক্রি হয়। শুধু ঠিকঠাক যোগানদার খুঁজে বের করতে প্রলেই হল। কিন্তু কা পোন চি এখনো যে জিনিস জোগাড় করতে পারল না, প্রতিরক্ষা বিভাগের সেই নতুন মডেলের অস্ত্র বাজারে কোন খেলোয়ার নিয়ে এল সেইটেই জানতে চাইছি।"

"আপনার নামটা কোথাও শুনেছি।"

মৃদু হাসল মানুষটা, "শোনবার কথা। সমস্ত পার্থিব প্রচারমাধ্যমেই আমার নামে সতর্কবার্তা দেয়া আছে।"

প্রফেসর বোসের ভুরুদুটো কুঁচকে উঠল, "হ্যাঁ। মনে পড়েছে। এই মুহূর্তে পূর্ব গোলার্ধের সবচেয়ে নামকরা চোরাকারবারী। টাকার জন্য না পারে এমন কাজ নেই।"

"বাজে কথা রাখুন। আপনি কাদের হয়ে কাজ করছেন সেটা বলবেন কী?"

কোন জবাব দিলেন না প্রফেসর। একটু বাদে লোকটা ফের মুখ খুলল, "আপনি লাজলো ক্লদিয়াসের লোক?"

"সে কে?"

"বোকা সাজবেন না প্রফেসর। চারখানা টাইটানিয়াম খনির মালিক লাজলোকে চেনে না এমন মানুষ কেউ নেই। টাকার কুমীর। পৃথিবীর সবচেয়ে দামি মহাকাশ প্রমোদতরীর মালিক। ওর টাইটানিয়ামের লোভের শেষ নেই।"

হঠাৎ চোখদুটি চকচক করে উঠল প্রফেসর বোসের, "কিন্তু আমি যে লাজলোর হয়ে কাজ করছি, হঠাৎ এ সন্দেহ আপনার হল কেন?"

"প্রশ্নগুলো আমি করব প্রফেসর, আপনি উত্তর দেবেন।"

"আমার বাঁধনটা খুলে দেবেন কি?"

"যতক্ষণ না আপনার ব্যাপারে নিশ্চিত হচ্ছি ততক্ষণ নয়।"

"আমার অস্ত্র তো আপনার কাছে। তবুও ভয় পাচ্ছেন?"

"আমার প্রশ্নের উত্তর দিন প্রফেসর। আপনি কি লাজলোর লোক?"

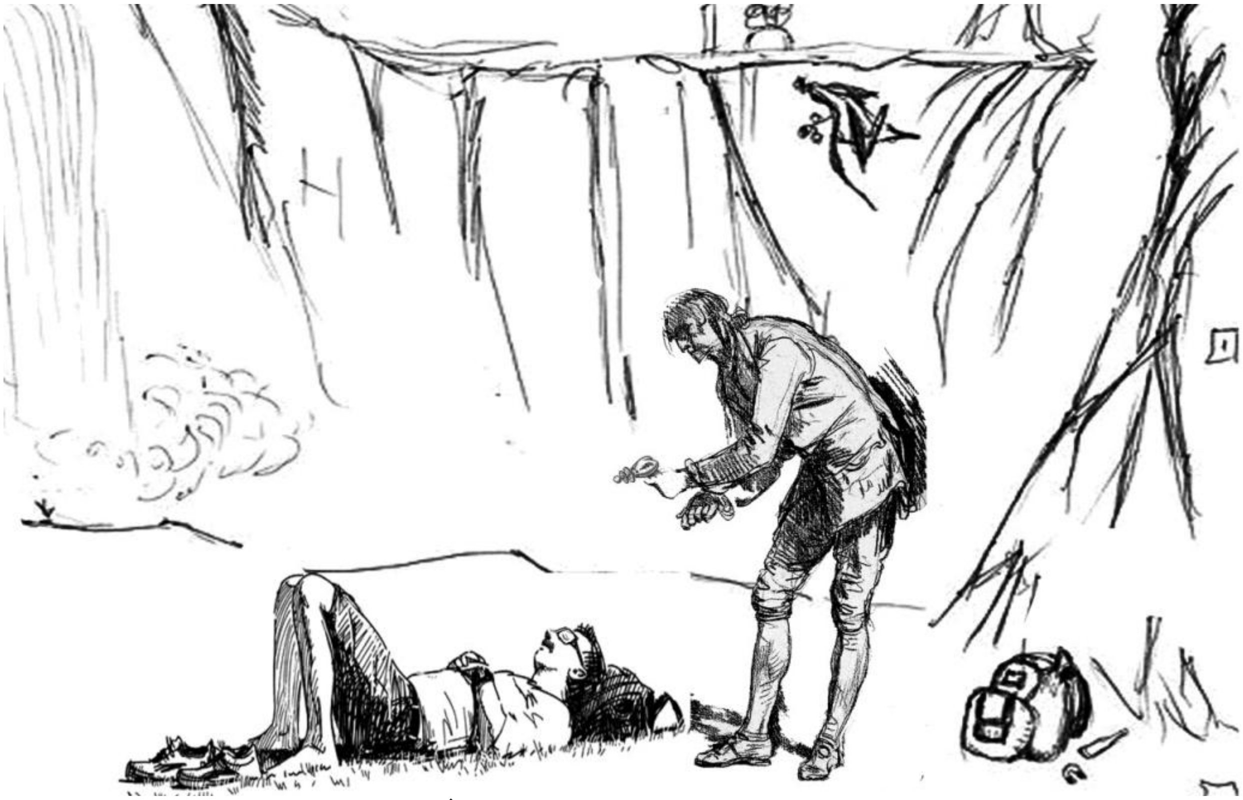

প্রফেসর বোসের মুখটা কঠিন হল এবারে, "অস্ত্রটায় পুরো চার্জ রয়েছে। আপনি চাইলে ওটা আমার ওপর ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু, বাঁধন না খোলা অবধি আমি আপনার কোন প্রশ্নের জবাব দেব না।"

"হুম। সাহস আছে। আচ্ছা বেশ- "

বলতেবলতেই জিষ্ণুর দিকে এগিয়ে গিয়ে হাতের অস্ত্রটা তার মাথার দিকে ঘুরিয়ে ধরল কা পোন। তারপর একটা ছোটো ছুরি নিখুঁত লক্ষ্যে ছুঁড়ে দিল প্রফেসর বোসের হাতের কাছে—

"-- এবারে বলুন- "

ততক্ষণে নিজের বাঁধনগুলো কেটে ফেলেছেন প্রফেসর বোস। জবাবে নিজের বাঁহাতটা তুলে ধরলেন তিনি। তারপর মনিবন্ধে একটা মৃদু টোকা মেরে বললেন, আপনার কাছে পরিচয়-চিপ স্ক্যানার আছে কী? আমার পরিচয়- চিপ এইখানে রয়েছে।

জিষ্ণুর দিকে এক হাতে অস্ত্রটা ধরে রেখেই মানুষটা অন্য হাতে তার পোশাকের পকেট থেকে একটা ছোটো যন্ত্র বের করে এনে সেটাকে ছুঁড়ে দিল প্রফেসরের দিকে।

বাঁহাতের মণিবন্ধে সেটাকে ছুঁইয়ে ফের কা পোনের কাছে তা ফেরত পাঠালেন প্রফেসর।

"প্রয়োজন হলে আমার রেটিনা স্ক্যান করে পরিচয় চিপের তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে নিতে পারেন কা পোন," খানিক পরে ফের কথা বললেন প্রফেসর।

"উঁহু। প্রয়োজন হবে না," হাতে ধরা যন্ত্রটার পর্দার দিকে দেখতে দেখতে জবাব দিল লোকটি, "আপনি লাজলোর লোক নন। আমি নিশ্চিত। ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা দফতরের পরিচয় চিপ নকল করবার প্রযুক্তি এমন কি লাজলোরও নাগালের বাইরে।"

“বেশ। এবারে বলবেন কি, আপনি কেন আমায় লাজলোর লোক ভেবেছিলান প্রথমে?”

প্রফেসরের কথার উত্তর না দিয়ে কা পোন চি একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল তাঁর দিকে। হঠাৎ করেই এক মুহূর্তের জন্য একটা লুব্ধ ভাব খেলে গেল তার মুখে, “লালপিওতে আপনার জন্য কত দর দিয়েছে জানেন?”

“আপনি—”

“সারা পৃথিবীর সমস্ত অপরাধীদল এই মুহূর্তে আপনাকে খুঁজছে, আর সেই হিরের খনি আমার হাতের মুঠোয় নিজে থেকেই এসে ঢুকে বসে আছে—”

“তুমি যা জানতে চেয়েছিলে তা জেনেছ কা পোন। এইবার এই অতিথির প্রশ্নের উত্তর দাও।”

বলতে বলতে দেয়ালের কাছ থেকে এইবারে আলোর বৃত্তের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন সন্ধ্যাবেলার সেই বৃদ্ধটি। তারপর প্রফেসর বোসের দিকে হাত তুলে মৃদু গলায় বললেন, “এইভাবে আপনাকে ব্যতিব্যস্ত করবার জন্য মার্জনা চাইছি হে অতিথি। কা পোন আমার একমাত্র সন্তান। সে আপনাকে সাহায্য করবার জন্যই এসেছে।”

প্রফেসর বোস সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বিরাটকায় মানুষটির দিকে ফের তাকিয়ে দেখলেন একবার। তারপর বললেন, “কিন্তু- ”

“আপনার সমস্ত কৌতুহলের জবাব আপনি পাবেন প্রফেসর,” কা পোনের মুখে মৃদু হাসি ফুটেছে এবার। লেজার পিস্তলটা প্রফেসরের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে সে মেঝের ওপর নিচু হয়ে বসে পড়ল তাঁর সামনে, “তবে প্রথম কৌতুহলটার জবাব প্রথমে দিয়ে নেয়া যাক। এই গুহাক্ষেত্রটির নীচে পৃথিবীর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট টাইটানিয়ামের ভাণ্ডার রয়েছে। এই এলাকায় এই ধাতুর উপস্থিতির আন্দাজ তার থাকলেও খনির সঠিক অবস্থানটা লাজলো নির্ণয় করতে পারে নি এখনো। সঠিক সন্ধানটা প্রথম পাবার জন্য সে যেকোন পথ ধরতে, যেকোন পরিমাণ অর্থ খরচ করতে তৈরি।”

“তাহলে আপনি এতদিন তাকে সে সন্ধান দেন নি কেন?”

কা পোনের ছোটো ছোটো চোখদুটো আরো ছোটো হয়ে উঠল কয়েক মুহূর্তের জন্য। খানিক বাদে মাথা নেড়ে সে বলল, “বাইরের দুনিয়া আমার ব্যাপারে একটা ভুল তথ্য জানে প্রফেসর। টাকার জন্য আমি সবকিছু করতে পারি তা ঠিক, কিন্তু এই পাহাড়টাকে আমি কিছুতেই বিক্রি করে দিতে পারি না। এই গুহাক্ষেত্রে আমি প্রথম পৃথিবীর আলো দেখেছিলাম। লাজলোর মাটি খোঁড়ার যন্ত্ররা এই পাহাড়কে ধ্বংস করে দিক তা আমি চাই না।”

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। তারপর নৈঃশব্দ ভাঙলেন সেই বৃদ্ধ, “তোমার ওপর সে বিশ্বাস আমার আছে বলেই আমি তোমাকে এই অতিথিদের খবর দিতে সাহস পেয়েছি।”

“তার মানে এই খনির খবর আপনিও—”

“এই সুকঠিন ধাতুর অস্তিত্ব আমরা জানি। এই গুহাগ্রামের গভীরতম অঞ্চল থেকে তুলে আনা ওই ধাতুমিশ্রিত পাথর দিয়েই আমাদের অস্ত্রাদি তৈরি হয়। কিন্তু সে কারণে আমি কথাটা বলি নি।”

“তাহলে কেন- ”

“এই গ্রহের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্রের কথা তুমি বলেছ, তা যদি সত্য হয় তাহলে এই গুহাগ্রামও রক্ষা পাবে না তার হাত থেকে। তাকে আটকাবার জন্য কা পোন যথাসাধ্য সাহায্য করবে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত ছিলাম বলেই আমি তাকে তোমাদের খবর দিয়েছি।”

“ক্ষমা করবেন প্রফেসর বোস,” কা পোন হঠাৎ মাথা নিচু করে বলল, “কিন্তু আশা করি আপনি বুঝবেন, কেন আপনাকে ভালো করে আগে পরীক্ষা করে নেবার প্রয়োজন ছিল। এই এলাকার প্রতি এখন শুধু লাজলোই আগ্রহী তা নয়। অস্বীকার করব না, মঙ্গল উপনিবেশকে অস্ত্র ও অন্যান্য রসদের বে আইনি সরবরাহ করাটা আমার মত চোরাই চালানকারীদের কাছে লাভজনক ব্যাবসা। কিন্তু এই এলাকায় কোন অপরিচিত মানুষের যে কোন খবরের জন্য যে চড়া মূল্যে দেবার প্রতিশ্রুতি তারা কয়েকদিন থেকে দিয়ে চলেছে পৃথিবীর সমস্ত গুপ্তসংস্থাকে তার পরিমাণের কাছে সে ব্যাবসার লাভের পরিমাণও তুচ্ছ হয়ে যায়। আমি নিজেও তাই কিছুকাল ধরে চোখকান খোলা রেখে চলেছি। কিন্তু আমার নিজের গ্রামেই যে-- ”

“আপনি কি তাহলে আমাদের- “ প্রফেসর হাতের অস্ত্রটি শক্ত করে চেপে ধরলেন।

“না। এইখানে আজ এসে পৌঁছোনোর আগে অবধি সে লোভ আমার মনে ছিল, তা আমি অস্বীকার করব না। কিন্তু, কেন তারা এ মূল্য দিতে প্রস্তুত হয়েছে তার কোন আন্দাজ আমাদের ছিল না। কিছুক্ষণ আগে বাবার কাছে সমস্ত ঘটনাটা আমি শুনেছি। আমি চোরাচালানের কাজ করে বেঁচে থাকি, কিন্তু আমার এই গ্রামকে, আমার গ্রহকে আমি ভালোবাসি প্রফেসর। কা পোন চি আপনাকে সমস্ত সহায়তা করবার জন্য তৈরি। বলুন, কী করতে হবে?”

একটা লম্বা শ্বাস ছাড়লেন প্রফেসর বোস, “একটা খবর দিয়ে আপনি আমার কাজ অনেক সহজ করে দিয়েছেন কা পোন চি। এইখানে টাইটানিয়ামের অফুরন্ত উৎস রয়েছে। আমার পরিকল্পনা সফল করে তোলবার জন্য এই ধাতুটিই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হবে। তবে প্রথমে একটা ছোটো কর্মীদল প্রয়োজন হবে আমার। আপনি- ”

মৃদু হেসে মাথা নাড়ল কা পোন, “আমাকে সে দলের মধ্যে ধরবেন না প্রফেসর। আমি যা করব তা গোপনেই করতে হবে। এ গ্রামের মানুষজনকে না জানিয়ে। আমি এখানে- ”

“না ক পোন। কাল থেকে তুমি আর এ গ্রামের পলাতক বাসিন্দা থাকবে না,” বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন, “সময় বদলেছে। অস্তিত্বরক্ষার প্রয়োজনে যে আইন আমাদের পূর্বজরা তৈরি করেছিলেন, আজ সেই অস্তিত্বরক্ষার প্রয়োজনেই সে আইন আমাদের বদলাতে হবে। আমি নিজে এই গ্রামের প্রধান হিসেবে সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।”

হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল কা পোনের মুখটা। সেখান থেকে নিষ্ঠুরতা আর ধূর্ততার মুখোশটা এক মুহূর্তে কে যেন সরিয়ে নিয়ে গেছে। ছোটো চোখদুটি খুশিতে চিকমিকিয়ে শক্তিশালী হাতের

ভেতর প্রফেসর বোসের হাতদুটোকে জড়িয়ে ধরে সে বলল, "ইউরোপার অন্ধকার সমুদ্রের টারমক শিকার করেছি আমি। কিন্তু সেদিনও এত আনন্দ আমি পাইনি। এতগুলো বছর বাদে আরো একবার সবার সামনে এই গ্রামের পথে আমি—শুধু আপনার জন্য -- আপনাকে ধন্যবাদ প্রফেসর। কা পোন আপনার কাছে চিরকাল ঋণী হয়ে থাকবে।"

তার গলার গমগমে আওয়াজ গুহার ভেতরে প্রতিধ্বনি তুলছিল। হঠাৎ সেই আওয়াজে চোখ মেলে লাফ দিয়ে উঠে বসল জিষ্ণু। তারপর প্রফেসর বোসের হাত ধরে থাকা অতিকায় মানুষটাকে দেখে একটা চিৎকার করে এসে লাফ দিয়ে পড়ল তার পিঠের ওপর।

মুহূর্তের মধ্যে অতবড়ো শরীরটাকে আশ্চর্য নমনীয়তায় বেঁকিয়ে নিয়ে হাতদুটো পেছনদিকে ঘুরিয়ে তাকে আলতো করে কোলের ওপর টেনে আনল টারমক শিকারী দুর্ধর্ষ মানুষটা, তারপর তাকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে ফের যখন কথা বলল, তখন তার কর্কশ গলায় এক আশ্চর্য কোমলতা ছিল, "তোমার নাম তো জিষ্ণু। আমি জানি। আমার কা পোন চি। আজ থেকে আমি তোমার বন্ধু। আমি একজন ভালো শিকারী। আমার সঙ্গে পাখি ধরতে যাবে নাকি?"

ক্রমশ

পঞ্চা নামে ভালুকটি

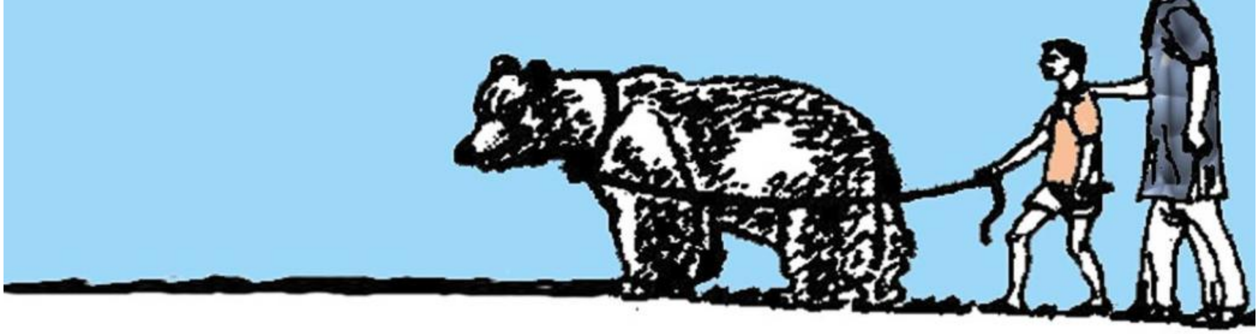

চিত্ত ঘোষাল

আট- ন’ মাস হল পঞ্চা আমাদের কাছে এসেছে। আজকাল দেখি মামা অন্য কাজকর্ম-ব্যাবসারও খোঁজখবর নিচ্ছে। একদিন মামা বলল, “বুঝলি দশা, শুরুতে যত পয়সা হচ্ছিল, এখন আর তেমন হচ্ছে না। ছোটো জায়গা তো, এক জায়গায় খেলা দেখানোর পর দু’মাস পরেও সেখানে আবার গেলে আগের মতো সাড়া পাচ্ছি না। তাই ভাবছি—”

বলে মামা চুপ করে গেল। আর কিছু বলে না দেখে আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, “পঞ্চাকে কি তবে বিক্রি করে দেবে?”

“আরে না না। এতেও যা হচ্ছে তাতে আমাদের চলে যাবে। আমি ভাবছি অন্য কথা। পঞ্চা হয়তো আর দু’চার বছর খেলা দেখাতে পারবে। তার মধ্যে আমাদের অন্য একটা পাকাপাকি ব্যাবসার ব্যবস্থা করতে হবে। হাতে কিছু জমেছে, সেটা থাকতে থাকতে নতুন কোনো ব্যাবসা শুরু করব। খেলা দেখানোটা তখন সাইড বিজনেস হিসেবে থাকবে।”

মুখে যা- ই বলুক মামা, আমার কিন্তু মনে হল মামা সব কথা খুলে বলছে না, আমার মন খারাপ হয়ে যাবে ভেবে রেখে- ঢেকে বলছে। আমি লেখাপড়া নিয়ে মেতে আছি, অন্যদিকে খেয়াল রাখি না। নিজের ওপর রাগই হল আমার। আমি যদি মামার কথা না ভাবি কে ভাববে তবে?

পরের রোববার মামার সঙ্গে বাজারে যাবার বায়না ধরলাম।

মামা বলল, "না না, তোকে যেতে হবে না, তুই পড়।"

"না," আমি জেদ ধরে বসলাম, "আমি যাবই। অত অত সবজি বাজার থেকে একা একা টেনে আনতে তোমার কষ্ট হয়। এখন থেকে ছুটির দিনে তোমার সঙ্গে আমিও বাজারে যাব। তুমি 'না' বলতে পারবে না।"

"বেশ বাবা বেশ," মামা হেসে বলল, "–তুই আমার পিতৃতুল্য, তোর হুকুম আমাকে মানতেই হবে। পিতৃতুল্যর মানে জানিস তো?"

"জানি, বাবার মতো। সে তুমি ঠাট্টা কর আর যা-ই কর, আমি এখন বড়ো হয়েছি, তোমার ভালোমন্দ আমি না দেখলে কে দেখবে?"

"ঠিক ঠিক।" মামা চোখ নাচিয়ে মাথা নাড়ল।

শীত চলে গেছে। ফুলকপি-বাঁধাকপি-মূলোর দিন শেষ। এই তিনটে সবজিরই ডাঁটাপাতা অনেক পড়ে থাকে বাজারে –এখন কোথায় সেসব? এদিকে তাকাই, ওদিকে তাকাই, পড়ে-থাকা জিনিস কিছু দেখি না।

"কী দেখছিস দশা?" মামা জিজ্ঞেস করল।

"ফ্রিতে পাওয়া যাবে এমন জিনিস কিছু দেখছি না মামা।"

"সে আবার শীত না এলে আর নয়। আলুটাই বেশি করে কিনব, আমরা খাব, পঞ্চারও পেট ভরবে। আর দেখি কী পাওয়া যায়।"

দরাদরি করে আঠেরো টাকা দিয়ে পাঁচ কেজি আলু কিনল মামা। দু'কেজি পাকা কুমড়ো নিল তারপর –বারো টাকায়। অনেকটা কুমড়োর বুকো পড়ে ছিল কুমড়োওলার পাশে। মামা তাকে বলল, "এগুলো নেব ভাই?"

"রোজ ফিরিতে কুমড়োর বুকো হয় না ভাই। তিন টাকা লাগবে।"

"এই যদি তোমার বিচার হয় –দেব। তবে কী জান ভাই, এসব তো অবোলা জীবের সেবায় লাগে..." মামা ঘুরিয়ে দাম কমাতে চাইল।

কুমড়োওলার মন তাতেও ভেজে না, "জানি ভাই, সবই জানি। যে অবোলা জীবের জন্য নিচ্ছ তার খেলা দেখিয়ে পয়সাও ভালোই পাচ্ছ।"

বোঝা গেল লোকটা কোথাও আমাদের ভালুকের খেলা দেখেছে। মামা আর কথা না বাড়িয়ে তিন টাকা দিয়ে বুকোগুলো নিয়ে নিল। তারপর পাঁচ টাকা দিয়ে এক কেজি কানা বেগুন আর এক টাকায় আড়াইশো একটু- একটু- থ্যাঁতলানো টম্যাটো কিনলাম আমরা। মনে মনে হিসাব করে আমাদের চক্ষু চড়কগাছ। উনচল্লিশ টাকার বাজার করেছি আমরা। পঞ্চা খাবে, আমি আর মামা খাব, তিন দিন যদি চলে এই সবজিতে তো খুব খুশি।

মামার হাতের থলেটা বড়ো, আমারটা ছোটো। আমরা বাড়ির দিকে হাঁটছি। মাঝপথে মামা আবার দুটো মুরগির ডিম কিনে নিল সাড় তিন টাকায়।

যেতে যেতে আমি মনে হিসাব করছি। সবজি ছাড়াও মামা দু'বেলাই আমাদের রান্না করা খাবারও পঞ্চাকে একটু একটু দেয়। পঞ্চার খাওয়ার খরচই লেগে যাচ্ছে প্রায় পাঁচ- ছ'শো টাকা মাসে। আবার শীত না পড়তে এই রকমই চলবে। বর্ষাকালে আরো বেশি লাগবে, তখন আনাজের দাম খুব বেড়ে যায় তো। ভালুকের খেলা দেখিয়ে কত টাকা আর হয় মামার? মাসে দেড় হাজারই হোক। এতে সব খরচ চালানো সত্যিই কঠিন। সত্যি, এত তাড়াতাড়ি যে সুখের দিন শেষ হয়ে যাবে ভাবতেই পারিনি।

দেখতে দেখতে বর্ষা এসে গেল। ছুটির দিনে মামার সঙ্গে বাজারে যাই। আগুন দাম সবজির। আমাদের বরাবরই, পঞ্চারও এখন প্রধান খাদ্য আলু। তার দাম সাত টাকা কিলো। তিন- চার মাস আগেও ছিল আড়াই টাকা- তিন টাকা কিলো। কী যে হবে?

প্রত্যেকটা ছুটিছাটার দিনে খেলা দেখাতেও বেরোতে পারে না মামা। যা বৃষ্টি, কে আসবে খেলা দেখতে? পার্ক- টার্ক কাদায় কাদা। মামার খুব মন খারাপ। চুপচাপ থাকে। মুখ গম্ভীর।

সবই বুঝতে পারি। কিন্তু আমি আর কী করব? তবে ভরসা একটাই –হার মানবার পাত্র নয় মামা, একটা না একটা রাস্তা ভেবে ঠিক বের করবেই। কত ব্যাবসা এল, কত ব্যাবসা গেল। ভালুক খেলায় না পোষালে অন্য ব্যাবসা ধরবে মামা। মামার ভাবনা সে জন্যে নয়, তা সে না বললেও জানি। মামার আমার দু'জনারই আসল ভাবনা পঞ্চাকে নিয়ে। সে আমাদের এত আপনজন হয়ে গেছে যে তাকে ছাড়া থাকবার কথা আমরা ভাবতেই পারি না। কিন্তু অবস্থা যা দাঁড়াচ্ছে তাতে কী করে যে ওকে আমরা পুষব তাও বুঝতে পারছি না। খুব খারাপ সময় যাচ্ছে আমাদের। এমন যে হবে আমরা একেবারেই ভাবতে পারিনি। দূরদৃষ্টি আমাদের সত্যিই কম –মামারও, আমারও।

মামা একদিন কাঁদো- কাঁদো মুখে আমাকে ডেকে বলল, "দশা, আর যে পারা যাচ্ছে না।"

এটুকু বলেই মামা চুপ করে গেছে। আমি কিন্তু বুঝতে পারি পরের কথাগুলো আমাকে কীভাবে বলবে তা- ই ভাবতে সময় নিচ্ছে সে। কথাগুলো যে কী হতে পারে তাও আমি আন্দাজ করতে পারি।

তাই মামাকে বলার কষ্ট না দিয়ে আমিই বললাম, "চলো, পঞ্চাকে কলকাতার চিড়িয়াখানায় রেখে আসি।"

মামা মাথা নাড়ল, "নেবে না। দিশি ভালুক কত আছে ওদের!"

"কিন্তু পঞ্চার মতো অসাধারণ ভালুক কি আছে?"

"তা নেই। কিন্তু চিড়িয়াখানার কর্তারা ওসব বিচার করে না। করার দরকারও নেই তাদের। তারা জন্তুজানোয়ারকে খাঁচায় আটকে রাখে, খেতে দেয়, লোকে টিকিট কেটে দেখতে আসে। ওদের কাছে একটা বোকাহাঁদা ভালুকও যা, পঞ্চার মতো মেধাবী ভালুকও তা- ই।"

"সার্কাস কোম্পানিতে দিলে হয় না?" আমি পরামর্শ দিই।

"নাঃ," মামা এক কথায় খারিজ করে দেয় আমার পরামর্শ, "কবে কোথায় কোন সার্কাস কোম্পানি তাঁবু ফেলবে তার জন্যে অপেক্ষা করে থাকা যায় না। তারা যে নেবে তারও ঠিক নেই।"

"তাহলে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসাই ভালো।"

"জঙ্গল কোথায় এখানে? ভালুক থাকে তেমন জঙ্গল? একা একা কেউ থাকতে পারে না রে।"

"তাহলে কী করবে মামা?"

"উপায় একটা ভেবেছি," চিন্তিত মুখে মামা বলল, "শহরের বাইরে দূরে কোথাও ওকে ছেড়ে দিয়ে আসব।"

"তারপর?"

"তারপর আর কী। লোকে নিশ্চয়ই ওকে দেখে পুলিশকে খবর দেবে। যা করার তখন পুলিশই করবে।"

"পুলিশ ওকে গুলি করে মেরে ফেলে যদি..."

"দূর পাগল। কোনো বন্যপ্রাণী হিংস্র না হয়ে গেলে তাকে মারা দন্ডনীয় অপরাধ। পুলিশ খবর দেবে বন- দপ্তরকে। তাদের লোক এসে পঞ্চাকে কোনো জঙ্গলে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করবে - যেখানে ওর জাতভাইরা থাকে।"

যতই অনিচ্ছা থাক আমাকে মামার কথায় সায় দিতেই হল, "তবে তা- ই করো। "

ক্রমশ

একটু রোসো।
আসছি রে বাবা।
ততক্ষণ আগের
পর্বগুলো আরেক
বার পড়তে থাকো
না কেন?

সোমেনবাবু হাওড়া স্টেশানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পান কিনছিলেন প্ল্যাটফর্মে। দেখানে তখন দিল্লি যাবার জন্য দুরন্ত এক্সপ্রেস হুইশিল দিয়েছে। হঠাৎ স্টেশানে দৌড়োতে দৌড়োতে ঢুকল ঢাউস ব্যাগ হাতে দুই যুবক। তাদের পেছন পেছন হাঁসফাঁস করতে করতে কোনমতে ছুটে আসছিলেন এক বৃদ্ধ। যুবকদুজন তো এক ছুটে এসে ট্রেনের কামরার হ্যান্ডেল ধরে উঠে পড়ল। বৃদ্ধ কোনমতে যখন কামরার কাছে এসে পৌঁছেছেন তখন ট্রেন গতি নিয়ে নিয়েছে। কামরার জানালা দিয়ে দুই যুবকের মুখ দেখা যাচ্ছিল। তারপর ট্রেন বেরিয়ে গেল। বৃদ্ধ তখন প্ল্যাটফর্মে বসে একবার মাথা চাপড়ে কাঁদেন আবার পেট চেপে ধরে হো হো হি হি করে হাসেন। তাই দেখে সোমেনবাবু তো তাকে এসে ধরে তুললেন। জিজ্ঞাসা করলেন আপনি এমন একসঙ্গে হাসছেন আবার কাঁদছেন কেন? বৃদ্ধ বললেন, কাঁদবো না? দু মাস আগে টিকিট কিনে রেখে এখন এক মিনিটের জন্য ট্রেনটা ধরতে পারলাম না। ও হো হো--

তাঁকে আবার কান্না শুরু করতে দেখে সোমেনবাবু তাড়াতাড়ি বললেন, আরে আরে আবার কাঁদে দেখি! ও মশাই তাহলে হাসছিলেন কেন? অমনি বৃদ্ধ পেট চেপে ধরে হাসতে হাসতে বলেন, আমার দুটো বজ্জাত নাতি, সবসময় আমার পেছনে লাগবে। আমায় তুলে দিতে এসেছিল ট্রেনে। সেদুটো ট্রেনে উঠে পড়ে আর নাবতে পারে নি। টিকিট ছাড়া উঠেছে। এইবারে যা নাকাল হবে না-- ও হো হো হি হি হি--

২। মোটা ভদ্রলোকঃ ডাক্তারবাবু আমি বড্ড রোগা হয়ে যাচ্ছি দিন কে দিন। আমার কী অসুখ হয়েছে বলুন তো!
ডাক্তারঃ সিম্পল। আপনার চোখের অসুখ হয়েছে। চশমা নিন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

নুনদানি

ঋত্বিক প্রিয়দর্শী
ষষ্ঠ শ্রেণী, এপিজে স্কুল, কলকাতা

আকাশ এর exospher e এ ঢুকতেই মেশিনটা কেমন যেন গরম হতে লাগলো। কন্ট্রোল প্যানেলটা তো গেছে, যদিও St abi l i zer গুলো কাজ করছে তাই বাঁচোয়া! একটুক্ষণ পরে দেখি যে আমার মহাকাশযানটা প্রায় ল্যান্ড করে গেছে, সিস্টেমগুলো শেই মুহূর্তে গ্রহের মাটিটাকে স্ক্যান করতে লাগলো। হঠাৎ সেফটি অ্যালার্মটা বেজে উঠল, এখানকার মাটি তো আমাদের দুনিয়ার থেকে অনেক শক্ত, নিচে পড়লে তো একদম চুরমার হয়ে যাব, ভয়ের চোটে অজ্ঞান হয়ে গেলাম। জ্ঞান ফিরতেই একটা আওয়াজ শুনতে পেলাম, আওয়াজটা ছিল “ধরেছি”।

আর যে কথা বলছিল সে ছিল একটা মানুষ। আমি ভাবলাম, “এ বাবা, কোথায় এসে ফাঁসলাম, এরা আমায় দেখতে পেলে তো মেরে ফেলবে”! মানুষটা বলল(আমায় তখনও দেখতে পায়নি), “কী সুন্দর একটা নুনদানি, এটাকে মায়ের জন্য নিয়ে যাব, আপাতত এটাকে এখানে রেখে দিই আর ম্যাচটা শেষ করি।” এইসব বলে আমায় নিয়ে রেখে ও খেলতে চলে গেল। কয়েক মিনিট পর আমি বাইরে তাকাতে গিয়ে আমার মহাকাশযানটার সাথে নীচের দিকে গড়াতে রাখলাম, যখন থামলাম বেরিয়ে দেখি এক প্রকান্ড দৈত্য (আসলে একটা বেড়াল)! আমি কিছু বুঝতে না পেরে আমার মহাকাশযানটার জ্বালানি, মানে H_2O এর পাইপটা ওর দিকে তাক করে

ছুঁড়লাম। আর জন্তুটা পালিয়ে গেল। একটু পরে ওই বাচ্চা ছেলেটা আমায় খুঁজে পেয়ে বলল "কোথায় চলে গিয়েছিলিস? চল বাড়ি চল!" বলে আমায় ওর বাড়ি নিয়ে গিয়ে ওর মাকে দেওয়ার

আগে ও আমায় আর আমার U. F. O টাকে ওর ঘরে নিয়ে গিয়ে ওর খাটের উপর রাখল। তারপর যেই না ঢাকনাটা খুলেছে, আমায় দেখে ভীষণ চিৎকার করতে করতে পালিয়ে গেল।

ছেলেটাতো চিৎকার করতে করতে পালিয়ে গেল, আমি ভাবলাম "এবার তো গেছি, মনে হয়ে ও অন্য কাউকে ডেকে আমায়ে তাড়িয়ে দেবে!"।কয়েক মিনিট পর ও আর একটা মানুষ(ওর দাদা)কে নিয়ে এই ঘরে এল, ওই ছোটো ছেলে টা আমার U. F. O টার ঢাকনা টা খুলতে গিয়ে ভুল করে আমার U. F. O টা নিচে ফেলেদিল। নিচে পরে ওটা একদম চুরমার হয়ে গেল, ভাঙা জাহাজটার মধের থেকে বেরলাম আমি(আমার কিছু হয়নি)।বড়ো ছেলেটা আমায়ে দেখে বলল "এতো দেখি একটা ভিনগ্রহী, আমার নাম গৌরব আর ও আমার ভাই টিনটিন"।

"ভিনগ্রহী!আমার ওতে খুব ভয়ে করে!"ভাই টা বলে উঠল।

আমি বললাম "আমার নাম কোকো, আর আমি এসছি আস্ট্রোফিগাস গ্রহের থেকে"।

"তো তুমি এখানে এলে কী করে?" গৌরব জিজ্ঞেস করল।

তারপর আমি ওকে আর ওর ভাইকে পুরো গল্পটা শোনালাম। অবশ্য ছোটো ভাইটা মুখ গোমড়া করে বসে ছিল! বড়ো ভাইটা বলল, “আমরা তোমায় সাহায্য করব, কিন্তু আজকের দিনটা আরাম করে ঘুমাও, কালকে থেকে তোমাকে পুরো শহর দেখাবো আর U. F. O টা ঠিক করার চেষ্টা করব।”

এই বলে আমায় একটা দেশলাই বাক্সের মধ্যে ঢুকিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিল, মাঝরাতে উঠে দেখি বৃষ্টি পড়ছে আর জানালায় কে একটা যেন হাত দিয়ে ঠক ঠক করছে! একটু পরে বুঝলাম যে আসলে সেটা একটা গাছের ডাল ছিল।

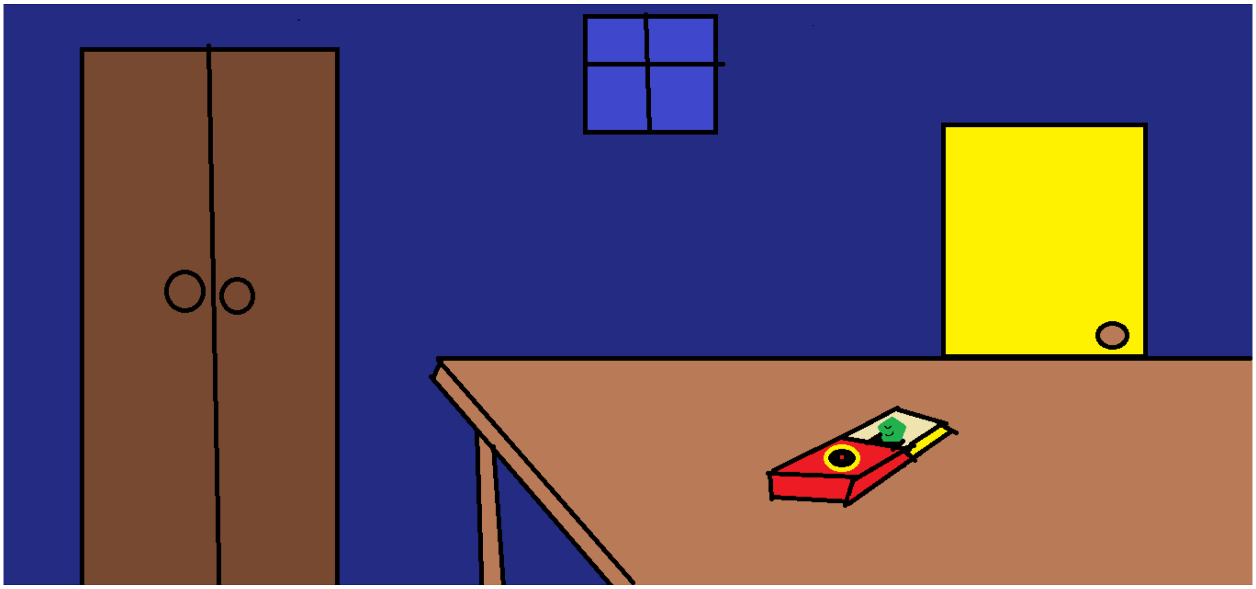

পরদিন সকালে উঠেদেখি গৌরব আর টিনটিন আমার জন্য ঠিক আমার U. F. O টার মতন দেখতে একটা জিনিস এনেছে(একটা নুনদানি)। আমায় বলল, “এটা আমরা ঠিকঠাক করার আগে তোমায়ে শহরটা দেখিয়ে আসি, কী বল, যাবে?”

”ঠিক, নিশ্চই!” আমি বললাম। এই বলে আমরা বাইরে বেরোলাম।

যেতে যেতে দেখলাম কতগুলো চৌকো- চৌকো বড় জিনিস, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “এইগুলো কী?” ওরা হাঁটতে হাঁটতে উত্তর দিল, “এইগুলো হল বাড়ি”। বাড়ি এত চৌকো হয় নাকি? আমাদের ওখানে তো বাড়ি গোল হয়!। তারপর কত সুন্দর জায়গা দেখলাম। একটা জায়গা ছিল, যেটার নাম ছিল কুতুব মিনার, আর ছিল হুমায়ুন্স টুম্ব, আরো অনেক সুন্দর জায়গা ছিল!

তারপর কত সব মজার জিনিস খেলাম তা তো আর বলার নেই, ছিল হচ্ছে সিঙারা, আইসক্রিম, ফিশ ফ্রাই। আরো অনেক কিছু খেলাম। ফিরতে ফিরতে সন্ধে হয়ে গেছিল।

বাড়ি ফিরে আমরা সবাই মিলে(৩ জন)ওর মেশিনটা দেখে দেখে কয়েকটা জিনিস যেগুলো U. F. O টা নুনদানি থেকে তৈরি করার জন্য দরকার ছিল সেগুলোকে একটা লিস্টে লিখে নিলাম। ভাবলাম পরদিন সারাদিন ধরে ওটা বানানোর চেষ্টা করব। ভেবে শুতে গেলাম। আজ রাতে ঘুম আসছিল না। বাড়ির কথা খুব মনে হচ্ছিল। কিনা একবার U. F. O টা নিয়ে বেরোলাম মা বাবার অনুমতি নিয়ে, কিন্তু এই জায়গাটায় এসে আটকে গেলাম! অবশ্য এই মানুষগুলো তো ভাল, অন্য কোনো মানুষ হলে তো আমায়ে মেরে ফেলত, যেমনটা ক্লাসের Astronomy সাবজেক্টে পড়েছিলাম!

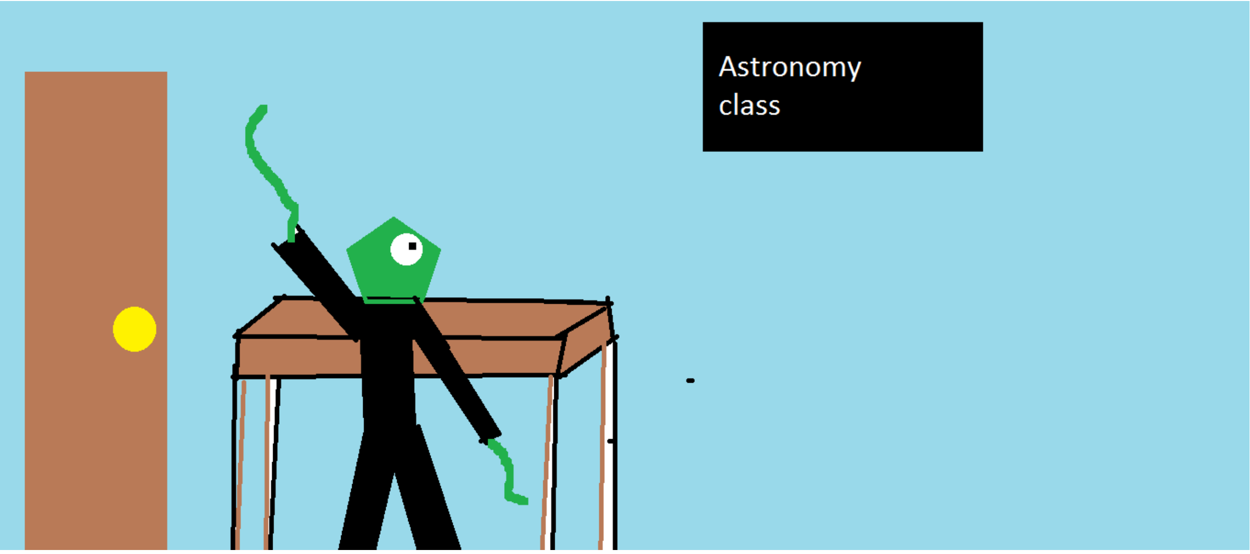

কিন্তু এই মানুষগুলো ভালো কেন? কে জানে? ঠিক করলাম, আমি বাড়ি গিয়ে এটার ব্যাপারে সবাইকে বলব। যাই হোক এখন তো ঘুমাই!

পরদিন সকালে আমি নিজে উঠিনি, আমায় ডাকা হয়েছিল। কে ডেকেছিল? দুই ভাই, তারা খুব আস্তে আমায় বলল, “চল আমরা তোমার মেশিনের জন্য জিনিসপত্র খুঁজতে যাই!”

“কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কেন? এখন তো সবে (ঘড়ির দিকে তাকিয়ে) পাঁচটা বাজে!” আমি বললাম। “কারণ, আমাদের আটটার থেকে স্কুল আছে!” টিনটিন বলল। আমি বললাম, “তোমাদের এখন থেকে স্কুল! আমাদের তো তিনটের থেকে স্কুল শুরু হয়! অবশ্য ঠিক আছে চল।”

একঘন্টা পর ফিরে আমরা একটুকক্ষণ বসে লিস্টটা পড়ে দেখলাম যে আমরা সব পেয়ে গেছি, শুধু একটা স্টিয়ারিং বাকি!

গৌরব বলল, “সময় হয়ে গেছে। মা এখুনি ডাকতে আসবে। কোকো তুমি তাড়াতাড়ি লুকিয়ে পড়, আমরা স্কুল থেকে ফিরে এসে সব জিনিসগুলো লাগিয়ে দেব। ঠিক আছে?”

আমি তারপর লুকিয়ে পড়লাম, গৌরব আর টিনটিনের মা হঠাৎ এসে বলল, “এই ছেলেগুলো, এখনও রেডি হোসনি! শিগগির রেডি হও। নাহলে স্কুলবাস মিস করবি!” বলে দমাস করে দরজাটা বন্ধ করে চলে গেল। ওরা আমায় বিদায় জানিয়ে একটা চৌকো বাস চড়ে স্কুলের দিকে

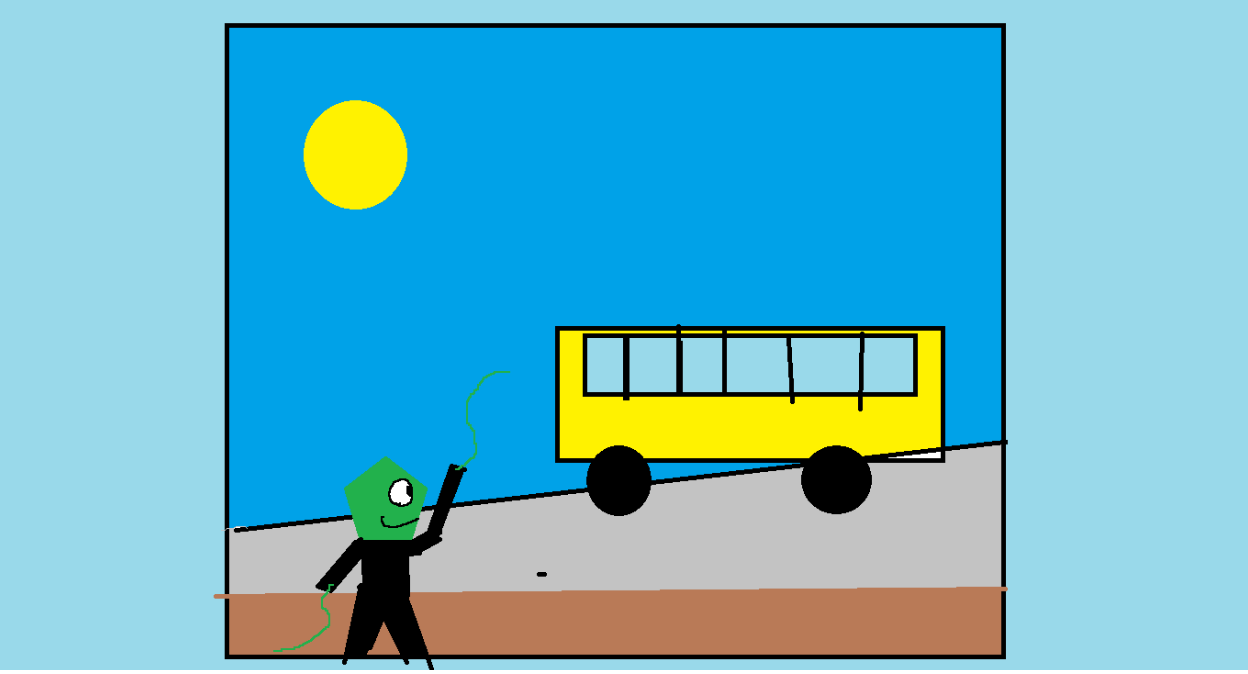

রওনা দিল।

সারা দুপুর ওদের জিনিসপত্র দেখলাম। যেমন টিভি বলে একটা জিনিস আর কয়েকটা মজার বই। আর টিনটিনের খরগোশটার সাথে অনেকক্ষণ খেললাম। দুটো বাজতে না বাজতেই ওরা ফিরে চলে এল। আসা মাত্রই ওদের মা'র ঘরে গিয়ে ওর মায়ের ড্রয়ার থেকে একটা আংটি নিয়ে চলে এল আর আমায় বলল, “এই নাও তোমার স্টিয়ারিং এর ব্যবস্থা হয়ে গেছে!”

তখন আমরা আমার U. F. O টা বানাতে শুরু করে দিলাম। আমরা প্রথমে সামনেটা খুলে ইঞ্জিনটা বসালাম। তারপর সেটা তার দিয়ে আমাদের কন্ট্রোল সিস্টেমটাতে জুড়লাম(এটাতে ৩ ঘন্টা লাগলো)। তারপর ইঞ্জিনটার মধ্যে জুড়লাম তারগুলো। সাথে- সাথে লাগালাম ফিউয়েল ট্যাঙ্ক। বানালাম বোতল দিয়ে। তারপর ওর মধ্যে ফিউয়েল(মানে জল)ভরলাম। এক্সট্রা ফিউয়েল দিলাম তারপর ৪টে ব্যাটারি(দুটো কন্ট্রোল সিস্টেমের জন্য আর দুটো এক্সস্ট্রা)।তারপর

লাগালাম সাইডের পাইপ। একটা সিট বসালাম। একটা stabilizer, খাবার আর একটা ফুল প্রুফ প্রটেকশন যাতে U. F. O টা না ভাঙে। আর আংটিটা steering এর জায়গাতে।

আর শেষে ওটাকে একটু রং করে দিলাম। এবার আমার যাওয়ার পালা। অমি ওদের বললাম, "ধন্যবাদ, তোমরা যা যা আমার জন্য করেছ। আমায় বাঁচালে তারপর শহর ঘোরালে, আমি তোমাদের জন্য বেঁচেছি। আর আমার ব্যাপারে কাউকে বোলো না। ঠিক?"

এই সব ভালো কথা শুনিয়ে কোকো আকাশে কোথায় হারিয়ে গেল।

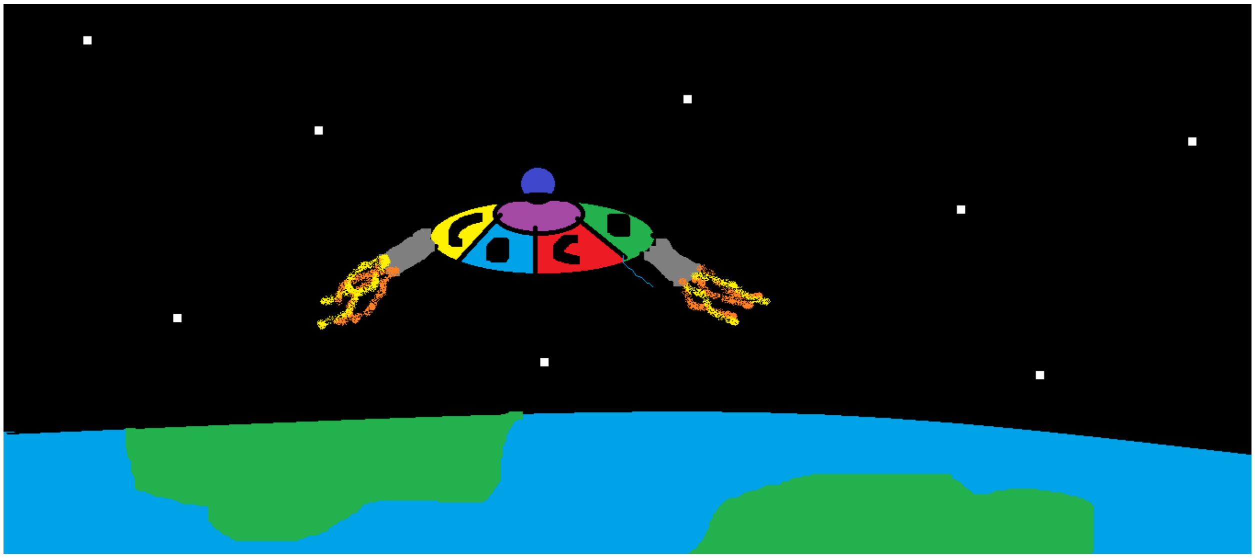

ছবিঃ ঋত্বিক

গ্যালারি

তানের ছবি

(রথযাত্রা)

তানের ছবি

(দশ নম্বর জার্সি)

নচিকেতা ও সত্য

পর্ব ২

সংহিতা

নচিকেতা হাজির হলেন যমালয়ে। তখন যম সেখানে অনুপস্থিত। যম ফিরতে তাঁর পরিচারকদের একজন জানালেন, "আগুনের মতো তেজি এক ব্রাহ্মণ এসেছেন। তাঁকে কিছু অর্ঘ্য দিলে তবে তিনি তুষ্ট হবেন। তাঁকে জল দিন।"

বৈদিক অনুশাসনে অতিথি ঈশ্বরের অংশ। তাই অতিথি সেবা দেবসেবার তুল্য বলে মনে করা হত। তার ওপর অতিথি ব্রাহ্মণ বা সন্ন্যাসী হলে তাঁর সাথে ঈশ্বরের যোগাযোগ খুবই দৃঢ় বলে মনে করা হত। তাই যমালয়ে যমরাজ ফিরলে তাঁকে তাঁর অনুচরেরা বললেন, "নচিকেতার পায়ে জল দিন।" এটাই ছিল অতিথির আপ্যায়নের রীতিতে প্রথম ধাপ।

যম বললেন নচিকেতাকে, "হে ব্রাহ্মণ, মান্য অতিথিবর, আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন। আমার বাড়িতে যেহেতু তিনরাত আপনাকে অভুক্ত থাকতে হয়েছে, সেহেতু আপনি তিনটি বর বেছে নিন।"

নচিকেতা বললেন, "আমার বাবা, গৌতম, যেন আমাকে নিয়ে তাঁর যত দুশ্চিন্তা সে সবের থেকে মুক্তি পান। যেন আমার ওপর তাঁর যত রাগ সব চলে যায়। যখন আপনি আমাকে তাঁর কাছে ফেরত পাঠিয়ে দেবেন, তখন তিনি যেন আমাকে সহজে গ্রহণ করতে পারেন । এসবই আমার চাই প্রথম বরে।"

উত্তরে যম বললেন, "ঔদ্দালকি আরুণি, তোমার বাবা। তিনি আমার ইচ্ছেতে তোমার মনোভাব জানবেন। আর তোমার প্রতি তাঁর আগের মনোভাব, আগেকার আচরণ ফিরে আসবে। তাঁর সমস্ত ক্রোধ অবলুপ্ত হবে যখন তিনি দেখবেন যে তুমি মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে গেছ।"

নচিকেতা বললেন, "স্বর্গের চৌহদ্দিতে কোন কিছুরই ভয় নেই। সেখানে আপনার বাস নয়। তাই সেখানে বার্ধক্যের ভয় নেই। খিদে, তেষ্টা, দুঃখকে অতিক্রম করে সেখানকার বাসিন্দারা কেবলই জীবনের উৎসব করেন।"

নচিকেতা আরও বললেন, "হে মৃত্যু, স্বর্গগামী যজ্ঞাগ্নির সব কথাই আপনি জানেন। সেসব কথা আমাকে বলুন। আমি যজ্ঞাগ্নির ভক্ত। স্বর্গলোকের অধিবাসীরা মরণশীলতা থেকে মুক্ত। দ্বিতীয় বরে আপনি আমাকেও অমর করে দিন।"

যম উত্তরে জানালেন, "স্বর্গগামী যজ্ঞাগ্নির ব্যাপারে সব কথাই আমি জানি বটে। সেসব কথা বলব তোমাকে নিশ্চয়ই। শোনো তবে। শুধু মনে রেখো যে, এই জ্ঞান চরাচরের তাবৎ জ্ঞান আর তার শক্তি। সমগ্র অস্তিত্বের প্রাণের গভীরে থাকে এই জ্ঞান।"

তারপর যম নচিকেতাকে বললেন, "যজ্ঞাগ্নি ত্রিলোকের প্রবেশপথ।" আরও বললেন তাকে যে কী ধরণের কটা ইট কেমন করে সাজিয়ে যজ্ঞবেদি তৈরি করতে হয়। সেসব কথা নচিকেতা হুবহু আওড়ে নিলেন একবার করে। তাতে খুশি হয়ে যম নচিকেতাকে বললেন, "তোমাকে আর একটা বর দিলাম। এই যজ্ঞাগ্নিকে ডাকা হবে তোমার নামেই। এখন এই রংবেরঙের মালাটা পরে নাও।"

তিনি আরও বললেন যে, "যে নচিকেতা যজ্ঞ তিনবার করে সে মাতা, পিতা ও গুরুর সাথে একাত্ম হতে পারে। আর যে বেদপাঠ করে, যজ্ঞাহুতি দিয়ে, দান করে ত্রিকর্তব্য পালন করে সে জন্ম ও মৃত্যুর চক্র অতিক্রম করে। যে এই শ্রদ্ধেয় জ্যোতির্ময় যজ্ঞাগ্নিকে যথাযথ জেনে, ব্রাহ্মণ থেকে জন্মলাভ করে ও ব্রাহ্মণকে উপলব্ধি করে সে চিরশান্তি অর্জন করে।"

তিনি আরও বললেন যে, "যে জানে কী করে তিন পর্যায়ের নচিকেতা যজ্ঞ করতে হয় অর্থাৎ কী করে সে যজ্ঞের বেদি গড়তে হয়, যূপকাষ্ঠ সাজাতে হয়, আহুতি দিতে হয়, সে জীবন থেকে মৃত্যু এবং আবার জীবনে ফেরার চক্রাকার পরিণতি থেকে মুক্তি পায়। তার ঠাঁই হয় স্বর্গে।"

তারপর তিনি জানালেন নচিকেতাকে, "এই তোমার যজ্ঞাগ্নি। এই যজ্ঞাগ্নিই নিয়ে যায় স্বর্গে। এই তোমার দ্বিতীয় বর। এবার বলো তৃতীয় বরে কী চাও।"

...... চলবে

জাতক কথা

ছোট্টো চড়াই ও বাজপাখি

নন্দিনী চট্টোপাধ্যায়

সে ছিল এক ছোট্টো চড়াই। একখানা চষা ক্ষেতই ছিল তার রাজ্যপাট। রোজ সকালে বাসা ছেড়ে সে চলে আসত এই ক্ষেতে। সমস্তদিন এখানেই সে কাটাত। কখনো বন্ধুদের সাথে হুটোপাটি তো কখনো খাবার খোঁজা-- এই ছিল তার কাজ। এখানে যা খাবার জুটত তাতেই তার ছোট্টো পেট ভরে যেত।

ছিল না তার অভাব কোনও

ছিল সে যে মনের সুখে---

কিন্তু একদিন তার কী দুর্মতি হল, সে গেল বনের ধারে আরেক ক্ষেতে।

শীতের দিনের নরম রোদ গায়ে মেখে সে দিব্যি ঘুরছিল। এমন সময় এল বিপদ। একটা ইয়াবড়ো বাজপাখি অনেকক্ষণ ধরে তাকে লক্ষ্য করছিল। মওকা বুঝে সে ছোঁ মেরে ধরল চড়াইকে। দু'পায়ের নখের মধ্যে আটকে নিয়ে উড়ে চলল তার বাসার দিকে।

বাজের পায়ের ফাঁকে ছটফট করতে করতে চড়াই নিজের মনেই বলতে লাগল, "হায়রে, কেন আমি মরতে এখানে এলাম! আমার নিজের জায়গায় থাকলে এ কি আমায় এত সহজে ধরতে পারত? বরং যুদ্ধ করেও আমাকে ওখানে হারাতে পারত না।"

চড়াই- এর কথা শুনে বাজের ভারি মজা লাগল। ছোট্টো চড়াই- এর সাহস কত! আমাকে নাকি ও হারাবে! ঠিক আছে ওর যুদ্ধের শখ আমি মেটাব।এই ভেবে সে চড়াইকে বলল, "আমার

সাথে লড়াই করার ভারি শখ দেখছি। তা তোর নিজের জায়গাটা কোথায় শুনি ?চল তোকে রেখে আসি। সেখানেই তোর সাথে আমার লড়াই হবে।"

চড়াই- এর দেখানো পথ ধরে বাজ তাকে নিয়ে এল তার নিজের জায়গায়, সেই চষা ক্ষেতে। সেখানে পৌঁছিয়ে চড়াই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। এ তার নিজের জায়গা। এখানে নিজেকে রক্ষা করার সব কলাকৌশল তার জানা। সে তীক্ষ্ণ চোখে বড় পাথরের উপর রাখা চোখা ফলার ছোট ঢেলাটাকে দেখে নিল। ওদিকে ঘন ঘন হুঙ্কার ছাড়ছে বাজ। ধারালো নখে শিকারকে ফালাফালা না করতে পারলে যেন তার শান্তি নেই!

চড়াই কিন্তু নিরুদ্বেগ। ধীরেসুস্থে উড়ে গিয়ে ধারালো পাথরটার উপর বসল। তারপর যুদ্ধং দেহি বলে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করতে লাগল।

আর যায় কোথা! একে পেটে খিদে, তার উপর তুচ্ছ চড়াই- এর এই পিত্তি জ্বলানো তাচ্ছিল্য! হাওয়ায় তীব্র আলোড়ন তুলে ঠোঁট কিড়মিড় করতে করতে বাজ ধেয়ে এল চড়াই- এর দিকে।

এটাই তো চাইছিল চড়াই। শেষ খেলাটা দেখাতে হবে তাকে। ধীরভাবে অপেক্ষা করতে লাগল সে। আরেকটু--- আরেকটু কাছাকাছি আসুক শমন।

এদিকে তিরবেগে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাজ। কিন্তু কাছাকাছি আসতেই চড়াই ডিগবাজি খেয়ে ঢিলের আড়ালে সরে গেল। বাজ কিছু বুঝতে পারার আগেই ঘটনাটা ঘটে গেল। ব্যস! ওমনি বাজ সটান আছড়ে পড়ল ওই পাথরটার ওপর। ফলাটা সোজাসুজি গেঁথে গেল তার বুকে। আর সঙ্গে সঙ্গে সে মরে গেল।

শিষ্যদের এই গল্প বলে বুদ্ধদেব বললেন, " কাজেই বুঝতে পারলে তো নিজের জায়গায় সবাই শক্তিশালী। সে জন্মে আমিই ছিলাম ঐ চড়াই।"

ইল রাজার উপাখ্যান

কুলদারঞ্জন রায়

সেকালে সুর্য্যবংশে, ইল নামে খুব ক্ষমতাশালী এক রাজা ছিলেন। রাজা ইল শিকার করিতে বড়ই ভালবাসিতেন। তিনি একদিন অনেক সৈন্যসামন্ত এবং লোকজন সঙ্গে লইয়া শিকারের জন্য বনে গেলেন। প্রতিদিন বনে বনে ঘুরিয়া শিকার করিতে করিতে, তাঁহার এতই ভাল লাগিল যে রাজধানীতে ফিরিয়া যাইবার জন্য তাঁহার আর ইচ্ছা হইল না। তিনি তাঁহার লোকদিগকে বলিলেন- "তোমরা সকলে রাজধানীতে ফিরিয়া গিয়া, আমার পুত্রকে লইয়া রাজত্ব কর; আমি জনকতক লোকের সহিত এখানে থাকিয়া, কিছুকাল শিকার করিব।"

রাজার কথায় সকলেই রাজধানীতে ফিরিয়া গেল। তখন তিনিও বনে বনে শিকার করিতে করিতে ক্রমে হিমালয় পর্বতে গিয়া সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। একদিন রাজা দেখিলেন, গভীর বনের মধ্যে অতি সুন্দর ঠিক অট্টালিকার মত সুসজ্জিত একটি গহ্বর। এই গহ্বরে যক্ষরাজ সমন্যু ও তাহার স্ত্রী সমা থাকিতেন। যক্ষেরা নানারূপ মায়া জানে; সমা ও সমন্যু অনেক সময় হরিণের রূপ ধরিয়া, বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং সে দিন তাঁহারা বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন।

রাজা ইল জানিতেন না যে, সেটা যক্ষের বাড়ী, কাজেই এমন সুন্দর সাজান শূন্য গহ্বরটি দেখিয়া তাঁহার লোভ হইল; তিনি লোকজন লইয়া সেইটাকে দখল করিয়া বসিলেন। যক্ষরাজ বন হইতে ফিরিয়া আসিলে, রাজার সেই অন্যায় ব্যবহার দেখিয়া বড়ই চটিয়া গেলেন। কিন্তু এখন উপায়? ইল রাজাকে ত যুদ্ধ করিয়া জয় করা সহজ নয়! আর, গহ্বরটি ছাড়িয়া দিতে বলিলে কি তিনি তাহা শুনিবেন?

যক্ষরাজ তখন তাঁহার আত্মীয় বড় বড় যক্ষ যোদ্ধাদিগকে স্মরণ করিয়া বলিলেন, "তোমরা ইল রাজার নিকট হইতে যেরূপে পার, আমার গহ্বরটি উদ্ধার করিয়া দাও।"

তাঁহার কথায়, সকল যক্ষযোদ্ধা মিলিয়া ইলরাজাকে গিয়া বলিল, "শীঘ্র আমাদের গহ্বর ছাড়িয়া দাও, নতুবা যুদ্ধ করিয়া তোমাকে তাড়াইয়া দিব।"

এ কথায় ইল রাজার অত্যন্ত রাগ হইল, তিনি তখনই যক্ষদিগের সহিত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া, তাহাদিগকে হারাইয়া দিলেন। বেচারি যক্ষরাজ কি আর করেন, স্ত্রীকে লইয়া মনের দুঃখে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ানো ছাড়া তাঁহার আর উপায় রহিল না। এইরূপে কিছুদিন যায়, একদিন যক্ষরাজ স্ত্রী কে বলিলেন "দেখ সমা! নিজের বাড়ী ছাড়িয়া বনে বনে আর কতদিন ঘুরিয়া বেড়াইব? এই অত্যাচারী দুষ্ট রাজাকে ফাঁকি দিয়া না তাড়াইলে তো চলিবে না! তুমি এক কাজ কর – সুন্দরী হরিণ সাজিয়া রাজাকে ভুলাইয়া যেরূপে পার একবার যদি তাঁহাকে উমা বনে লইয়া যাও, তবেই রাজামশাই জব্দ হইবেন। আমি ত আর সেখানে যাইতে পারিব না, কাজেই তোমাকে এই কাজটা করিতে হইবে।"

ইহা শুনিয়া যক্ষিণী বলিল, "তুমি কেন উমা বনে যাইবে না? সেখানে গেলে দোষ কী?"

যক্ষরাজ বলিলেন, " পার্বতীর অনুরোধে, মহাদেব তাঁহার জন্য একটি নির্জ্জন বন প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। তাহারই নাম 'উমাবন'। মহাদেব বলিয়াছেন যে, সেখানে তিনি, গণেশ, কার্ত্তিক, আর নন্দী এই কয়েকজন ছাড়া অন্য কেহ গেলে তখনই সে স্ত্রীলোক হইয়া যাইবে। এখন বুঝিতেই পার, সেখানে আমার যাইবার সাধ্য নাই।"

ইহার পর, যক্ষের উপদেশ মত সমা হরিণী সাজিয়া, ইল রাজার সম্মুখে গিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহাকে দেখিয়াই রাজার মনে শিকারের লোভ চাপিল, তিনি একাকী ঘোড়ায় চড়িয়া তাহাকে তাড়া করিলেন। মায়াবিনী হরিণীও রাজাকে ক্রমে সেই উমাবনের দিকে লইয়া চলিল। এইরূপে যখন সে বুঝিতে পারিল, যে, রাজা উমা বনে প্রবেশ করিয়াছেন,তখন হঠাৎ সে হরিণীরূপ ছাড়িয়া পুনরায় যক্ষিণী হইয়া, একটা অশোকগাছের তলায় দাঁড়াইয়া রহিল। এদিকে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া, রাজাও সেই অশোক গাছের নিকটেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তাঁহাকে দেখিয়া যক্ষিণী হাসিতে হাসিতে বলিল, "কি গো সুন্দরী ইলা ! তুমি স্ত্রীলোক হইয়া পুরুষের বেশে একা ঘোড়ায় চড়িয়া,কাহাকে খুঁজিতেছ?"

যক্ষিণী তাঁহাকে "ইলা" বলিয়া সম্বোধন করায় রাজার ভারি রাগ হইল এবং তিনি তাহাকে ধমক দিয়া,সেই হরিণীটার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

যক্ষিণী বলিল, "ইলা ! তুমি রাগিতেছ কেন? আমি তো কোন অন্যায় কথা বলি নাই?" ততক্ষণে রাজার চৈতন্য হইল যে, তিনি সত্য সত্যই স্ত্রীলোক হইয়া গিয়াছেন! এখন উপায়? ইলা তখন বিষম ভয় পাইয়া, যক্ষিণীকে এই অদ্ভুত ব্যাপারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "দোহাই তোমার, সত্য করিয়া বল, কেন আমি স্ত্রীলোক হইলাম। তুমি নিশ্চয় ইহার কারণ জান। তুমিই বা কে, তাহাও আমাকে বল।"

যক্ষিণী বলিল, "আমার পতি যক্ষরাজ সমন্যু হিমালয়ের গহ্বরে থাকেন,আমি তাঁহার পত্নী সমা। আপনি এতদিন যে গহ্বরে আছেন,সেটাই আমাদের বাড়ী। আমিই হরিণী সাজিয়া আপনাকে ভুলাইয়া এই উমাবনে আনিয়াছি। মহাদেবের আদেশ অনুসারে, কোন পুরুষমানুষ এখানে আসিতে পারে না, আসিলেই সে স্ত্রীলোক হইয়া যায়। এইজন্যই আপনি স্ত্রীলোক হইয়াছেন। এখন দুঃখ করিয়া আপনার কোন লাভ নাই। আপনি ক্ষত্রিয় যোদ্ধা এবং সূর্যবংশের উপযুক্ত বীর ছিলেন। কিন্তু আপনার যুদ্ধ করা আর শিকার করা এখন জন্মের মত শেষ হইল। আর তাহার জন্য দুঃখ করিয়া লাভ কি? দুদিন পরে আপনি সেসব কথা ভুলিয়া যাইবেন।"

যক্ষিণীর কথায় ইলা আরও ভয় পাইয়া বলিলেন, "যক্ষিণি! তুমি অনুগ্রহ করিয়া বল,কি করিয়া আমার সময় কাটিবে,আমি কাহার আশ্রয়ে থাকিব।"

যক্ষিণী বলিল, "পূর্বদিকে খানিক দূরেই চন্দ্রের পুত্র মহাত্মা বুধের আশ্রম আছে। বুধ তাঁহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য প্রতিদিন এই পথ দিয়া যান। তিনি যখন যাইবেন,

তখন তুমি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইও; তিনিই তোমাকে আশ্রয় দিবেন।” ইহার পর একদিন

বুধগ্রহ পিতার নিকট যাইবার পথে সুন্দরী ইলাকে দেখিয়া বলিলেন, “হে সুন্দরী! তুমি একাকী এই বনে কী করিয়া আসিলে? তোমার যদি কোন আপত্তি না থাকে তো আমার সঙ্গে চল, আমি তোমাকে আমার রানী করিয়া রাখিব। ইলা সন্তুষ্টচিত্তে সম্মত হইয়া বুধের সঙ্গে গেল, বুধও তাহাকে বাড়ীতে লইয়া গিয়া বিবাহ করিলেন। কিছুকাল পরে ইলার পরম সুন্দর একটি পুত্র জন্মিল। অনেক মুনি এবং দেবতা তাহাকে দেখিবার জন্য সেখানে আসিলেন। জন্মিবামাত্রই সে শিশু উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিতে লাগিল। তাহার এইরূপে “পুরু” অর্থাৎ উচ্চ রব শুনিয়া দেবগণ তাহার নাম রাখিলেন পুরূরবা।

পুরূরবা দিন দিন বড় হইতে লাগিল; বুধ নিজে তাহাকে অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি নানা রকমের বিদ্যা শিখাইলেন। ইলা যদি তাঁহার পূর্ববকার সমস্ত কথা ভুলিতে পারিতেন, তবে তাঁহার এক্সদুঃখের কোনই কারণ থাকিত না। কিন্তু সে সকল কথা তাঁহার মনে জাগিয়া রহিল। বড় হইয়া পুরূরবা দেখিলেন, তাঁহার মা অনেক সময় মলিন মুখে বসিয়া বসিয়া কি জানি ভাবেন। একদিন মাকে এইরূপে চিন্তা করিতে দেখিয়া, পুরূরবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! তুমি সময় সময় মুখখানি মলিন করিয়া কী চিন্তা কর? কিসের জন্য তোমার এত দুঃখ? তুমি আমায় বল কিসে তোমার দুঃখ দূর হইবে, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি।"

ইলা বলিলেন, "বাবা তোমার পিতা বুধ সকলেই জানেন; তাঁহাকে গিয়া জিজ্ঞাসা কর, তিনিই তোমাকে উপদেশ দিবেন।"

পুরূরবা তখন পিতার নিকট গিয়া তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিয়া উপদেশ চাহিলেন। বুধ বলিলেন, "পুরূরবা, ইলার পূর্ব্বকথা সবই আমার জানা আছে। বিপুল রাজ্যের অধীশ্বর মহারাজ ইল, উমাবনে প্রবেশ করিয়া, মহাদেবের শাপে সকল হারাইয়া, এখন অসহায় স্ত্রীলোকরূপে সংসার বাস করিতেছেন। তুমি গোতমিগঙ্গায় স্নান করিয়া, মহাদেব এবং পার্বতীর বিধিমতে পূজা কর। তাঁহাদের অনুগ্রহ হইলেই এ শাপ দূর হইতে পারে। নতুবা আর কোন উপায় নেই।"

পিতার উপদেশে পুরূরবা গোতমিগঙ্গায় চলিলেন, ইলা এবং বুধও তাঁহার সঙ্গে গেলেন। গোতমিগঙ্গায় স্নান করিয়া, তিনজনে মহাদেব ও ভগবতীর আরাধনা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের কঠোর তপস্যায়ে সন্তুষ্ট হইয়া, মহাদেব ও পার্বতী তাঁহাদিগকে দেখা দিয়া বলিলেন, "তোমাদের পূজায় আমরা অতিশয় তুষ্ট হইয়াছি। এখন কি বর চাও বল- তাহাই তোমাদিগকে দিব।"

পুরূরবা বলিলেন, "প্রভু! ইল রাজা না জানিয়া আপনার বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন; তাঁহাকে আপনি ক্ষমা করিয়া শাপ হইতে মুক্ত করুন।"

মহাদেবের মত লইয়া ভগবতী বলিলেন, "তথাস্তু, ইলরাজা এখন গোতমিতে স্নান করিলেই, তাঁহার পূর্ব্বমত রূপ লাভ করিবেন।"

পার্ব্বতির কথায়, ইলা গৌতমিগঙ্গায় ডুব দিয়া মাথা তুলিবামাত্র, সকলে দেখিল ইলা আর নাই, তাহার স্থানে সশস্ত্র মহারাজ ইল যোদ্ধৃবেশে জল হইতে উঠিয়া আসিলেন। সেই অবধি সে স্থানের নাম হইল 'ইলাতীর্থ'।

বানান অপরিবর্তিত

স্মরণীয় যাঁরা

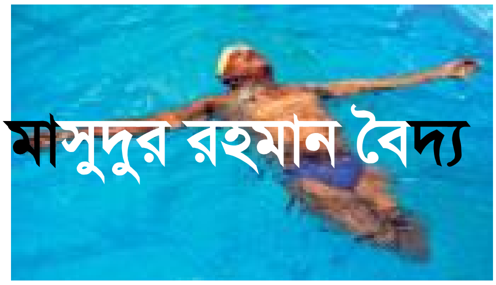

মাসুদুর রহমান বৈদ্য

উমা ভট্টাচার্য

মাসুদুর রহমান বৈদ্য ছিলেন বিশ্বের সাঁতারের জগতে বাংলার এক প্রবাদপ্রতিম লড়াকু সেনানী। সদ্য চলে গেলেন এই পৃথিবী ছেড়ে। তারিখটা ছিল গত ২৬শে এপ্রিল ২০১৫ । তাঁর কলকাতা তপসিয়ার বাড়ির কাছের এক নার্সিং হোমে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৪৬ বছর বয়সে তিনি চলে গেলেন। এবারের 'স্মরণীয় যাঁরা' পর্বে তাঁর উদ্দেশ্যে সামান্য স্মৃতি অর্ঘ্য দেব, জয়ঢাকের পাতায়।

প্রথমে বলি কেন তিনি সাঁতারের জগতে এতটা স্মরণীয়। মাসুদুর রহমান ছিলেন "বিশ্বে প্রথম শারীরিক প্রতিবন্ধী এশীয় সাঁতারু",যাঁর দুটি পা- ই ছিল হাঁটুর ঠিক নীচে থেকে কাটা।উত্তর ২৪ পরগণার বল্লভপুর গ্রামের এক মসজিদের ইমামের ছেলে মাসুদুর ছোট থেকেই ছিলেন অত্যন্ত প্রাণবন্ত, গ্রামের মাঠেঘাটে খেলাধূলা, আর পুকুরের জলে সারাদিন ঝাঁপানো আর দাপাদাপিতে ছিল তাঁর পরম উৎসাহ। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে হলেও কোনও বায়না ছিলনা, একটাই স্বপ্ন, ভাল সাঁতারু হবে সে।

হঠাৎ বিপর্যয় নেমে এল নয় বছরের বালক মাসুদুরের জীবনে। সেটা ১৯৭৮ সাল। একদিন রেললাইন পারাপারের সময় একটি মালগাড়ির চাকায় তাঁর দুটি পা- ই হারালেন। ভর্তি করা হল হাসপাতালে, সংক্রমণ এড়াতে দুটি পায়ের হাঁটুর একেবারে নীচ থেকেই বাদ দিতে হল। চিকিৎসার জন্য প্রায় দেড়টি বছর তাঁকে কাটাতে হয়েছিল বিভিন্ন হাসপাতালে।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে যে মাসুদুর বাড়িতে ফিরে এলেন তিনি একেবারে আলাদা মানুষ। কোন কান্নাকাটি নেই, ক্ষোভ নেই, পা হারানোর জন্য দুঃখ নেই। মুখে শুধু এক কথা, তাঁকে ভাল সাঁতারু হতে হবে। মা- বাবা তো বটেই , সারা বল্লভপুরের প্রতিবেশীরা সহানুভূতি জানাতে এসে ফিরে গেল অবাক হয়ে।

বাবা–মা নীরবে অশ্রু বিসর্জন করেন ছেলের অবস্থা দেখে। সাঁতারের প্রধান দুই অত্যাবশ্যক অঙ্গ হাত আর পা, তার মধ্যে দুটি পা- ই যার নেই সে কী করে স্বপ্নপূরণ করবে?

কিন্তু মাসুদুর নিজের সিদ্ধান্তে অটল। কারো বারণ তাঁকে দমাতে পারেনি। শরীর একটু সুস্থ হলে আর পায়ের ক্ষত একেবারে শুকিয়ে যেতেই, আবার তিনি নামলেন জলে। প্রথম দিকে বাবা নিয়ে যেতেন, পরে নিজেই আয়ত্ত করে নিলেন পুকুরে যাবার উপায়। নাওয়া- খাওয়া আর ঘুমের সময়টুকু বাদে সারাদিনই তিনি পড়ে থাকতেন বাড়ির কাছের পুকুরে, পা ছাড়া সাঁতার কাটা অভ্যাস করতে।

প্রথম দিকে জলের মধ্যে পা- হীন শরীরটা কোমর থেকে বেঁকে যেত নীচের দিকে, আর শরীরটাকে টানতো নীচের দিকে, শুধু হাত দুটোর সাহায্যে অমানুষিক কসরৎ চলতো জলে ভেসে থাকার। একা, একেবারে একা এক প্রতিবন্ধী লড়াকু ছেলের সাঁতারু হবার প্রয়াস। প্রথমদিকে এইটুকুই ছিল তাঁর চেষ্টা। পা দিয়ে জল কাটার ব্যবস্থাটি কেড়ে নিয়েছিল দুর্ঘটনা, আমরা হ'লে বলতাম ভাগ্য বা নিয়তি। কিন্তু ধার্মিক ইমামের ছেলের কিন্তু আস্থা ছিল মানুষের মনের শক্তির

উপরে। ঈশ্বর ,দৈব, আল্লা কাউকেই টেনে আনলেন না নিজের জীবনের ক্ষেত্রে। স্বপ্ন হল তাঁর

চালক, ইচ্ছা হল তাঁর বাহন, আর মনের দৃঢ়তা হল তাঁর শক্তি। প্রত্যেক সফল খেলোয়াড়ের মতই, তাঁর জীবনে চারটে ‘ডি’- ড্রিম, ডিটারমিনেশন, ডেডিকেশন, আর ডিসিপ্লিন- ই হল তাঁর সহায়।

একদিন সফল হলেন তিনি। কবির ভাষায় যাকে বলে ‘পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং’- সেই প্রবাদ বাক্যটি তিনি প্রমাণ করলেন তাঁর জীবনে। প্রবাদানুসারে ঈশ্বরের কৃপাতেই পঙ্গু মানুষও পাহাড় ডিঙোতে পারে, কিন্তু মাসুদুর রহমানের ক্ষেত্রে সেই ঈশ্বর হলেন তাঁর প্রবল মনের জোর, যা কিছুতেই তাঁকে হার মানতে দেয়নি। শুরু হল তাঁর সফল সাঁতারুর জীবন।

পশ্চিমবঙ্গে প্রথম সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন,পানিহাটি থেকে আহিরীটোলা পর্যন্ত গঙ্গাবক্ষে সাঁতারে। কলকাতার মধ্য দিয়ে সাঁতার কেটে গন্তব্যে পৌঁছুলেন পঞ্চম স্থান অধিকার করে।

এরপর অংশ নিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলা আয়োজিত ভাগীরথীতে ৮১ কিলোমিটার দীর্ঘ সাঁতার প্রতিযোগিতায়, সেখানেও পঞ্চম স্থান অধিকার করেছিলেন।

১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে অংশ নিয়েছিলেন ‘পুনে আর্টিফিসিয়াল লিম্ব সেন্টার’ আয়োজিত সাঁতার প্রতিযোগিতায়, সেখানে ১৭টি প্রতিযোগিতার মধ্যে ১৬টিতেই তিনি প্রথম স্থান অধিকার

মাসুদুরের চ্যানেল ক্রসিং–একলা এক সাঁতারু

করেছিলেন।

এরপরই তিনি আরও কঠিন প্রতিযোগিতার দিকে এগিয়ে গেলেন। ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে পার হলেন ইংলিশ চ্যানেল। তাঁর এই সাহসিকতা ও সফলতার পুরস্কারের সঙ্গে তিনি ‘বিশ্বের প্রথম চ্যানেল পার হওয়া শারীরিক প্রতিবন্ধী সাঁতারু’ বলে ঘোষিত হলেন।

তাঁর পরবর্তী উল্লেখযোগ্য প্রতিযোগিতা ছিল সঙ্কীর্ণ, তরঙ্গবিক্ষুব্ধ জিব্রাল্টার প্রণালীতে সন্তরণ। ২৫ শে সেপ্টেম্বর ২০০১ খ্রিস্টাব্দে পার হলেন জিব্রালটার। স্পেনের ট্যারিফ দ্বীপ থেকে সাঁতার কেটে মরক্কোর সাগরতীর পর্যন্ত ২২ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিলেন মাত্র ৪ ঘণ্টা ২০মিনিটে। সকাল ৮টা ২০ মিনিটে ট্যারিফ দ্বীপের কাছে একটি নৌকা থেকে জলে ঝাঁপ দিয়ে দুপুর ১২ টা ৪০ মিনিটে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছেছিলেন।

পৃথিবীর সাঁতারের ইতিহাসে এই বিজয় তাঁকেই প্রথম ঘোষণা করল। কারণ তিনিই প্রথম শারীরিক প্রতিবন্ধী যিনি জিব্রাল্টারের মত কঠিন সমুদ্র পথে ঢেউয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়ী হলেন। ২০১০ সালে একবার পার হয়েছিলেন পক প্রণালী। প্রতিবন্ধকতার জন্য অলিম্পিক ইভেন্টে যেতে পারবেন না ,জেনেই তিনি বেছে নিয়েছিলেন লঙ সুইমিং। আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য যে এইরকম একটি মানুষ গত আট বছর ধরে কোনও বড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারেননি স্পনসরের অভাবে।

তাঁর এই অক্ষমতার কথা তিনি নিজ মুখেই বলেছিলেন মৃত্যুর কয়েকদিন আগে ,২৩শে এপ্রিল ২০১৫, বুধবার কলকাতার ‘বিধান শিশু উদ্যানে’র এক অনুষ্ঠানে এসে। তাঁর ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের দ্বাদশ বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্য করে আয়োজিত হয়েছিল অনুষ্ঠানটি। সেদিন প্রায় ১০০ শিশু এসেছিল সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে, যাদের মধ্যে ১২ জন ছিল শারীরিক প্রতিবন্ধী। এরা সবাই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনীর সদস্য। তিনি তাদের সঙ্গে নানা গল্প করেছিলেন, ইংলিশ চ্যানেলের ডলফিনদের গল্প, সাগরের ঢেউয়ের ধাক্কার গল্প , আর বলেছিলেন একটি মৎস্যকন্যার কথা, যে নাকি ইংলিশ চ্যনেলে সাঁতার কাটার সময় খানিকটা পথ তাঁর সঙ্গে চলেছিল। তিনি বলতেন, তাঁর সাঁতারু জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় মুহূর্তই ছিল মৎস্যকন্যার সঙ্গে দেখা হওয়ার মুহূর্তটি। সেদিনের সভায় বারবার তিনি শিশুদের বলেছেন “নিজেকে কেউ কখনও প্রতিবন্ধী ভাববে না, অক্ষম ভাববে না, আমিও ভাবিনি, ভাবিনা।”

তিনি বলতেন সাঁতার তিনি কোনদিন ছাড়বেন না। সম্প্রতি বাংলা গানের ব্যাণ্ড ‘জোয়ার’,আর সিলিকন গ্রুপ অফ ইণ্ডাস্ট্রিসের সদস্যরা এগিয়ে এসেছিলেন তাঁকে স্পনসর করার জন্য। অর্থসংগ্রহ চলছিল। ভারত ও সিংহলের প্রতিরক্ষা দপ্তরের সঙ্গে প্রাথমিক কথা হয়েছিল আগামী জুলাই মাসে তাঁর ‘মিশন পক স্ট্রেট’ অভিযানের জন্য।

আমরা কি আর একটু ভাবতে পারতাম না কেন এই মানুষটি স্পনসর পাচ্ছেন না? কেন তিনি আর কঠিন কোন প্রতিযোগিতায় যাবার সুযোগ পাচ্ছেন না? কেন তাঁর রক্তাল্পতা, কেন ভালো চিকিৎসা করানো যায়নি তাঁর? এখন কিছুই আর দরকার নেই তাঁর। পরিবারে মা,স্ত্রী, আর ছোট ছোট দুটি মেয়েকে রেখে, স্পোর্টস কাউন্সিলের কোচের চেয়ারটি খালি করে দিয়ে, সুভাষ সরোবরে অনুশীলনকারী তাঁর ছাত্রছাত্রী- ভাবী সাঁতারুদের শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে, ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমকারী তাঁর শিষ্যা অমৃতা দাস, এছাড়া অগণিত ভক্তদের রেখে তিনি চলে গেছেন অসীমের আর অমৃতের দেশে।

ছোটবেলা থেকে দীর্ঘসময় জলে থাকার জন্য তাঁর পাকতন্ত্রে ব্যাকটিরিয়া সংক্রমণ ছিল, ফলে রক্তাল্পতা ছিলই , শেষদিকে হয়েছিল ডায়াবেটিস। অবশেষে হৃদরোগের আক্রমনের ধাক্কা তাঁকে কেড়ে নিয়ে গেল পৃথিবী থেকে। আমরা হারালাম এক ক্ষণজন্মা লড়াকু মানুষকে যিনি ছিলেন অনেক প্রতিবন্ধী মানুষের আশার আলোকস্তম্ভ, সারা ক্রীড়াজগতের কাছেই একটা

‘আইকন’। মনে পড়ছে তাঁর সেই কথা যা তিনি বিভিন্ন সময়ে বলেছেন,- “আমি কোনও প্রতিবন্ধী নই। এবার কি এভারেস্ট জয় করে সেটা প্রমাণ করতে হবে?”

আজ তাঁর স্মৃতিচারণ করে একটু শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম, তোমরাও এর শরিক হয়ো।

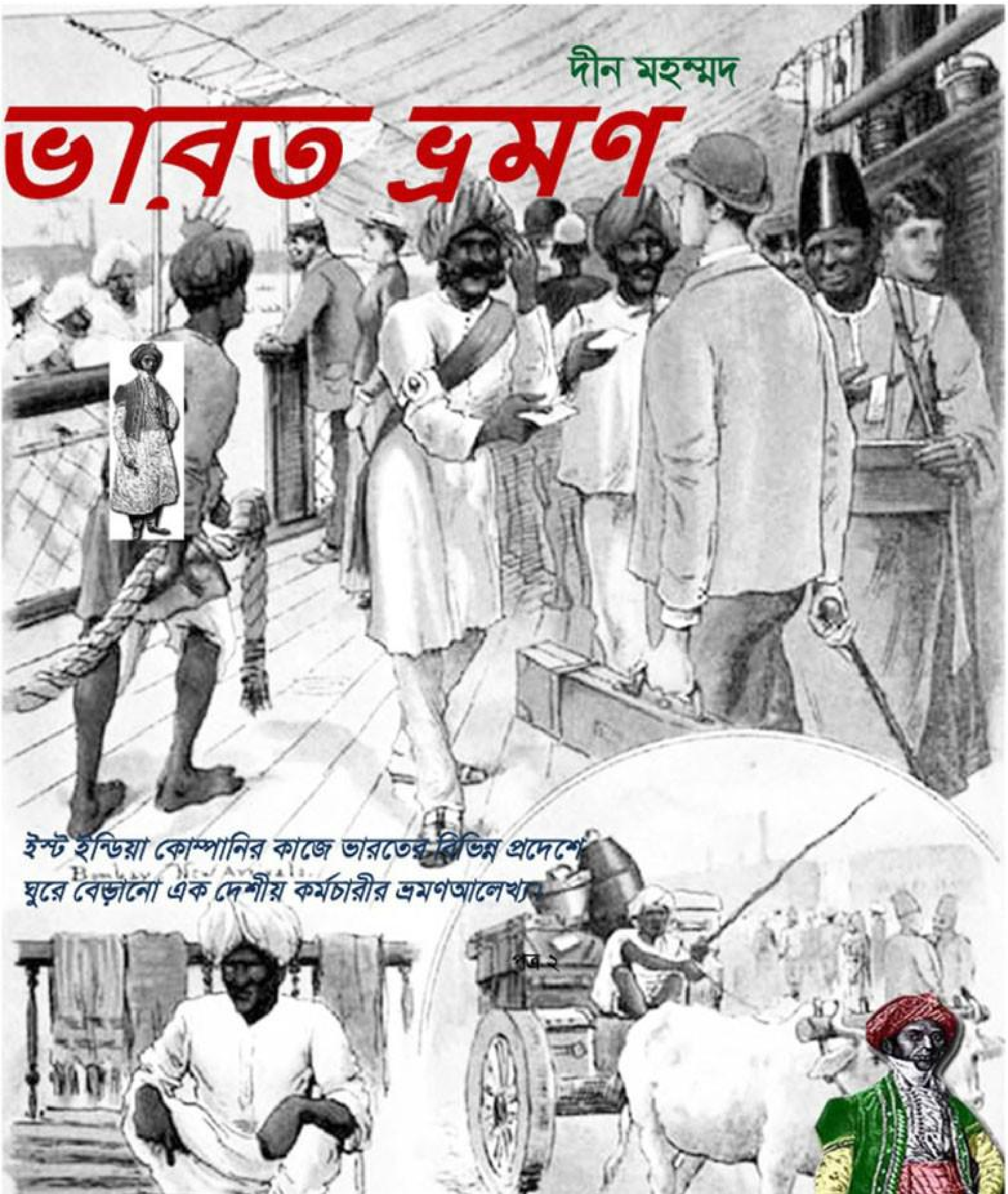

পত্র – ১০

সেনা পরিদর্শন শেষ হলে আমরা দমদম ছেড়ে কলকাতার দিকে এগোলাম। ১৭৭২ সাল। আমরা কলকাতায় এসে পৌঁছোলাম। প্রথম ব্রিগেড, যারা ফোর্ট উইলিয়ামে ছিল, দানাপুর রওনা হল আর আমাদের একাংশ তাদের জায়গা নিল। এরা হল থার্ড ব্রিগেড। এক ব্যাটেলিয়ান ইউরোপিয়ান সৈনিকেরা ফোর্ট উইলিয়ামের দখল নিল। তিন রেজিমেন্ট সেপাইদের আশ্রয় হল চিৎপুরের সেনা ছাউনিতে । মিস্টার বেকারসহ বাকি ইউরোপিয়ান সৈন্যদের আর তিন রেজিমেন্ট সেপাইদের বহরমপুর যাবার আদেশ দেওয়া হল। কয়েকদিন থেকে তারা যথারীতি পাততাড়ি গোটাল।

কলকাতা এক বর্ধিষ্ণু শহর, ইংরেজ কোম্পানির সদর দপ্তর। পদ্মার অনেকটা পশ্চিম দিকে ২২ ডিগ্রি ৪৫ মিনিট উঃ অক্ষাংশ এবং ৮৭ ডিগ্রি পূঃ দ্রাঘিমাংশে এর অবস্থান। বালেশ্বর থেকে১৩০ কিলোমিটার উত্তর পূর্বে আর হুগলির ৪০ কিলোমিটার দক্ষিণে। চওড়া সোজা সোজা রাস্তা, লোকেদের বাড়িঘর, বাগান, বেড়ানোর জায়গা, মাছভর্তি পুকুর, কি নেই কলকাতায়! আর সবচেয়ে উল্লেখ করার মতো যেটা সেটা হল এর জনসংখ্যা। ছ লাখের ওপর।

শহরের মূল রাস্তাগুলো মোটামুটি এরকম। চাঁদনিচক, হরেকরকম মাল পত্র বিকিকিনির স্থান। চায়না বাজার, চিনে জিনিসপত্র বেচাকেনার জায়গা। তারপর লালবাজার, ধর্মতলা, চৌরঙ্গী, বৈঠকখানা, মেছোবাজার আর চাঁদপাল ঘাট। এই অঞ্চলগুলিতেই মূলত প্রায় সমস্ত ইউরোপিয়ানদের বাস। ইংরেজ, ফরাসি, ওলন্দাজ, আর্মেনিয়, হাবসি, ইহুদি সকলের জমায়েত এইখানে। ব্যবসায়ী, উৎপাদনকারী, দালাল – ভারতবর্ষের বিভিন্ন কোণ থেকে এসে জড়ো হয়েছে এখানে।

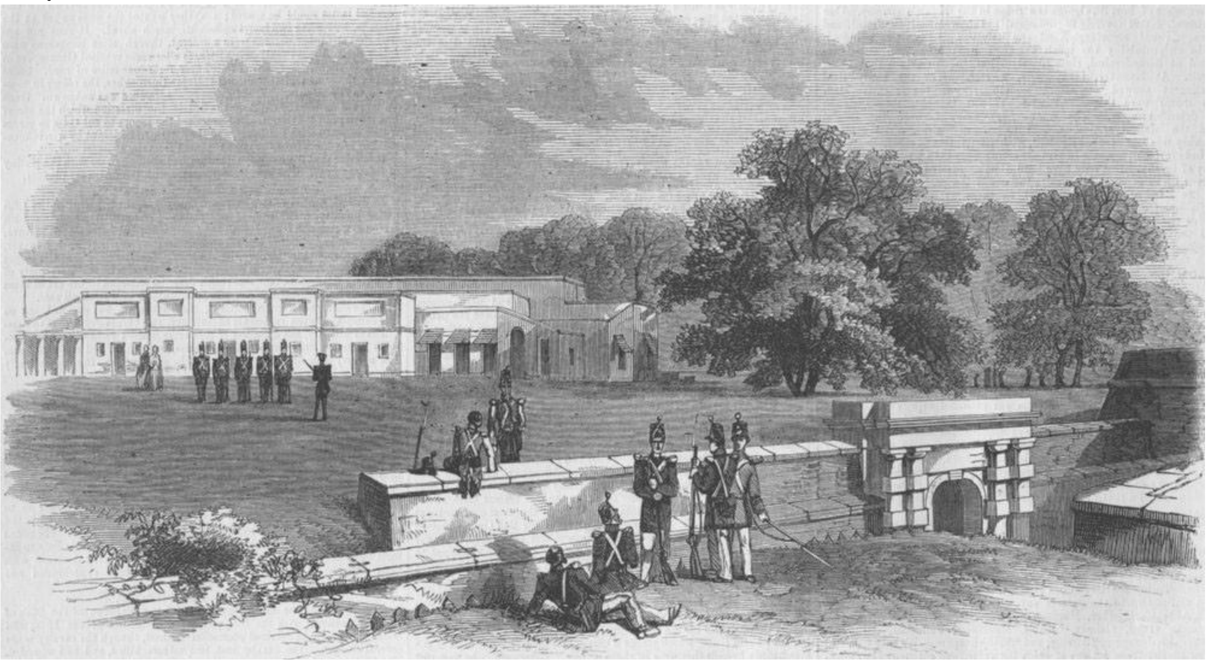

চাঁদপাল ঘাটের কাছেই পুরোনো কেল্লা। ওরই মধ্যে থাকত কোম্পানির রসদ। পাহারার দায়িত্বে রাখা হত অল্প শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ভাড়াটে সৈন্যদের। অর্থসংগ্রাহক, খাদ্যবন্টনকারী আর করণিকদের বসবাস ছিল এখানে। আমাদের সময়ে এখানে ছিলেন মিস্টার প্যাক্সন। উনি ছিলেন ট্যাঁকশালের নির্দেশক বা সুপারিনটেনডেন্ট। টাকা আনা পাইপয়সা ছাপানোর জায়গা। শহর থেকে মাইলটাক দূরে ফোর্ট উইলিয়াম। ভারতের মধ্যে এই কেল্লাই সবচেয়ে বিস্তৃত। বিষম চতুর্ভুজ আকৃতির জমিতে এই দুর্গটি ইট আর চুন-সুরকি দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। চুন, সুরকি, গুড় আর শন দিয়ে সিমেন্টের মতো এমন মিশ্রণ বানানো হত যা পাথরের মতোই শক্ত-পোক্ত। দুর্গের চারপাশ ঘিরে ছ'শ কামান মোতায়েন। মূল অন্দরে প্রবেশের জন্য ছয়খানা দরজা যার চারটে সবসময় খোলা রাখা হয়। আর দুর্গের বাইরের দিকে মোট চোদ্দটা প্রবেশদ্বার, নানান রাস্তা থেকে ভেতরের দরজা অবধি প্রবেশের জন্য। চারখানা দরজার একটা নদীর দিকে, একটা হাসপাতাল, একটা খিদিরপুর আর একটা কলকাতার বিপরীতে অবস্থিত। চারটে দরজার পাশেই একখানা করে কুয়ো খোঁড়া হয়েছিল। সৈন্যদের প্রয়োজনীয় জল ইঞ্জিনের সাহায্যে তোলা হয় ওগুলো থেকে। সেনাদলের সর্বাধিনায়ক থাকেন দুর্গের মধ্যে

একটা সুন্দর প্রাসাদে। সৈন্যদলের সমস্ত চাহিদা মেটানোর জন্য ভেতরেই একটা বাজার বসে।

সেনাধ্যক্ষের ঠিক নীচুতলার অফিসারদের জন্যও চমৎকার সুদৃশ্য বাড়ি বানানো হয়েছিল। কেল্লার ভেতরেই এই বাড়িগুলি অন্দরমহলের দরজার ভেতরের দিকে গোল করে সাজানো; একটু উঁচু থেকে দেখলে পুরো ব্যাপারটা একজন দর্শকের কাছে অপূর্ব লাগবে।

বাকি অফিসার ও একেবারে নীচুতলার সৈনিকদের জন্য মোট আটখানা ব্যারাক ছিল কেল্লার ভেতরে। গোলাবারুদ, সাজসজ্জা ও যন্ত্রপাতির গুদামঘর; অস্ত্রশস্ত্র, গুলি বন্দুক; কামান ও গোলা বানানোর কামারশালা সমস্ত ব্যবস্থাই ছিল। এখান থেকেই মূলত ভারতের সর্বত্র কোম্পানির সৈন্যদলের সাধারণভাবে ব্যবহারের সবরকম রসদ যোগান দেওয়া হত। মোটের ওপর ফোর্ট উইলিয়াম হল মানুষের বানানো এক অত্যাশ্চর্য কর্মশালা, আর এক বৃহৎ অবস্থান যেখানে দশ হাজার লোক একত্রে থাকতে পারে।

অন্যান্য সাধারণ নির্মাণগুলির মধ্যে রইল আদালত, জেলখানা আর চার্চ। তিনখানা আদালত ভবন রয়েছে এখানে, লালদিঘির পারে, বড়োলাটের প্রাসাদের পাশে আর চাঁদপালঘাট অঞ্চলে। দুটো জেলখানার একটা লালবাজারে আর একটা চৌরঙ্গীতে। আর

অনেকগুলি চার্চ। ইংরেজদের চার্চ ছাড়া, আর্মেনিয় আর পর্তুগিজ চার্চগুলিও উপাসনার জন্য যথেষ্ট উল্লেখ করার মতো। তাদের গঠনশৈলী, আকার- আয়তন এবং কারুকার্য কোন অংশেই কারো চেয়ে কম নয়।

নদীর অপর তীরে জাহাজঘাটা। সেখানে জাহাজের মেরামতি, পরিষ্কার ইত্যাকার কাজকর্ম হয়। শহরের বাইরে রয়েছে একটা হাসপাতাল। গাছপালা দিয়ে ঘেরা। আর রয়েছে মনোহর কতগুলি বাসা। ইউরোপীয় ভদ্রলোকেদের গ্রীষ্মাবাস। ফুলের বাগানঘেরা বাসা, চমৎকার বাঁধানো হাঁটার পথ, পথের দুপাশে ঝুঁকে থাকা গাছ । টলটলে পুকুর, জলে মাছ। তার পাড় জুড়ে গাছের ভিড়। আকাশের নীল চাঁদোয়ার ছায়া পড়েছে জলে। শহরের মধ্যে একটা খাল, খুব সুন্দর জলপথ। মিস্টার টলি নিজের খরচে কাটিয়েছেন ওটা। এলাকার মাঝ বরাবর সোজা খিদিরপুর থেকে পাঁচ ছ মাইল দক্ষিণে নালাটা গঙ্গানদীকে সুন্দরবনের নদীর

সঙ্গে যোগ করেছে। নৌকো যাতায়াতের পক্ষে আদর্শ পথ। সড়কপথে মাল পরিবহনের থেকে জলপথে সুবিধেজনক বলে মিস্টার টলি এ থেকে কর আদায়ে বেশ লাভবান হয়েছিলেন। ক্রমে বাংলার বিভিন্ন অংশে মাল পরিবহনের জন্য এই জলপথ অন্যতম প্রধান রাস্তা হয়ে ওঠে।

অনুবাদকের সংযোজনঃ বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার থেকে জানা যাচ্ছে, গঙ্গার মজা একটা খালের সংস্কার করেন মেজর উইলিয়াম টলি। ১৭৭৬ সালে। এটা ছিল ব্যক্তিগত উদ্যোগ। এ কাজে তাঁকে বেশ কিছু জমির পাট্টা দেয়া হয় ও জলপথে পরিবহনের কর আদায়ের অধিকার দেওয়া হয়। সংস্কার করা নালা বহুলভাবে ব্যবহার শুরু হয় ১৭৭৭ সালে। ১৮০৪ সালে সরকার বাহাদুর এই নালা অধিগ্রহণ করেন। শুরুতে এর দৈর্ঘ্য ছিল অত্যন্ত কম, পরে ক্রমশ তা বিস্তৃত হয়। টলি নালার উৎপত্তি খিদিরপুর থেকে শুরু হয়ে তারাদহ অবধি ১৭ মাইল বিস্তৃত ছিল। এই নালা হুগলি নদীকে বিদ্যাধরী নদীর সংগে যোগ করেছিল। অর্থাৎ দীন মহম্মদ যখন দেখেন তখন এই নালা সংস্কার সবে শুরু হয়েছে এবং অল্প স্বল্প পরিবহন চলছে।

পত্র – ১১

কলকাতায় এত অল্প সময় ছিলাম যে কেবল শহরের খানিকটা বিবরণ, কেল্লা আর তার চারপাশের পরিবেশটুকুই সংক্ষেপে লিখতে পারলাম। আমি সত্যিই ভাবছিলাম যে মানুষজনের আচার আচরণ এসব সম্বন্ধে বিশদে কিছুই আপনাকে জানানো হল না। আর হঠাৎ করেই এর মধ্যে আমাদের বহরমপুর চলে যাবার আদেশ এল।

১৭৭৩ সাল নাগাদ বহরমপুর পৌঁছোলাম। পথে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি বলাই বাহুল্য। ভাগীরথী নদীর তীরে এখানকার সেনাছাউনি। বাইশটা ব্যারাক, গোলাবারুদ রাখার জায়গা, মালপত্রের গুদাম আর দপ্তর । নদীর কাছে, দক্ষিণদিকের দুটো ব্যারাক কর্নেল এবং মেজরদের জন্য। পুবে আর পশ্চিমে ছটা করে ব্যারাক অন্যান্য অফিসারদের থাকার জন্য। উত্তরে নিচুতলার অফিসারেরা এবং গোলন্দাজ ও পদাতিক বাহিনীর সৈন্যদের থাকার জায়গা। সর্বাধিনায়কের জন্য একটা দারুণ বাড়ি, নিচুতলার অফিসারদের ব্যারাক থেকে কিলোমিটারখানেক তফাতে। ব্যারাকগুলোর মাঝের জায়গাটা চৌকো মতো মাঠ। সেখানে সেপাইরা শারীরিক কসরৎ করে।

বহরমপুর খুব ঘনবসতিপূর্ণ। বহরমপুর আর মুর্শিদাবাদের মাঝে ছড়ানোছেটানো বিচ্ছিন্ন বসতি। মাঝামাঝি দুটো গুরুত্বপূর্ণ জায়গা, কল্কাপুর আর কাশিমবাজার। সিল্ক ও সুতির কাপড় তৈরির জন্য বিখ্যাত। ভারতের অন্যান্য যেকোনো জায়গার চেয়ে সহজ ও সুবিধেজনক শর্তে ব্যবসায়ীরা কাপড় সংগ্রহ করে এখান থেকে। কৌতূহলবশত মুর্শিদাবাদ শহর দেখতে গেলাম। বেশ বড়ো ব্যবসায়ী শহর। দেশীয় মানুষদের ব্যবসাবাণিজ্যের পীঠস্থান, যেখানে মোগল পার্শি মুসলমান হিন্দু সকলেরই অবাধ গতায়াত। বাড়িগুলি পরিচ্ছন্ন, কিন্তু সুসজ্জিত নয়। প্রত্যেকটা বাড়ি তার মালিকের শখ ও মর্জিমতো তৈরি করা। ব্যবসায়ীদের বাড়িগুলি সাধারণভাবে মোটামুটি ঠিকঠাক নকশা অনুযায়ী বানানো আর তাতে উন্নতমানের ইট ব্যবহৃত।

অন্যদিকে শহরের কাছে কোম্পানির কর্মচারীদের বাড়িগুলিও যথেষ্ট ছিমছাম। মুর্শিদাবাদ শহর আর শহরতলী মিলে লম্বায় নয় মাইল, প্রায় বহরমপুর অবধি বিস্তৃত। মাঝের ছাড়া ছাড়া এলাকাতে বড়োমানুষদের বসতবাড়ি, প্রাসাদ, ইত্যাদি। যার মধ্যে মুবাররক উদ দৌলার প্রাসাদ অন্যতম। অন্যান্য প্রাসাদের থেকে একেবারে স্বতন্ত্র ও সর্বোত্তম। মর্মর পাথরের খিলান দেওয়া স্তম্ভ, নানা রঙের নকশা করা পর্দা লাগানো তাতে। খিলানের ওপরে নহবৎ। বাজনদারদের দল নানান বাদ্যযন্ত্র নিয়ে সকাল সন্ধ্যায় সঙ্গীত পরিবেশন করে।

প্রাসাদের একপাশ দিয়ে একেবেঁকে ভাগীরথী বয়ে চলেছে। অন্যপাশে চকবাজার।

সেখানে ঘোড়া বিক্রি হয়। বাজপাখি বেচাকেনা হয়। বুনো এবং পোষা দুইই। গাইয়ে পাখি পাওয়া যায়। ভারতের যাবতীয় উৎপাদিত জিনিসই মেলে এই বাজারে। এখানে আসার পরপরই নবাবের জৌলুসে আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। একদিন নবাব তাঁর হাজারতিনেক সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে জাঁকজমক করে প্রাসাদ থেকে নিজের এলাকার মন্দির দর্শনে চলেছেন। তাদের দামি পোশাক- আশাক, জামাকাপড়ের জেল্লা সব মিলিয়ে আমার দেখা সেরা মিছিল।

একটা বড়ো ঢাকা পালকির মতো আসনে নবাব বসে আছেন। সেটা বয়ে নিয়ে চলেছে ১৬ জন বেহারা। তাদের সকলের পরনে লাল রঙের পোশাক। পালকির চাঁদোয়া খুব উজ্জ্বল রঙের কাপড়ে তৈরি, রুপোর মিনে করা ভেলভেটের পাড় বসানো তাতে। চাঁদোয়ার চার কোণ চারটে রুপোর দণ্ডের ওপর আটকানো। সবমিলিয়ে একটা সুন্দর হাতলওয়ালা কেদারার মতো দেখতে। ডিম্বাকার ও অভিজাত। নবাব তাইতে পা মুড়ে, নরম তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে। দুপাশের হাতলগুলিও টকটকে লাল ভেলভেটে মোড়া আর তার ওপর সোনার ফুলকারি কাটা। নবাবের পাশে পাশে দুজন, কি জানি কোন পশুর ল্যাজ দিয়ে বানানো দুটো চামর নিয়ে মশা মাছি তাড়াতে তাড়াতে চলেছে। চামর দুটোর হাতলগুলো রুপোর। অতবড়ো মানুষটার মাথায় সাদা মসলিনের ছোট্ট পাগড়ি, চুয়াল্লিশ হাত লম্বা তো বটেই, যার ওজন মাত্র ছ সাতশ গ্রাম। পাগড়ির সামনের দিকে পাড় বরাবর ছোটো ছোটো ঝালর নবাবের ডান কপালের ওপর ঝুঁকে। পাগড়ির সামনে নিখাদ ও নিখুঁত একখানা হিরে বসানো। মসলিনের পাতলা কাপড়ে দেহখানি ঢাকা, তার ওপরে আরেকখানা মাখনরঙা সাটিনের দেহঢাকা লম্বা পোশাক; একই

কাপড়ের পাৎলুন। পোষাকের ধারগুলো রুপোয় মোড়া, প্রতিটি বোতাম রুপোর তৈরি। উটের লোম দিয়ে তৈরি দামি একখানা শাল আলগোছে কাঁধে ফেলা। আরেকখানা কোমরে জড়ানো। দ্বিতীয় শালটির মধ্যে গুঁজে রাখা তার তরবারি। সেটিও একটি অসাধারণ কারিগরীর নিদর্শন। হাতলটা সোনার তৈরি, তাতে হীরে বসানো আর ছোটো ছোটো সোনার চেন লাগানো। নবাবের জুতোও লাল ভেলভেট কাপড়ে বানানো, চারধার রুপোয় মোড়া আর মুক্তো বসানো।

দুজন সচিব ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে তার পাশে পাশে চলেছেন। এদের তুলনায় নবাবের পোশাকআশাকের সামান্যই তফাৎ তবে পাগড়িতে বসানো হীরেটা নিশ্চিতভাবে অনেকটাই তফাৎ গড়েছে। ঘোড়াদের জিন- এ নানান রকম কারুকাজ, ঝালর লাগানো। নবাবের সামনে পেছনে অসংখ্য পাইক বরকন্দাজ। নবাবের সিংহাসন- লাগোয়া ঘোড়ার পিঠে তাঁর নিজস্ব দেহরক্ষী। সকলের পোশাকআশাকেই আলাদারকম বিশেষত্ব নজরে পড়ে। পৃথিবীও যেন তার সমস্ত ঐশ্বর্য দিয়ে এদের সাজিয়েছে। কারিগররা তাদের সমস্ত দক্ষতা দিয়ে ঘোড়াদের নানা সাজে সাজিয়েছে। নবাবের হাতে গড়গড়ার নল, স্থানীয় ভাষায় হুকা। নলটা পেঁচানো, নয় হাত লম্বা। নলের মাথাটা নবাবের হাতে, আর গড়গড়ার বাকি অংশ নীচে হেঁটে চলা এক পরিচারকের হাতে। রুপোর তকলিতে সুগন্ধি, মধু, গোলাপজল আর মিহি করে কাটা তামাক দিয়ে সাজা। মিশ্রনটা টিকের হাল্কা তুষের আগুনের ওপরে রাখা, তার মিহি সুগন্ধি ধোঁয়া একটা হলদে মতো তরলের মধ্যে দিয়ে এসে লম্বা গড়গড়ার নলের ভেতর দিয়ে সোজা নবাবের মুখ পর্যন্ত পৌঁছেছে।

পরিচারকের হাতে ধরা যে অংশটা, সেটা কাচের, তাতে এক লিটার মতো জল ভরা। পাত্রটার চারদিক দিয়ে সুন্দর করে ছোটো ছোটো সোনার চেন লাগানো; লম্বা নলটির দু প্রান্তেই সোনার মুখ লাগানো। মাঝখানের অংশটা সাটিন, সিল্ক আর মসলিন দিয়ে বোনা একটা লম্বা নল বিশেষ। মুখে ধরার অংশটা তো সোনা দিয়ে তৈরিই, ঠোঁটের যে অংশটা নলকে স্পর্শ করবে সেখানটায় হীরে বসানো।

দেশীয় গাইয়ে বাজিয়েদের একটা দল রয়েছে তার সাথে সাথে। উটের পিঠে চাপানো মস্তো একটা ঢোল। অনেক দূর থেকে এটার আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়। পুরো মিছিলটার আগে আগে ঘোষক বা হরকরা, নবাবের আগমন ঘোষণা আর রাস্তা পরিষ্কার করতে করতে চলেছে সে। আশেপাশের লোকেরা ভেঙে পড়েছে দেখার জন্য। আমি খানিক অপেক্ষা করে রইলাম, সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে নবাবের মন্দিরে ঢোকার অপেক্ষায়। সকলে মন্দিরের পবিত্র চত্বরে প্রবেশের আগে বাইরে জুতো খুলে রেখে ঢুকল। এই অসামান্য আড়ম্বরপূর্ণ শোভাযাত্রায় আমি যারপরনাই মুগ্ধ হলাম, আর বেশ কিছুদিন মুর্শিদাবাদে থেকে যাবার ইচ্ছে হল।

সীমান্তের অন্তরালে

সমরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী

হাতে লেখা মূল পাণ্ডুলিপি থেকে সংকলন ও সম্পাদনা—শ্রীমতী স্বপ্না লাহিড়ী

হাত বোমা নিয়ে গুহার মুখে এগিয়ে গেল কয়েকজন বৃটিশ সোলজার। এক, দুই, তিনটে হাত বোমার ফিউজ খুলে বোমাগুলি ফেলে দিলো গুহার ভিতর । গুড়ুম গুম গুম শব্দে হাত বোমাগুলি ফেটে গেল গুহার মধ্যে, আর পায়ের তলায় মাটি কেঁপে উঠলো থর থর করে। তারপর বেয়নেট চড়ানো রাইফেল নিয়ে বৃটিশ সোলজাররা, আর কক করা রিভলবার হাতে

বৃটিশ অফিসাররা ঢুকে পড়লেন গুহার ভিতরে, জীবন্ত বা মৃত ফকিরসাহেবকে টেনে বার করার জন্যে।

কিন্তু কোথায় ফকিরসাহেব? গুহার ভিতর এক জায়গায় কিছু কাঠ জ্বলছে তখনও, আর ফকির সাহেবের নিত্যব্যবহার্য কয়েকটি সামান্য জিনিস সেখানে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে তিনি কিছুক্ষণ আগেও সেখানে ছিলেন, কিন্তু এই মুহূর্তে ফকিরসাহেব একেবারে লা পতা। ফকিরসাহেবের হাতে বৃটিশ ইন্টেলিজেন্সের লজ্জাজনক পরাজয়।

****

ওয়াজিরিস্থান অপারেশন শেষ হয়ে গেছে প্রায় তিন বছর হল। ফকিরসাহেবের ওয়াজিরি লশকর ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, তাই থাল স্পিনওয়াম রাস্তা আর তত ভয়াবহ ছিল না। নদীর এপারে গাড়িটা ফ্রন্টিয়ার কন্সটিবিউলারির পোস্টের নিচে রেখে আমি ইব্রাহিম খান আর নজিব গুলকে সঙ্গে নিয়ে কুরাম নদীর ওপর সেতু পার হয়ে হেঁটে এগিয়ে চললাম স্পিনওয়ামের দিকে।

সেতু পার হয়েই বেশ খানিকটা চড়াই ভেঙে একটি ছোট পাহাড়ের মাথায় উঠলাম। এই পাহাড়টি ফ্রন্টিয়ার কন্সটিবিউলারির পিকেট পোস্টের ঠিক বিপরীত দিকে। সেখান থেকে প্রায় তিনশ গজ নেমে গিয়ে রাস্তাটি মাইলখানেক সমতল জমির ওপর দিয়ে গেছে। রাস্তার ডানদিক ঘেঁসে ছোট বড় গাছপালাবিহীন শুকনো পাহাড়ের সারি। প্রায় পাঁচশ গজ দূরে দুটো ছোট পাহাড়ের মাঝখানে হাজারখানেক গজ জমি সবুজ ঘাসে ভর্তি। চারদিকে বাদামি রঙের পাহাড়ের মাঝখানে এই সবুজ ঘাসে ভর্তি জায়গাটি দেখে মনে হল যেন একটি বড় তামার পদকের বুকে একখানি দামি পান্না বসানো। একটি পাহাড়ি ঝর্ণার জল এসে এই সবুজ জায়গাটির ওপর ছড়িয়ে পড়েছে।

জনবিহীন দেশে এ রকম দুর্লভ ঝর্না থাকলে লোকে সে জমিতে চাষ আবাদ করে সেখানে সোনা ফলায়, কিন্তু এ জমিতে কোনও চাষ আবাদ না দেখে ইব্রাহিমকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। ইব্রাহিমের উত্তরে জানতে পারলাম যে আগে এখানে চাষ করা হত, কিন্তু বছর দুই থেকে চাষ করা বন্ধ। কারণ, জমিটার মালিকানা নিয়ে কাবুল খেল আর কুরাম খণ্ড জাতির মধ্যে গোলমাল বেধেছে। দুই জাতির প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমেও কোন সমাধান হয়নি। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ইংরাজ গভর্নর সাহেবের মধ্যস্থতাতেও কোন নিষ্পত্তি হয় নি এই কলহের ।

বেলা পড়ে আসছিল। কাজেই আর স্পিনওয়ামের দিকে বেশি দূর না এগিয়ে ফিরলাম। আপাতদৃষ্টিতে শান্ত ওয়াজিরিস্তান শুধু ছাই চাপা আগুনের মত। বলা যায় না কখন, কোন সময় , কোনখানে সে আগুন ফেটে বেরোয়!

ফেরার পথে হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিলাম যে পান্নার মত সবুজ জমির টুকরোটা হয়ত একদিন কাবুল- খেল আর কুরাম খণ্ড জাতির লোকেদের রক্তে রুবির মত রাঙা হয়ে উঠবে। এইসব ভাবতে ভাবতে কুরাম নদীর সেতুর ওপর এসে পড়েছি, সেই সময় পিছনের একটি পাহাড় থেকে শব্দ এলো কড়াক আর সঙ্গে সঙ্গেই সোঁ করে রাইফেলের একটি গুলি মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল। তৎক্ষণাৎ সেতুর উপর শুয়ে পড়লাম আমরা। এলোপাথাড়ি গুলি এসে

পড়ছিল সেতুর ওপর। প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টায় বুকে হেঁটে সেতুর ওপর দিয়ে এগোতে লাগলাম ফ্রন্টিয়ার কন্সিবিউলারি পোস্টের দিকে ।

সামনে দেখা যাচ্ছিল কনস্টিবিউলারি পিকেটের ওপর রাইফেল আর মেশিনগান নিয়ে বসে দেখছে সিপাইরা কিন্তু তাদের পাল্টা গুলি চালাবার কোনও লক্ষণ দেখলাম না। তাদের নিষ্ক্রিয়তা দেখে রাগ হল। তবে অদৃষ্ট ভাল ছিল, জীবন্ত এবং অক্ষত অবস্থায় সেতুর এপারে পিকেটে এসে পৌঁছলাম। ওয়াজিরিদের রাইফেল ততক্ষণে নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। ওরা বোধহয় মনে করল যে শুধু শুধু রাইফেলের গুলি খরচ করে লাভ কী!

কনস্টিবিউলারির সেপাইদের ওপর তখনও আমার রাগটা পড়েনি। জিজ্ঞাসা করলাম তাদের এতক্ষণ নিষ্ক্রিয় থাকবার কারণটা কী?

পিকেট এর হাবিলদারের আমার অভিযোগের উত্তর ছিল“ ,আপনারা সেতুর ওপর বুকে হাঁটছিলেন, আমরা গুলি চালালে এক আধটা গুলি ফসকে আপনাদের লাগলে আপনারা মারা যেতেন।”

“কিন্তু আমরা তো ওয়াজিরিদের গুলিতেও মারা যেতে পারতাম ”?

“তা বেশক পারতেন, কিন্তু সে ক্ষেত্রে আমাকে বেশি জবাবদিহি করতে হত না। আমাদের নিয়ম যে লাইন অফ ফায়ার এর মধ্যে যদি নিজেদের লোক থাকে, তবে গুলি চালানো উচিত নয়। আমি ঠিক নিয়ম মোতাবেক কাজই করেছি গুলি না চালিয়ে।”

সে রাতটা কাটল টুকরো টুকরো উদ্ভট স্বপ্ন দেখে – কখনও ওয়াজিরিদের রাইফেলের গুলি আমাকে তাড়া করে চলেছে, আবার কখন থাল স্পিনওয়াম রাস্তায় সেই সুন্দর সবুজ ঘাসে ভরা জমির পাশের পাহাড়ি ঝর্না থেকে ঝলকে ঝলকে রক্ত বেরোচ্ছে জলের পরিবর্তে।

পরে একদিন ঘটনাটি বন্ধু রশীদ খানকে বলেছিলাম। শুনে খান সাহেব বললেন, "আপনি কি মনে করেন যে গভর্নমেন্টের অফিসগুলোতেই শুধু রেড টেপের বাঁধন? উটের নাকে নকেল বাঁধা থাকলে উট যেমন নকেলের টানের দিকেই শুধু চলে, একটুও এদিক ওদিক যায় না, তেমনই বৃটিশ গভর্নমেন্ট এর চাকরি যারা করে, তারা লাল ফিতার লাইনের একচুলও এদিক ওদিক যেতে নারাজ।

"শুনুন তবে আপনাকে একটি ঘটনার গল্প বলি। একদিন মিলিশিয়ার একটি পিকেট আক্রমণ করেছে উপজাতি লশকর। পিকেটের সেপাইরা যখন দেখল যে তারা উপজাতি লশকরের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছে না, তখন হিলিওগ্রাফে সিগনাল করে কাছাকাছি একটি মিলিশিয়া বাহিনীর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল। মিলিশিয়া বাহিনীর সেপাইরাও উপজাতীয় পাখতুন বাচ্চা, যুদ্ধের নাম শুনে লাফিয়ে ওঠে। তাদের সুবেদারের হুকুম 'ফল-ইন' শোনামাত্রই সব রাইফেল নিয়ে ছুটে এসে লাইন দিয়ে দাঁড়ালো, কিন্তু সরকারি কায়দা অনুযায়ী হুড়মুড় করে এলোমেলোভাবে যুদ্ধ করতে যাওয়া যায় না।

"সুবেদার হুকুম দিলো' ,র রাইট দ্রেশ'। লাইনটি নিখুঁতভাবে সাজানো হওয়ার পর হুকুম হল 'নাম্বার'। ডান দিক থেকে সেপাইরা আউড়ে যেতে লাগলো ,ইউ, দোয়া, দ্রে, ইউ, দোয়া, দ্রে। যাঃ সর্বনাশ হয়ে গেল ! একটি সেপাই ' ইউ' এর বদলে ভুলে 'দ্রে' বলে ফেলল। আবার গোড়া থেকে আরম্ভ করা হল নাম্বার, 'ইউ,দোয়া, দ্রে; ইউ,দোয়া,দ্রে' । এবারেও একটি সেপাই ভুল করে ইউ এর বদলে দ্রে বলে ফেলল। সুবেদার সাহেব চটে গিয়ে বললেন' ,তা গলত্ শো কনা সড়িয়া'। আবার গোড়া থেকে নাম্বারিং আরম্ভ।

"এরা কায়দাদুরস্ত ভাবে যতক্ষণে পিকেট পোস্টে গিয়ে পৌঁছল ততক্ষণে আক্রমণকারী দল সেই পিকেট পোস্টটি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে চলে গেছে বহুদূর। বৃটিশ সাম্রাজ্যে নিয়মের ব্যতিক্রম হবার জো টি নেই।

****

কোথায় যেন পড়েছিলাম, কে একজন বলেছেন, "অগর মুঝসে কোই পুছে কি জিন্দগি ক্যা হৈ তো মৈ কহুঙ্গা, কুছ জীনে কা ফসানা, কুছ মরণে কা ইন্তেজার।"

জীবনটাকে তিনি বলতে চেয়েছেন, কিছুটা পিছনে ফেলে আসা দিনের কাহিনী, আর কিছুটা মৃত্যুর প্রতীক্ষা। উত্তরপশ্চিম সীমান্তের উপজাতি পাখতুন, সারা জীবনটা মৃত্যুর প্রতীক্ষাই করে চলে। পিছনে ফেলে আসা জীবনের কাহিনীর প্রতি তার ভ্রুক্ষেপ নেই। কী পাইনি তার হিসাব মিলানো সম্বন্ধে নিতান্তই উদাসীন, তাই তার কোনও সুসংবদ্ধ ইতিহাস নাই।

ঐতিহাসিকরা পাখতুন আর তাদের দেশ সম্বন্ধে দু এক কলম লিখেই তাঁদের কর্তব্য শেষ করেছেন। আর ইংরাজ আমলে কয়েকজন সামরিক অফিসার পাখতুনদের সঙ্গে তাঁদের যুদ্ধের বিবরণ কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তাঁদের বর্ণনার মধ্যেও বেশির ভাগ তাঁরা নিজেদের বাহাদুরিই দেখাতে চেয়েছেন। আর পাখতুনদের এমন একখানি ছবি এঁকে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরেছেন যা দেখলে তাদের সম্বন্ধে এক অতি হীন ধারণা জন্মায় সভ্যজগতের মনে। কোথাও কোথাও হয়তো অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাদের সদগুণগুলির ওপর কিছুটা আলোকপাত হয়েছে, কিন্তু সেটা ব্যতিক্রমমাত্র। বৃটিশ গভর্নমেন্টের কাছে এরা শুধু বর্বর খুনি, কারণ বিশাল

বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিপুল শক্তির কাছে তাদের বিজিত জাতিরা সকলেই একে একে নতিস্বীকার করেছে, কিন্তু পাখতুন বৃটিশ সাম্রাজ্যের শেষ দিন অবধি তাদের সঙ্গে যুদ্ধই করে গেছে, নতিস্বীকার করেনি।

এল এ স্টার তাঁর **Frontier folks of the Afgan border & beyond** গ্রন্থে পাখতুনিস্তান সম্বন্ধে লিখেছেন, **"It is an abode of outlaws, for the unwritten law is ,might is right ,and the pride of the people that they have never known a master and never will."**

পাখতুনদের সঙ্গে ইংরাজদের সম্যক পরিচয় হল প্রথম অ্যাংলো -আফগান যুদ্ধর সময় ১৮৩৮- ১৮৪২ সালে। খুব ঘটা আর জাঁকজমক করে এক বিরাট বৃটিশ বাহিনী রওনা হল পাঞ্জাবের ফিরোজপুর থেকে লেফটেন্যান্ট জেনারেল সর জন কিন এর সেনাপতিত্বে। সহকারী সেনাপতিগণ ছিলেন মেজর জেনারেল কটন, সেল এবং উইলসায়ার। শিখণ্ডী খাড়া করলেন এঁরা রাজ্যহারা শাহ্ সুজাকে। শাহ সুজাকে পুরোভাগে রেখে চলল সেই বিরাট বাহিনী মেদিনী কাঁপিয়ে, কোয়েটা হয়ে কান্দাহার গাজনি কাবুল জালালাবাদ। এই যুদ্ধের ইতিহাস সুবিদিত, তাই তার বিবরণের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

আফগানিস্তানে ব্রিটিশের অবস্থা যখন সঙ্গিন হয়ে উঠলো তখন, মেজর জেনারেল সেল তাঁর ব্রিগেড নিয়ে জালালাবাদ থেকে পশ্চাদপসরণ করে পেশোয়ারের দিকে রওনা হলেন, কিন্তু সেখানে পৌঁছোতে পারলেন না। খাইবার পাসের মুখে আটকে গেলেন পাখতুন উপজাতির প্রচণ্ড আক্রমণে। পাখতুনদের ভাবটা যেন, খুব ঘটা করে তো তোমরা আফগানিস্তান জয় করতে গিয়েছিলে, ফিরে পালাবার পথে একটু আমাদের সঙ্গেও মুলাকাত করে যাও।

পাখতুনদের প্রচণ্ড আক্রমণের সামনে দাঁড়াতে না পেরে জেনারেল সেল তাঁর বাহিনী নিয়ে আবার ফিরলেন জালালাবাদের দিকে। এদিকে তাঁর ফৌজকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ওয়াইল্ডকে এক সৈন্যবাহিনী সমেত পাঠানো হল পেশোয়ার থেকে, কিন্তু তিনি আলমসজিদ এর ওদিকে আর যেতে পারলেন না। পাখতুনরা তাঁকেও নাজেহাল করে তাঁর সৈন্যবাহিনী সমেত তাড়িয়ে একেবারে পেশোয়ারে ফেরত পৌঁছে দিল। পরে অবশ্য জেনারেল পোলাক আর একটি বিরাট ফৌজ নিয়ে আফগানিস্তানে অবরুদ্ধ ব্রিটিশ বাহিনীকে উদ্ধার করেন, কিন্তু তাঁকেও পাখতুনদের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ করতে হয়েছিল খাইবার দিয়ে ফেরার পথে।

ক্রমশ

ছবি শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

এলিচপুরে পৌঁছে রায়মন শা দুলা-র দরগার কাছে একটা তেঁতুলতলায় আমরা আস্তানা গাড়লাম। জায়গাটা ভারি সুন্দর। দরগার কাছেই ছোট্ট একটা নদী কাছের পাহাড় থেকে বয়ে আসছে। তার ওপরে গাছে ঘেরা পীরসাহেবের দরগাটা দেখে মনে হয় শান্তির নীড়। পৌঁছোবার পর হাতমুখ ধুয়ে পথের পোশাক পালটে আজিমাকে নিয়ে আমি সেই দরগায় গিয়ে পুজো দিয়ে এলাম। তারপর তাকে ঘাঁটিতে পৌঁছে দিয়ে দরগার মৌলবিদের সঙ্গে গল্প করতে বসলাম। উদ্দেশ্য এলিচপুরের খবরটবর নেয়া। শহরটা বড়। এখানে ভালো কাজকর্ম হবার আশা ছিল আমাদের।

কথায় কথায় এক মোল্লা আমায় আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে আমি বললাম আমি ঘোড়ার ব্যবসা করি। হিন্দুস্তান থেকে ঘোড়া নিয়ে হায়দরাবাদে বেচতে এসেছিলাম। বিক্রিবাট্টা শেষ করে এখন দেশে ফিরছি। সঙ্গে আছেন আমার বাবা, চাকরবাকরের দল আর কিছু পথিক। তাঁরা পথে আমাদের সঙ্গ ধরেছেন।

মোল্লাসাহেব শুনে বলেন, "তার মানে, গোটা একটা কাফিলা নিয়েই চলেছেন দেখছি!"

"ঠিক তাই। আমাদের দলটা এত বড় আর শক্তপোক্ত যে ঠিক করেছি বেতুল হয়ে জব্বলপুরের রাস্তা দিয়েই ফিরব। ও পথে ছোটখাটো দল যেতে ভয় পায় বটে কিন্তু আমাদের দলটার চেহারা তো দেখছেনই!"

"তা তো বটেই। ও পথে গেলে আপনাদের রাস্তা অনেক কমে যাবে। নইলে নাগপুর হয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে অনেক বেশি পথ পেরোতে হত। তা এতবড়ো দল যখন যাচ্ছে আপনাদের, সে দলে আরো দু একজন লোক যদি এসে জোটে আপনাদের কোন আপত্তি হবে না তো?"

"তা যাঁরা যাবেন তাঁরা যদি ভদ্রলোক হন তাহলে আপত্তি কীসের?"

"আরে হ্যাঁ, সে তো বটেই। যাঁর কথা বলছি তিনি পদমর্যাদায় একজন নবাবের চেয়ে কম নন। তাঁর ভাইপো ভোপালের শাসক। উনি ভাইপোর কাছে ফিরছেন।"

আমি মাথা নেড়ে বললাম, "বুঝেছি, বুঝেছি, আপনি সবজি খানের কথা বলছেন, তাই না?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ। লোকটা ভালো লড়াই করে। এককালে ওর শত্রুরা ওকে যমের মত ভয় পেত। কিন্তু ওই এক সবজি, মানে ভাঙের নেশাতেই ওর সব গেল।"

"দুঃখের ব্যাপার। দক্ষিণ থেকে হিন্দুস্তানে আসা লোকজনের মুখে ওঁর অনেক সুখ্যাতি শুনেছি এককালে। ওনাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারলে আমি খুশিই হব। শুনেছি সঙ্গী হিসেবেও উনি নাকি অসাধারণ।"

"ঠিকই শুনেছেন সাহেব। নবাব রোজ সন্ধেবেলা এইখানে ভাঙ খেতে আসেন। আজ যখন আসবেন আমি আপনাকে খবর দেব। দেখা করে যাবেন। আলাপ করিয়ে দেবো' খন।"

"ঠিক আছে মোল্লা সাহেব। আপনি খবর দিলেই এসে যাবো।"

ঘাঁটিতে ফিরতে ফিরতে ভাবছিলাম, এইবারে যে কাণ্ডটা হতে চলেছে সেটার কাছে আমাদের আগের সব কাজকর্ম তুচ্ছ হয়ে যাবে। অনেক লোকলশকর থাকবে এর সঙ্গে। ধনরত্নও নিশ্চয় কম থাকবে না। তার ওপর একে নিকেশ করলে দেশ জুড়ে যা হইচই শুরু হয়ে যাবে, ভূভারতে তার তুলনা থাকবে না।

ব্যাপারটা নিয়ে আমি কারো সাথে বিশেষ আলোচনা করলাম না। আমি চাইছিলাম গোটা ব্যাপারটা আমার একার পরিকল্পনায় ঘটাবো। দলে এত লোক আছে যে কাজটায় সাফল্য আসবেই। তারপর আমার দেশজুড়ে এমন নামডাক হবে যে কেউ কোনদিন আর তার নাগাল পাবে না। নবাব যে একজন শিক্ষিত যুদ্ধব্যবসায়ী, তাঁর সঙ্গে যে অস্ত্রশস্ত্রও কম থাকবে না এ কথাটা মাঝে মাঝে আমার মাথায় উঁকি দিয়ে যাচ্ছিল বটে, কিন্তু তখন আমার আত্মবিশ্বাস এমন তুঙ্গে যে দুনিয়ার কোনকিছুকেই আমি পরোয়া করি না।

তবে একটা কথা ঠিক যে ইংরেজ সাহেবদের সঙ্গে আমরা লাগতে যেতাম না। ভয়টয় ওদের আমরা কোনদিন পাইনি। কিন্তু, সে ব্যাটারা সবসময় ঘোড়ার পিঠে চেপে চলে। পথ চলার সময় সঙ্গে একটা পয়সা বা কোন গয়নাগাঁটি কিচ্ছু রাখে না। রাতে যেখানে থাকে সেখানে তাঁবু ঘিরে হাজারটা নফরকে খাড়া করিয়ে পাহারা রাখে। যখন পালকিতে চড়ে যায় তখনো সঙ্গে পিস্তল রাখে। আর সবচেয়ে বড়ো কথা একটা সাহেব মারলে এত হইচই শুরু হয়ে যায় যে লাভের বদলে সাহেব মেরে লোকসানের বহরই বাড়ে শুধু।

সে যাক। সেদিন সন্ধেবেলায় আমি আমার তাঁবুর দরজায় বসে আছি এমন সময় দেখি একটা লোক সঙ্গে বেশ কয়েকজন লোককে নিয়ে ঘোড়ায় চেপে এদিকেই আসছে। দলটার মধ্যে একটা অল্পবয়সী সুন্দরী মেয়েও ছিল। আমাদের ঘাঁটি পেরিয়ে দলটা গিয়ে দরগার ভেতরে ঢুকল। খানিক বাদে একজন লোক এসে খবর দিল মোল্লা সাহেব আমাকে স্মরণ করেছেন।

।২৩।

গিয়ে দেখি বুড়ো মোল্লাসাহেবের সঙ্গে বসে নবাব সবজি খান বাহাদুর তাঁর ভাঙের ঘটিতে চুমুক দিচ্ছেন। তাঁকে ঘিরে তাঁর দেহরক্ষীরা দাঁড়িয়ে। তাদের শক্তপোক্ত শরীরে বহু যুদ্ধের চিহ্ন। নবাবের পেছনে বসে সেই অল্পবয়সী মেয়েরা আরেক ঘটি ভাঙ তৈরি করতে ব্যস্ত।

আমায় আসতে দেখেই মোল্লাসাহেব বললেন, "এই যে মীর সাহেব এসে গেছেন। এঁর কথাই আমি বলছিলাম নবাবসাহেব। দেখেই বুঝতে পারছেন ভালো ঘরের ছেলে। আপনার সঙ্গে যাবার জন্য এ একেবারে উপযুক্ত হবে।"

আমি তাড়াতাড়ি আমার তলোয়ারের বাঁটটা তাঁর দিকে এগিয়ে ধরে নজরানা পেশ করলাম। তিনি সেটা একবার ছুঁয়ে দিয়ে আমায় পাশে বসতে হুকুম দিলেন। আমি বিনয় দেখিয়ে বললাম আমি সে সম্মানের যোগ্য নই, আর তারপর তাঁর আসনের একপাশে গিয়ে, সামনে ঢাল আর তলোয়ার নামিয়ে রেখে হাঁটু গেড়ে বসলাম। তলোয়ারটা দেখি নবাবের চোখ টেনেছে। বলেন, "মীর সাহেব, এ তো দেখি দারুণ জিনিস! একবার হাতে নিয়ে দেখবো?"

"নিশ্চয় হুজুর। আমার তলোয়ার আপনার সেবার জন্য প্রস্তুত।"

"না না, তলোয়ারটা আমি চাই না। তবে আমার তলোয়ার জমানোর শখ, তাই এ ব্যাপারে একটু আধটু কৌতূহল আছে।"

তলোয়ারটাকে তার খাপের থেকে বের করে তার চোখ ঝলসানো ফলাটার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন নবাব, যেন কোন পুরোন বন্ধুকে স্বাগত জানাচ্ছেন। মানুষটা বড়োসড়ো চেহারার। পেশিবহুল শরীরটা তাঁর মসলিনের পোশাকের নিচে থেকে ফুটে বের হচ্ছিল। বয়সের জন্য একটু মোটার দিকে ধাত। কোঁকড়ানো চুলদাড়িতেও একটু একটু সাদার আভাস। ভারী সুপুরুষ চেহারা। প্রশস্ত কপাল, তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল চোখে ঈগলের মত দৃষ্টি, দাড়িগোঁফে ছাওয়া ছোট্ট মুখটা সবসময় যেন একটা ব্যাঙ্গের ভঙ্গী করে রয়েছে। এমন আকর্ষণীয় চেহারা আমি আগে কখনো দেখিনি। মনে হচ্ছিল, মসলিনের বদলে এই মানুষ যদি একেবারে কমদামি পোশাক পরেও ঘোরেন তাহলেও তাঁর চেহারার আভিজাত্য এতটুকু কমবে না। গলায় একটা জপমালার থলে ছাড়া আর কোন অলংকার ছিল না। নিখুঁত ধবধবে পোশাকেও কোন বড়োলোকপনা নেই। বুকে আর ঘাড়ে দুটো গভীর কাটার দাগ। এই হলেন সবজি খান, আর এঁকেই আমি প্রথম সুযোগেই নিকেশ করবার মতলব ফেঁদেছি তখন।

তলোয়ারটা নিয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে এত মনোযোগ দিয়ে দেখছিলেন সবজি খান যে আমার ভয় হতে শুরু করল, বাবার হাতে মারা যাওয়া তাঁর কোন পরিচিত বন্ধুর হবে হয়তো তলোয়ারটা। হঠাৎ সেরকম কিছু জিজ্ঞাসা করে বসলে কী জবাব দেবো তাই মনে মনে তৈরি করছি এমন সময় তার ধারালো দিকটায় আঙুল বোলাতে বোলাতে সবজি খান বললেন, "তা তোমার তলোয়ার দেখছি যুদ্ধেও কাজে লেগেছে। চোটগুলো খুব সুক্ষ কিন্তু এই বুড়ো সৈনিকের আঙুলকে ফাঁকি দিতে পারবে না। তা লড়াইটা হয়েছিলো কোথায়?"

"ও কিছু না। কয়েকটা ডাকাতের সঙ্গে একটু তলোয়ারবাজি হয়েছিলো একবার-- " এই বলে আমি তাঁকে নিরমূলের পথের সেই ডাকাতদের সঙ্গে যুদ্ধের গল্পটা শোনালাম।

গল্প শেষ হলে তিনি বললেন, "ভালো কাজ। কিন্তু তাড়া করে গিয়ে আর ক'টা ডাকাতকেও নিকেশ করে দিলে ভালো করতে হে! তোমার বুকে সাহস থাকলে এই তলোয়ার তোমাকে ঠকাতো না।"

"বুকে আমার সাহসের কোন অভাব নেই নবাবসাহেব, " আমি জবাব দিলাম, "যারা আমায় চেনে তারা সবাই সে কথা বলবে আপনাকে। কিন্তু সে অবস্থায় এ ছাড়া আমার আর কিছু করার ছিল না। আমরা সংখ্যায় বেশি ছিলাম না, জঙ্গলটাও বেজায় ঘন ছিল, তার ওপরে অন্ধকারও ছিল খুব।"

"তা ঠিক। তা বল দেখি বন্ধু, আমার সঙ্গী হবে? এখন আমি তোমায় কিছুই দিতে পারবো না সে ঠিক, কিন্তু ইনশাল্লা, সামনেই আমার দিন আসছে। ভোপাল থেকে আমার বন্ধু দোস্ত মহম্মদ আমায় লিখেছে তাড়াতাড়ি আসতে। তার নতুন অভিযানে অনেক ভালো সেনানায়ক দরকার হবে। তোমায় দেখে আমার মনে হচ্ছে সে তোমাকে লুফে নেবে এক কথায়। ঘোড়া বেচে খাওয়া তোমায় সাজে না হে। যদি সে ব্যবসায় কিছু টাকা রোজগার করেও থাকো তাহলে সে টাকাকে যথার্থ কাজে লাগাও। একটা সেপাইয়ের দল তৈরি করে তাদের নিয়ে আমার সঙ্গে ভোপালে চলো। কী বলো?"

আমি আবেগদীপ্ত গলায় বললাম, "ধন্য, ধন্য হে বন্দে নওয়াজ, এই তো আমার চিরকালের স্বপ্ন! আপনার কৃপা হলে সে স্বপ্ন আমার পূরণ হবেই, সে আমি বেশ জানি। দেখে নেবেন, আমি এর উপযুক্ত প্রতিদান দেব একদিন আপনাকে।"

"তাহলে তুমি আমার সঙ্গে যাবে বলে ঠিক করলে, তাইতো? বড়ই খুশি হলাম হে। শুনলাম লোকজন নিয়ে তুমি জবলপুরের রাস্তা ধরে চলেছ। রাস্তাটা ছোট, আমারও সময়ের বড়ো অভাব। তবে রাস্তাটায় শুনেছি চোরডাকাতের বড় উপদ্রব।"

"হুজুর, চোরডাকাতের ভয় আমি করি না। আমার দলটা বেশ বড়ো। তার ওপরে আপনার মত বীর যদি সঙ্গে চলেন তাহলে তো কথাই নেই। তা আপনারও নিশ্চয় চোরডাকাত নিয়ে ভয়ডর কিছু নেই!"

"না হে। তোমার মত একজন হাতিয়ারবন্দ নওজওয়ানের দলের সঙ্গে গেলে আমার আর কোন ভয় থাকবার কথা নয়। এমনিতে আমার সে রাস্তা ধরে যেতে একটু অস্বস্তি হতো। শুনেছি ও পথের ডাকাতগুলো বেজায় নিষ্ঠুর খুনে সব। সারাটা জীবন যুদ্ধক্ষেত্রে কাটিয়ে সবজি খান শেষে কোন অজানা জঙ্গলে লাশ হয়ে পড়ে থাকবে সেটা ভাবতে আমার একটু অস্বস্তি হচ্ছিল বইকি!

আমি মনে মনে বললাম, "সেই পরিণতিই তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছে হুজুর।"

"তা রওনা কবে হবে বলে ঠিক করেছো মীর সাহেব? এখানে কোন কাজকর্ম আছে নাকি তোমার?"

"আজ্ঞে না হুজুর,   কাজকাম কিছু নেই। আমি তো ঠিকই করে রেখেছিলাম কাল সকালবেলা এলিচপুর ছেড়ে রওনা দেবো। তা হুজুরের যদি আরো দুএকদিন সময় লাগে তাহলে-- "

"না, কালকে হবে না হে। পরশু দুপুরবেলা আমি রওনা হতে পারি। তোমার তাতে অসুবিধে নেই তো?"

"জো হুকুম। আমি সেইরকমভাবে তৈরি থাকব। তা এখন কি আমি যেতে পারি হুজুর?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়। তোমায় আমি আর দেরি করাবো না। আমার বন্ধু সলাবত খান আমায় আজ সন্ধেয় একটা মহফিলে নিমন্ত্রণ করেছে। আমাকেও এখন সেখানে রওনা দিতে হবে।"

ঘাঁটিতে ফিরে আমি তখনও বাবাকে কিছু বললাম না। ঠিক করে রেখেছিলাম নবাব আমাদের দলে এসে যোগ দেবার পর সব কথা বাবাকে খুলে বলব। শুধু এইটুকুই বললাম যে দুদিন পর সেখান থেকে আমরা রওনা দিতে চাই।

পরের দিন গিয়ে তৃতীয় দিন সকালে যখন আমরা রওনা দেবার জন্য তৈরি হচ্ছি, তখন নবাব ঘোড়ায় চেপে আমাদের ঘাঁটিতে এসে আমার খোঁজ করলেন। আমি তাড়াতাড়ি বের হয়ে এসে বাবার সঙ্গে তাঁর আলাপ করিয়ে দিলাম। কথাবার্তা চলতে চলতে নবাবের অলক্ষ্যে বাবা আমার দিকে ইশারা করে জানতে চাইলেন ব্যাপারটা কী? উত্তরে আমিও ইশারায় তাঁকে আমার মতলবটা বুঝিয়ে দিলাম। দেখি বাবার চোখে খুশির ঝলক চিকমিক করছে।

খানিকক্ষণের মধ্যেই আমাদের গোটা দলটা রওনা হয়ে পড়ল। নবাব আমার পাশে পাশে একটা বিরাট, তেজি ঘোড়ায় চেপে চলেছেন। তার গায়ে লাল বনাতের সাজ। জিনের গায়ে সোনার সুতোর ঘন নকশা। নবাবের শরীরে দারুণ একখানা বর্ম। কোমরের কাছে একখানা চাদর জড়ানো। তার ভেতর দিয়ে সোনারূপোর কাজ করা গোটাতিনেক বড় বড় ছুরির বাঁট উঁকি দিচ্ছে। উরু আর হাতদুটোর ওপরে লোহার খাপ আটকানো। মাথায় লাল রুমাল দোলানো লোহার হেলমেট, পিঠে গন্ডারের চামড়ার রংচং করা একটা ঢাল ঝোলানো, কোমরে লম্বা ঝকমকে তলোয়ার আর ঘোড়ার জিনের সঙ্গে বাঁধা একখানা যুদ্ধের কুড়ুল। যেতে যেতে ভাবছিলাম এমন লোককে কাবু করতে পারবো তো?

"তুমি দেখছি আমায় অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছো?" হঠাৎ সবজি খান বললেন।

"হ্যাঁ হজুর। দেখছি। এমন নিখুঁত যোদ্ধার চেহারা আমি আগে কখনো দেখিনি। আপনি কি সবসময় এইভাবেই পথ চলেন?"

"সব সময় মীরসাহেব। একজন যোদ্ধাকে সবসময় যুদ্ধের জন্য তৈরি থাকতে হয়। ব্যাটা আলসে সলাবত খানের সঙ্গে যেক'টা দিন আমি কাটিয়েছি তাতেই আমার শরীরটা একটু নরম পড়ে গেছে হে! বর্ম পরে গায়ে ব্যথা হচ্ছে।"

চলতে চলতে তাঁর নানা যুদ্ধের গল্প শোনাচ্ছিলেন সবজি খান। মুগ্ধ করার মত গল্প বলার ক্ষমতা তাঁর। শুনতে শুনতে একেক সময় মনে হচ্ছিল, যদি এঁকে বন্ধু হিসেবে পেতাম! যদি এঁর পতাকার নিচে দাঁড়িয়ে পাশাপাশি যুদ্ধ করার সৌভাগ্য হত! কিন্তু তখন আর তা হবার নয়। আমাদের ধর্মের নীতি অনুযায়ী তখন মানুষটা আমাদের উদ্দিষ্ট শিকার হয়ে গিয়েছে। তখন সে একজন বুনিজ মাত্র। মৃত্যু ছাড়া আর তাকে আর আমাদের কিছু দেবার নেই।

যাত্রার প্রথম ধাপটা কোন ঘটনা ছাড়াই কেটে গেল আমাদের। যে গ্রামটায় এসে থেমেছিলাম, তার বাসিন্দারা জানাল এর পরেই শুরু হয়ে যাচ্ছে ঘন জঙ্গল। রাস্তাও ভালো নয়। আর জঙ্গলের গোন্দ মানুষেরা যাকে পায় তাকেই লুটপাট করে সব কেড়ে নিয়ে যায়।

শুনে নবাব বলেন, "চেষ্টা করে দেখুক একবার! ইনশাল্লা, লড়াই কাকে বলে তার শিক্ষা হবে এবারে বেটাদের।"

পরদিন সকালে আমরা খুব সাবধানে জঙ্গলের পথ ধরে এগোতে লাগলাম। আজিমার গাড়ি ঘিরে চলল কয়েকজন বিশ্বস্ত যোদ্ধা, আর গোটা দলটার আগে আগে ঘোড়ায় চড়ে আমি আর সবজি খান চললাম।

ক্রমশ জঙ্গল এত ঘন হয়ে উঠলো যে গাছপালা, ঝোপঝাড় কেটে কেটে পথ করে এগোতে হচ্ছিল আমাদের। মাঝে মাঝে আবার রাস্তা চলেছিল গভীর নালার মধ্যে দিয়ে। তার ওপর থেকে মাথার ওপর যদি তীর পাথরের বৃষ্টি শুরু হয় তাহলে বাঁচবার কোন সম্ভাবনাই আর থাকবে না আমাদের।

খানিক বাদে জঙ্গল কমে এসে আমরা একটা ঝোপঝাড়ে ভরা সমতল এলাকায় এসে পড়লাম। পেছনের দিকটা দেখিয়ে বললাম, "জায়গাটা বেশ খারাপ ছিল নবাবসাহেব।"

"হ্যাঁ তা বটে। আমার যদ্দূর জানা আছে ও জায়গাটার খুব বদনাম রয়েছে এ তল্লাটে। তবে এর পর থেকে ঝোপজঙ্গল আর বিশেষ থাকবে না। বড়ো গাছের বন শুরু হয়ে যাবে। আর চিন্তা—আরে—ওটা কী!?—হায় আল্লা, এ যে দেখছি গোন্দদের দল!"

বলতে বলতেই হঠাৎ গলা ছেড়ে নবাবসাহেব চিৎকার করে উঠলেন, "সমশের- এ আলম-- "

কাড়ানাকাড়ার মত তাঁর গম্ভীর গলার শব্দ ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে। "সমশের বু দুস্ত-- " ধ্বনি দিতে দিতে তাঁর খাপ থেকে তিনি বের করে আনলেন চোখ ঝলসানো তলোয়ার। তারপর ঘোড়াটাকে পায়ের টোকায় সতর্ক করে নিয়ে বর্মের লোহার টুপিটা মুখের ওপর নামিয়ে নিয়ে নবাবসাহেব চিৎকার করে আমাদেরও তৈরি হতে বললেন।

আমিও ঢালতলোয়ার হাতে তুলে নিয়ে ঘোড়াটাকে পায়ের ধাক্কা দিয়ে দুই লাফে নবাবের ঘোড়ার পাশে নিয়ে এলাম। আমাদের পেছন পেছন বদ্রীনাথ আর আরো কয়েকজন ঘোড়ায় চেপে আর বাকিরা পায়ে হেঁটে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দল বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়েছে ততক্ষণে।

"আয় শয়তানের বাচ্চা কাফিরের দল। আয় দেখি কত জোর ধরিস কবজিতে,"

বলতে বলতে নবাব গোন্দদের দলটার দিকে তলোয়ার তুলে নাড়াচ্ছিলেন। গোন্দরা অবশ্য এগিয়ে আসবার নামও করল না। যেখানে আছে সেইখান থেকেই ধনুক উঁচিয়ে একরাশ তীর ছুঁড়ে মারল আমাদের দিকে। তার মধ্যে একটা তীর এসে সবজি খানের ঘোড়াটার কাঁধের কাছে লাগতেই বুনোগুলো একটা উল্লাসের ধ্বনি ছাড়ল।

সবজি খান ঘোড়াটার ঘাড়ে হাত বোলাতে বোলাতে বলেন, "আহা রে, আমার মোটির কি ব্যথাই না লেগেছে! মীরসাহেব, এরা তো মনে হচ্ছে কিছুতেই সামনে এগোবে না। কয়েকটা গুলি ছুঁড়ে দেখেন যদি তাড়ানো যায়!"

আমি পেছন ফিরে বললাম, "তীর ছোঁড়বার জন্য যে লোকটা মাথা তুলবে সেটাকেই নিশানা করো সবাই।"

শুরু হল তীরন্দাজ শিকার। এক ব্যাটা গোন্দ একটা পাথরের ওপর বসে বিরাট লম্বা একটা ধনুক থেকে তীর ছুঁড়ছিলো। সরফরাজ খানের বুলেট গিয়ে বিঁধলো তার গলায়। তাতে ও তরফ থেকে যা চিৎকার উঠলো তাতে মনে হল এবার বুঝি সবক'টা মিলে তেড়েই আসবে। কিন্তু তারপর তাদের আরেক তীরন্দাজ গুলি খেয়ে মাটি নিতেই সবকটা উল্টোমুখে ছুটে পাহাড়ের ভেতর পালিয়ে গেল। তাড়া করে যাবার কোন চেষ্টা করলাম না আমরা। ওতে লাভ কিছু হত না।

সন্ধেবেলা চলার শেষে রাতের জন্য ঘাঁটি গাড়তে বাবা এসে বলল, "আমীর আলি, একটা কথা বল। নবাবকে নিয়ে কী করতে চাও? যদি তাঁকে আমাদের অতিথি হিসেবে নিমন্ত্রণ করে থাকো তাহলে সেকথা পরিষ্কার করে বল। নাহলে এইবারে ব্যবস্থা তো কিছু একটা করে ফেলতে হয়।"

"না না অতিথি টতিথি কিছু নয়," আমি তাড়াতাড়ি বললাম, "এই জঙ্গলের পথে একটা ভালো জায়গাটায়গা দেখে নিয়ে নিকেশ করে ফেললেই হবে।"

"অসম্ভব," বাবা মাথা নাড়ছিলো, "লোকটা সবসময় ঘোড়ার পিঠে বসে থাকে। ঘোড়াটাও চালাক। বিপদের গন্ধ পেলেই ছুট দেবে। ওকে ধরে আটকাবার ক্ষমতা কারো হবে না। অন্য কোন রাস্তা ভাবো।"

"দাঁড়াও, দেখছি কী করা যায়," বলে বাবাকে আমি শান্ত করলাম।

ক্রমশ

দাদু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে বসে গল্প শুনতেন মোহনলাল- শোভনলাল ছোট্ট দুই ভাই। শুনতে শুনতে তাঁরা নিজেরাও লিখতে শুরু করলেন, আর তাঁদের লেখা সেই গল্পগুলি প্রকাশিত হয়ে চলল তখনকার একমাত্র ছোটদের পত্রিকা ‘সন্দেশ’- এ। তখন দুই ভাইয়ের বয়স সবে নয়- দশ। শোভনলালের নিজের কথায় – ‘সন্ধ্যা হলে রোজ দাদামশায় দিদিমার ঘরে একটা ইজিচেয়ারে গল্পের বই খুলে বসতেন, আমরা নীচে আসনপিঁড়ি হয়ে ঢালা বিছানায় বসতুম। কতরকম গল্পই যে দাদামশায় মুখে মুখে অনুবাদ করে বলতেন! কত দেশ- বিদেশের ভ্রমণকাহিনী, রূপকথা, কত দেশের কত উপকথা। দাদামশায়ের মুখে শোনা আসাম দেশের একটা উপকথা শুনেই আমি প্রথম গল্প লিখি ‘কাক ও ব্যাঙ’। আগের মাসের ‘সন্দেশ’- এ দাদার একটি গল্প বার হয়েছিল। এবার আমার নামে একটি গল্প বার হল।’ শোভনলালের সেই প্রথম গল্পটির ছবি এঁকেছিলেন সুকুমার রায় স্বয়ং। ক্রমে ‘মৌচাক’ পত্রিকাতেও বার হতে থাকল দুই ভাইয়ের গল্প। ‘পার্বণী’ ও ‘রংমশাল’ নামে দুটি বার্ষিকীতেও বেরোল। তারপর দুই ভাইয়ের এসব গল্পের গুচ্ছ বেঁধে দুটি বই প্রকাশিত হল – ‘সোনার ঝরনা’ (১৩২৭) ও ‘পুঁতির মালা’ (১৩২৮)।

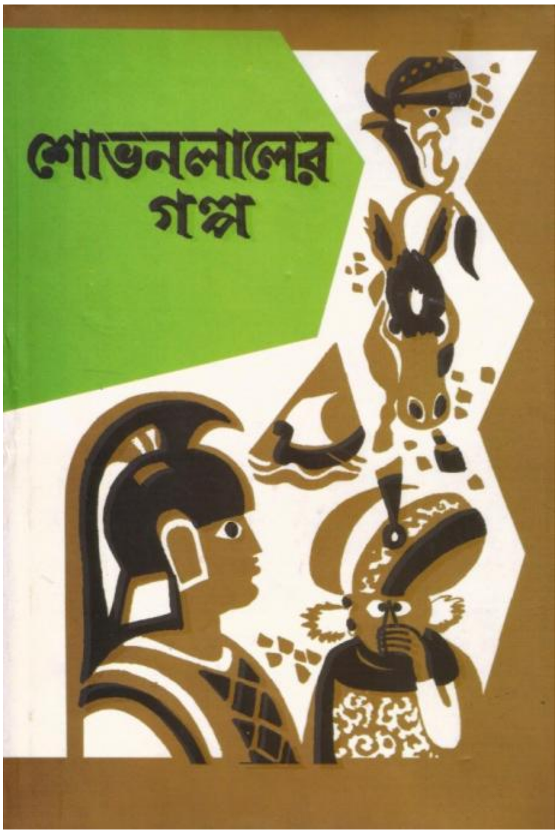

বই: শোভনলালের গল্প
লেখক: শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: শৈল চক্রবর্তী
প্রকাশক: লালমাটি প্রকাশন
৫/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩
পৃষ্ঠাসংখ্যা: ১৩৫; দাম: ১০০ টাকা

সেই দুই বই থেকে ছোট ভাই শোভনলালের ১৭টি গল্প ও ১টি নাটিকা বেছে নিয়ে সংকলিত হয়েছে ‘শোভনলালের গল্প’। উপরি পাওনা শোভনলালের আত্মস্মৃতির একাংশ আর শ্রী পুলিনবিহারী সেনের ভূমিকা; শিল্পী শৈল চক্রবর্তীর আঁকা দারুণ সব ছবির সাথে সুন্দর ত্রুটিহীন ছাপা; সুন্দর প্রচ্ছদ ও বাঁধাই।

এবারে গল্পের কথায় আসি। প্রথমেই ‘নিদুলি- মন্ত্র’ গল্পের একটি সংলাপ তুলে দিচ্ছি – ‘বাপু হে, এই তিন যুগ ধরে ক্রমাগতই শুনে আসছি - চাঁদের আলো, দখনে বাতাস, ফুলের গন্ধ আর কোকিল পক্ষীর ডাক – শুনে শুনে আমাদেরই কান ঝালাপালা হয়ে গেল। এতে কি আর ছেলে ভোলে রে বাপু!’ ছেলে যে কীসে ভোলে তা শোভনলাল বিলক্ষণ জানতেন! তাঁর গল্পে ছেলে তো ভোলেই, আমার মতো ধেড়ে খোকারাও দিব্যি ভোলে। দুর্দান্ত সব গল্প এই বইয়ে। প্রথম অংশের গল্পগুলিতে রয়েছে বিচিত্র সব চরিত্র আর বিদঘুটে সব ঘটনার ঘনঘটা। সরস অনায়াস লেখনীতে গল্প তরতরিয়ে এগিয়ে চলে। আছে এক তর্কচূড়ামণির নাকাল হওয়ার গল্প, বাদশা হারুন- অল- রশিদের বাদশাহি খেয়ালের গল্প, বীরবলের বুদ্ধিবলের গল্প। আমার নিজের সবথেকে ভালো লেগেছে ‘নিদুলি- মন্ত্র’, ‘বোগদাদি চটি’ আর ‘আলেকজান্ডারের চীন অভিযান’। ‘সংযোজন’ অংশের ছ’টি গল্প তো আরও মজার। এগুলিতে যত রাজ্যের কাক, ব্যাঙ, ইঁদুর, বাঁদর, গাধা, শেয়াল, ভাল্লুকের কাণ্ডকারখানা।

উপেন্দ্র- অবনীন্দ্র- সুকুমার ঘরানার এসব গল্প ৯৫ বছর পর আজও সমান সুস্বাদু, সমান মুচমুচে; একেবারে টাটকা যেন। এ জিনিস যে চিরকালের! শোভনলালের নিজের ভাষাতেই বলতে হয়, তাঁর বাঁশিতে বাজে ‘ভারি নূতন অথচ ভারি পুরোনো’ সেই চিরন্তন সুর। এ বই একবার হাতে নিলে আর শেষ না করে রেহাই নেই।

তাপস মৌলিক

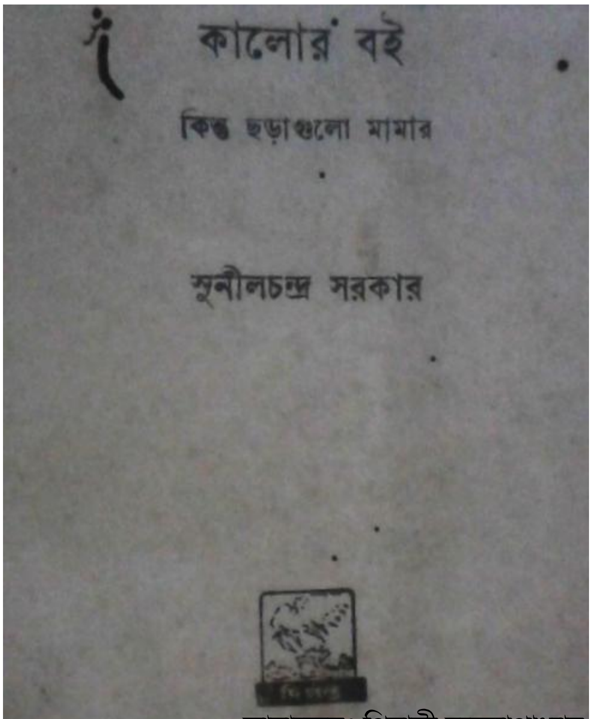

জানাচ্ছেনঃ পিয়ালী বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরোনো বইপত্র গোছাতে বসে হাতে এসে গেল আশ্চর্য একখানা বই যাক ছুঁলেই ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ছে। আসল মলাট তো হারিয়েছে। তবু কী ভাগ্যি ৯৬ পাতার সবক'টিই অক্ষত।

প্রথমেই নজর কাড়ল বইয়ের নাম। 'কালোর বই' কথাটা মোটা হরফে লেখা, তার তলায় ছোটো করে একটা মজার কথা/লাইন- "কিন্তু ছড়াগুলো মামার।"

সঙ্গেসঙ্গেই মনের মধ্যে কৌতুহল দপ করে জ্বলে উঠল। কালোই বা কে আর মামাই বা কে? বইখানির লেখক শ্রী সুনীলচন্দ্র সরকার। প্রকাশকাল ১৩৫৭)মাঘ)। প্রকাশক অজিত দত্ত। দিগন্ত পাবলিশার্স, ২০২ রাসবিহারী অ্যাভেন্যু, কলি ২০। দাম দেড় টাকা।

পরের ভূমিকার পাতাটিতে গিয়েই তাজ্জব। ভূমিকা লিখেছেন শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর লেখাটি তুলে ধরলে বইটির আকর্ষণের কারণ সংক্ষেপে বোঝা যাবে-

"সুনীলচন্দ্র সরকার ছেলেদের জন্য এই কালোর বইখানির লেখক। নানান পশুপক্ষী, দুটি ছেলে এবং তাদের পিসি,বাবা এবং মামাকে নিয়ে এই মনোরম গল্পটি সুনীলবাবুর হাতে বেশ ফুটেছে। এ ধরণের বই ছেলেমেয়েদের জন্য বেশি নেই----

------মানুষের সঙ্গে পশুপাখিরা একঠাঁই বাস করছে, অচেনাভাবে ওদের কথা গল্প ছড়ার মধ্য দিয়ে এল পাঠকের কাছে, বইখানির এটুকুই মূল্য। "

শুরুতে রয়েছে এক ছেলেমানুষী প্রণাম, ছড়ার মাধ্যমে মা- কে। বড়ো হয়ে যাবার পর মানুষকে বাধ্য হয়ে নানারকম মুখোশ পরতে হয়। তবু মাকে বলা যায়-

আমি যাদের মধ্যে ঘুরিফিরি
থাকি তাদের সমান
তবু ছেলেমানুষ আছি যে মা
একলা তুমিই প্রমাণ

এমন চমৎকার ছন্দমিলের ছড়া অনেককাল পড়িনি। তবে মনে রাখতে হবে ছড়াগুলো মামার। সে এক আজব মামা যার "বয়স সাতাশ আটাশের বেশি নয়, মুখে মুখে ছড়া বানানোর ক্ষমতা আছে" "—কী সব ভারী ভারী বই পড়ে, কী বলে, কখন কী মেজাজে থাকে কিচ্ছু বোঝার উপায় নেই।"

তিনি মা হারা দুই ভাই কালো আর ধলোকে শেখালেন,

গুণী ছুটি পায় কদাচিৎ
ধনী বিছানায় সদা চিৎ

অথবা

ভগবান যদি দেন খাদ্য
কোনোদিন হব না অবাধ্য।

লেখক এখানে কালোধলোর শুভানুধ্যায়ী পাড়াতুতো কাকা। ঠাকুমার কাছে রূপকথা শুনে শুনে ছেলেগুলো অবাস্তব জগতে বিচরণ করছে দেখে তিনি ওদের জগদানন্দ রায়ের প্রাণীর বই কিনে দিয়ে প্রাণী পর্যবেক্ষক বানাতে চান। পিতা উমেশচন্দ্র কাইজারি গোঁফ ঝুলিয়ে কাজের ধান্দায় ঘুরে বেড়ান মুলুক থেকে মুলুকে। ইতিমধ্যে এসে জুড়ে বসেন মামা আর ছেলেদের বখিয়ে দেন হ য ব র ল- র মতো বই দিয়ে। যার ফলে "পশুপাখি মাছের নাম ওলটপালট করে এমন সব অদ্ভুত নাম ওদের শেখানো হল যে কোনকালেই ওরা সেই গন্ডগোল শুধরে উঠতে পারবে তা মনে হয় না। পাতিপাঁটা, বলগা কুকুর, গলদা ফড়িং, ডেঁয়ো মশা।"

এহেন কালোর পিছুপিছু একদিন রাস্তার এক নেড়ি চলে এল বাড়িতে। কালোর ভাষায়—চাকরি নিল কায়দা করে। গল্প জমে উঠল যখন বাঘা (চাকরি পাওয়া নেড়ি) গিয়ে পড়ল সেই কাহারপাড় বনে বুনোদের পাল্লায়। জ্যোৎস্নারাতে কালো চলল মামার সঙ্গে বাঘা ফিরিয়ে আনতে। আর তারপর এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। করালীর মুদির দোকানে আগুন লাগানো, পোড়া ছাগলের মাংসের বখরা নিয়ে শেয়ালদের ঝগড়া—শেয়ালরা বলছে তারাই দোকানে ঢুকে তুলোর বস্তার ওপরে লম্ফ উল্টিয়ে ফেলে আগুন লাগিয়েছে—মাংস তাদের পাওনা।

এই ঝগড়ায় আবার ঢুকে পড়ে বাঘা। তর্ক শুরু হয়, পোষা কুকুর, বেড়াল, গরু আর বুনো, স্বাধীন জন্তুদের মধ্যে। এই পর্বের নামকরণও মজার—মানুষঘেঁষাদের মনের কথা।

বুনোরা পোষাদের তাচ্ছিল্য করে নাম দিয়েছে "মানুষঘেঁষা"।

"খেঁকি বিশ্রি দাঁত বের করে বললে, ওরা আবার কুকুর! মানুষের পোষা ভেড়া সব। ভুল জায়গায় শোঁকে, ভুল চালে দৌড়োয়। না বোঝে পাখপাখালির চিহ্ন, না জানে আওয়াজের মানে। কাকশালিখের আওয়াজে আমি বুঝি কোথায় খাবার পড়েছে। ইঁদুরের আওয়াজে বুঝি মানুষ ঘুমিয়েছে, তখন লাফিয়ে ঢুকি রান্নাঘরে।"

"পোষাকুকুর রেগে উঠে বললে, 'ভারী কম্মই করো। চুরির অন্নে শরীরের যা দশা হয়েছে তা দেখতেই পাচ্ছি। '

"পোষা বললে, মানুষের জিনিস আমরা পাবো এই নিয়ম। আমরা মানুষের আপনার লোক।' শেয়াল জবাব দিলে, 'ওরে মানুষঘেঁষার দল, ওরে অপশু, লজ্জা করে না বলতে? আপনার লোক তোরা, না ভিখিরি।'

ঝগড়া বাড়ে। পোষারা মানুষের পক্ষে সওয়াল করে—বিড়ালের উৎপাতের উপমা দেয়, কথায় কথা বাড়ে। শেয়াল গম্ভীর হয়ে গরুর উপমা দেয়, "গরু তো নিরীহ পশু? মানুষের উপকারই করে- "তবু তো মানুষ তাকে মারছে। পরশু এই জঙ্গলে গরু কাটা হয়েছে।"

সব পশুপাখিদের জোটের মাঝে শেয়াল গলা উঁচিয়ে বলে, "এই বনে এক মাসের মধ্যে আড়াইশো পাখি, সতেরোটা খরগোশ আর একটা শিয়াল মারা পড়েছে শিকারীর বন্দুকে।" সকলের ক্ষোভ ঘনীভূত হয়। কুকুরগুলো উত্তর দিতে পারে না। সুযোগ বুঝে শেয়াল সর্দার হাঁক দিলে, "চলে আয় সব বনে, চলে আয়। ছেড়ে আয় মানুষকে। পশু তোরা, পশুর মতন বাঁচ।"

কাহিনী এগোয় উপসংহারের দিকে। কিন্তু মনকে ভাবিয়ে তোলে আমরা যারা পশুদের ভালোবাসি, তাদের পুষি, তারা সত্যিই কি পশুদের ভালো করছি? স্বাধীনভাবে তারা যেমন বাঁচত, আমরা কি তেমন আরাম দিতে পারি তাদের? মানুষের চোখে না তাকিয়ে একবার যদি পশুদের চোখে তাকাই?

বইটা আবার ছাপা হলে খুব ভালো হয় তাই না?

পুনশ্চঃ

পরিশেষে আমার কৃতজ্ঞতা আমার বন্ধু তিতির রায়কে যিনি তাঁর বাবা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে বইটি খুঁজে এনে দিয়েছেন।

সম্পাদকীয় সংযোজনঃ

কালোর বইয়ের কিছু ছড়া

সোন সোন ছোকরা সোন
চাস কি তুই সাসতি কোন?
সনিবার তায় বৈশাখে
(তুই) মেরেছিস আমার সেজদাকে!
সারা সিতকাল উপুসি ভাই
সালিক বাসায় সেঁধুলো তাই
মানুসের কিছু করেনি দোস,
হিংসুলি তবু, এত সাহস!
কাঁদিস কি হাত জোড় করিস
সেখাই আজকে সাপের বিস- -

****

চিকি চিকি চাকা চিড়িক
বেধেছে বেধেছে হিড়িক
খবর ছড়াই, চড়াই! চড়াই!

চ চ চ চঃ
চ চ চ চঃ
সভা! সভা!
চিররপ
চিয়ার আপ!

****

কিরিকিচিকিচি চিকারা চিকারা চুয়াঃ
একজন প্রশ্ন করে
“বলো কি হয়েছে? কি কেড়ে নিয়েছে?
ঠুকরেছে নাকি? কি গাল দিয়েছে?”
তার উত্তর -
“বলেছে ফাজিল, বলেছে মুখ্যু,
তাতেও তেমন করি না দুখ্যু,
কিন্তু ভাইরে কথাটা শুনছ
চড়াই জাতকে বলেছে উঞ্ছ!”

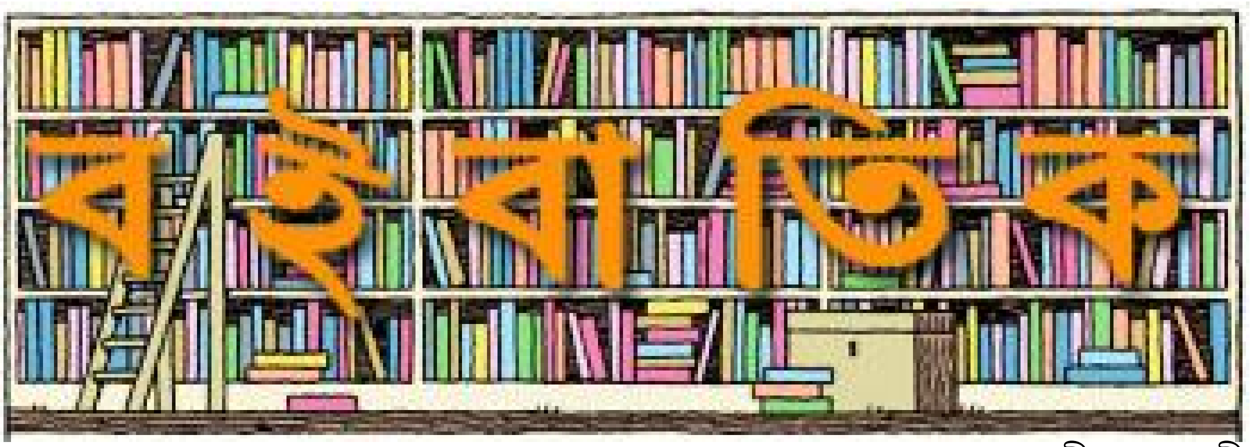

দীপক গোস্বামী

ছেলেটি হয়ত আমাদের অনেকেরই চেনা। মাস্টারমশায় ক্লাশে এসে জিজ্ঞাসা করেছেন, ‘তোমাদের প্রিয় লেখক কে?’

সবাই নানা নাম বলছে।

একটি দুষ্টু ছেলে, যে বইএর ধারে কাছেও যেতে চায় না, বলল, ‘বিধানচন্দ্র রায়।’ মাস্টারমশায় অবাক, ‘কিন্তু তিনি তো কোনো বই লেখেন নি।’

ছেলেটি এক গাল হেসে বলল , ‘সেই জন্যেই তো সবচেয়ে প্রিয়, স্যার।’

এ রকম বই-পালানো ছেলে সব ক্লাশেই দু-চারটে থাকে। তার কাছে ‘ডিক্‌শনারি’ শব্দের মানে জানতে চাইলে সেই উল্টে জিজ্ঞাসা করে , ‘কোন বইতে পাওয়া যাবে ভাই ?’ অবশ্য আমরা ধরে নিচ্ছি আমাদের ছোট্ট বন্ধুরা কম বেশি এর উল্টো। তাদের বই পড়তে খু-উ-ব ভালো লাগে। অনেকের তো গল্পের বই পড়তে বসলে নাওয়া-খাওয়ারও হিসেব থাকে না।

তাই বই দিয়েই শুরু করা যাক। গ্রীক ভাষায় ‘বিবলিওন’ মানে বই। ইংরেজিতে দুটি শব্দ আছে– ‘বিবলিওম্যানিয়া’ এবং ‘বিবলিওফিলি’। বিবলিও কথাটি এসেছে গ্রিক ‘বিবলিওন’ থেকে, আর ‘ম্যানিয়া’ মানে যে ‘বাতিক’, তা তো আমরা সবাই জানি। তোমাদের বন্ধুদের মধ্যেও রোগ-রোগ বাই আছে, এমন দু-একজনকে খুঁজে পাওয়া নিশ্চয়ই শক্ত হবে না। সেই হিসাবে ‘বিবলিওম্যানিয়া’ হচ্ছে বইপত্র সংগ্রহের নেশা। আর ‘বিবলিওফিলি’ হচ্ছে পুস্তকপ্রীতি বা আর একটু শুদ্ধ করে বললে– গ্রন্থানুরাগ। প্রথম বৈশিষ্টটি যাদের আছে, তারা যতটা বইপত্র সংগ্রহের জন্য পাগল ততটা পুস্তকপ্রেমিক নয়। কিন্তু আমরা এখানে যাদের জন্য লিখতে বসেছি, তারা সত্যিই বইকে ভালবাসে– তাই বই পত্রপত্রিকা সংগ্রহ করে, সংগ্রহটাকে গুছিয়ে রাখে, নিজে ব্যবহার করে বা অন্যদের ব্যবহার করতে দেয়। অর্থাৎ যে কারণে লেখক বইটি লিখেছেন এবং প্রকাশক প্রকাশ করেছেন, তা সার্থক করতে সাহায্য করে।

আমরা লাইব্রেরি না বলে ইচ্ছা করেই সংগ্রহ কথাটি ব্যবহার করছি। কারণ লাইব্রেরি বললেই যে একটা ছোট বা বড় বাড়ি, ছাদ পর্যন্ত উঁচু তাক-ভর্তি বই, মাঝখানে একজন গম্ভীর-গম্ভীর লাইব্ররিয়ান বসার ছবিটা ভেসে ওঠে– আমরা এখনই সে জায়গায় যেতে চাইছি না। আমদের সকলের বাড়িতেই তো কম বেশি কিছু বই থাকে– সেটাই সংগ্রহ। কিন্তু বইপত্র বাড়িতে সংগ্রহ হয় কী করে ? নিশ্চয়ই কিছু বই কিনে, কিছু উপহার পেয়ে আর (বলতে অস্বস্তি হলেও) বেশ কিছু বই অন্যের কাছ থেকে পড়তে এনে ফেরত দিতে ভুলে গিয়ে। সব সময়ই কি ভুলে

গিয়ে? কোনো কোনো সময় ইচ্ছা করে ফেরত না দিয়েও। বিখ্যাত আমেরিকান লেখক মার্ক টোয়েনের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। এটা ছদ্মনাম। আসল নামে স্যামুএল লংহর্ন ক্লেমেন্স। কেউ কেউ হয়ত মার্ক টোয়েনের লেখা 'অ্যাড্‌ভেনচারস অফ টম সইয়ার' বা 'অ্যাড্‌ভেনচারস অফ হাক্‌লবেরি ফিন' পড়েও ফেলেছ। তাঁর বাড়িতেও প্রচুর বই পড়ে থাকত এলোমেলো ছড়ানো ছিটোনো। এক বন্ধু জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'বইগুলো এভাবে ছড়িয়ে না রেখে আলমারিতে গুছিয়ে রাখ না কেন ?'

মার্ক টোয়েনের চটজলদি উত্তর, 'আরে ভাই, বইগুলো যেভাবে এসেছে আলমারি তো সেভাবে আসবে না। আলমারি তো কারো কাছ থেকে চেয়ে এনে ফেরত না দিয়ে থাকা যায় না।' এই ফেরত না দেবার অভ্যাস কিন্তু কম-বেশি আমাদের অনেকেরই আছে। অন্য ব্যাপারে প্রচণ্ড সৎ লোকও বই ফেরত দেবার বেলায় অবলীলায় ভুলে যান! নিজের এই অভ্যাসের কথা মার্ক টোয়েনও জানতেন। তাই অন্য আর এক বন্ধু তাঁর সংগ্রহের একটি বই পড়তে চাইলে তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, 'মাপ করো ভাই, বই দিতে পারব না। আমার সব বন্ধুরাই ম্যাথামেটিকসে খারাপ, কিন্তু বুক-কিপিং-এ ওস্তাদ।'

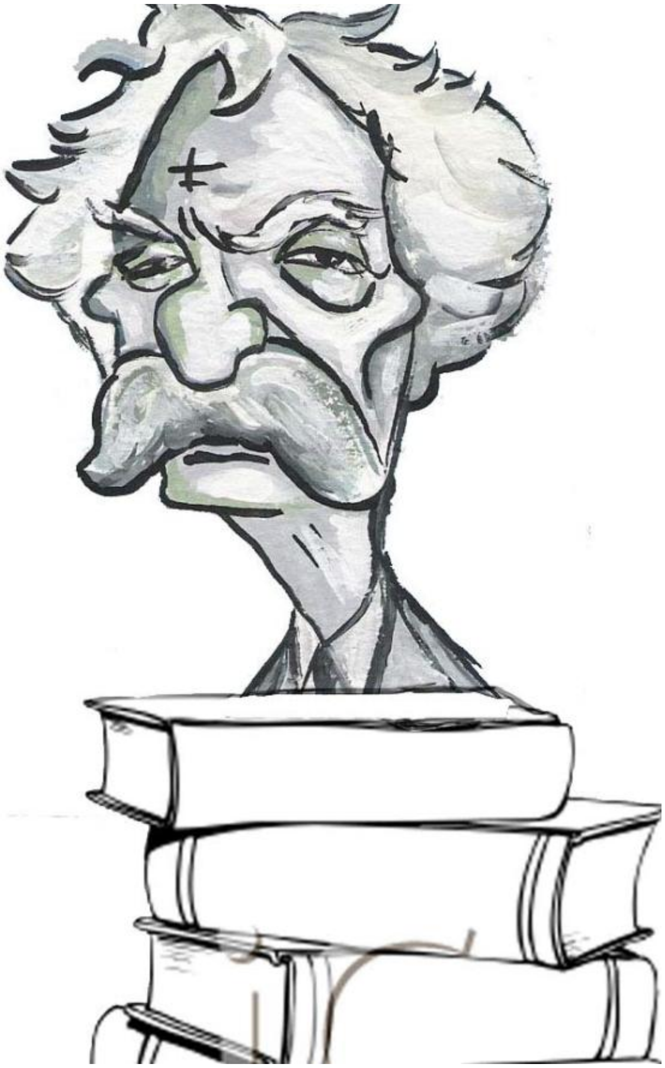

কিন্তু তা সত্ত্বেও বাড়িতে বই, পত্র-পত্রিকা আসে, সে সব জমে। দু-চার খানা লোকের হাতে হাতে বেহাত হয়, কিছু দুপুর বেলা পুরনো কাগজওয়ালার সম্পত্তি হয়ে যায়। যা পড়ে থাকে, তাও কম নয়–আলমারি শেলফ ভরে যায়, টেবিল উজাড় হয়ে ওঠে। আমার এক মাস্টারমশায়কে দেখেছিলাম, সব জায়গা ভর্তি হয়ে যাবার পর তিনি ফ্রিজের মাথায় বই রাখতে শুরু করলেন। একদিন ভুল করে ফ্রিজের ভেতরেই বই রাখায় স্ত্রী তো বিদ্রোহ করে বসলেন। অগত্যা তাঁকে বাথরুমে কমোডের সিস্টার্নের ওপর বই রাখার নতুন ব্যবস্থা শুরু করতে হলো। তবে এটাও সত্যি, আমাদের বইবাতিকের জন্য বাড়িতে যত বই আসে, তত বই পড়ে ওঠা যায় না। কিছু পরে পড়ব বলে রেখে দিই। কয়েকটা হয়ত পরে পড়ি, কিছু বা পড়ে ওঠাই হয় না। সব বাড়িতেই এই না-পড়া বই বেশ কিছু থেকে যায়।

তাতে ক্ষতি নেই। তবে আমার পড়া না হলেও অন্য কারো পড়তে তো বাধা নেই। সব বই পত্র-পত্রিকাই কম-বেশি জ্ঞানের বাহন–সে বাহন গোরুর গাড়ি হতে পারে, জেট প্লেনও হতে পারে। শহরে আমার গোরুর গাড়ির প্রয়োজন না থাকতে পারে, কিন্তু গ্রামের লোকের থাকবে। যে বই আমার কাজে লাগছে না, সেটা যার লাগবে তাকে পড়তে দিলে তো বইএর সদ্ব্যবহারই হবে। কিন্তু ব্যবহারেরও তো একটা পদ্ধতি আছে। অন্য লোকে কি করে জানবে আমার কাছে কি বই আছে! অন্য লোক তো দূরের কথা, শ'পাঁচেক বই জমা হলে আমার নিজের পক্ষেই কি মনে রাখা সম্ভব কোন বইটা কোথায় রেখেছি! পড়ার পর যেখানে জায়গা খালি ছিল রেখে দিয়েছি। দরকারের সময় দ্রুত সেটা খুঁজে পাওয়া যাবে তো ?

আমার এক কাকিমার ঘর গোছানোর বাতিক ছিল। আর মেয়েরাই তো ঘর গোছানোয় বেশি পারদর্শী। বাইরের ঘরের কাঁচের আলমারিতে তিনি সেই সব বই-ই সাজিয়ে রাখতেন যেগুলো নতুন এবং ঝকঝকে। সেখানে পরপর সাজানো থাকত রবীন্দ্রনাথের 'গীতবিতান'-এর পাশে 'সরল চাইনিজ রন্ধন-পদ্ধতি', 'রামকৃষ্ণ কথামৃত'-এর পাশে 'খালি হাতে শরীর-চর্চা' কিংবা শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত'-এর পাশে 'বেড়াল পোষার অ-আ-ক-খ'। নতুন বইগুলো চোখের তৃপ্তি দিলেও এভাবে সজানোতে মন সায় দেয় কি ? অর্থাৎ যেমন তেমন করে নয়, বই সাজানোরও একটা পদ্ধতি আছে। যিনি বই সাজাচ্ছেন শুধু তিনি নন, যাঁরা সেগুলো ব্যবহার করবেন তাঁদের সকলের জানা দরকার কোন বইটা কোথায় আছে–অন্যভাবে বললে কোথায় থাকা উচিত।

বইকে নানা ভাবে ভাগ করলেও, গোদা ভাষায় বই দু'রকম। এক রকম– সেই সব বই যা আমরা প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা পর্যন্ত পড়ি। বিভূতিভূষণের 'চাঁদের পাহাড়' যেদিন বন্ধুর কাছ থেকে এনেছিলে, সব কটা পাতা কত তাড়াতাড়ি শেষ করেছিলে, মনে আছে ? কিন্তু এমন অনেক বই আছে, যা আমরা পাতার পর পাতা পড়ি না। 'বিজিগীষা' শব্দের মানে কিংবা mississippi নদী সম্পর্কে জানার জন্য যখন অভিধান বা Encyclopaedia খুলি তখন কি সেই খন্ডের সব ক'টা পাতা দেখি? নিশ্চয়ই না, শুধু সেই পাতাটা খুলি যেখানে এই শব্দগুলো আছে। আশেপাশের কোনো পাতা পড়বার দরকারই হয় না। কোলকাতা থেকে দিল্লী বেড়াতে যাবার জন্য হাওড়া-দিল্লী রুটের ট্রেনগুলোই দেখতে চাই, চেন্নাই লাইনের ট্রেন দেখার প্রয়োজন পড়ে না। অর্থাৎ কিছু বই আছে যেগুলো আমরা আমদের মানসিক তৃপ্তির জন্য পড়ি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। আর কিছু বই আমরা পাতার পর পাতা নয়, নির্দিষ্ট কিছু তথ্য জানার জন্য ব্যবহার করি। গোছাবার সময় এদের আলাদা করে দু'জায়গায় রাখলে পরে আমাদেরই সুবিধা হবে।

শুধু গোছানোই নয়, দু' রকমের বইএর ব্যবহারের ধরণও আলাদা। অবনীন্দ্রনাথের 'বুড়োআংলা' একটা অসাধারণ বই। বুড়ো আঙুলের মাপে হয়ে যাওয়া দুষ্টু ছেলে হৃদয় হয়ত তোমারও খুব প্রিয়। তবু বইটা মাসখানেকের জন্য কোন বন্ধু পড়তে নিয়ে গেলে খুব অসুবিধা হবার কথা নয়। কিন্তু Samsad English- Bengali Dictionary-টা দু'দিনের জন্য পাশের বাড়ি গেলেও তোমায় ছটফট করতে হয়। ইংরেজি শব্দের অর্থ জানার জন্য তো ওটা সব সময় তোমার কাজে লাগে। অর্থাৎ প্রথম ধরণের বই দূরে যেতে পারে, কিন্তু দ্বিতীয় ধরণের বই সংগ্রহের সঙ্গেই থাকা দরকার। আবার মার্ক টোয়েনের গল্পেই যাওয়া যাক। একদিন তিনি এক প্রতিবেশীর কাছে একটি বই চেয়েছেন। মার্ক টোয়েন তখন বিখ্যাত লেখক। তবু প্রতিবেশী বললেন, 'দুঃখিত, আমার বাড়ির বই পড়তে হলে আমার বাড়িতে বসেই পড়তে হবে।' হতে পারে, তিনি দ্বিতীয় ধরণের বইই চেয়েছিলেন। আবার না-ও পারে, কারণ মার্ক টোয়েনের বই

ফেরত না দেবার অভ্যাসটা কারো অজানা ছিলনা। কিন্তু এর থেকে একটা কথা বোঝা যাচ্ছে যে সব বই ধার দেওয়া যায় না।

শুধু সেটাই নয়, এতক্ষণের বকবকানি থেকে তোমরা বোধহয় এটাও বুঝে ফেলেছ যে বইএর জগতের কিছু নিয়ম কানুনের কথা জানতে চাইছি আমরা, যাতে বইপত্র ব্যবহার করাটা আমাদের কাছে আরো সুবিধাজনক হয়ে ওঠে। মা যখন দুপুরে জামাকাপড়ের আলমারিটা গুছোন, তখন লক্ষ করেছ নিশ্চয়ই যে শাড়িগুলো একটা তাকে রাখেন, শার্টগুলো অন্য তাকে, প্যান্টগুলো হ্যাঙ্গারে। কেন? এভাবে রাখলে ব্যবহারের সময় এগুলো তাড়াতড়ি খুঁজে পাওয়া যায়। বাথরুমে টুথব্রাশগুলো নানা রঙের, যাতে অন্য কারো সঙ্গে বদল না হয়ে যায়। এ সবই ব্যবহারের নিয়ম। নিয়মগুলো যেমন আমাদের জীবনে, তেমনি বইএর রাজ্যেও। গ্রন্থাগারবিজ্ঞানও একটা নিয়মবদ্ধতার বিজ্ঞান। এরপর থেকে সেগুলোকেই দেখতে চেষ্টা করব আমরা।

তার আগে একটা কথা জানিয়ে রাখা দরকার। ইন্টারনেটের যুগে ছাপানো বইএর পা্শাপাশি ই-বুক এবং ই-জার্নালের সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। খুব তাড়াতাড়িই হয়ত ছাপানো বইএর সংখ্যাকে ছাড়িয়েও যাবে। ই-বুক বই পড়ার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও সুবিধাজনক মাধ্যম। সামান্য কমপিউটার ব্যবহারের জ্ঞান থাকলেই এগুলো পড়া যায়, প্রয়োজনমতো আন্ডারলাইন করা যায়, মার্জিনে নোটও করা যায়। দামের দিক থেকেও ই-বুক অপেক্ষাকৃত সস্তা, অনেক বই পড়তে তো কোনো খরচই লাগে না। তবু এখানে আমাদের আলোচনা মূলতঃ ছাপানো বই নিয়েই। ই-বুককে আমরা ছাপানো বইএর প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, পরিপূরক বলেই মনে করি। তাই সভ্যতার যথেষ্ট অগ্রগতি হলেও ছাপানো বই কোনোদিনই বিলুপ্ত হবে না। কিন্তু তখন হয়ত সেগুলোর ব্যবহারের পদ্ধতি নিয়ে কারো কথা বলার সময় থাকবে না। সেই কাজটাই সেরে রাখছি আমরা।

তবে আগামী সংখ্যায় সেই কাজ শুরু করার আগে প্রতিবেশীর কাছে মার্ক টোয়েনের বই ধার চাওয়া গল্পের শেষটুকু জেনে নেওয়া ভাল। বাড়িতে বই নিয়ে যেতে না দেওয়ায় মার্ক টোয়েন যথেষ্ট অপমানিত হলেও বাইরে রাগ না দেখিয়ে প্রতিবেশীর বাড়িতে বসেই বইটির প্রয়োজনীয় অংশ পড়ে ফিরে এসেছিলেন। এর কিছুদিন পরেই সেই প্রতিবেশীই মার্ক টোয়েনের কাছে এসেছেন ওঁদের ঘাস কাটার কলটা একটু ধার চাইতে। মার্ক টোয়েন অম্লান বদনে বললেন, 'দুঃখিত, আমার বাড়ির ঘাস-কাটা কল ব্যবহার করতে হলে আমার বাড়ির ঘাসই কাটতে হবে।' দেখো, ব্যবহারের পদ্ধতিতে ভুল করে ফেলে তোমাদেরও যেন অন্যের বাড়ির ঘাস না কাটতে হয়।

এরপর পরের সংখ্যায়
গ্রাফিক্‌স্‌ ইন্দ্রশেখর

তুর্কমেনিস্তান

উমা ভট্টাচার্য

আমরা সবাই তুর্কি ঘোড়ার নাম শুনেছি, তুর্কিনাচন কথাটার সঙ্গেও আমরা পরিচিত। এবার সেগুলির নাম যে দেশগুলির নাম থেকে পাওয়া সেগুলির মধ্যে একটি দেশ তুর্কমেনিস্তানের কথা আমরা জানবো।

তুর্কি ঘোড়া হচ্ছে মধ্য এশিয়ার পশুচারণকারী নানা উপজাতিদের ব্যবহৃত তেজি ঘোড়া। তুর্কোমেন উপজাতির লোকেরা মূলত ছিল মধ্য এশিয়ার স্তেপ তৃণভূমি অঞ্চলের তুর্কি ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ। এদের মধ্যে যারা বিস্তীর্ণ তৃণভূমি অঞ্চলের পশ্চিম অঞ্চলে বাস করত তাদের বলা হত অঘুজ উপজাতি। এরা ছিল মোঙ্গলদের একটি শাখা। এদের বলা হত অঘুজ টার্ক বা অঘুজ তুর্কি- ধারাবিবরণী রক্ষকদের লেখায় এদেরই আবার অন্য নাম ছিল তুর্কমেন। এরা এশিয়ার বৃহত্তম লবণাক্ত জলের হ্রদ ক্যাস্পিয়ান সাগরের পূর্বতীরে গড়ে তুলেছিল এদের বাসস্থান –তুর্কমেনিস্তান। হ্রদের পশ্চিমদিকে বাস করে এদেরই আরেক গোষ্ঠী তুর্কিরা, যাদের বাসভূমির নাম তুরস্ক।

তুর্কমেনিস্তানের চারদিক ঘিরে আছে কাজাখস্তান, উজবেকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরান। প্রায় বারোশো বছর আগে থেকে কিছু অঘুজ উপজাতির পশুচারক কিছু যাযাবর মানুষ মঙ্গোলিয়ার পশ্চিম অঞ্চল থেকে অর্থাৎ মধ্য এশিয়ার উরাল- আলতাই অঞ্চল ছেড়ে ঘুরতে ঘুরতে চলে আসে এই অঞ্চলে।

নতুন বাসভূমিতে এসে এরা ‘সেলজুক সাম্রাজ্যের’ অধীনে বাস করেছিল। সেলজুক সাম্রাজ্য ছিল বর্তমান ইরান ও তুর্কমেনিস্তানের পুরোনো বাসিন্দা অঘুজ তুর্কিদেরই সাম্রাজ্য।

অবশ্য আগে এরা তুর্কমেন নামে পরিচিত ছিল না। নশো একাত্তর সালে, অর্থাৎ দশম শতাব্দিতে এদের মধ্যে এক বিরাট সংখ্যার জনগণ - প্রায় দু লক্ষ মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। আর ধর্মান্তরিত হবার পর থেকে এই অঘুজ উপজাতির মুসলমান মানুষদের পরিচয় হয় 'তুর্কমেন'। তুর্ক+ ইমান মিলে হয় 'তুর্কমেন'। ইমান কথার অর্থ ছিল ইসলামে বিশ্বাসী। আবার 'মেন' বলতে বোঝানো হত 'খাঁটি তুর্কি'। আর এই খাঁটি তুর্কিদের বাসভূমির নাম হল 'তুর্কমেনিস্তান'।

এদেরই কিছু উত্তরপুরুষ আর সেনারা এখনকার আজারবাইজান আর পূর্ব তুরস্কে চলে গিয়ে বসবাস শুরু করেছিল। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল নিজেদের সংস্কৃতি। দ্বাদশ শতকে এসে তুর্কমেনিস্তান আর সেলজুক সাম্রাজ্যের অধীন থাকল না। আসলে পরবর্তী সময়ে দুর্ধর্ষ মোঙ্গলদের অনেক দল নানাদিকে অভিযানে বের হয়েছিল। এদের একটা অংশ পশ্চিমদিকে চলে আসে। ক্রমে এরা তুর্কমেনিস্তানের উত্তর দিকের অনেক অংশ দখল করে নিয়েছিল। সেখানকার আগেকার মানুষদের তাড়িয়ে দিয়েছিল। তারা ঘরছাড়া হয়ে আরও দক্ষিণে পালিয়ে যেতে লাগল। আর নবাগত মোঙ্গলরা সেসব স্থানে বসতি করল। এরা আর সেলজুক শাসকদের মানল না। এদের মধ্যে আবার কলহের কারণে নানা বিভাগ উপবিভাগের গোষ্ঠী তৈরি হল। এদের সকল গোষ্ঠীই নিজের নিজের এলাকায় স্বাধীন ছিল। এরা খুবই নৃশংস ছিল, তাই এদের প্রতিটি শক্তিশালী গোষ্ঠীই ছিল প্রতিবেশী দেশগুলির আতঙ্কের কারণ।

তখন এদের দুটি প্রধান আর শক্তিশালী শাসনকেন্দ্র ছিল- একটি ছিল 'খিবা' আর অন্যটি 'বুখারা'। তুর্কমেনদের ভাষায় যেগুলিকে বলা হত 'উজবেক খানাতে'- আমাদের দেশের 'সরকারের' মতন আর কি!

দেশটিতে অফুরন্ত প্রাকৃতিক তেলের ও গ্যাসের ভাণ্ডার ছিল। এখনও আছে। ক্রমে সভ্যতা এগোতে লাগলো। দেশটির উপর নজর পড়ল অনেক প্রতিবেশী দেশের। ক্রমে রাশিয়া তার থাবা বসাল দেশটির উপর। 'গিওক টেপে' বলে এক জায়গার ভীষণ যুদ্ধে তুর্কমেনিস্তানের শাসকরা হেরে গেলো রাশিয়ার কাছে। ১৮৮১ সালে রাশিয়া দখল করে নিল তুর্কমেনিস্তান। রাশিয়া উজবেক খানাতেগুলি ভেঙে দিল, সেখানে প্রতিষ্ঠিত হল জারের শাসন।

এরপর জারের শাসনের বিরুদ্ধে ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় বিদ্রোহ দেখা দিল, আর রাশিয়ান বিপ্লবের ফলে জারের শাসন শেষ হয়ে নতুন সোভিয়েত ইউনিয়ন গড়ে উঠলো। তখন তুর্কমেনরা সেই শাসন মানবে না ঠিক করলো। ১৯২০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে 'বাসমাচি বিদ্রোহে' সামিল হল তারা।

তুর্কমেন সৈন্যরা দলে দলে কাজাক,কিরঘিজ আর উজবেক বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিল। কিন্তু তবুও এরা সোভিয়েত শাসনেই থেকে যেতে বাধ্য হ'ল । দীর্ঘ ৬৯ বছর পরে ১৯৯১ সালের ২৫ শে ডিসেম্বর তুর্কমেনিস্তান রাশিয়ার হাত থেকে স্বাধীনতা পেল। এদেশের পার্লামেন্টকে বলে 'মেজলিস'। এদেশে এখন ৫টি প্রদেশ। প্রদেশগুলি আবার জেলায় বিভক্ত।

তুর্কমেনিস্তানে দেখার মত একটি জায়গা হ'ল 'ডোর অফ হেল' বা নরকের দরজা। সবাই ভাববে নরকের দরজা আবার দেখবার মত কী হল! সত্যিই দেখবার মত বটে, তাইতো নানা দেশ থেকে এখন অনেক পর্যটক আসে এই প্রাকৃতিক গ্যাসের অগ্নিগহ্বর

দেখতে। কারাকোরাম মরুর বুকে দারভাজা অঞ্চলে গত ৩৮ বছর ধরে জ্বলছে এই নরকের দ্বারের অগ্নিকুণ্ড। পৃথিবীর শুষ্কতম মরুভূমিগুলির মধ্যে একটি কারাকোরামের বুকেই এই দেশ। তার মধ্যে প্রায় ৬০ মিটার বিস্তৃত আর ২০ মিটার গভীর এই আগুনে ক্রেটার।

কিন্তু এই ক্রেটার বা জ্বালামুখ কোনও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সৃষ্টি

হয়নি। ১৯৭১ সালে সোভিয়েতের প্রাকৃতিক গ্যাস অনুসন্ধান প্রকল্পের এক দুর্ঘটনার ফলে এটির সৃষ্টি হয়েছিল। অফুরন্ত প্রাকৃতিক গ্যাসের ভাণ্ডার দারভাজাতে গ্যাস উত্তোলনের জন্য রাশিয়ার সরকারের তরফে মাটিতে ড্রিল করার সময় ভুলবশত যে জায়গাটিতে ফুটো করা শুরু হয়, ঠিক সেই জায়গাটির সামান্য নীচেই ছিল বিপুল গ্যাসের আধার। সামান্য চাপ পড়তেই পুরো এলাকাটি মাটিতে বসে গেল, সৃষ্টি হ'ল বিরাট গহ্বর। ড্রিলিংএর যন্ত্রপাতিসহ অনেক কিছুই চলে গেল সেই গহ্বরে। বিরাট এক দুর্ঘটনা ঘটল।

ভূবিজ্ঞানীরা চিন্তা করলেন, এই উদগীর্ণ বিষাক্ত গ্যাসে মানুষের ক্ষতি কীভাবে আটকানো যায়। তাঁরা মনে করলেন এই বেরিয়ে আসা গ্যাসকে জ্বালিয়ে দিলে দিন কয়েকের মধ্যেই তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। কিন্তু হিতে বিপরীত হল। আগুনের ছোঁয়া পেয়ে মাটির নীচেকার গ্যাসের দীর্ঘ ভাণ্ডার থেকে গ্যাস বেরিয়ে জ্বলতেই লাগল। এই দীর্ঘ গ্যাসের ধারা আজও জ্বলে চলেছে রাবণের চিতার মত। কবে যে তা নিভবে তা কেউ জানেনা। অন্ধকারের রাতেও বহুদূর থেকে দেখা যায় আগুনের লেলিহান শিখা, বাতাসে ভরে থাকে জ্বলন্ত সালফারের গন্ধ। রাতের অন্ধকারে সে দৃশ্য অপূর্ব। তাই দলে দলে পর্যটকেরা আসেন সেই আশ্চর্য 'নরকের দরজা' দেখতে। এ আগুনের শেষ কোথায় কেউ জানে না।

এক নজরে কিছু তথ্য

পৃথিবীর ৫২ তম বৃহত্তম দেশ তুর্কমেনিস্তান আয়তনে স্পেনের থেকে কিছু ছোট আর আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার থেকে একটু বড়। ৪৯১,২১০ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের দেশটির শতকরা ৮০ ভাগ জুড়ে অবস্থান করছে কারাকোরাম মরুভূমি। গোটা দেশে জলাশয়ের ভাগ মাত্র চার দশমিক নয় ভাগ। দেশের মাঝখানটি জুড়ে তুরাণের নিম্নভূমি আর কারাকোরাম মরুভূমি।

- ২০১৪ সালের জনগণনা অনুসারে লোকসংখ্যা প্রায় ৫,১৭১,৯৪৩ জন। মাথা পিছু আয় ১৪,১৭৪ ডলারের মত।
- শুষ্ক জলবায়ু। বৃষ্টিপাত বছরে গড়ে আন্দাজ ১২ মিলিমিটার। আমুদরিয়া নদীর তীরের শহর কেরকির তাপমাত্রার রেকর্ড আছে সর্বোচ্চ ৫০ দশমিক ১ ডিগ্রি। প্রধান শহর আসগবাটের সর্বোচ্চ তাপমাত্রার রেকর্ড ৪৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। দীর্ঘ গ্রীষ্মকাল, নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি শীতকাল।
- পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম প্রাকৃতিক গ্যাস আর তেলের ভাণ্ডার এই দেশটির অভ্যন্তরে দারিদ্র্য চরম,আর বিদেশের কাছে ঋণের বোঝা অনেক। যদিও তুর্কমেনিস্তান হিন্দুকুশ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, আর একটি তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে উৎপন্ন বিদ্যুৎ মধ্য এশিয়ার দেশগুলিতে, আর দক্ষিণের প্রতিবেশী দেশগুলিতে প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করে।
- সেচের মাধ্যমে উৎপন্ন কৃষিজাত ফসলের মধ্যে তুলা উৎপাদনে বিশ্বের নবম বৃহৎ তুলা উৎপাদনকারী দেশ।
- দেশে সকলের শিক্ষা বাধ্যতামূলক। বারো বছর স্কুলজীবনের তিনটি স্তর। প্রাথমিক স্কুল তিন বছরের তিনটি গ্রেড। হাইস্কুলে লাগে ৫ বছর। সেকেণ্ডারি স্কুলের সময় সীমা ৪ বছর।

- তুর্কমেনিস্তানের জনগণের মধ্যে অধিক সংখ্যায় আদি তুর্কমেন জনগণ ছাড়াও আছে উজবেক, রাশিয়ান, কাজাক, তাতার, কুর্দ, বালুচ প্রমুখ অনেক জাতির মানুষ। সরকারি ভাষা তুর্কমেন। এছাড়া রাশিয়ানও বলে প্রচুর মানুষ ।
- ইসলাম,খ্রিষ্টান, আর ধর্মহীন মানুষের বাস এখানে।
- ফল ,দুধ, বেরি, মাশরুম, মাংস, মাটির নীচের কন্দমূল, গাজর ইত্যাদি থাকে খাদ্য তালিকায়।
- নানাধরনের পাখির মধ্যে আছে চড়ুই, ঈগল, শকুন আর কিছু পরিযায়ী পাখি। এদের সংস্কৃতির প্রধান চিহ্ন ঘোড়া। সরীসৃপের মধ্যে আছে সাপ, টিকটিকি ইত্যাদি।

শুকতারার গল্প

মহাশ্বেতা

অনেক কাল আগে একটা বুড়ো লোক ছিল যে রোজ রোজ খোলা আকাশের তলায়, বরফের ওপর গিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকত। কেন? সিল মাছ ধরবে বলে, আবার কেন। সে কান পেতে রইত কখন বরফের চাদরের ওপর গর্তগুলোর কাছে নিঃশ্বাস নিতে আসবে সিল। আর এলেই খপাত করে ধরে ফেলবে সে সেটাকে। কিন্তু সমুদ্রের অন্য পাড়ে একটা খাদ ছিল। তাতে সারাদিন খেলে বেড়াত একপাল ছেলে মেয়ে। আর বারবার তাদের তীক্ষ্ণ চিৎকারে বুড়োর শিকারে বাধা পড়ত। যেই হারপুন ফোটাতে যেত, ওমনি সিলটা কোন একটা আওয়াজে সতর্ক হয়ে গিয়ে চম্পট লাগাত। আর বুড়োর শিকার হত না। মনে মনে ফুঁসত সে।

এরকম করতে করতে ব্যাপারটা বুড়োর সহ্যের সীমা পেরিয়ে গেল একদিন। সে আকাশের দিকে তাকিয়ে হাত ছড়িয়ে চিৎকার করে উঠল, “হে খাদ! বুজে যাও। যারা আমার শিকার দিনের পর দিন পণ্ড করছে, তাদের নিয়ে তুমি বুজে যাও!”

আর সঙ্গে সঙ্গেই উল্টোদিকের সমুদ্রতটের বরফের পাহাড়গুলো আস্তে আস্তে নড়তে চড়তে লাগল আর কিছুক্ষণের মধ্যেই খাদ বুজে আসতে লাগল। বাচ্চারা শুরুতে কী হচ্ছে বুঝতে পারেনি, কিন্তু ক্রমেই তারা চিৎকার চেঁচামেচি করতে লাগল। তারপর শুরু করল পালাতে। কিন্তু তাদের মাথার ওপরেই বুজে গেল খাদ। তারা সেখানেই আটকে পড়ল, আর বেরোতে পারল না।

তাই দেখে এবার বসতির লোকেরা বুড়োর

ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। জাদু করে সে তাদের ছেলেমেয়েদের সে খাদে আটকে দিয়েছে কিনা!

বুড়ো প্রাণপণে পালাতে লাগল। কিন্তু লোকজনও তার পেছন ছাড়ল না। কিন্তু এক জায়গায় এসে যখন তার পা আর চলে না, তখন সে মোটমাট হাল ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। কিন্তু ও মা এ কী! তার সারা গা দিয়ে একটা অদ্ভুত জ্যোতি বেরোতে লাগল, আর সে আস্তে আস্তে আকাশে ভেসে উঠতে লাগল। এরকম করতে করতে সে একটা জলজ্যান্ত তারাই হয়ে আকাশে টিমটিম করে জ্বলতে লাগল। আমরা এখনও তাকে পশ্চিম আকাশে দেখতে পাই, যখন রাত্রের পরে সকাল আসার তোড়জোড় করে। কিন্তু সব সময় দিগন্তের কাছাকাছিই থাকে, আকাশের গা বেয়ে উঁচুতে ওঠে না কখনই। আমরা তাকে ডাকি 'নালোসার্তক'- যে দাঁড়িয়ে থেকে কান পেতে শোনে।

সে- ই আমাদের শুকতারা।

ইন্যুইট লোককথা

ফেলে আসা কলকাতা

সুজয় রায়

অতীতের ধূসর ইতিহাসে লুকিয়ে আছে অবশিষ্ট কিছু এই শহরের স্মৃতিসৌধ।সেদিকে তাকালে ও জানলে ভাবনা হয়, তাদের তুলনায় আমাদের বর্তমানকাল সত্যিই রিক্ত।এককালে সরস্বতী নদী বহমান ছিল। সেই জলধারা অষ্টাদশ খ্রিস্টাব্দে পালিমাটিতে বুঁজে যায়। মধ্যযুগে এই নদীর তীরে সপ্তগ্রাম গঞ্জতে শ্রেষ্ঠীরা মুঘল সাম্রাজ্যের সঙ্গে ব্যাবসা- বাণিজ্য করত।পরবর্তী সময়ে তারা এসে হাওড়াতে ‘বিতর’- এ(আজকের ব্যাঁটরা) বাণিজ্যকেন্দ্র করে ব্যাবসা করতে লাগলেন পর্তুগিজদের সঙ্গে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৬৯৮ সালে মাত্র ১৩০০ টাকা মূল্যে কলকাতা, সুতানটি ও গোবিন্দপুর গ্রাম কিনেছিল বড়িশার সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের কাছ থেকে। সেই থেকে আজকের শহরের সূত্রপাত। এই ঘটনার পরিণাম কিপলিং লিখেছেন, “chance directed,chance erected” কলকাতা নগরী।

ক্রমে সেই সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি সিকদারদের মধ্যে ভাগ হতে হতে প্রায় নিশ্চিহ্ন হল।অবশিষ্ট আছে ৩৭৫ বছর পুরাতন দুর্গাপূজা, ঠাকুরদালান। আর আছে আটচালার কয়েকটা থাম ও কুলদেবতা রাধাকান্ত জিউ- এর বিগ্রহ।

কলকাতার লালদিঘির আশপাশে ছিল এই বংশের লক্ষ্মীকান্ত রায়চৌধুরীর কাছারিবাড়ি। আর ছিল শ্যামরায়ের মন্দির। সেখানে ধুমধাম করে দোল উৎসব হত, আবিরের রঙ লেগে দিঘির জল হয়েছিল রঙিন।তাই দিঘির নাম লালদিঘি।

সার্বণ রায়চৌধুরী পরিবারের আটচালা, বড়িশা

চোরবাগানের মিত্রবাড়ির কথা বলা যেতে পারে।আজ যেটা মুক্তারামবাবু স্ট্রিট সেখানে অবস্থিত এ বাড়ি। সেইকালে বনবাদাড় অতিক্রম করে গঙ্গা স্নানার্থীরা এই পথ ধরে যেত। প্রায়শই তাদের সর্বস্ব লুট হয়ে যেত ডাকাতদলের হাতে। তাই চোরবাগান কুখ্যাতি।

মিত্রবাড়ি ৩৫০ বছরের বেশি পুরোনো।এটি তৈরি করেছিলেন রামসুন্দর মিত্র, তাঁকে ডাকতো খ্যাঁদারাম মিত্র নামে। মিত্র পরিবারের আদি বাড়ি কোন্নগর। মুর্শিদাবাদের নবাবের কাছে দেওয়ানি পেয়েছিলেন পূর্বপুরুষ রামরাম মিত্র। ভূমিকম্পে এই বাড়ির ক্ষতি হয়। প্রায় পাঁচ বিঘা জমির উপর বাড়ি ম্যাকিনটশ বার্নের সাহায্যে অনেক পরিবর্তন করা হয়। গ্রিক স্থাপত্যে নির্মিত তিনতলা এই বাড়ি। দেশবিদেশ থেকে আনা বিচিত্র নান্দনিক জিনিস এখানে আছে।দুর্মূল্য শিল্পসামগ্রী এখানে ছড়ানো আছে।

রাজা বিজয়কৃষ্ণদেবের মৃত্যুর পর তাঁর সংগ্রহ করা জিনিস মিত্রবংশ কিনেছিল নিলাম থেকে। আরও অনেককিছু কেনা হয়েছিল দালালদের হাত ঘুরিয়ে ও সাহেবদের সংগ্রহ থেকে। এত জিনিস ছিল, কিন্তু কোনো লাইব্রেরি অথবা পুঁথি এঁদের সংগ্রহে ছিল না। এঁরা লবণের ব্যাবসা করতেন। রামসুন্দর মিত্রের ছিল মহাজনি কারবার। ওয়ারেন হেস্টিংস এঁদের কাছ থেকে দৈনিক সুদে টাকা ধার নিতেন। অন্যান্য সাহেব ও তৎকালীন বিখ্যাত পরিবারগুলো মিত্রবংশের পরবর্তী প্রজন্মদের কাছ থেকে ধার করতেন। সে যুগে মিত্রবংশ ছিলেন যেন প্রায় আজকের দিনের ব্যাঙ্কার।

চোরবাগানের মিত্রবাড়ি

এই পরিবারের অমৃতনাথ রায় বাহাদুরও ইন্ডিয়ান মুসলিমের ট্রাস্টি হয়েছিলেন।দুর্ভিক্ষত্রাণ ও ভিক্টোরিয়া ফান্ড- এ অর্থদান করেছিলেন এই পরিবার।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে প্রায় দেড়শত পন্ডিত এসেছিলেন। উৎসব উপলক্ষে এখানে খাওয়ার তালিকা শেষ করা যায় না লিখে। তালিকার মধ্যে ছিল ১১৭টি নিরামিষ খাদ্যের পদ। বনেদি বাড়ির ভোজনের বিবরণ শুনলে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে।এঁদের কালীপুজো ৩৩০ বছরের পুরোনো। চোরবাগানের মিত্রবাড়ির কালী ভয়ংকারী নন, বিহারিণী।

মহাজনি কারবার ব্যতীত এই পরিবারের জমিদারী ছিল প্রচুর লাভজনক। গোবড়ডাঙার নিকট হরদতপুরে জমিদারী ছিল। ডালহৌসি স্কোয়ার, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ক্যানিং স্ট্রিট, বউবাজার, লাউডন স্ট্রিট, পার্ক স্ট্রিট, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কুমারটুলি ইত্যাদি এলাকাতে ক্রমে বিষয়সম্পত্তি বেড়ে উঠেছিল।এইসব এলাকাতে এই পরিবারের ভাড়াবাড়ির সংখ্যা অনেক, নিজেদের বসত-বাড়ির অংশবিশেষ ভাড়া দেওয়ার প্রয়োজন হয়নি।পূর্বাঞ্চলীয় রঞ্জি ট্রফি বিজয়ী রাজ্যকে যে মনা মিত্র চ্যালেঞ্জ কাপ দেওয়া হয়, সেই মনা মিত্র এই বাড়ির সন্তান।

৭৮ নিমতলা ঘাট স্ট্রিটে হাটখোলার দত্তবাড়ি কলকাতার আরেক অন্যতম পুরোনো বাড়ি।এই বাড়ি অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে তৈরি করেন জগতরাম দত্ত।তিনি ছিলেন পাটনাতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমদানি রপ্তানি বিভাগের দেওয়ান।এঁর দুই পুরুষ আগে রামচন্দ্র দত্ত- ও ছিলেন দেওয়ান ও জমিদার।

জগতরামের ঠাকুরদালানে দুর্গা ও কালীপূজা হয়।২০০ বছরের বেশি পুরাতন দুর্গাপূজা। এখন পর্যন্ত প্রতিমা ভাসানের সময় নীলকন্ঠ পাখি ওড়ানো হয়।দেবী দুর্গা যে ফিরে যাচ্ছেন এই পাখি সেই খবর আগাম দিতে যায় শিবকে। এই পরিবারের নানা শাখাপ্রশাখা বিস্তার হয়েছে। তিনটি বাড়িতে সাবেককালের রীতি মান্য করে দুর্গাপূজা হয় এবং প্রতিমা হয় একইরকম দেখতে।

হাটখোলার দত্তবাড়ি

শোভাবাজারের রাজবাড়ির মত ইংরেজতোষণ এঁরা করেননি। শোভাবাজার রাজবাড়িতে একটা সিঁড়ি আছে। স্থানীয় লোকেরা তাকে বলে, “ঘোড়াতোলা সিঁড়ি”। সিঁড়ি ভেঙে দুইতলা উঠতে সাহেবদের পরিশ্রম হবে, তাই রাজা ঘোড়ার দোতলায় যাতায়াত করবার জন্য সিঁড়ি বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন।দত্তরা সেই উদাহরণ অনুসরণ করেন নি।

আগে এই বাড়ি লোকমুখে ‘পাখিওলা বাড়ি’ নামে পরিচিত ছিল। রামনাথ দত্ত ছিলেন পাখিবিশারদ ও পাখিচিকিৎসক। ছিলেন বিখ্যাত পাখোয়াজবাদক। তাঁর প্রকান্ড পাখোয়াজের জুড়ি প্রবীণরাও দেখেননি।

দত্ত পরিবারের শাখা প্রশাখা ব্যাপক ছড়িয়ে গেছে। আছেন বহু কৃতি পুরুষ। ভক্তবিনোদ কেদারনাথ দত্ত এই পরিবারের “দত্ত বংশমালা” নামে লিখেছেন পারিবারিক ইতিহাস। সেটা লেখা হয় ১৮৭৬ সালে। বর্তমানে এঁদের ২৯তম প্রজন্ম চলছে। প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, তিনিও বংশের ইতিহাস লিখেছেন। পটলডাঙার বসুমল্লিক পরিবার বিবাহসূত্রে এঁদের আত্মীয়। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু দত্তবাড়ির নাতি। রাজনারায়ণ বসুর স্ত্রী নিস্তারিণী হাটখোলার দত্তবাড়ির মেয়ে। তাঁর বড়োমেয়ে স্বর্ণলতার চার ছেলে।তার মধ্যে একজন ঋষি অরবিন্দ, আর এক ছেলে বারীন্দ্র ঘোষ।

দত্তবাড়ির প্রবেশপথে আছে ঢেঁকি। তিথি- নক্ষত্র মিলিয়ে এখন পর্যন্ত ঢেঁকি পূজা করা হয়।পুরাতন প্রথা আজও ধরে রাখা হয়েছে।

দত্তবাড়ির লোকদের নামে কলকাতায় মদনমোহন দত্ত লেন, কাশীনাথ দত্ত রোড, নিমতলার ঘাট।তনুবাবুর ঘাট রামতনু দত্তর স্মরণে আছে।তনুবাবু সকাল- সন্ধ্যা বাড়ি গোলাপজলে ধোয়া মোছা করতেন। বসরাই গোলাপের নির্যাস আসত মির্জাপুর থেকে।

বিখ্যাত কাশিমবাজার রাজবাড়ির সমৃদ্ধি হয় রেশম, পান- সুপারি, ঘুড়ি, তাঁত বুনে কাপড়ের ব্যাবসা থেকে। ব্যাবসা শুরু করেন রাধাকৃষ্ণ নন্দী। ভালো ঘুড়ি ওড়াতেন তিনি। তাঁর প্রথম ছেলে কৃষ্ণকান্ত কাশিমবাজার রাজবাড়ির প্রতিষ্ঠা করেন। কলকাতায় এঁদের পুরাতন বাড়ি ২৬৩ চিৎপুর রোডে। সেটা ভাড়া দেওয়া হয়েছে। নন্দীরা এখন থাকেন ৩০২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে। এটাই এখন কাশিমবাজার রাজবাড়ি নামে পরিচিত। কলকাতা টাঁকশালের অধীক্ষক জেমস ফরবেস ১৮০০ সালে এই বাড়ি তৈরি করেন। ফরবেসের কাছ থেকে ১৮২৪ সালে সেই বাড়ি কিনে নেন কাশিমবাজারের রাজা হরিনাথ। রানি স্বর্ণময়ীর সময় এই বাড়ির নাম হয় রানিকুঠী। এখানে দুটি পুকুর ও ২০ বিঘে জমির ওপর এই বাড়ি, পূর্বে সেটা ছিল বাগানবাড়ি।

১৭৫৪ সালে হেস্টিংসের বেনিয়ান হয়েছিলেন কৃষ্ণকান্ত নন্দী। তিনি নাকি হেস্টিংসকে লুকিয়ে রেখে নবাবের আক্রমণ থেকে বাঁচিয়েছিলেন। কৃষ্ণকান্ত প্রচুর জমি কিনে সম্পত্তি বাড়িয়েছিলেন। তিনি মুর্শিদাবাদ, মালদা, রংপুর ও মেদিনীপুরের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব পেয়েছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে। যাঁরা এক একটি পরগনার রাজস্ব বেশি আদায় করতে পারতেন তাঁরাই এই অধিকার পেতেন কোম্পানির কাছ থেকে। এই নিয়মের নাম ছিল "রেভেনিউ ফার্মিং" অর্থাৎ "রাজস্ব কর্ষণ"। বহু সাধারণ গ্রামবাসীর চোখের জল মিশে গিয়েছিল এই প্রথার সঙ্গে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হলে এঁরা জমিদার হয়ে উঠেছিলেন। কৃষ্ণকান্ত পেয়েছিলেন ১৩টি পরগনায় রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব।

কৃষ্ণকান্ত হিজলী, তমলুক, মহিষাদল ইত্যাদি অঞ্চলে লবণ উৎপাদন করিয়ে প্রচুর আয় করেছিলেন। মেদিনীপুরে ত্রিশ শতাংশ এলাকায় লবণ উৎপাদন করতেন। এই অত্যন্ত লাভজনক ব্যাবসা কলকাতার অনেক বনেদি পরিবার করত অষ্টাদশ শতাব্দি জুড়ে। রাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দীর ছেলে সমেন্দ্রচন্দ্র এই শহরের পুরাতন থামওয়ালা বাড়ি দেখলে তাদের পূর্ব মালিকদের নাম লবণ ব্যাপারীদের তালিকা থেকে বলে দিতে পারেন বলে দাবি করেন। লবণ উৎপাদকদের, মালুঙ্গি ও নীলচাষীদের ওপর অকথ্য অত্যাচারের ইতিহাস এক বিষাদময় অধ্যায়।

কাশিমবাজার রাজবাড়ি

এই বংশের হরিনাথ নন্দী দানধ্যান করে নাম করেছিলেন। হরিনাথ হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করবার জন্য ২০ হাজার টাকা দিয়েছিলেন।কবিয়ালদের ও ধুলিদারদের এক রাত্রির আসরে মোটা টাকা দিতেন। হরিনাথের পুত্র কৃষ্ণনাথের স্ত্রী স্বর্ণময়ী ৭০ লক্ষ টাকা দান করেছিলেন বিভিন্ন সৎকার্যে, যেমন স্ত্রীশিক্ষা, নিখরচায়

ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা। স্বর্ণময়ীর ছেলে মণীন্দ্রচন্দ্র প্রায় তিন কোটি টাকা দান করেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ল'কলেজ, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ, কারমাইকেল হাসপাতাল(এখনকার নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল) , আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ, বেঙ্গল কেমিক্যাল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে।

এই বংশের সোমেন্দ্রচন্দ্র ঐতিহাসিক ও নাট্যকার। তাঁর লেখা "লাইফ এন্ড টাইমস অফ কান্তবাবু" দেশে ও বিদেশে সমাদৃত। অষ্টাদশ শতকের ভূমিব্যবস্থা, জমিদারী ও সমাজব্যবস্থা নিয়ে গবেষণামূলক এই লেখা।

ক্রমশ

কমলা সোহনি–ভারতের প্রথম মহিলা বিজ্ঞানী পি এইচ ডি

উমা ভট্টাচার্য

আমাদের পাড়ায় ডঃ আহমেদ একদিন দেখি দাদুর কাছে এসে বলছেন "একটু হোমিওপ্যাথির গুলি দেবেন দেখি দাদা। কাল থেকে জ্বর।" শুনে তো আমি অবাক। সবাই ওঁকে ডঃ আমেদ বলে ডাকে। দেশেবিদেশে পড়াতেটড়াতে যান। তাহলে ডাক্তারবাবু দাদুর মতো শখের হোমিওপ্যাথের বাড়ি ওষুধ নিতে আসে কেন? কথাটা দাদুকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি তো প্রথমে ছাদ ফাটিয়ে হাসলেন অনেকক্ষণ। তারপর বললেন, "শোন বুড়ি। আহমেদ হল পদার্থবিদ্যার ডাক্তার।"

"সেটা আবার কী?"

বড়ো হয়ে বুঝেছিলাম, আসলে শুধু চিকিৎসকদেরই ডক্টর বলে না। যে কোন বিষয়ে পড়াশোনা করে সর্বোচ্চ স্তরের গবেষণা সাফল্যের সঙ্গে করলে কোন বিশ্ববিদ্যালয় সেই পণ্ডিত মানুষটিকে সেই বিষয়ের পি এইচ ডি বা সে বিষয়ের "ডক্টর অব ফিলসফি" উপাধি দেন। পড়াশোনার জগতে, বিএ এমএ ইত্যাদি ডিগ্রিদের মধ্যে, বলতে পারো, এইটেই সেরা উপাধি। এ উপাধি যিনি পান সেই সফল গবেষক নিজের নামের আগে ডক্টর এই কথাটা ব্যবহার করতে পারেন।

আমাদের দেশে এককালে মেয়েদের পক্ষে এইরকম ডক্টর হওয়াটা স্বপ্নের মতই ব্যাপার ছিল। অত গভীর পড়াশোনা বা গবেষণা দূরে থাক সামান্য একটু অ আ ক খ পড়বার জন্যও তাদের অনেক দুঃখ সইতে হত। অনেক জায়গায় এখনও সেইরকম ভয়ংকর অবস্থা আছে মেয়েদের। এই তো সেই আফগানিস্তানের এত্তটুকু মেয়ে মালালা, যে কিনা কদিন আগে নোবেল প্রাইজ পেলো, তাকেও তো পড়াশোনা করবার অপরাধে দুষ্টু লোকেরা গুলি করে দিয়েছিল।

তবেই ভাবো, আজ থেকে প্রায় আশি নব্বই বছর আগে যদি কোন ভারতীয় উপমহাদেশের মেয়ে মাস্টার ডিগ্রি করে বায়ো কেমিস্ট্রিতে পি এইচ ডি করতে চায় তাহলে তাকে কী বেজায় বাধা পেতে হতে পারে? তা সে'সব বাধা তাঁর প্রতিজ্ঞা আর মেধার সামনে উড়ে গিয়েছিল একেবারে। সেই সঙ্গে সঙ্গে এই উপমহাদেশে মেয়েদের সামনে উচ্চশিক্ষার একেবারে প্রথম সারির আসনগুলোর দরজাও খুলে দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর নাম ডঃ কমলা সোহনি। এসো তাঁর গল্প শুনি।

বরোদার এক শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান কমলার বাবা নারায়ণ রাও ভাগবতও ছিলেন একজন সফল রসায়নবিদ। তাঁর ভাই, তাঁর ছেলে এবং পরিবারের আরও অনেকেই ছিলেন নামকরা রসায়নবিদ। সেই পরিবারের মেয়ের কমলারও স্বপ্ন ছিল বিজ্ঞানী হওয়ার।

শান্তশিষ্ট, মোটাসোটা মেয়েটিকে দেখে বোঝাই যেত না যে তাঁর মধ্যে এত মেধাসম্পদ ঘুমিয়ে আছে। তাঁর এক মোটাসোটা রসায়নবিদ কাকা ছিলেন। তাই ছোটবেলা থেকেই মোটাসোটা মেয়েটির মনে ধারণা হয়েছিল যে তিনিও কাকার মতই রসায়নবিদই হবেন। প্রাপ্তবয়সেও তাঁকে দেখে কিছুই বোঝা যেতনা, এমনই সাধারণ ছিল তাঁর চাউনি, চেহারা। কোথাও অহমিকার চিহ্ন নেই। বোঝা যেত না যে কর্মজীবনে স্থান করে নিতে তাঁকে কতটা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে ।

প্রথমে তিনি ব্যাঙ্গালোরের টাটা ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স থেকে পড়াশোনা শেষ করার পর বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন নিয়ে বি এস সি পাশ করেন। বি এস সি তে তিনি প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এইবার তিনি গবেষণা করার সুযোগ লাভের জন্য ব্যাঙ্গালোরে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সে ভর্তি হবার জন্য আবেদনপত্র জমা দিলেন।

কিন্তু সঙ্গেসঙ্গেই সেই আবেদন নাকচ করে দিলেন প্রতিষ্ঠানের নির্দেশক সি ভি রামন। কারণ দেখালেন বিজ্ঞানে গবেষণার জন্য একজন স্ত্রীলোকের যথেষ্ট মেধা নেই। তারা এক্ষেত্রে কাজ করার অনুপযুক্ত।

ভর্তির আবেদন এভাবে নাকচ হওয়া মেনে নিয়ে পিছিয়ে যেতে রাজি হলেন না কমলা। ধর্নায় বসলেন। শুরু হল বিজ্ঞানের এক মহীরূহের বিরুদ্ধে জ্ঞানেচ্ছু এক মেধাবী মেয়ের লড়াই।

সময়টা ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ। গান্ধিজীর সত্যাগ্রহের ধারার অহিংস আন্দোলনে বসলেন মেয়েটি। আন্দোলনের নাম দিয়েছেন, 'লীলাবতীস ডটারস'। সামনের ঘরেই রয়েছেন নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী স্যার সি ভি রামন।

সে যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন ভাবী বিজ্ঞানী সেই মেয়েটি। আর এই আন্দোলনের ফলেই পরবর্তীকালে ভারতীয় বিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে মেয়েদের প্রবেশাধিকার সম্ভব হয়েছে। তাই তাঁকেই এই ক্ষেত্রের 'আলোকবাহক'(টর্চ বিয়ারার), পথ প্রস্তুতকারক বললে ভুল বলা হবেনা।

রমন অবশেষে তাঁর আবেদন মঞ্জুর করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু শর্ত রাখলেন যে এক বছর তাঁর কোন প্রবেশন থাকবেনা। অর্থাৎ তিনি এই এক বছর যা কাজ করবেন তার কোন স্বীকৃতি তিনি পাবেন না। তাঁর কাজের উৎকর্ষ বিচার করে ডিরেক্টর সন্তুষ্ট হলে তবেই তাঁর কাজ স্বীকৃতি পাবে। আরও বললেন তাঁর কোনও কাজের বা ব্যবহারের ফলে পুরুষ গবেষকদের কাজের যেন ক্ষতি না হয়। কমলা বাধ্য হলেন এই অপমানকর শর্ত মেনে নিয়ে ভর্তি হতে। জীবনের প্রথম বড়ো বাধাটা পার করলেন সেই ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দেই।

শ্রীনিবাসাইয়া নামে একজন কঠোর, কিন্তু সহানুভুতিপ্রবণ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে তাঁর গবেষণার কাজ শুরু হল। একবছরের কার্যকালে তাঁর মেধা, নিষ্ঠা ও নিয়মানুবর্তিতা দেখে অত্যন্ত খুশি হলেন সি ভি রামন। বায়ো- কেমিস্ট্রিতে বা জীব- রসায়নবিদ্যায় নিয়মিত গবেষণার জন্য তিনি অনুমতি পেলেন। প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের ভর্তির অনুমতিও দিলেন রমন সেইসঙ্গে। কমলার জয় হল।

গবেষণাগারে তিনি ডাল, দুধ ও লেগুমস(নানাধরনের ডাল, বিন ইত্যাদি ফসল) এর মধ্যে থাকা প্রোটিন নিয়ে গবেষণা করছিলেন। কারণ সাধারণ ভারতীয়দের খাদ্য তালিকায় এগুলির উপস্থিতি পুষ্টির দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি কোর্সের ছাত্রী থাকাকালীন তিনি ডালের ভিতরে থাকা প্রোটিন নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। সেই গবেষণাটিকেই এ'সময় সম্পূর্ণ করে তিনি পাঠিয়ে দিলেন বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে। আর তার ভিত্তিতেই সেখান থেকে এম এস সি ডিগ্রি পেলেন।

এরপরে তিনি চলে গেলেন কেম্ব্রিজে,সেখানে তিনি গবেষণার কাজ করতেন ডঃ ডেরিক রিখটারের গবেষণাগারে, তাঁরই তত্ত্বাবধানে। কেম্ব্রিজে তাঁর গবেষণা করার জায়গাটি বিজ্ঞানী মেরি কুরির প্রথম দিকের গবেষণাগারের মতই ছিল। একটি মাত্র টেবিল সম্বল। ডঃ ডেরিক তাঁকে একটি খালি টেবিল দিয়েছিলেন তাঁর কাজের জন্য। কমলার কাজের সময় ছিল দিনের বেলা। আর রাতে ডঃ ডেরিক ফিরে এলে তিনি বাড়ি চলে যেতেন। যখন ডঃ কোনো কাজে বাইরে যেতেন তখন কমলাকে কাজ করতে হ'ত ডঃ রোবিন হিলের তত্ত্বাবধানে। তিনি কাজ করছিলেন উদ্ভিদ কলা (প্ল্যান্ট টিস্যু) নিয়ে। এইখানে আলু নিয়ে কাজ করতে করতেই আবিস্কার করলেন যে প্ল্যান্ট টিস্যুর প্রতিটি কোষের মধ্যেই আছে, সাইটোক্রোম সি –একপ্রকার অণুঘটক (এনজাইম) যা উদ্ভিদ কোষের ভেতরে জারণ প্রক্রিয়াতে সাহায্য করে। তাঁর এই মৌলিক আবিষ্কারের বিষয়টি পুরো উদ্ভিদ জগতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। পি এইচ ডি ডিগ্রির জন্য, মাত্র চোদ্দ মাস গবেষণা করে তিনি তাঁর এই আবিষ্কারের বিষয়ে একটি ছোট্ট, চল্লিশ পাতার রিপোর্ট লিখে পাঠালেন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। এবং তার ভিত্তিতেই মিলল কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পি এইচ ডি ডিগ্রি।

দেশে ফিরে এলেন কমলা। অধ্যাপিকা ও নবস্থাপিত বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগের প্রধান হিসাবে যোগ দিলেন নয়া দিল্লির লেডি হার্ডিঞ্জ মেডিকেল কলেজে। পরে তিনি কুন্নুরে নিউট্রিশন রিসার্চ ল্যাবরেটরির সহকারী নির্দেশক হয়েছিলেন। এখানে কাজ করার সময়ই তিনি ভিটামিনের প্রভাব নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা শুরু করেছিলেন, কিন্তু অজানা কারণে, কলেজে সে কাজ তিনি করতে বাধা পাচ্ছিলেন অনেক। তিনি তখনই সিদ্ধান্ত নিলেন এ কাজে তিনি ইস্তফা দেবেন।

এই সময় মিঃ এম ভি সোহনি নামে এক বিজ্ঞানীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়, এবং তিনি বোম্বেতে ফিরে আসেন ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে। এই সময় মহারাষ্ট্র সরকার বোম্বের রয়্যাল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সে, তাদের নতুন খোলা বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগের জন্য বায়োকেমিস্ট্রির অধ্যাপক চাইছিলেন। তিনি সেখানে আবেদন করলেন ও নির্বাচিত হলেন। এখানে কাজ করার সময়ই তিনি তাঁর ছাত্রদের সঙ্গে মিলে দেশীয় তরল খাদ্য 'নীরা'(তালজাতীয় গাছের পুষ্টিকর সুমিষ্ট রস), ডাল , চালের গুঁড়ো ও লেগুমের প্রোটিন নিয়ে আবার গবেষণা শুরু করেন। কারণ এগুলির সবকটিই ভারতীয় জনসাধারণের নিত্যদিনের খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে জড়িত। যদিও 'নীরা' নিয়ে গবেষণা শুরু করেছিলেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের উপদেশে।

'নীরা' নিয়ে তাঁর পরীক্ষানিরীক্ষার ফল দেখে পরীক্ষামূলকভাবে তাঁর ছাত্ররা বাস্তবে খাদ্য তালিকায় 'নীরা'- র অন্তর্ভুক্তির ফল দেখতে চায়। অপুষ্টির শিকার উপজাতীয় ছেলেমেয়েদের ও সন্তানসম্ভবা মায়েদের খাদ্যতালিকায় নীরা অন্তর্ভুক্ত করে তাঁরা দেখেছিলেন তাদের সাধারণ স্বাস্থ্যের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে।

তাঁর একনিষ্ঠ তত্ত্বাবধানে ১০-১২ বছর ধরে তাঁর ছাত্ররা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নীরা সংগ্রহ করে ও বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের খাদ্যতালিকায় সেটি অন্তর্ভুক্ত করে একই সুফল পেয়েছিল। এই

কাজের জন্য তিনি রাষ্ট্রপতি পুরষ্কার পেয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা এই বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়েও তাঁকে তাঁর চার বছরের কর্মজীবনে পদমর্যাদার উপযুক্ত কাজ করার অনেক সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, হয়তো তিনি মহিলা বলেই প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছেন। অবশেষে তাঁকে যখন নির্দেশকের পদে উন্নীত করা হয়, তখন কেম্ব্রিজে তাঁর গবেষণার প্রথম গাইড লিখেছিলেন, 'এইরকম বিখ্যাত একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিলা ডিরেক্টর হয়ে কমলা সোহনি আজ ইতিহাস তৈরি করলেন'।

ভালমন্দ মিশিয়ে তিনি একটি পূর্ণ জীবন যাপন করেই গেছেন। তাঁর প্রতি অবিচারের কথা ,তাঁর জীবন আর কাজের ইতিহাস শুনে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চের প্রথম মহিলা ডিরেক্টর জেনারেল ডঃ সত্যবতী মেয়েদের গবেষণার কাজে যোগ দেবার পক্ষে নিয়মের অনেক সংশোধন করেছিলেন, মেধাবী ছাত্রীদের গবেষণার সুযোগ করে দেবার জন্য।

শেষ জীবনে তিনি কনজিউমার গাইডেন্স সোসাইটির সক্রিয় কর্মী সদস্য ছিলেন, ১৯৮২-৮৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি এই সংস্থার প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি উপভোক্তা নিরাপত্তা নিয়ে তাঁদের প্রচারিত 'কীমত' পত্রিকায় অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ লিখে গেছেন।

জীবনে অনেক ক্ষেত্রে তিনি যোগ্য মর্যাদা বা সঠিক কাজের সুযোগ না পেলেও তিনি যে কাজ করে গেছেন তাঁর মূল্য কিছু কম নয়। তাঁর স্বপ্ন ছিল বিজ্ঞানের তাবড় শিক্ষকদের সান্নিধ্যে কাজ করবেন। সে আশা তাঁর পূর্ণ হয়েছিল নিজের দক্ষতায় অর্জিত দুটি বৃত্তির অর্থ থেকে। কেম্ব্রিজের স্যার উইলিয়াম ডন ইনস্টিটিউট অফ বায়োকেমিস্ট্রিতে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন নোবেলজয়ী অধ্যাপক ফ্রেডরিক হপ্‌কিন্সের সঙ্গে। দ্বিতীয় বৃত্তিটি ছিল আমেরিকান ট্রাভেলিং ফেলোশিপ স্কলারশিপ , যেটির অর্থানুকূল্যে তিনি ইউরোপের বহু প্রখ্যাত বিজ্ঞানীদের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের উপদেশ পেয়ে সমৃদ্ধ হতে পেরেছিলেন।

তাঁর জীবনের শেষ দিনটিতে তিনি আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন ডঃ সত্যবতী আয়োজিত এক সম্বর্ধনা সভায়। সেখানেই প্রসঙ্গক্রমে গল্প করেছিলেন প্রথম জীবনে বিজ্ঞানের রথে উঠতে গিয়ে সেই বাধাপ্রাপ্তির কথা, বিজ্ঞানী রামনের একদেশদর্শীতার কথা । তারপর, জীবনের সব ব্যথা ভুলে মঞ্চের উপরেই ঢলে পড়লেন মৃত্যুর কোলে, চলে গেলেন শান্তির দেশে। মৃত্যুর সময়ে তার বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

না ছোড়নু

উমা ভট্টাচার্য

না ছোড়নু। ডোন্ট স্পেয়ার দেম। এগিয়ে যাও। রক্ষা করো মাতৃভূমিকে শত্রুর কবল থেকে। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে নানান যুদ্ধে দেশের সম্মান রক্ষা করতে ভারতবর্ষের বীর যোদ্ধাদের এইটেই মূলমন্ত্র। তাঁদের নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান। শুধু মিল একটাই মাতৃভূমির সম্মান রক্ষায় নিজের প্রাণকেও তুচ্ছ করবার শক্তি। এমন চারজন যোদ্ধার গল্প এবারের দেশ ও মানুষ-এ।

নায়েক যদুনাথ সিং

নায়েক যদুনাথ সিং ছিলেন এক রাজপুত সেনা। ১৯৪৭ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে, জম্মু ও কাশ্মীর ফিল্ডে যুদ্ধ করেছিলেন ও বীরের মৃত্যু বরণ করেছিলেন। পেয়েছিলেন মরণোত্তর 'পরম বীর চক্র' –তিনি ছিলেন ভারতের চতুর্থ 'পরমবীর চক্র' প্রাপক।

ভারতীয় সেনা বাহিনীর রাজপুত রেজিমেন্টের ফার্স্ট ব্যাটেলিয়নের সেনা ছিলেন তিনি। ১৯৪৮ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি, জম্মু ও কাশ্মীরের তাহিন্ধার নামে এক জায়গায় ২নম্বর পিকেটের সামনের দিকের একটি মিলিটারি পোস্টের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন মাত্র নয়জন সেনা। শত্রুপক্ষ ভারতীয় সেনা পোস্টটির দখল নেবার জন্য বারংবার আক্রমণ করছিল। নায়েক যদুনাথ তাঁর সামান্য নয়জনের সেনাদল নিয়ে শত্রুসেনাদের বিরুদ্ধে এক আশ্চর্য বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর সুদক্ষ নেতৃত্বে ফৌজ এভাবে যুদ্ধ চালিয়েছিল যে শত্রুপক্ষ কিংকর্তব্যংবিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল, তারা বুঝতে পারছিল না যে প্রতিপক্ষে কতজন সৈন্য আছে।

দীর্ঘ সময় যুদ্ধের পর তাঁর চারজন সেনা গুরুতর আহত হয়।কিন্তু তিনি বাকি সেনাদের নতুন কায়দায় সাজালেন শত্রুপক্ষের মহড়া নিতে। এই অবস্থায় শত্রুসেনা পোস্টটির দখল নিতে পুনরায় প্রচন্ড আক্রমণ চালায়। যতক্ষণ না নায়েক আর তাঁর সেনারা সকলেই আহত হলেন ততক্ষণ প্রতিপক্ষ গুলিগোলা চালিয়ে যায়। বাকি পাঁচজন সেনার সঙ্গে সঙ্গে নায়েকও আহত হয়েছিলেন। কিন্তু ভারতীয় পোস্টটি তো শত্রুপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া যাবেনা। তাই বিপক্ষের সেনারা পোস্টের পিছনের প্রাচীরটির কাছে পৌঁছবার আগেই আহত নায়েক তাঁর দলের একজন আহত ব্রেন-গানারের হাত থেকে নিমেষে ব্রেন-গানটি কেড়ে নিলেন, আর আহত সেনাদের উদ্দীপিত করতে ভয়ংকরভাবে এলোপাথারি গুলি চালাতে লাগলেন। ফলে বিপক্ষ সেনা এগিয়ে এসে প্রাচীরটির ওপাশে পৌঁছুতে পারেনি। তাঁর মারাত্মক আক্রমণে শত্রুরা এগোতে পারল না। একেবারে হেরে যাওয়া পরিস্থিতিকে এইভাবে তিনি জয়ে পরিণত করলেন, ভারতীয় পোস্টটি আবার একবার রক্ষা পেল।

ততক্ষণে তাঁর সকল সেনাই ভীষণভাবে আহত, রক্তাক্ত। এই অবস্থায় কিছুক্ষণ পরে আবার শত্রুপক্ষ অতর্কিতে আক্রমণ করলো। তখন প্রতিরোধ করার মত একমাত্র নায়েক যদুনাথ সিং ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। নিরুপায় যদুনাথ তাঁর সম্বল স্টেন-গানটি নিয়ে ফায়ার করতে করতে নিজের আশ্রয়ের জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে এলেন, আগুয়ান শত্রুসেনার দিকে। শত্রুসেনার সমবেত আক্রমণের সামনে একা যদুনাথ স্টেন-গানটি ফায়ার করতে করতে বীরের মৃত্যু বরণ করলেন। এইভাবে জীবনপণ লড়াই করে বীর যদুনাথ শহীদ হলেন, দেশের জন্য।

সিপাহী কাঁসিরাম

১৯৬২ সালের চীন-ভারত যুদ্ধের সময় কাঁসিরাম নেফায় জেঙ্গিয়ং এলাকায় একটি ভারতীয় পোস্ট রক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৬২ সালের অক্টোবরের একদিন , কাঁসিরাম একলা একটি হালকা মেশিনগান হাতে পাহারায় ছিলেন। এমন সময় ৫০০ সেনার একটি চীনা দল সেই পোস্ট আক্রমণ করল। নির্ভীক কাঁসিরাম দৃঢ়চিত্ত হয়ে একাই ফায়ার করে কয়েকজনকে নিহত করে ফেললেন। এইবার চীনারা ভারী কামান সঙ্গে করে আক্রমণ করল, কিন্তু কাঁসিরাম একাই প্রতিরোধ চালিয়ে যেতে লাগলেন। একজন চীনা অফিসার আরও চারজন অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে কাঁসিরামের দিকে এগিয়ে এলেন। চীৎকার করে

কাঁসিরামের দলের অন্য সবাইকে ট্রেঞ্চ থেকে বেরিয়ে এসে আত্মসমর্পণ করতে আদেশ দিলেন। কাঁসিরাম তৎক্ষণাৎ চিৎকার করে চীনা সেনাদেরই আত্মসমর্পণ করতে বললেন।

সেই চরম মুহূর্তে কাঁসিরামের বারুদের ভাণ্ডার প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল, তবুও সাহস সম্বল করে, একটি শক্তিশালী গ্রেনেড হাতে নিয়ে ছুটলেন সেই অফিসারদের দিকে, আর চোখের পলকে সেই গ্রেনেড প্রচন্ড বেগে ছুঁড়ে মারলেন অফিসারদের দিকে। গ্রেনেডের আঘাতে চারজন চীনা অফিসারের মৃত্যু হল। এই ফাঁকে চীনা সেনারা তাঁকে ঘিরে ফেলল, একজন তাঁর হাতের মেশিনগানটি ছিনিয়ে নিতে গেল আর অন্য এক সেনা অটোমেটিক রাইফেল থেকে গুলি করে তাঁকে আহত করল। আহত অবস্থাতেই কাঁসিরাম তাঁর হাতের লাইট মেশিনগানটি তো ছাড়লেনই না, উপরন্তু ঘিরে থাকা চীনা সেনাদের আচমকা এমন এক রামধাক্কা দিলেন যে কয়েকজন সেনা মাটিতে পড়ে গেল। চীনাদের এই অসতর্কতার মুহূর্তেই কাঁসিরাম বিপক্ষের এক সেনার হাত থেকে একটি লোডেড অটোমেটিক রাইফেল ছিনিয়ে নিয়ে নিজের প্লেটুনের কাছে ফিরে এলেন। হাতে নিজের লাইট মেশিনগানটি তখনও ধরাই আছে। সেভেন ইনফ্যানট্রি ব্রিগেড কর্তৃক সেই হল শত্রুর হাত থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে আনার প্রথম ঘটনা। এই সাহস আর বীরত্বের জন্য তিনি পেয়েছিলেন 'মহাবীর চক্র' পুরস্কার।

লেফটেন্যান্ট অরুণ ক্ষেত্রপাল

ভারতীয় সেনাবাহিনীর ১৭ নম্বর পুণা হর্স ডিভিশনের এক নবনিযুক্ত অফিসার ছিলেন অরুণ ক্ষেত্রপাল। লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম এল ক্ষেত্রপালের ছেলে অরুণের জন্ম পুণাতে ১৯৫০ সালে। তাঁদের পরিবারের অনেকেই ভারতের সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তখন ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সময় পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের পশ্চিম সীমান্ত এলাকাতেও যুদ্ধ চলছিল। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পুণা হর্স ডিভিশনের বি স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডারের কাছ থেকে সাহায্যের আবেদন এল। কারণ শাহকোর সেক্টরের জারপালে পাকসেনা প্রচণ্ড আক্রমণ করে প্রচুর ক্ষতি করেছিল। ভারতীয়দের তুলনায় পাকিস্তানী প্রতিরক্ষা অধিক শক্তিশালী হওয়াতে নতুনভাবে ভারতীয় সেনা সংস্থাপন করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। এই জরুরি প্রয়োজনের কথা শুনে 'এ' স্কোয়াড্রনের সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট অরুণ ক্ষেত্রপাল স্বেচ্ছায় তাঁর সেনাদল নিয়ে 'বি' স্কোয়াড্রনের সাহায্যার্থে এগিয়ে

চললেন। পথে বাসান্তর নদী অতিক্রম করার সময় অরুণ ক্ষেত্রপাল ও তাঁর সৈন্যরা শত্রুপক্ষের একটি শক্ত ঘাঁটির কাছ দিয়েই যাচ্ছিলেন।(বাসান্তর রাভী নদীর একটি উপনদী। আর এই বাসান্তর ফিল্ডের যুদ্ধ ১৯৭১ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল)। সেই সময় শত্রুসেনার দিক থেকে তাঁরা প্রচুর গোলাগুলির নিশানা হন।

সময় তখন খুবই মূল্যবান, আর যাদের সাহায্যার্থে যাচ্ছিলেন সেই 'বি' স্কোয়াড্রন সেক্টরের অবস্থা খুবই জটিল আর বিপদাপন্ন হচ্ছিল। অরুণ সেই মুহূর্তেই আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। বাঁধাধরা নিয়মের তোয়াক্কা না করে সেই সংকটপূর্ণ মুহূর্তে শত্রুসেনার শক্তিশালী ক্ষেত্রগুলি আক্রমণ করতে লাগলেন, তাদের সাঁজোয়া গাড়ির চালকদের গ্রেফতার করে ফেলতে লাগলেন।

এই সময় তাঁর একজন কমান্ডার মারা গেলেন।কিন্তু সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট অরুণ ক্ষেত্রপাল অবিশ্রান্ত আক্রমণ চালিয়ে গেলেন। তিনি তাঁর ট্যাঙ্ক দিয়ে শত্রুর প্রতিরোধ ব্যবস্থা গুঁড়িয়ে দিতে দিতে এগোতে লাগলেন। পদাতিক সেনাদের ধরে ফেলে তাদের অস্ত্র কেড়ে নিতে লাগলেন। এইরকম চলল যতক্ষণ না তিনি শত্রুসেনার অবরোধ গুঁড়িয়ে দিয়ে সময়মত 'বি' স্কোয়াড্রনের কাছে পৌঁছুলেন। সেখানে পৌঁছে দেখলেন শত্রুসেনারা 'বি' স্কোয়াড্রনের উপর তাদের প্রথম হামলা চালানোর পর পিছু হটছে। নিজের দেশকে বাঁচাতে যে বিপুল উৎসাহ নিয়ে তিনি যুদ্ধে এগিয়েছিলেন, সেই উদ্যমেই তিনি পশ্চাৎ অপসারণকারী শত্রুসেনাদের ধাওয়া করলেন। অপসৃয়মাণ ট্যাঙ্কগুলিকে আক্রমণ করতে লাগলেন, এবং একটি ট্যাঙ্ককে ধ্বংস করে ফেললেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই শত্রুসেনা নিজেদের শক্তি সংহত করে, নতুনভাবে সেনাসজ্জা করে এগোতে লাগলো দ্বিতীয়বারের আক্রমণের জন্য। এইবার তারা অরুণ ক্ষেত্রপালের সেক্টরকে, আর দুটি শক্তিশালী ট্যাঙ্ককে তাদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য করল। প্রচন্ড ট্যাঙ্কযুদ্ধের পর দেখা গেল দশটা পাক ট্যাঙ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আর এপক্ষে অরুণ ক্ষেত্রপাল সাংঘাতিক আহত হয়েছেন। তাঁর ওপরওয়ালা তাঁকে নিজের ট্যাঙ্কটি ধ্বংস করে ফেলতে বললেন, কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন, "না, স্যার, আমি আমার ট্যাঙ্ক ছাড়বো না, আমার বন্দুক এখনও সক্রিয় আছে।আমি এই বদমাশদের শায়েস্তা করেই ছাড়বো।"

আহত অবস্থাতেই আক্রমণ চালিয়ে গেলেন অরুণ। এবারে আর একটি পাক ট্যাঙ্ক ধ্বংস করলেন। আর তার ঠিক পরেই একটি শক্তিশালী গোলা এসে তাঁর ট্যাঙ্কে আঘাত করল।সেইস্থানেই তাঁর মৃত্যু হল।

তাঁর এই মাটি আঁকড়ে দাঁড়িয়ে থেকে লড়াই করার জন্যই শেষ পর্যন্ত সে যাত্রা একটিও শত্রুট্যাঙ্ক ভারতের সীমা অতিক্রম করে দেশের মধ্যে ঢুকতে পারেনি। তিনি সেদিন কমান্ডারের নির্দেশমত নিজের ট্যাঙ্ক ধ্বংস করে দিয়ে পিছিয়ে এলে, হয়তো যুদ্ধের চিত্রটা অন্যরকম হত।

এই যুদ্ধে তাঁর যাবার কথা ছিল না। তিনি নিজে থেকে এগিয়ে গিয়েছিলেন ‘বি’ স্কোয়াড্রনকে সাহায্য করতে। তাঁর চিন্তায় দেশ একটাই, তাকে রক্ষা করার জন্য নিয়ম বা নির্দিষ্ট সরকারী কর্তব্যের থেকে বড়ো হল দেশের প্রতি কর্তব্য, কোনও নিয়মের গণ্ডিতে সেই কর্তব্যবোধকে বাঁধা যায়না।

তাঁর এই মৃত্যু আত্মত্যাগের এক সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই বীরত্বের জন্য তিনি্ মরণোত্তর ‘পরম বীর চক্র’ পুরস্কার পেয়েছিলেন। এই শহীদের স্মরণে ভারতীয় সেনা মহাবিদ্যালয় তাদের অডিটোরিয়ামটির নাম রেখেছেন ‘ক্ষেত্রপাল অডিটরিয়াম’। সেখানে সকল নতুন অফিসাররা শপথ গ্রহণ করেন।একাডেমির সদর দরজাটির নামকরণও হয়েছে তাঁর নামে। ন্যাশনাল ডিফেন্স একাডেমিও তাদের একটি মাঠের নাম রেখেছে ‘ক্ষেত্রপাল গ্রাউণ্ড’। ভারতীয় সেনাবাহিনী তাঁর ব্যবহৃত বিধ্বস্ত ট্যাঙ্কটিকে পরে উদ্ধার করে এনে সারিয়ে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছিল, যেটি বর্তমানে সসম্মানে রাখা আছে আহমেদনগরে ‘আরমারড কর্পস্ সেণ্টার এণ্ড স্কুলে’।

ক্যাপ্টেন মনোজ কুমার পান্ডে

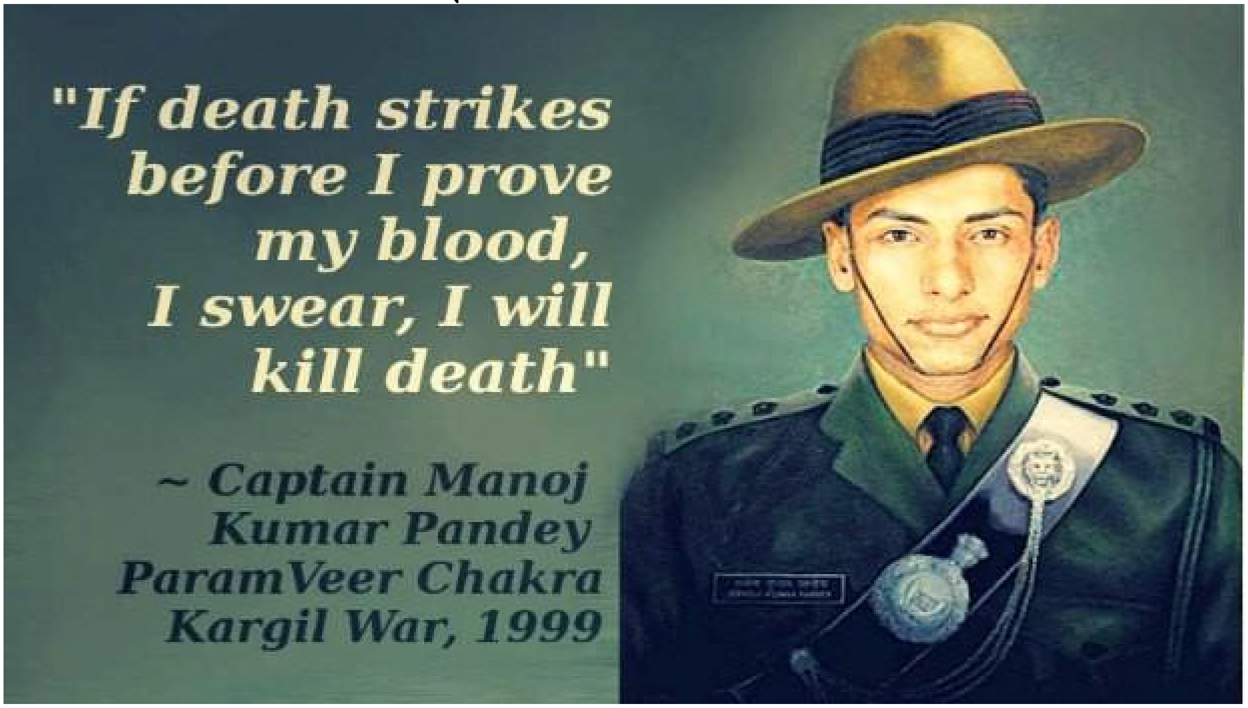

ক্যাপ্টেন মনোজ পান্ডে ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর ১/১১ গোর্খা রাইফেলস্ এর একজন সাহসী সৈনিক। ১৯৯৯ সালের কার্গিল যুদ্ধে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বীরের মৃত্যু বরণ করেছিলেন। উত্তরপ্রদেশের সীতাপুরের ছেলে, মেধাবী এবং অত্যন্ত সাহসী। মিলিটারিতে যোগদানের সময় ইন্টারভিউয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কেন তিনি মিলিটা্রিতে যোগ দিতে ইচ্ছুক। তাঁর সরাসরি উত্তর ছিল পরম বীর চক্র পাওয়ার জন্য তিনি মিলিটারিতে যোগ দিতে চান। মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে, কার্গিল যুদ্ধে,

অপারেশন বিজয় অভিযানে গিয়ে আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে তাঁর সেই ইচ্ছা পূরণ হয়েছিল।

কার্গিল যুদ্ধে তাঁর দায়িত্ব ছিল অনুপ্রবেশকারী পাক সেনাদের তাড়িয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অধিকৃত বাঙ্কারগুলি দখলমুক্ত করা। সেই বাঙ্কারগুলি দখলমুক্ত না করলে ভারতীয় সেনাদের প্রকাশ্য দিবালোকে খোলা জায়গা থেকে যুদ্ধ করতে গিয়ে শত্রুর নিশানায় এসে বিনা বাধায় মৃত্যুবরণ করাই ছিল ভবিতব্য। এই দখলদার অনুপ্রবেশকারীদের হাত থেকে অধিকৃত অঞ্চলে থাকা ভারতীয় সেনাদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল বাঙ্কারগুলি পুনর্দখলের অভিযানের নামই ছিল অপারেশন বিজয়।

কাজের ভার নিয়ে প্রথমেই তিনি তাঁর প্লেটুনকে ঘন ঘন শত্রুসেনার ফায়ারিংয়ের মধ্য দিয়েই অত্যন্ত ক্ষিপ্রতা আর দক্ষতার সঙ্গে, একটি নিরাপদ সুবিধাজনক স্থানে নিয়ে গেলেন। তাঁর প্রধান কর্তব্য ছিল দখল হয়ে যাওয়া জুবার টপ দখল করা। সেই জায়গাটি ছিল সেনা সংস্থাপনের পক্ষে খুবই সুবিধাজনক অবস্থানে। সেইসময় আশ পাশের উঁচু জায়গা থেকে তাদের উপর প্রচন্ড গোলাবর্ষণ হচ্ছিল। তারপর তিনি প্লেটুনের একটি অংশকে ভার দিলেন ডানদিক থেকে শত্রুসেনাদের তাড়িয়ে দিতে, আর নিজে গেলেন বাঁদিকের দখলদারদের তাড়িয়ে দেবার কাজে।

এবার তিনি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলেন। নির্ভীকভাবে শত্রুসেনাদের দিকে ফায়ার করতে করতে এগোতে লাগলেন, পরপর চারজন শত্রুসেনাকে হত্যা করে কিছুক্ষণের মধ্যেই শত্রুসেনা অধিকৃত প্রথম ও দ্বিতীয় বাঙ্কার দুটি দখল করে নিলেন। এইসময় তিনি কাঁধে আর পায়ে ভীষণ আঘাত পান, কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই তিনি ফায়ার করতে করতে এগিয়ে যান ও তৃতীয় বাঙ্কারটিও দখলমুক্ত করেন। এবার তিনি সহযোদ্ধাদের সঙ্গে নিয়ে চতুর্থ বাঙ্কারের দখল নিতে এগিয়ে চলেন এবং গ্রেনেড ছুঁড়ে শেষ বাঙ্কারটিও দখল করে নেন।

এইসময় গ্রেনেডটি ফেটে এসে তাঁর কপালেও লাগে এবং ভীষণ আঘাত পান, গভীর ছিল সেই ক্ষত। সেইসময় তিনি চতুর্থ বাঙ্কারটির মধ্যে পড়ে যান। ক্লান্ত অবসন্ন আর আহত দেহে, কপালের আঘাতই তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়। সহযোদ্ধাদের প্রতি তাঁর শেষ নির্দেশ ছিল "না ছোড়নু"- নেপালি ভাষায় যার অর্থ ওদের ছেড়োনা- ডোন্ট স্পেয়ার দেম। তাঁর এই আত্মদানের ফলে ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষে, বাটালিক সেক্টরের খালুদুর পুনর্দখল করা সম্ভব হয়েছিল। আর তিনি পেয়েছিলেন তাঁর সেই স্বপ্নের পরম বীর চক্র- যদিও তাঁর বৃদ্ধ পিতাকে হাতে করে গ্রহণ করতে হয়েছিল সেই পুরস্কার।

পূর্বপ্রকাশিতের পর

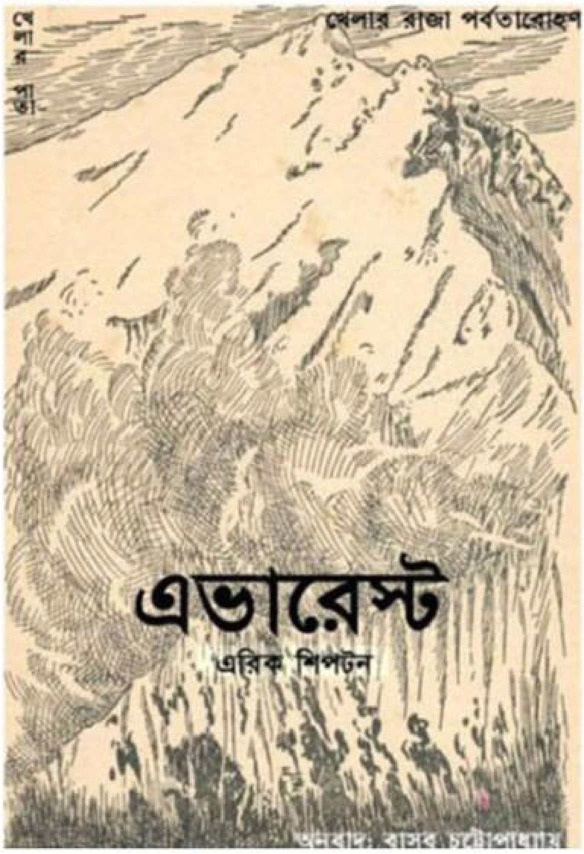

আমি তখন ক্লান্ত, নিঃশেষিত। স্থান পরিবর্তন করে নতুন উদ্যমে স্মাইথকে সাথে নিয়ে অগ্রসর হতে প্রস্তাব দিলাম। উভয়েই এ ব্যাপারে যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও ওয়েগারের ভয়ংকর রকম শ্বাসকষ্ট শুরু হল। ওয়েনকেও খুবই ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। তবুও বাড়ির তৈরি ফলের রস পান করে তাঁরা পঞ্চম শিবিরের দিকে নামতে থাকলেন।

খুব তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে পাহাড়ে আমার সে রাত কেটেছিল। তুষারের উপর তাঁবু স্থাপনের পর শরীরের তাপমাত্রায় তাঁবুr মেঝের বরফে গর্ত হয়ে যায়। ঢালু হয়ে যাওয়া বরফের মেঝের সবচেয়ে নীচে অমন একটা গর্তে আমার রাতের স্থান জুটেছিল। স্মাইথেরও সে রাত অনিদ্রাতেই কাটল। নিজেকে সুস্থ, সচল এবং ঠান্ডার দংশন থেকে বাঁচতে গোড়ালি দিয়ে অনবরত নিজেকে আঘাত করতে থাকলাম। দমবন্ধ পরিবেশে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে এ কাজ চলল সারা রাত। ভোর হতে তখন কয়েক ঘন্টা বাকি। অসম লড়াইয়ের সামিল হয়ে আরোহণের জন্য প্রস্তুত হলাম।

আলো ফোটার আগেই তুষারপাত শুরু হল। সঙ্গে শুরু হল মিহি তুষার সহ ঝোড়ো হাওয়া। এই অবস্থায় অগ্রসর হওয়ার কথা চিন্তা করাই মূর্খামি। আমরা সেদিন ষষ্ঠ শিবিরে অপেক্ষা করবো বলে মনস্থির করলাম। উপলব্ধি করলাম, শীর্ষারোহণের ক্ষীণ আশাও হারিয়ে যাচ্ছে। তার প্রধানতম কারণ দিনের শুরুতেই তুষারপাত, অভিযানে বিপদের সম্ভাবনা তৈরি করে।

দ্বিতীয়তঃ অতি উচ্চতায় অক্সিজেনের অভাব শারীরিক সক্ষমতার প্রতিনিয়ত অবনতি ঘটাতে থাকছে। ক্ষুধা এবং আচ্ছন্নভাব শরীরকে দুর্বল করে দিচ্ছে। এ অবস্থায় ২৭,৪০০ ফুট উচ্চতায় কতক্ষণ জীবিত অবস্থায় থাকা যাবে –কয়েকটি প্রশ্নচিহ্নের সামনে অভিযাত্রীদের দাঁড় করালো।

(i)এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি কি ক্ষণিকের?

(ii)অভিযাত্রীরা কি বিশ্রামের মধ্যেই চিরনিদ্রার জগতে চলে যাবেন?

দুপুরে ঝোড়ো হাওয়ার দাপট কমেছে। তবুও আজকের দিনটা যদিও খুব চিত্তাকর্ষক নয়। তাঁবুর ভিতরের ছোট্ট জানলার পর্দা তুলে শৃঙ্গশীর্ষ দেখতে পেলাম। শীর্ষ শিবিরের মধ্যবর্তী সামান্য স্থানই দেখা গেল। ১৬০০ ফুট খুব বেশি দূরে নয়। পাথরের গায়ে ঝুরো বরফের আস্তরণ না থাকলে এক ঘন্টায় যে কোন পর্বতারোহী অনায়াসে এই উচ্চতা আরোহণ করতে পারবেন। কিন্তু আমরা তখন এতটাই দুর্বল যে, এই সুন্দর আবহাওয়ার সুযোগ নিয়ে শীর্ষকে আঁকড়ে ধরার মত শারীরিক এবং মানসিক অবস্থা আমাদের ছিল না। দূর্বল মানসিক অবস্থা আমাদের তীব্র যন্ত্রণাবোধের জন্ম দিচ্ছিল।

পরবর্তী রাত্রি যেন আগের রাতের ফোটোকপি। ভোর তখন তিনটে। বরফ গলিয়ে জল তৈরি করে কফি বানালাম। ঠান্ডায় শক্ত হয়ে যাওয়া জুতোকে নরম করা সময়সাপেক্ষ। জুতো দুটো যেন দুটো পাথরের টুকরো। রাতে জুতোজোড়া বিছানার গরমে নিজের কাছে নিয়ে শুয়েছিলাম নমনীয় রাখার জন্য। কিন্তু তাতেও কোনো ফল না হওয়ায় মোমবাতির শিখায় সেঁকে জুতো জোড়া নরম করার আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকলাম। সে চেষ্টায় জুতোর ওপরের অংশ নরম হলেও পায়ের পাতার

অংশে নমনীয়তার কোনো চিহ্ন দেখা গেল না। পায়ে প্রত্যেকে দুজোড়া করে মোজা, গায়ে সাতটি সোয়েটার, উইন্ডচিটার, উলের টুপি এবং মাথায় হেলমেট পরে নিলাম। হাত- জোড়া, উলের এবং ভেড়ার চামড়ার গ্লাভস দিয়ে রক্ষা করলাম। আরোহণের সবরকম সরঞ্জামে নিজেদের সাজিয়ে শীর্ষারোহণের জন্য প্রস্তুত হলাম। উষাকালের অপেক্ষায় আকাশের দিকে তাকিয়ে সময় কাটতে থাকল।

সকাল সাড়ে সাতটায় আমরা অগ্রসর হলাম। সুন্দর সকাল, কিন্তু তীব্র ঠান্ডা। পেটে অসহ্য একটানা যন্ত্রণা ও দুর্বল শরীর নিয়েও গ্রেট কুলিয়ারের উদ্দেশ্যে আড়াআড়ি আরোহণ শুরু করলাম। পথ খুব কঠিন ও খাড়াই নয়। অনেকটা যেন ছাদের উপর পাথরের টালি দিয়ে সাজানো। কিন্তু পিচ্ছিল পথে সন্তর্পণে ধীরে এগোনোই নিরাপদ। ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে ইয়েলো ব্যান্ডের অধিকাংশ স্থানই তখন বরফমুক্ত। কিন্তু পাহাড়ের ফাটল ও গালি, গুঁড়ো বরফে আচ্ছাদিত হওয়ার প্রতিটি পদক্ষেপের চিহ্ন মুছে যাচ্ছিল। ফলে দ্রুত আরোহণ সম্ভব হচ্ছিল না। ধীরে আত্মবিশ্বাসের সাথে আমরা এগিয়ে চললাম।

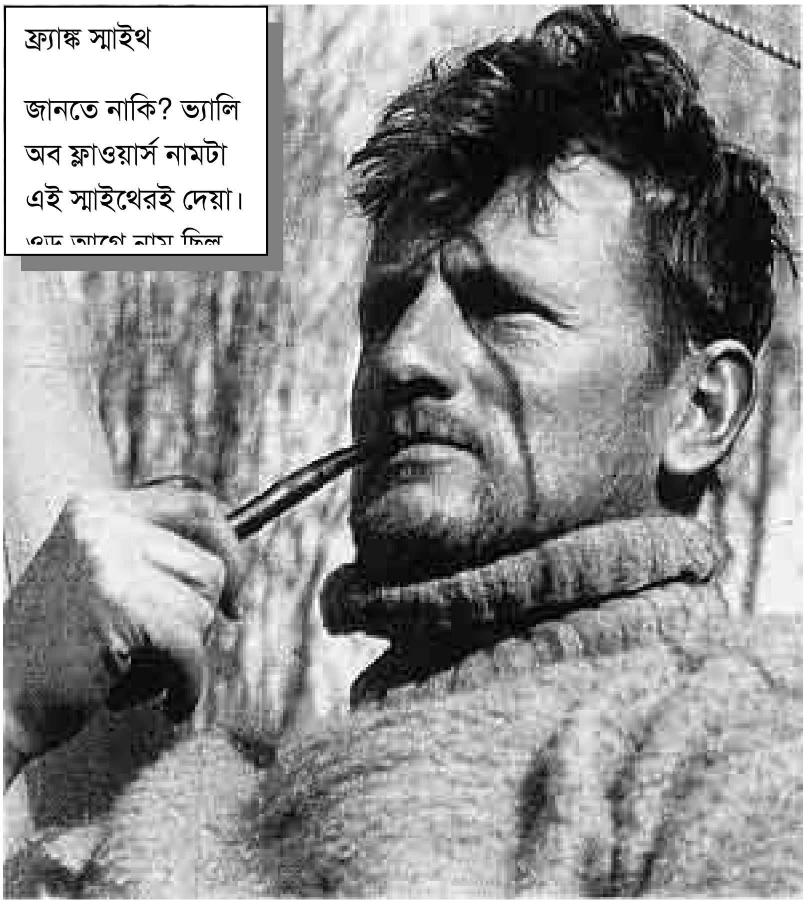

ঘন্টাদুয়েক এভাবে আরোহণের পর আমি তখন ক্লান্ত, বিধ্বস্ত। দড়ির একপ্রান্তে বাঁধা অবস্থায় নিজের শরীরকে টেনে নিয়ে চললাম অজানার উদ্দেশ্যে। অনুভব করলাম এই শারীরিক অবস্থায় কোনো জরুরি মুহূর্তেই সহঅভিযাত্রী স্মাইথের দিকে আমার সাহায্যের হাত বাড়ানো সম্ভব হবে না। যদিও আমাদের অভিযান একটি কঠিন নিয়মের বেড়াজালে বাঁধা ছিল। পথে কারও অন্তিম বিপদ (মৃত্যু) না ঘটলে কেউ কাউকে ত্যাগ করে অগ্রসর হব না। ফলে একজন অসুস্থ, অশক্ত অভিযাত্রীকে সঙ্গে নিয়ে এই আবহাওয়ায় সহঅভিযাত্রীর পক্ষে দুর্গম, দুস্তর পথের মোকাবিলা করা প্রায় অসম্ভব।

আমি আর অগ্রসর না হবার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলাম। স্মাইথ এগিয়ে চললেন একা।

ক্রমশ

“হিমালয়ের কাছে যেতে হলে নতজানু হয়ে যাও। যদি তাঁর সৌন্দর্য, রাজকীয়তা এবং শক্তিকে শ্রদ্ধা করতে পারো, তোমার প্রাপ্য তুমি পাবে। যদি অন্ধের মতো, উদ্ধতের মতো তাঁর কাছে যাও, তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। অন্য পর্বত ভুলত্রুটি বা ঔদ্ধত্য ক্ষমা করতে পারে, হিমালয় করে না।” - ফ্র্যাঙ্ক স্মাইথ, কিংবদন্তি ব্রিটিশ

উচ্চতার হিসেবে অন্নপূর্ণা (৮০৯১ মিটার) বিশ্বের ১০ নম্বর পর্বতশৃঙ্গ। ১৯৫০ সালে ৮০০০ মিটারের চেয়ে উঁচু প্রথম শৃঙ্গ হিসেবে অন্নপূর্ণা জয় করেন মরিস হারজগের নেতৃত্বে এক ফরাসী অভিযাত্রী দল। আটহাজারি শৃঙ্গগুলিতে মোট ২২টি বিফল অভিযানের পর তাদের এই সাফল্য সারা বিশ্বে হৈচৈ ফেলে দেয়। জয়ঢাকে ধারাবাহিকভাবে চলছে সেই অভিযান নিয়ে হারজগের লেখা রুদ্ধশ্বাস কাহিনী। এবারে চতুর্থ পর্ব।

শীর্ষচিত্রঃ দক্ষিণ বেসক্যাম্প থেকে অন্নপূর্ণা; ফোটোঃ মোহন কে. দুয়াল

পরদিন সকালে ঘোড়ায় চড়ে কালী গন্ডকির বিশাল পাথুরে গিরিখাত পেরিয়ে রওনা দিলাম। শেরপারা আমাদের লারজুং হয়ে নিয়ে গেল। বোঝাই গেল যাবার পথে ওরা লারজুং- এর জপযন্ত্রগুলো একবার করে ঘুরিয়ে যেতে চায়, তাই এই ব্যবস্থা। জায়গাটা অবশ্য অসাধারণ সুন্দর। দুপাশের বাড়ি থেকে এগিয়ে আসা ছাদে সরু সরু গলিগুলো ঢাকা, দেখে মনে হয় শীতকালে এখানে প্রচুর তুষারপাত হয়। আরও আধমাইল মত এগিয়ে ঘোড়াগুলোকে ছেড়ে দিলাম। সবুজ ঘাসে ঢাকা বিস্তীর্ণ পাহাড়ের ঢালে দলে দলে ইয়াক আর গরু চরে বেড়াচ্ছে, আমাদের ঘোড়াগুলিও ব্যস্ত হয়ে তাদের সঙ্গে ঘাস খাওয়ায় যোগ দিল। আমরা যে দিকে যাব সে রাস্তার দুপাশে সারি দিয়ে গাছ, তাতে লাল আর গোলাপী প্রচুর ফুল ফুটে আছে, মিষ্টি গন্ধ আসছে। এরকম স্বর্গীয় পরিবেশে ঘড়ি ধরে চলা খুব শক্ত। আজ কুলিরা যতবারই বিশ্রাম চাইল, আপত্তি করলাম না আমরা। শেরপারা একটু অবাক হল। ভাবতে খুবই অদ্ভুত লাগে, এই পুষ্পিত বৃক্ষরাজি আর সবুজ ঘাসে ছাওয়া পাহাড়ি ঢালের গভীর প্রশান্তি থেকে মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে একটা সমীহ- উদ্রেককারী, ভয়ানক ও বিস্তীর্ণ হিমবাহে পৌঁছে যাওয়া যায়।

আমরা বড় গাছপালার সীমানা বা ট্রি- লাইন পেছনে ফেলে এগিয়ে চললাম। এই উচ্চতায় জায়গায় জায়গায় কিছু ছোট ঝোপ ছাড়া আর কোনও সবুজ নেই। মাঝে মাঝে কয়েক ফালি তুষার জমে আছে। কুলিরা মাল নিয়ে বেশ মসৃণভাবেই উঠে এল। সন্ধেবেলা, হিমবাহের আগে শেষ পাথুরে জমিতে আমাদের বেস ক্যাম্প স্থাপন করা হল।

আমাদের সঙ্গে যে রেডিও সেটটি আছে তার মাধ্যমে ছ'মাইল ব্যাসার্ধের ভেতর যোগাযোগ করা যায়। সেটটা চালু করে তুকুচায় কথা বললাম, "হ্যালো, আইজ্যাক। আমরা ঠিকমত পৌঁছে গেছি। এদিকে আবহাওয়া একটু মেঘলা, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। তোমাদের খবর কী?"

"নোয়েল কাল রওনা দিয়ে তোমাদের সঙ্গে যোগ দেবে। এদিকে কোজি আর শ্যাজ ফিরে এসেছে।"

"ও, তাই! অন্নপূর্ণার কী খবর?"

"ওরা মিরিস্তি খোলা বরাবর তিনদিন ধরে হেঁটে গেছে, শেষমেশ মিরিস্তি খোলার গিরিখাতের শেষে যে গিরিপথ মত আছে সেখানে পৌঁছতে পেরেছে।"

"বাঃ, দারুণ! তারপর?"

"গিরিপথটা পেরিয়ে ওরা অন্নপূর্ণার মূল গিরিশিরাগুলির একটা থেকে নেমে আসা একটা উপ- গিরিশিরার তলায় পৌঁছেছিল।"

"যেটা অডটের সঙ্গে ওরা ২৭শে এপ্রিল দেখেছিল?"

"ঠিক তাই। এই উপ- গিরিশিরাটা নাকি একটা বিশাল ব্যাপার। ওপরে গিয়ে সম্ভবত ওটা মূল গিরিশিরায় মিশেছে, কিন্তু নিচ থেকে সংযোগস্থলটা দেখা যায় না।"

"আর এগোয় নি ওরা?"

"না। ওরা বলছে ওখান থেকে সেই উপ- গিরিশিরাটা ঘুরে অন্নপূর্ণার উত্তরগাত্রের দেখা পাওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।"

"ও, তাহলে তিলিচো পাসের কোনও খোঁজ ওরা পায় নি!"

"কোনও পাসের কোনও চিহ্নই নেই। তিলিচো পাস যদি সত্যিই কোথাও থাকে, সে অন্য কোথাও আছে।"

"হুমমম। তিনিগাঁওয়ের সেই শিকারি তাহলে ঠিকই বলেছিল।"

পরদিন ভোরে আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বেরিয়ে পড়লাম; খুব দ্রুত হিমবাহের হিমানী- প্রপাতের (ice-fall) দিকে এগিয়ে চললাম। সামনে থেকে আধো- আলো আধো- অন্ধকারে হিমানী- প্রপাতটিকে বেশ ভয়ঙ্কর লাগছিল। আমাদের দল ছ'জনের – আমি, ল্যাচেনাল ও রেবুফত, আর শেরপাদের মধ্যে আং থারকে, ফু থারকে এবং সরকি। অভিযানে এই প্রথম শেরপারা এমন একটা পরিস্থিতির সামনে পড়ল যেখানে পর্বতারোহণের বেশ কঠিন কলাকৌশল জানা দরকার।

হিমবাহটা বরফের ফাটল বা ক্রিভাসে ভর্তি। ফাটলের ওপর প্রাকৃতিক বরফের সেতু বা স্নো ব্রিজ খুঁজে খুঁজে আমাদের এগোতে হচ্ছিল। পাশের খাড়া পর্বতপ্রাচীরের গায়ে বড় বড় বরফের চাঙড় বিপজ্জনকভাবে ঝুলে আছে, যেন যে কোনও সময় ভেঙে পড়বে। কখনও কখনও বাধ্য হয়ে সেগুলোর তলা দিয়ে যেতে হল, অন্য কোনও রাস্তা নেই। পায়ে ক্র্যাম্পন বেঁধে কঠিন বরফে চড়াই উঠতে উঠতে মাঝে মাঝেই চোখ চলে যাচ্ছিল সেই দৈত্যাকৃতি চাঙড়গুলোর দিকে।

ধীরে ধীরে ঢালটা আরও খাড়াই হল, আইস- অ্যাক্স দিয়ে কঠিন বরফে সিঁড়ির মত ধাপ কেটে কেটে আমাদের এগোতে হচ্ছিল। পিঠে চল্লিশ পাউন্ডেরও বেশি ওজনের একেকটা রুকস্যাক নিয়ে শেরপাদের খুবই কষ্ট হচ্ছিল উঠতে। বেলা ১১টা থেকেই মেঘ জমতে শুরু করেছিল, হঠাৎ আবহাওয়া খুবই খারাপ হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি একটা মোটামুটি সমতল জায়গা খুঁজে তাঁবু ফেলতে হল যেখানে

তুষারধ্বসের সম্ভাবনা কম। তখন সবে ২টো বাজে, হিমবাহের দৈর্ঘ্য বরাবর মাত্র অর্ধেকটা আমরা পার হয়েছি, তুষারপাত শুরু হয়ে গেল। বিকেলটা নষ্ট হল। তারপর খুব অস্থির একটা রাত কাটল, সারা রাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারলাম না।

ধৌলাগিরি ও তার পূর্ব হিমবাহ, বাঁদিকে ধৌলাগিরির দক্ষিণপূর্ব গিরিশিরা; ছবিঃ আন্তর্জাল

পরদিন অন্ধকার থাকতেই উঠে পড়লাম। প্রতিদিনই দেখছি দুপুর ২টোর পর যে কোনও সময় আবহাওয়া খারাপ হয়ে যেতে পারে; তারপর সন্ধ্যে অবধি শুধু গুরুগুরু মেঘের গর্জন আর চারপাশের পর্বতগাত্রে তার প্রতিধ্বনি। ক্যাম্পের ওপরের প্রথম চড়াইটা যখন পেরিয়ে গেলাম তখন ভোরের আলো সবে ফুটছে। আমাদের রুকস্যাকে বোঝাই আইস-পিটন, হাতুড়ি, ক্যারাবিনার ইত্যাদি পর্বতারোহণের জরুরী জিনিসপত্র – তাদের ঠোকাঠুকির সুমধুর আওয়াজ পিঠের পেছন থেকে কানে আসছিল। সমস্তরকম কঠিন পরিস্থিতির জন্য আমরা প্রস্তুত হয়ে বেরিয়েছিলাম। ভোরবেলার এই ঠাণ্ডায় বরফ একদম পাথরের মত শক্ত। শেরপারা তাদের ক্র্যাম্পন ঠিকঠাকই ব্যবহার করছিল, কিন্তু আমাদের তুলনায় ওদের গতি মন্থর। আর তুকুচার দক্ষিণের সেই পাহাড়ের ওপর থেকে যেমনটি দেখেছিলাম, হিমবাহের ডানতীর (True Right Bank) ধরে এগোনোটাই দেখলাম সবচেয়ে ভালো (এবং হয়তো একমাত্র) রাস্তা।

প্রায় ১৬০০০ ফিট উচ্চতায় উঠে বেশ হাঁপ ধরতে লাগল। বিশ্রামের জন্য দাঁড়ালে শেরপারা তাদের আইস-অ্যাক্সের ওপর ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে একরকম তীক্ষ্ণ শিসের মত বিচিত্র আওয়াজ করে ফুসফুসটা পুরো খালি করে দেয়। এর আগে নিচের দিকে ট্রেকিং-এর সময় কিছু কুলিকেও এরকম করতে দেখেছি, তাই ব্যাপারটা বেশ পরিচিত হয়ে গেছিল। আমার মনে হচ্ছিল, ল্যাচেনাল আর রেবুফতের থেকে অক্সিজেনের অভাবটা আমি কম অনুভব করছিলাম; একটু কম হাঁপ ধরছিল। এটা মনে হয় দিনকয়েক আগে ১৬০০০ ফিটের বেশি উচ্চতায় দু'তিন রাত কাটানোর সুফল। এই অভিজ্ঞতার পরই ঠিক করলাম চূড়ান্ত অভিযানের আগে আমাদের দলের প্রত্যেককে ১৬০০০ থেকে ২০০০০ ফিট উচ্চতার মাঝে কিছু রাত কাটিয়ে অতি-উচ্চতার সাথে সড়গড় হয়ে নিতে হবে।

দুপুর হয়ে গেল। হিমানী প্রপাতের ওপরের ছোট্ট সমতল জায়গাটা তখনও ৩০০ গজ দূরে। হিমবাহের চলন অনেকটা নদীরই মত। সমতল পেলে শান্তভাবে নিজেকে ছড়িয়ে দেয়, আবার তার পরই খাড়াই ঢাল বরাবর দুর্দমনীয় জলপ্রপাতের মত ঝাঁপ দেয়। আমাদের এই হিমবাহটির ৩০০ গজের এই শেষ প্রতিরোধ কী করে সামলাব মাথায় তখন সেই চিন্তা। ল্যাচেনাল বলল, "ব্যাপার মোটেই সুবিধের ঠেকছে না।"

"হুমম, খাড়াই ঢালটা বেয়ে কত বরফের চাঙ্গড় গড়িয়ে পড়েছে দেখ," বলল রেবুফত।

বললাম, "পুরো খাড়াইটাই কঠিন বরফ। আর খাড়াই বলে খাড়াই! এ একটা ভদ্রলোকের মত রাস্তা হল? তার চেয়ে হিমবাহটা পেরিয়ে বাঁ তীর (True Left Bank) দিয়ে চেষ্টা করি চলো।"

"হুম, তবে ওদিকে যাবার আগে এদিকটা একবার চেষ্টা করে দেখলে হয়," রেবুফত বলল।

"বেশ, দেখো। তুমি আর ল্যাচেনাল দুজনেই যাও। শেরপাদের সঙ্গে অপেক্ষা করছি আমি।"

মুহূর্তের মধ্যে সেই কঠিন সবুজ বরফের ঢাল বেয়ে বেশ খানিকটা উঠে গেল দুজন। "দারুণ, চালিয়ে যাও," চেঁচিয়ে উৎসাহ না দিয়ে পারলাম না আমি। ওদের কেরামতি দেখে মন ভালো হয়ে গেল, আর শেরপারা তো অবাক!

কিছুক্ষণ পর ল্যাচেনালের গলা পাওয়া গেল, "মরিস, হিমবাহ পেরোনোর দরকার নেই। তুমি উঠে আসতে পারবে। আরেকটু এগোলেই সমতল জায়গাটা পেয়ে যাবার কথা।"

"ঠিক আছে, সাবধানে এগোও।"

আকাশটা ঘোলাটে হয়ে গেছে। প্রতিদিনের মত আজও ঝড় আসছে মনে হয়। ল্যাচেনাল আর রেবুফত খুবই বিপজ্জনক জায়গায় আছে। যে কোনও সময় ঢাল বেয়ে তুষারধ্বস নামতে পারে।

শেরপাদের বললাম, "চলো, আমরাও এগোই।" ওরা খুব খুশি হল বলে মনে হল না। ওদের জন্য বরফের ঢালে আমায় বড় বড় করে ধাপ কাটতে হল, হাতে ধরার জন্যও খুপরির মত হোল্ড কাটতে হল, নইলে পিঠের বোঝার ভারে ওরা খাদের দিকে উল্টে যেতে পারে। ঢালটা এতটাই খাড়াই যে সোজা হয়ে দাঁড়ালে একজন অনায়াসে বরফের দেওয়ালটা একটু চেটে দেখতে পারে।

"যাচ্চলে, এবারে কী হবে?", ওপর থেকে একটা গলা পেলাম।

"যাঃ, এতো দেখছি পুরো হিমবাহটার প্রস্থ বরাবর বিশাল এক ফাটল!", অন্যজন বলল। দুজনেই খুব শাপশাপান্ত করছে শুনলাম।

"ডিঙনো যাবে না?", চিৎকার করে বললাম আমি, "তাহলে হিমবাহটা সেই পেরোতেই হবে আর কি! ওই পারে হয়তো রাস্তা পাওয়া যাবে।"

হালকা তুষারপাত শুরু হয়ে গেছে। মেঘটা খুব নিচে নেমে এসেছে, আর অনবরত গুড়গুড় করে ডেকে আমাদের স্নায়ুর পরীক্ষা নিচ্ছে। আমাদের ছ'জনের অবস্থানই তখন খুব ভয়ানক জায়গায়, চারদিকের খাড়া পাহাড়ের গায়ে বিরাট বিরাট বরফের চাঁই বিপজ্জনকভাবে ঝুলছে। হিমবাহটির অভাবনীয় প্রতিরোধের সামনে আমরা প্রায় দিশাহারা; তার জায়গায় জায়গায় ফাটল ধরার আওয়াজ আসছে; আর তাতে আমাদের পায়ের তলার বরফ কেঁপে কেঁপে উঠছে। আলো খুবই কমে এসেছে।

ল্যাচেনাল আর রেবুফতও যথেষ্ট বেকায়দায় পড়েছে। তাও হিমবাহ পেরিয়ে কোনও রাস্তা পাওয়া যায় কিনা দেখার জন্য ওরা একটা মরিয়া চেষ্টা করল। আমরা প্রায় শ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করলাম। হিমবাহ মাঝে মাঝেই ভূমিকম্পের মত কেঁপে উঠছিল। বিমর্ষভাবে ফিরে ওরা বলল, "নাঃ, ওদিকেও কোনও রাস্তা নেই।"

সন্দেহের সুরে বললাম, "হুম, ব্যাপারটা ঠিক হজম হচ্ছে না। যাক গে... কিছুই যখন করার নেই..."

রেবুফত বলল, “মরিস, আমাদের মনে হয় নিচে নেমে যাওয়াই উচিত। এ জায়গাটা খুব একটা নিরাপদ নয়।”

ওর কথা শেষ হয়েছে কি হয়নি, চড়- চড়- চড়াৎ করে একটা তীব্র দীর্ঘ ফাটল ধরার আওয়াজ হল। আমরা সঙ্গে সঙ্গে দুহাত দিয়ে মাথা ঢেকে বরফের ওপর উবু হয়ে মুখ গুঁজে বসে পড়লাম। কিন্তু নাঃ, আমাদের পালা তখনও আসে নি!

“নিচে চলো, ধ্বস নামবে,” ল্যাচেনাল চীৎকার করে উঠল, “এক্ষুনি নিচে নামো সব।”

“চলো ফিরে যাই এখান থেকে,” রেবুফত বলল। অনবরত বজ্রপাতের শব্দ আমাদের আশঙ্কা আরও বাড়িয়ে তুলল। একে ঠিক ফিরে যাওয়া বলা যায় কি? একে বলে পালিয়ে যাওয়া! ছোবল মারতে উদ্যত রণসাজে সজ্জিত পর্বত থেকে ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়ে যাওয়া!

“ভাগ্য খুব ভালো থাকলেই বেঁচে ফিরব আজ,” ওর শেরপার সাথে পড়িমরি নামতে নামতে কোনওমতে বলল ল্যাচেনাল।

“জলদি চলো ভাইয়া, জলদি জলদি,” আমি আমার রোপ- এ বাঁধা শেরপার উদ্দেশে চীৎকার করে বললাম। মনে হচ্ছিল আমার সঙ্গীই সবচেয়ে মন্থর। একে একে সেই খাড়া বরফের দেওয়াল বেয়ে নেমে এলাম আমরা। ঠিক তখনই শুরু হল প্রচণ্ড তুষারঝড়। গতি নিয়ন্ত্রণ করতে হল আমাদের। তাড়াহুড়ো করে নামাটা এখন বিপজ্জনক, প্রতিটা পদক্ষেপ খুব সাবধানে ফেলা উচিত।

“শেরপাদের দিকে খেয়াল রেখো, কারও সাথে যেন ছাড়াছাড়ি না হয়,” সেই হাওয়ার মধ্যে গলা চড়িয়ে ল্যাচেনালকে বললাম। ল্যাচেনাল খুব দ্রুত নামছিল, ওর সাথে পাল্লা দেওয়া শেরপাদের পক্ষে কঠিন। “আরে এখনও অনেক রাস্তা নামতে হবে। জলদি না করলে হবে?”, বিন্দুমাত্র গতি না কমিয়ে জবাব দিল ল্যাচেনাল।

খানিক নিচে নামার পর হাওয়ার জোর কিছু কমল। বিপজ্জনক ঢালটা থেকে নেমে আমরা তখন মোটামুটি নিরাপদ জায়গায়।

“ইসস্, আর একটু হলেই হিমবাহটা পেরিয়ে যেতাম আজ...!”

“এরকম পরিস্থিতি ও আবহাওয়ায় গাজোয়ারি করে এগোনোটা মোটেই ঠিক নয়।”

মনে মনে ভাবলাম, হিমবাহটা যদি পেরোতেও পারতাম আমরা, এই রুট ধরে অভিযানের পুরো দলকে ওপরে নিয়ে যাওয়া একটা উন্মাদের মত সিদ্ধান্ত হবে। জেনেশুনে এরকম মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ রাস্তায় সঙ্গীদের উঠতে বাধ্য করা কখনওই উচিত নয় আমার। গোঁয়ারের মত এ পথে এগিয়ে যদি একটিও প্রাণহানি হয়, শৃঙ্গজয় হলেও তার ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না। জীবন সবার আগে।

তুষারঝড় থেমে গিয়ে তখন তুষারপাত শুরু হয়েছে। চারদিক ঘন কুয়াশায় সাদা হয়ে গেছে; পাঁচ গজ দূরেও কিছু দেখা যাচ্ছে না। তার মধ্য দিয়ে ভূতের মতন আমরা ছ'জন নিচে নেমে চলেছি। দূরে পেছনে অনবরত তুষারধ্বস নেমে চলেছে, তার ভয়ঙ্কর আওয়াজ কানে ভেসে আসছে। সেই প্রলয় থেকে আমরা অক্ষত বেরিয়ে এলাম বটে, কিন্তু দিনটা সারাজীবন একটা দুঃস্বপ্নের মতোই আমাদের মনে থেকে যাবে।

বিকেল পাঁচটা নাগাদ বেসক্যাম্পে পৌঁছলাম। নোয়েল দূর থেকে আমাদের দেখতে পেয়েই চায়ের জল চাপিয়ে দিয়েছিল।

“নোয়েল, তুমি এখানে কবে এলে? গতকাল?”

“হ্যাঁ, রাস্তা চিনতে কোনও অসুবিধে হয় নি আমার। এখানে পৌঁছেই আংদাওয়া ছোকরাকে তুকুচা ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছি। বেকার দুজনে মিলে এখানে বসে বসে অন্নধ্বংস করার কোনও মানে হয় না। তাছাড়া আংদাওয়াকে টেরের দরকার।”

“আজ তাহলে কত তারিখ? আমাদের দিনক্ষণের হিসেব সব গোলমাল হয়ে গেছে।”

"আজ তিন তারিখ।"

"অ্যাঁ, বলো কী? মে মাসের তিন তারিখ হয়ে গেল আজ? বর্ষা নামার আগে আর মোটে একমাস বাকি? বোঝো! আর এদিকে ধৌলাগিরির গায়ে একটা আঁচড়ও কাটতে পারলাম না আমরা! কী করে যে কী হবে! এখান থেকে শেষ চেষ্টা হিসেবে সামনের ওই দক্ষিণ- পূর্ব গিরিশিরাটা ধরে একবার এগিয়ে দেখলে হয়।"

"হুম, আমি আর রেবুফত দেখতে পারি," বলল ল্যাচেনাল।

"বেশ। তোমাদের স্কি চলে এলেই গিরিশিরা ধরে এগিয়ে ওই বরফের উঁচু টিপির মত জায়গাটা অবধি যেতে পারো। ওখান থেকে ধৌলাগিরি দক্ষিণগাত্রের ভালো ছবি পাওয়া যাবে।"

নোয়েল তুকুচার সঙ্গে রেডিওয় যোগাযোগ করার প্রস্তাব দিল।

বলল, "ঘন্টাদুই আগে আইজ্যাকের সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু এরিয়াল থেকে এমন গোঁ গোঁ আওয়াজ হচ্ছে যে কিচ্ছু শোনা যাচ্ছে না। বন্ধ করে দিলাম।"

"বেশ করেছ! এরিয়ালে বাজ পড়ে যদি রেডিওটা নষ্ট হয়ে যেত? আমাদের কিছু হোক না হোক, রেডিও গেলে সর্বনাশ!" ল্যাচেনাল ফোড়ন কাটল।

কিছুক্ষণ পর তুকুচাকে ধরা গেল রেডিওয়।

"হারজগ বলছি। তুকুচার খবর কী?"

"হ্যাঁ, আইজ্যাক বলছি। সব ঠিকঠাক এখানে। তেমন কোনও খবর নেই। টেরে আর অডট আজ সকালে রওনা দিয়েছে ধৌলাগিরির উত্তরদিকে অনুসন্ধান চালাতে। তোমাদের কী খবর?"

"আমাদের? আমাদের খবর হল... ধৌলাগিরির পূর্ব হিমবাহটা পেরিয়ে ওপরে উঠতে পারি নি আমরা... তবে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি।"

"বাঃ, তার মানে ওই রাস্তায় চূড়োয় ওঠা সম্ভব তাহলে?"

"পাগল? এই রাস্তায় কোনও অভিযানের পক্ষেই ওঠা সম্ভব নয়। এ পাহাড়গুলো সব অসভ্য রকমের দুর্গম, এতে চড়া মানুষের কাজ না।"

"তাহলে? কী করবে এখন?"

"আমি কাল নেমে আসছি। ল্যাচেনাল আর রেবুফত দক্ষিণ- পূর্ব গিরিশিরা ধরে এগিয়ে মোটামুটি ১৮০০০ ফিট উচ্চতায় একটা টিপি অবধি যাবে। ওখান থেকে ধৌলাগিরির দক্ষিণগাত্রটা পুরো দেখতে পাবে ওরা।"

হিমালয়ান থর

"ওদের জন্য কিছু পাঠাতে হবে?"

"হ্যাঁ, আরও খাবারদাবার পাঠাও। আর তিনজোড়া স্কি লাগবে ওদের।"

"বেশ। কাল সকাল সকাল ফিরে এলে তোমায় লাঞ্চে থরের মাংস খাওয়াব।"

"থর?"

"হ্যাঁ, থর। হিমালয়ের এক প্রজাতির বুনো লোমশ ছাগল, বেশ বড় বড় হয় (*Thar বা Himalayan tahr*)। জিবি আর এখানকার সেই সুবা আমাদের রাইফেল দিয়ে শিকার করছিল, তিনটে মেরেছে। আমাদের ভাগে একটা পড়েছে।"

"ওঃ, তাহলে তো কাল নেমে আসতেই হচ্ছে! আর টেরে? সে থরের মাংস ফেলে বেরিয়ে গেল যে বড়?"

"চিন্তা নেই, টেরে বেশ বড় সাইজের একটা খণ্ড সঙ্গে নিয়েই গেছে।"

“তাই বলো! ঠিক আছে। কাল দেখা হচ্ছে। ওভার।”

পরদিন খুব ভোরবেলা বরফের ঢালে ওঠার কলাকৌশল নিয়ে শেরপাদের একটা ছোট ক্লাস নিলাম, তারপর একা একা রওনা দিলাম তুকুচার দিকে। নামার রাস্তাটা সত্যিই দারুণ উপভোগ্য। গাছে গাছে লাল ফুলে বসন্তের সমারোহ, সবুজ মখমলের মতো ঘাসের ঢালে এখানে সেখানে রঙবেরঙের ছোট ছোট ফুল ফুটে আছে। প্রাণ জুড়িয়ে গেল। খুব বেশি সময় নষ্ট করতে চাইছিলাম না, অথচ পথের সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য একটু পরপরই থামতে বাধ্য হচ্ছিলাম, আবার খানিক পরে গুনগুন করে আপনমনে গান গাইতে গাইতে নামছিলাম। নামতে নামতে দুটো ফার গাছের ফাঁক দিয়ে দেখি, গাছপালায় ঢাকা পাহাড়ের কোলে প্রায় লুকোনো অসাধারণ সুন্দর সবুজ এক হ্রদ; তার স্থির জলে তুষারশুভ্র নীলগিরির ছায়া পড়েছে; তার চারধার ছোট ছোট ঝোপ আর নরম সবুজ শ্যাওলায় ঢাকা। স্বর্গীয় এক দৃশ্য!

কালী গন্ডকির পাথুরে গিরিখাতে নেমে দেখি, ওপরে গত ক'দিনের তুষারপাতের ফলে নদীর জল অনেক বেড়ে গেছে; পা ভেজাতে হবে। জুতোটা ভেজাতে চাইছিলাম না, কেননা ভেজা জুতো পড়ে হাঁটলে পায়ে ফোস্কা পড়বে। এদিকে খালি পায়ে হাঁটারও অভ্যেস নেই। জুতো খুলব কিনা ভাবছি, সৌভাগ্যক্রমে ঠিক সেই সময় একটি তিব্বতী লোক সেখানে এসে উপস্থিত হল। এক ঝলক দেখেই সে ব্যাপারটা আন্দাজ করে নিল, আর তারপর আরামসে আমায় পিঠে তুলে নিয়ে খালি পায়ে অনায়াসে সেই খরস্রোতা নদী পেরিয়ে ওপারের শুকনো ডাঙায় নামিয়ে দিল। কৃতজ্ঞতাবশত তাকে একটি রৌপ্যমুদ্রা দিলাম। অত্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে বার বার মাথা নিচু করে অভিবাদন করে সে আমায় ধন্যবাদ জানাতে লাগল। বেচারা! মহানুভবতা দেখাবার এরকম সুবর্ণ সুযোগ এসব অঞ্চলে তো বিশেষ পাওয়া যায় না, তাই আরেকটি রৌপ্যমুদ্রা তার দিকে বাড়িয়ে ধরে বললাম, “এই নাও আরেকটা।” সে যেন নিজের চোখকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারল না! আরেকবার অভিবাদন করে এগিয়ে এসে সটান আমার পায়ের পাতায় একটা চুমু খেয়ে ফেলল। আমি কী করব কিছু বুঝতে না পেরে বোকার মত দাঁড়িয়ে রইলাম। মুখে হাসি এনে দেবতার মত একটা বরাভয় ভঙ্গি করার চেষ্টা করলাম। তারপর নিজের ব্যবহারে অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে মাথা নিচু করে ধীরে ধীরে তুকুচার দিকে রওনা দিলাম।

বেলা একটা নাগাদ তুকুচা পৌঁছলাম। কোজি আর আইজ্যাক হাসিমুখে আমায় অভ্যর্থনা জানাল। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছিল। যে পরিমাণ খেলাম, মনে হয় টেরের সাথে পাল্লা দিতে পারতাম। খেতে খেতে গল্প চলল, “আহা! কতদিন পর টাটকা মাংস খাচ্ছি। থরের জন্য জিবিকে ধন্যবাদ।”

“ধৌলাগিরির পূর্ব হিমবাহটা কি এতটাই দুর্গম?”

“পর্বতারোহণের কলাকৌশলের দিক দিয়ে দেখলে ওটা আল্পসের সবচেয়ে কঠিন কোনও রুটেরই মত, তবে নিঃসন্দেহে তারচেয়ে অনেক বেশি বিপজ্জনক। ল্যাচেনালও তাই মনে করে। আমাদের খুব খারাপ একটা সময় কেটেছে ওর ওপর। অল্পের জন্য বেঁচে গেছি! শেরপারা বেশ কয়েকবার পাহাড়ের ঢাল থেকে পড়ে গেছে।”

“হুম, খুব চিন্তার কথা,” কোজি বলল, “যাক, ভাগ্য ভালো যে কোনও ক্ষতি হয়নি...”

“ক্ষতি হয়েছে বৈকি! সময়? হু হু করে সময় চলে যাচ্ছে যে! যা দেখছি... ধৌলাগিরির রক্ষণ বেশ মজবুত।”

“হুম! বেশি চিন্তা কোরো না! আগামীকালই হয়ত একটা রুট খুঁজে পেয়ে যাব আমরা!”

আইজ্যাক কোজির দিকে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, “আগামীকাল! পেলে খুবই অবাক হব আমি। রুট একটা খুঁজে বার করতেই হবে আমাদের, সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই। কিন্তু

আমার যেটা চিন্তা হচ্ছে, তা হল, আমাদের মধ্যে কেউই এখনও অবধি আশার ক্ষীণতম আলোটুকুও দেখতে পাইনি। অনুসন্ধান পর্ব শেষ করতেই এখনও বহু দেরি আমাদের!”

বললাম, “তা কেন? দক্ষিণ- পূর্ব গিরিশিরা ধরে চূড়ায় ওঠার রাস্তা পাওয়া যেতে পারে, ল্যাচেনাল আর রেবুফত ওই রুটেই যাচ্ছে। দক্ষিণগাত্র ধরে কোনও সম্ভাবনা আছে কিনা তাও ওরা দেখতে পাবে। আর পূর্ব হিমবাহ এবার আমরা পেরোতে পারি নি ঠিকই, তবে ওর বাঁ তীর (True left) ধরে একবার চেষ্টা করে দেখলে হয়।”

“দেখো মরিস, আমায় ক্ষমা করো, আমি অতোটা আশাবাদী হতে পারছি না।”

“হ্যাঁ, মানছি। আমার মনেও অনেক সংশয় দানা বেঁধেছে,” স্বীকার করতেই হল আমায়।

“পূর্ব হিমবাহের পথে আমি আর শ্যাজ একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি”, কোজি বলল।

“হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। তোমাদের বিশ্রাম নেওয়া হয়ে গেছে?”

“উমমম, কী আর বলি! হ্যাঁ বলাই উচিত!”

“ঠিক আছে। তোমরা এক ঢিলে দুই পাখি মারতে পারবে। অতি উচ্চতার সঙ্গে মানিয়ে নিতেও পারবে, আর পূর্ব হিমবাহ ধরে একবার শেষ চেষ্টাও হয়ে যাবে।”

“বেশ, কালই বেরিয়ে যাব আমরা। দক্ষিণগাত্র, উত্তরগাত্র, এই গিরিশিরা, ওই গিরিশিরা – সব চষে ফেলব একে একে, একটাও ছাড়ব না। দেখি ধৌলাগিরি কীভাবে ঠেকায় আমাদের!”, কোজি তেতে উঠেছে।

সন্ধেবেলা একটু বিশ্রাম নেবার ইচ্ছে ছিল। পরিস্থিতির জট ছাড়াতে ঠাণ্ডা মাথায় একটু চিন্তা করা দরকার। এমন সময় তাঁবুতে এল জিবি। বললাম, “খরের জন্য ধন্যবাদ, জিবি।” সে নিজেকে খুব ভালো শিকারি বলে মনে করে। দেখলাম আজ ও আড্ডার মুডে আছে। অগত্যা ওর সঙ্গে বকবক করতে হল। নেপাল, গুর্খা সম্প্রদায়, এ দেশের সর্বেসর্বা নেপালের রাজপরিবার... নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা চলল। পকেট থেকে বার করে রাজার লেখা নিয়োগপত্রটা দেখাল জিবি, আগেও বারকয়েক দেখিয়েছে অবশ্য! বাঁশ থেকে হাতে তৈরি কাগজে সংস্কৃতে লেখা, তাতে নানারকম শিলমোহর।

তুকুচার এক স্কুলশিক্ষকের বাড়ির ভেতরের উঠোন; ছবিঃ অন্নপূর্ণা অভিযান

পরদিন, ৫ই মে, সকাল ৮টা নাগাদ কোজি আর শ্যাজ বেরিয়ে গেল। পূর্ব হিমবাহে এবারে ওদের রগড়ানির পালা। ওরা বেরিয়ে যেতেই হঠাৎ সব কেমন চুপচাপ হয়ে গেল। তুকুচার বেস ক্যাম্পে রইলাম শুধু আমি আর আইজ্যাক।

"একজন সৈনিক নিচের দিকে তানসিং অবধি যাচ্ছে। কোনও চিঠিপত্র পাঠাতে হবে?"

অবশ্যই! পোস্ট করার জন্য চিঠির পাহাড় জমে আছে যে! কিন্তু পাঁচ সপ্তাহের ওপর হয়ে গেল, ফ্রান্স থেকে কোনও চিঠি পেলাম না তো আমরা? জিবির সাহায্য নিয়ে গুরখালি ভাষায় তানসিং- এর পোস্টমাস্টারকে একটা চিঠি পাঠানো হল, তিনি যাতে ব্যাপারটা একটু দেখেন।

তারপর একটা ক্যামেরার ট্রাইপডে 25X- এর একটা টেলিস্কোপ লাগিয়ে আমি আর আইজ্যাক বসলাম। মোটামুটি ১৬০০০ ফিট উচ্চতায় সেই সাদা বরফের ঢিপির মতো চুড়োটার গায়ে ল্যাচেনাল আর রেবুফতকে আবিষ্কার করলাম। ওরা তখন ফ্রেঞ্চ পদ্ধতিতে স্কি করে নেমে আসছে। ল্যাচেনালকে সহজেই চিনলাম ওর অনবদ্য স্টাইল দেখে। শেরপাদের অবাক করে দিয়ে ও দুর্দান্ত কিছু বাঁক নিল।

ফিরে এলে আইজ্যাক রেবুফতকে ধরল, "কী, কেমন দেখলে ধৌলাগিরির দক্ষিণগাত্র?"

"বাগলুং থেকে দেখে তো দারুণ লেগেছিল," আমিও যোগ করলাম।

"হুঁ, দারুণই বটে! কাছ থেকে দেখলে বুঝতে! সে এক রাক্ষুসে বরফের ঢাল, মাইলের পর মাইল খাড়া উঠে গেছে, মাঝে কোথাও দাঁড়াবারও জায়গা নেই। আল্পসের সাথে তুলনা করলে অনেকটা ম্যাটারহর্নের উত্তরগাত্রের মত, শুধু ওর থেকে তিন গুণ বড়। ওটাকে স্রেফ খরচের খাতায় ফেলে দেওয়াই ভালো।"

আমরা নীরবে একে অপরের মুখের দিকে তাকালাম।

"হুম, বোঝা গেল! আর দক্ষিণপূর্ব গিরিশিরা? সেদিন পূর্ব হিমবাহের ক্যাম্পে বসে যখন কথা হচ্ছিল তখন তোমরাই তো ওই রুটের ব্যাপারে সবচেয়ে আশাবাদী ছিলে! তোমরাই বললে..."

"ভুল বলেছিলাম। প্রথম কথা, রাস্তাটা অসম্ভব দীর্ঘ। দ্বিতীয়ত, পুরো রাস্তাটাই খুব উঁচু দিয়ে গেছে। আর সবচেয়ে বড় কথা, ওই রুট টেকনিক্যালি প্রচণ্ড কঠিন – পুরো রাস্তাটাতেই পর্বতারোহণের খুব উঁচু মানের কলাকৌশলের প্রয়োজন। অসংখ্য তুষারপ্রাচীর, আইস টাওয়ার, ভাঙাচোরা রাস্তা; কিছু জায়গা আবার পাথুরে, ছোট ছোট পাথুরে শৃঙ্গ দাঁতের মত উঁচিয়ে আছে – বাধার কোনও শেষ নেই।"

"তাঁবু ফেলার জায়গা নেই?"

"একটাও না।"

"হুম, ব্যাপার তো খুব সুবিধের ঠেকছে না।"

"ওই রাস্তায় যাবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।"

আইজ্যাক বলল, "দ্যাখো, আমার মনে হয় না দক্ষিণপূর্ব গিরিশিরা নিয়ে আমাদের কারও মনে কোনও উচ্চাশা ছিল। দক্ষিণগাত্রের ব্যাপারেও তাই।"

"তাহলে মোদ্দা কথাটা কী দাঁড়াল?"

"খুব সহজ! ধৌলাগিরির দক্ষিণগাত্র আর দক্ষিণপূর্ব গিরিশিরা – এই দুই রুটেই একটা করে বড় বড় ঢ্যাঁড়া এঁকে দাও! দুঃখের হলেও এটাই বাস্তব।"

বিমর্ষবদনে আমরা সবাই রাতের ডিনার সারতে মেস টেন্টের দিকে চললাম।

পরদিন আমাদের ক্যাম্পে এক বৌদ্ধ লামার পায়ের ধুলো পড়ল। এঁর সাথে বাগলুং- এই দেখা হয়েছিল। লামার পরনের মেরুন রঙের জোব্বাটি খুব পরিষ্কার বলে মনে হল না, কিন্তু লোকটি খুব ভালোমানুষ – হাসিখুশি, মজাদার। আইজ্যাক এই সহজসরল বন্ধুত্বপূর্ণ লামাদের খুব পছন্দ করে।

সে প্রচুর খাওয়াল লামাকে। উনি প্রবল উৎসাহের সঙ্গে মুক্তিনাথের মহিমা সম্বন্ধে আমাদের অনেক কিছু বললেন। আং থারকেকে দোভাষী করে আমাদের বাক্যালাপ চলল।

"আপনি তাহলে এখন মুক্তিনাথ যাচ্ছেন?", জিগ্যেস করলাম আমরা।

"হ্যাঁ, আগামীকাল পৌঁছব সেখানে।"

"কিন্তু সে তো এখান থেকে বেশ দূর!" যদিও লামাদের অনেক অলৌকিক ক্ষমতা থাকে বলে শুনেছি, তাও একদিনে কী করে ইনি মুক্তিনাথ পৌঁছবেন সেটা আমার মাথায় ঢুকল না।

"আপনারাও অবশ্যই আসুন একবার মুক্তিনাথে। প্রতিদিন ওখানে নানারকম অলৌকিক কাণ্ডকারখানা ঘটে চলেছে... পাতাল থেকে অগ্নিশিখা বেরিয়ে আসছে... পুরোহিতরা প্রতিদিন অসাধারণ সব ভবিষ্যৎবাণী করে চলেছেন..."

"হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই যাব। এই কিছুদিনের মধ্যেই যাব..."

আইজ্যাকের মাথায় হঠাৎ দারুণ এক বুদ্ধি খেলে গেল। সে জিগ্যেস করে বসল, "লামাসাহেব, আমরা কি ধৌলাগিরির শৃঙ্গে উঠতে সক্ষম হব?"

এইবার! এতক্ষণে লামার সামনে নিজের আসল ক্ষমতা প্রদর্শনের সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হল! প্রথমেই গভীর ধ্যানে তলিয়ে গেলেন তিনি। তারপর হাতে একটা জপের মালা নিয়ে গুনতে গুনতে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে চললেন, একবার আকাশের দিকে তাকান, তারপরই ফের নিজের হাতের দিকে। এরকম চলল প্রায় মিনিট পাঁচেকেরও বেশি। আমরা চুপ করে নট নড়নচড়ন হয়ে বসে আছি। এতদিনে কি তবে চোখের সামনে কোনও অলৌকিক ঘটনা দেখতে চলেছি? আমরা কি আর জানিনা যে এই লামারা হলেন একেকজন অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি?

ধীরে, খুব ধীরে ধীরে, মনে হল লামা লৌকিক জগতে ফিরে এলেন। তারপর মৃদুস্বরে উচ্চারণ করলেন, "ধৌলাগিরি আপনাদের পক্ষে শুভ নয়..."; মিনিটখানেক চুপ করে থেকে যোগ করলেন, "ওকে ছেড়ে দেওয়াই মঙ্গল, মনকে অন্যদিকে চালিত করুন।"

"কোনদিকে?" আইজ্যাক জিগ্যেস করল। আমাদের কাছে দিকটা গুরুত্বপূর্ণ!

"মুক্তিনাথের দিকে," লামা এমনভাবে বললেন যেন এ আর জিগ্যেস করার কী আছে?

কিন্তু, উনি কি অন্নপূর্ণা বোঝাতে চাইলেন? জানি না। ভবিষ্যৎই একমাত্র বলতে পারবে।

ল্যাচেনাল ফিরল, রোদে পুড়ে একদম তামাটে হয়ে গেছে। পূর্ব হিমবাহের ক্যাম্পে এখন কোজি আর শ্যাজ। রেডিওটা কাজ করছে না, তাই কিছুদিন ওদের কোনও খবর পাব না। বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ অডট আর টেরে ক্যাম্পে 'অবতরণ' করল। বাড়িয়ে বলছি না, আক্ষরিক অর্থেই 'অবতরণ', কারণ ওরা ক্যাম্পের পাশের খাড়া পাথুরে দেওয়ালটার ওপর থেকে র‍্যাপেল করে নামল। টেরে যথারীতি প্রচণ্ড উত্তেজিত, দাড়িগোঁফ বেড়ে গিয়ে তাকে বেশ ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে।

"শোনো ভাইসব, ধৌলাগিরির ব্যাপারে তোমরা নতুন করে ভাবতে পারো," উত্তেজনায় আর বাছাবাছা শব্দ প্রয়োগে টেরে প্রায় ফেটে পড়ল, "দ্যাখো মরিস, পৃথিবীর কোনও বীরপুঙ্গবের সাধ্য নেই তোমার ওই সাধের ধৌলাগিরিতে চড়ে। ওতে ওঠা যায় না। ও একটা শয়তানের পাহাড়।"

"আরে এসো, বোসো আগে, চা- কফি খাও, বিশ্রাম করো, ঘেমেনেয়ে একাকার হয়ে গেছ যে!" টেরেকে একটু ঠাণ্ডা করার জন্য বললাম।

"চা- কফি? খাবারদাবার কিছু নেই নাকি?" টেরের জিজ্ঞাসা।

"হ্যাঁ হ্যাঁ, ওরা নিয়ে আসছে তোমার জন্য। তারপর বলো, কী দেখলে তোমরা?"

"প্রথম থেকে বলি," অডট শান্তভাবে শুরু করল, "তেসরা মে মোটামুটি ১৪৭০০ ফিট উচ্চতায় তাঁবু ফেললাম আমরা, তোমাদের দুটো ক্যাম্পের মাঝামাঝি জায়গায়। পরদিন রাত্রে ক্যাম্প করলাম

তোমাদের আবিষ্কৃত 'গুপ্ত উপত্যকায়'। ওই উপত্যকায় পৌঁছনোর পাস অবধি গিয়ে কুলিরা একটু ঝামেলা করেছিল, আর এগোতে চাইছিল না। ওর পরে আর যায় নি ওরা কখনও, তাই ভয় পাচ্ছিল। কাল সকালে, খুব ভোরে রওনা দিয়ে, গুপ্ত উপত্যকা ধরে এগিয়ে গিয়ে আমি আর টেরে আরেকটা পাসে পৌঁছলাম, যেটা তোমরা দূর থেকে দেখেছিলে। সেই পাসটাই হল ধৌলাগিরির উত্তরদিকের উপত্যকায় পৌঁছনোর গিরিপথ (*এটি এখন 'ফ্রেঞ্চ পাস' নামে পরিচিত*)। আর সেখান থেকে যা দেখলাম..."

"ওফ, ভাবলে আমার এখনও হাত- পা কাঁপছে," টেরের পক্ষে চুপ করে থাকা আর সম্ভব হল না, "সেখান থেকে দেখলাম এই পৃথিবীর ভয়ঙ্করতম গিরিখাত!"

"আমাদের মুখোমুখি তখন ধৌলাগিরির দানবীয় উত্তরগাত্র," অডট বলে চলল, "আর পায়ের নিচে এক বিশাল বিস্তীর্ণ হিমবাহ, ফাটলে ফাটলে ভর্তি..."

"পৃথিবীর বীভৎসতম হিমবাহ," টেরের অলঙ্করণ চলতে থাকে।

"... হিমবাহটা এক সুগভীর গিরিখাত ধরে পশ্চিমদিকে বয়ে চলেছে। গিরিখাতের দুপাশের পাথুরে দেওয়াল একেবারে খাড়া, হাজার হাজার ফিট উঁচু!"

"দেখেছ? ঠিক ধরেছিলাম আমি," আইজ্যাক প্রায় বিজয়ীর উল্লাসে লাফিয়ে ওঠে, "তাহলে প্রমাণ হল ধৌলাগিরির উত্তরগাত্র ধোয়া জল মায়ান্দি খোলা দিয়েই নামছে, দাম্বুশ খোলা দিয়ে নয়।"
(*তৃতীয় পর্বের পৃষ্ঠা ৩ : ধৌলাগিরির ভৌগোলিক বিন্যাস দ্রষ্টব্য*)

'ফ্রেঞ্চ পাস' থেকে ধৌলাগিরির উত্তরগাত্র; ছবিঃ অন্নপূর্ণা অভিযান

টেরের কথা তখনও শেষ হয়নি, "জায়গাটায় সবকিছুই দানবীয় মাপের, অভাবনীয় আকৃতির, এ যেন এক অন্য পৃথিবী! যদি উত্তর গিরিশিরার কথা ধরো, যেটা ওই হিমবাহ থেকে পূর্ব হিমবাহকে আলাদা করে রেখেছে, সেটা আধা পাথুরে আর আধা কঠিন বরফ, পুরোটাই খুব খাড়াই। আর উত্তর-পশ্চিম গিরিশিরা, যেটা আমরা আগে দেখিনি, সেটা ওই ভয়ঙ্কর গিরিখাতের মধ্যে নেমে গেছে।"

খুবই হতাশাজনক ব্যাপার সন্দেহ নেই।

"তার মানে বলছ ওই রাস্তায় যাওয়া যাবে না?", বললাম আমি।

আইজ্যাক বলল, "লামা তো বলেই গেলেন 'ধৌলাগিরি তোমাদের পক্ষে শুভ নয়, মুক্তিনাথ চলো।' ভুলে গেলে?"

"ঠিক, মুক্তিনাথেই যেতে হবে আমাদের," দৃঢ়স্বরে বললাম আমি, "কাল সকালেই রওনা হব!"

"তার মানে? তিলিচো পাসের দিকে?" রেবুফত জিগ্যেস করল।

"আমি মোটামুটি নিশ্চিত তিনিগাঁও- এর সেই শিকারি ঠিকই বলেছিল। তিলিচো নীলগিরির উত্তরে, দক্ষিণে নয়। দক্ষিণে হলে কোজি, শ্যাজ আর অডট তিলিচোর খোঁজ পেত। তিলিচো পেরিয়ে আমরা উত্তরদিক থেকে অন্নপূর্ণার দিকে এগোব।"

"মিরিস্তি খোলার দিক দিয়ে নয় কেন? ওদিক দিয়ে এগিয়ে কোজি আর শ্যাজ তো অন্নপূর্ণা দেখতে পেয়েছিল!"

"দেখেছিল, তবে সে অনেক দূর থেকে। আর ওরা উত্তরগাত্রটা দেখতে পায় নি। ওই রুট দিয়ে অন্নপূর্ণার উত্তরগাত্রে পৌঁছনো সহজ হবে না। যে গিরিশিরাটা ওরা দেখেছিল ওটার কথা ভেবেও লাভ নেই। ওদেরও তাই মত..."

"মরিস, ম্যাপটা দেখ," আইজ্যাক বলে উঠল, "নীলগিরির উত্তরে দেখানো সেই তারাচিহ্নটাই যদি তিলিচো পাস হয়, তাহলে কিন্তু আমাদের অনেক দিনের হাঁটা বেঁচে যাবে।"

"ঠিক। আমরা একেবারে সরাসরি অন্নপূর্ণার উত্তরগাত্রের গোড়ায় উপস্থিত হব। আর সাধারণত হিমালয়ের শৃঙ্গগুলির উত্তরগাত্র অপেক্ষাকৃত সুগম হয়। অন্নপূর্ণার খোঁজে ওই রাস্তায় আমরা যতদূর যেতে হয় যাব। যদি সেই মানাংভোট অবধি যেতে হয় তাও সই!"

"বাহ! পরিস্থিতি তাহলে শেষে এরকম দাঁড়াল? কোথায় আমাদের অন্নপূর্ণার শৃঙ্গে ওঠার কথা, আর আমরা এখন ভাবছি কিনা অন্নপূর্ণার খোঁজে যাব!"

ফোড়ন কাটল বটে আইজ্যাক, তবে ওর কথার সুরে হতাশাটা গোপন রইল না।

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

চমরী গাই বা ইয়াক; ছবিঃ অন্নপূর্ণা অভিযান

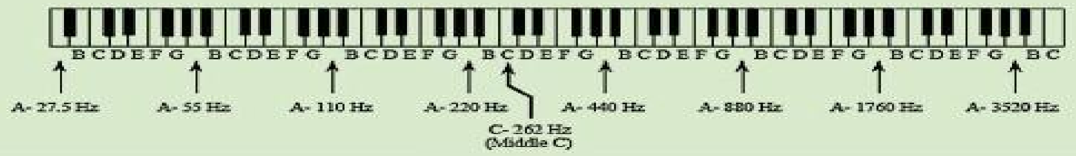

সুর ঢাক

প্রদীপ মুখোপাধ্যায়

http://www.youtube.com/watch?v=scL927e4augপণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর ভাতখন্ডে' র ' হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতি–ক্রমিক পুস্তক মালিকা' থেকে কিছু কিছু অংশ এর আগে আমরা ব্যবহারিক ভাবে শেখার জন্য নিয়েছিলাম।

এবারের জন্য ' খামাজ' বা ' খাম্বাজ' রাগটিকে বেছে নেওয়া হল। এই একই নামে একটি ঠাটও আছে। উত্তর ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের দশটি ঠাট সম্পর্কে এর আগেও কথা হয়েছে। ঠাট কে মোটামুটিভাবে স্কেল বলা যেতে পারে - অর্থাৎ কোন কোন স্বরগুলি ব্যবহার হচ্ছে তাই দিয়ে মোটামুটি ভাবে বোঝা যায় একটি রাগ কোন ঠাটের অন্তর্গত। দশটি ঠাটের নাম আবার একবার বলি - বিলাবল, কল্যাণ, খমাজ, ভৈরব, পূর্ব্বী, মারওয়া, কাফি, আশাবরী, ভৈরবী ও টোড়ী। খমাজ ঠাটে ' নি' স্বরটি কোমল(ণ), অর্থাৎ এই ঠাটে ব্যবহৃত স্বরগুলো হল - সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি, র্সা। এই স্বরবিন্যাস দক্ষিণ ভারতীয় বা কর্ণাটকি পদ্ধতির হরিকম্বোজী ও পাশ্চাত্য উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সি- মিক্সোলিডিয়ান মোড এর সাথে তুলনীয়। এই ঠাটে বেশ কয়েকটি অত্যন্ত জনপ্রিয় রাগ আছে - খমাজ, দেশ, জয়জয়ন্তী, ঝিঁঝোটি, যোগ, রাগেশ্রী, তিলক- কামোদ, গৌড়- মল্লার, গাউতি, গোরখ- কল্যাণ, সোরট, তিলং ইত্যাদি।

খমাজ রাগের ভিত্তি ফোক্ বা লোকগান হওয়ায় এটি ধুন- রাগ পর্যায়ে পড়ে আর তাই এই রাগে মূলত গজল, ঠুংরী, টপ্পা, দাদরা জাতীয় লঘু ধরণের সঙ্গীতই বেশি শোনা যায়। এই রাগে বেশ কিছু বিখ্যাত ধ্রুপদ ও খেয়ালও অবশ্য আছে- যেমন আব্দুল করিম খাঁ সাহেবের সুধী বিসর গয়ী, ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের পিয়া তোরে তিছরি নজর লাগে, ডাগর ভাইদের শ্যাম রঙ্গ ডারি ইত্যাদি। ভাতখন্ডেজি' র লেখার সময় থেকে অন্যান্য রাগের মত এই রাগেরও নানা পরিবর্তন হয়েছে - আমরা এই রাগটির বিভিন্ন রূপের আভাষ পাব এই লেখার সাথে দেওয়া লিঙ্কগুলিতে। লিঙ্ক১ এ ভাতখন্ডেজীর বইটিতে দেওয়া স্বরলিপির সফট- সিন্থ এ বাজানো স্থায়ী, অন্তরা আর লিঙ্ক ২এ এই রাগের ওপর কয়েকটি কন্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতের অংশ দেওয়া হল।

লিঙ্ক ১ - সফ্ট- সিন্থে বাজানো ভাতখন্ডেজীর বইয়ে দেওয়া স্বরলিপি - পনঘট মূরলিয়া বাজে সখী

লিঙ্ক ২ - (ক) উস্তাদ নিসার হুসেইন খাঁ - (১৯২৯ সালে রেকর্ড করা)
(খ) পণ্ডিত রবিশঙ্কর - সেতার
(গ) ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ- সরোদ

আমরা কয়েকটি বাহার রাগ ভিত্তিক জনপ্রিয় গানও শুনে নেব - তাহলে সুরের চলনটা মনে রাখতেও সুবিধে হবে। এইসব গানের ইউ- টিউব লিঙ্ক দিয়ে দেওয়া হল। (পাতার নিচে লিংকগুলো পাবে)

৩) অব ক্যা মিশাল দুঁ ম্যয় তুমহারি শবাব কি - https://www.youtube.com/watch?v=ad5BcGFpxog
৪) কুছ তো লোগ কহেঙ্গে, লোগো কা কাম হ্যয় কহনা - https://www.youtube.com/watch?v=95UdAo4JdJI
৫) তেরে মেরে মিলন কি ইয়ে রয়না - https://www.youtube.com/watch?v=F8IVa-7-2_w
৬) আয়ো কাঁহাসে ঘনশ্যাম - https://www.youtube.com/watch?v=iasaMPf_4ag

লিঙ্ক ৭ - খমাজ রাগাশ্রিত রবীন্দ্রসঙ্গীত - *এই কথাটি মনে রেখো* - ইন্দ্রাণী সেনের গাওয়া।

লিঙ্ক ৮ - খমাজ রাগাশ্রিত নজরুল গীতি - *চেয়োনা সুনয়না* - ইন্দিরা দেবীর গানের সাথে মহ: রফির গান মিশিয়ে দেখানো হল যুগের সাথে একই গান কেমন পাল্টে যাচ্ছে।

ধুন- রাগ গোত্রের হওয়ার ফলে খমাজ রাগ ঠুংরী হিসেবে পরিবেশণ করার সময় কোমন গা, কড়ি মা, কোমল ধা ইত্যাদি স্বরও ব্যবহার করা হয়। খমাজ যেহেতু একটি রাগ অঙ্গও বটে, তাই খমাজ ঠাটের অন্যান্য রাগে যেমন তিলং, দেশ, ঝিঁঝোটি, গারা ইত্যাদিতে খমাজ রাগের অঙ্গ ব্যবহৃত হয়।

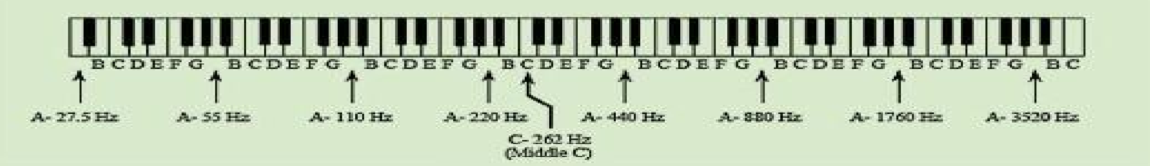

© প্রদীপ মুখোপাধ্যায়

http://www.youtube.com/watch?v=scL927e4aug

এই রাগটি একটু দুষ্টু- মিষ্টি, নরম, রোম্যান্টিক ভাব প্রকাশ করার জন্য উপযোগী। আবার উপাসনা, ভক্তিমূলক মনোভাব প্রকাশের জন্যও এই রাগটি বেছে নেওয়া হয়।

ঠাট - খমাজ (স র গ ম প ধ ণ র্স)
জাতি - ষাড়ব- সম্পূর্ণ (আরোহনে ছয় স্বর স, গ, ম, প, ধ, ন;
অবরোহে সম্পূর্ণ সাতটিই স্বর - র্স, ণ, ধ, প, ম, গ, র)
আরোহণ - ণ্- স- ম, প- জ্ঞ- ম, ম- ণ- ধ, ন- র্স
অবরোহণ - র্স- ণ- প- ম- প- জ্ঞ- ম- র- স
পকড় (রাগরূপ প্রকাশী বিশেষ স্বরগুচ্ছ বা রাগস্বরূপ)- প, গ, মগ; ম, প, ধ; গ, মগ; গ, ম, ধ, ন, র্স; র্স, র্র, র্স, ণ, ধ, ণ, ধ, প; গ, ম, প, ণ, ধ; ম, প, ধ, ম, গ; গ, ম, ণ, ধ, প, ধ, ম, গ, প।
বাদী - গা
সম্বাদী - নি। সময় - রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। তবে ধুন গোত্রের রাগ বলে এই রাগ পরিবেশনের ক্ষেত্রে সময়ের ততটা কড়াকড়ি নেই।

গানের যে উদাহরণগুলো আগের পাতায় দেওয়া আছে, সেখান থেকে ভাতখন্ডেজীর দেওয়া ' পণঘট মুরলিয়া বাজে সখী' স্বরলিপিটি নিচে দেওয়া হল।

স্থায়ী

+				2				0				3			
							র্সা	**$^{র্স}$ণ**	**ণ**	**ধপ**	**ম**	**^{ধ}প**	**ম**	**গ**	**^{র}গ**
							প	ন	ঘ	ট	মু	র	লি		য়া
ম	**-**	**প**	**ম**	**প**	**-**	**-**	**-**								
বা		জে	স	খী											
								^{ন}র্স	**ন**	**র্স**	**$^{র্স}$র্র**	**র্স**	**ণ**	**ধ**	**প**
								সি	মি	ট	যু	ব	তী	জ	ন
ম	**গ**	**ম**	**গর**	**স**	**^{গ}র**	**ণ**	**স**	**^{স}ন**	**স**	**গ**	**ম**	**প**	**প**	**ন**	**ন**
ঠা		ড়ে	নি	চৈ		ভ	ন	পু	ল	কি	ত	স	ব	ত	ন
^{ন}র্স	**ন**	**র্স**	**$^{র্স}$র্র**	**র্স**	**ণ**	**ধ,**	***^{ধ}র্স***	***$^{র্স}$ণ***	***ণ***	***ধপ***	***ম***	***^{ধ}প***	***ম***	***গ***	***^{র}গ***
মু	কু	লি	ত	ন	য়	ন,	*প*	*ন*	*ঘ*	*ট*	*মু*	*র*	*লি*		*য়া*

অন্তরা

+				2				0				3			
								^{ম}গ	**ম**	**ণধ**	**ন**	**স**	**-**	**ন**	**র্স**
								রা	-	গ	খ	মা	-	জ	শু
$^{র্স}$ন	**-**	**র্স**	**র্স**	**ন**	**র্স**	**ণ**	**ধ**	**র্স**	**ন**	**র্স**	**র্র**	**র্স**	**ণ**	**ধ**	**প**
না		য়	সু	লে		চ্ছ	ন								
র্স	**ণ**	**ধ**	**প**	**ম**	**গ**	**র**	**স**	**^{স}ন**	**স**	**গ**	**ম**	**প**	**প**	**ন**	**ন**
								পু	ল	কি	ত	স	ব	ত	ন
^{ন}র্স	**ন**	**র্স**	**$^{র্স}$র্র**	**র্স**	**ণ**	**ধ,**	***র্স***	***$^{র্স}$ণ***	***ণ***	***ধপ***	***ম***	***^{ধ}প***	***ম***	***গ***	***^{র}গ***
মু	কু	লি	ত	ন	য়	ন,	*প*	*ন*	*ঘ*	*ট*	*মু*	*র*	*লি*		*য়া*

শম্পা গুহমজুমদার

এবারে স্টিল ফটোগ্রাফি

কেমন আছ সবাই? গত সংখ্যায় তোমাদের স্টিল ফটোগ্রাফি সম্বন্ধে বলব বলেছিলাম। বর্ষাকাল আসছে। বাড়ি থেকে বেরোনোও মুশকিল। ঘরে বসেই একটা দুনিয়া তৈরি করতে পারবে। ঘরের যে জানালা দিয়ে আলো আসে সেখানে একটা টেবিলে আমরা নানান জিনিস সাজিয়ে ফটো তুলতে পারি। ফুল- ফল- কাপ ডিশ থেকে আরম্ভ করে যে কোন জিনিসেরই ফটো তোলা যেতে পারে। ফুলের ছবি মানে যে দামি ফুল কিনতে হবে তার কোন মানে নেই। বাড়ির টবে ফোটা ফুলও সুন্দর করে সাজিয়ে নেওয়া যায়। ভাঙা কাপ, প্লেট ও পুরানো কোন জিনিস যেমন ঘড়ির ছবিও তুলতে পার।

আসলে তোমার চারদিকেই সাবজেক্ট রয়েছে। কোনভাবে জিনিসটিকে দেখা হচ্ছে তার ওপর ছবিটি কেমন হবে তা নির্ভর করছে। দিনের বেলা ছাড়াও রাতে টেবিলল্যাম্পের এর আলোতেও স্টিল ফোটোগ্রাফি করা যেতে পারে। সে বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব। স্টিল ফোটোগ্রাফির মজাটা হল নিজের মতন করে সেট সাজিয়ে নেওয়া যায়। সেটাও একটা শিল্প।

ফুলদানিতে ফুল রেখেছ, এবার জানালাতে যদি একটা নেট-এর পরদা টাঙিয়ে দাও তা হলে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আরও সুন্দর হবে। সাধারণ ফুলগুলোই তখন অসাধারণ হয়ে উঠবে। বাঁধানো বই নানাভাবে সাজিয়েও ছবি তোলা যেতে পারে। একটা কাঁটাচামচও subject হতে পারে। আঙুর, পাকা পেঁপে, ফলের বা আলুর ঝুড়িতে সাজিয়ে ছবি তোলা যেতে পারে। শীতকালে গাছের পাতা পড়ে গেলে আঁকাবাঁকা ডাল সংগ্রহ করে রেখে দেবে।

শুকনো ফুল আর শুকনো ডাল দিয়ে ফুলদানি অপূর্বভাবে সাজানো যায়। তুমি যে টেবিল সেট করবে তার ব্যাকগ্রাউন্ডটা নতুন ধরনের করার জন্য একটা আর্টপেপারে

জলরং দিয়ে নিজের মনের মত সবুজ বা নীল বা অন্য যে কোন রং করে নেওয়া যেতে পারে। ভাঙা কাচের টুকরো, আয়না, কিছুই ফেলবে না, এমনকি পুরোনো বুটজুতোর ছবিও হয়ে যেতে পারে বিখ্যাত একটি স্টিল ফোটোগ্রাফি। যারা কম্পিউটারে অভ্যস্ত তারা ইনটারনেটে স্টিল ফোটোগ্রাফির উদাহরণ দেখে নিতে পার। তবে কখনোই তাকে নকল করবে না। ধারণাটা নেবে আর নিজের সৃজনশীলতাকে যথাসম্ভব ব্যবহার করার চেষ্টা করবে।

এই প্রসঙ্গে ফটোশপিং সম্বন্ধে একটু বলি। শব্দটা এখন খুবচালু। ক্যামেরায় তোলা ছবিতে নানান পরিবর্তন আনা যায় ফটোশপ নামের সফটওয়ারটি দিয়ে। তোমরা নিশ্চয়ই ফটোশপ এডিটিং, এই শব্দগুলোর সঙ্গে পরিচিত। তাছাড়া এমন আরো অনেক সফটওয়ার দিয়েই কাজটা করা যায়। যেমন ধরো picasa।ইনটারনেট থেকে একে বিনিপয়সায় ডাউনলোড করে নেয়া যায়

তবে প্রকৃতির ছবি (ল্যান্ডস্কেপ)বা অন্য ফটোতে এডিট না করাই ভাল। কিন্তু, স্টিল ফোটোগ্রাফির ক্ষেত্রে তা করা যেতে পারে। একটি ফুলদানিতে ফুল রাখা আছে ধরো। picasa নামের সফটওয়ারটি ব্যবহার করে ছবিটাকে একটু soft করে দিলে তা আরও সুন্দর হয়ে উঠতে পারে। অবশ্য এগুলো ঠিক বলে বোঝানো যায় না। ছবি আঁকার মতন ব্যাপারটা। তোমার পছন্দ অনুযায়ী তুমি

তোমার ছবিকে এডিট করে নেবে। অতি সাধারণ পেঁয়াজ বা রসুন এর ফটো ও artistic হতে পারে । চেষ্টা করে দেখতে পার। বাড়িতে প্যাস্টেল রং থাকলে একটা বান্ডিল করে নাও। এবারে তার ক্লোজ আপ নাও। এই ফটোটি picasa তে একটু soft করে দ্যাখো কি অপূর্ব লাগে। আমি যে

উদাহরণগুলি দিলাম, এছাড়াও যে কোন জিনিসেরই ফটো তুলতে পার। একটা বই এমনভাবে খুলে রাখতে পার যে পাতাগুলি সোজাভাবে থাকবে। বাড়িতে ঝিনুক, শাঁখ থাকবেই এইগুলিকেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

আমি যে ফটোগুলি তুলেছি সেই বস্তুগুলি সব বাড়িতেই পেয়ে যাবে। আমি কিছু উদাহরণ দিলাম। তোমরা আরও নতুন নতুন idea করার চেষ্টা কর। আশা করি আমার থেকেও অনেক ভাল টেবিলটপ সাজাতে পারবে।

আচ্ছা, অনেক ফটো তোলো আর খুব আনন্দে থাকো। পরের বার street photography নিয়ে আলোচনা করব।

ক্রমশ

ছবিঃ লেখক

<u>সিনেমা হল</u>

<u>মহাশ্বেতা</u>

সেল্কি হল আইরিশ উপকথার এক কাল্পনিক জীব। তারা জলে সিল মাছের রূপ ধরে থাকে কিন্তু ডাঙায় ওঠা মাত্র মানুষ হয়ে যায়। তখন তাদের গা থেকে ঝড়ে পড়ে যায় তাদের সেল্কি কোট। তারপর তারা ডাঙারই কোন মানুষকে বিয়ে করে সংসার পাতে। কিন্তু পরে যদি কখনও তাদের ফেলে আসা কোটটাকে খুঁজে পায় তারা, তাহলে তাদের ফিরে যেতে হয় সমুদ্রে, তাদের আসল বাড়িতে। কিন্তু সেল্কিদের সবচেয়ে বড় শক্তি হল তাদের গান- তাতে আছে এক বিশেষ জাদু- অভিশপ্ত পরীদের মুক্তি দেওয়ার ক্ষমতা। এই সেল্কিদের নিয়েই পরিচালক টম মুরের দ্বিতীয় ছবি ‘সং অফ দা সি।’

বোন সিওর্শার জন্মের পরই ছোট্ট বেন-এর মা চলে গিয়েছিল তাদের ছেড়ে। চলে যাওয়ার আগে তাকে দিয়ে গিয়েছিল একটা শঙ্খ। তাতে কান পাতলেই শুনতে পাওয়া যেত সমুদ্রের গান।

তারপর থেকেই তার বাবা কেমন যেন হয়ে যান। সমুদ্রের বুকে ছোট্ট দ্বীপে লাইটহাউসের ধারে তাদের বাড়ি। আশপাশে জনবসতি বলতে লঞ্চে করে সমুদ্র পেরিয়ে ছোট একটা টাউন। বেনের বন্ধু বলতে একজনই, তার প্রিয় কুকুর ‘কু’। সিওর্শার ছ’বছর হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তার

মুখে কথা ফোটেনি। বেন সিওর্শাকে ঠিক পছন্দও করে না, কারণ তার জন্মের পরই মা চলে গেছিল।

কিন্তু তাদের দুজনকে ঘিরে থাকে তাদের মায়ের অস্তিত্ব। তাঁর গাওয়া ঘুমপাড়াণি গান, তাঁর আঁকা ছবি, তাঁর বলা গল্প। যেমন মাকা ডাইনীর গল্প, যে তার শাগরেদদের নিয়ে বেরোতো আত্মা চুরি করবার জন্য। আর মাকার ছেলে মাক লীর, যে ভীষণ দুঃখে পাথর হয়ে গেছিল অনেক অনেক দিন আগে। আর ছিল সেল্কিদের গল্প।

কিন্তু তারা কেউ জানত না যে আসলে এই মা- ই ছিল একজন সেল্কি, আর বোন সিওর্শাও! গোল বাঁধল সিওর্শার ছ নম্বর জন্মদিনে। সেই উপলক্ষে তাদের ঠাকুমা এসেছিলেন শহর থেকে। তিনি কড়া মানুষ। ছেলে নাতিনাতনিদের নিয়ে এমন একটা পাণ্ডববর্জিত জায়গায় থাকে তাতে তাঁর বিরাট আপত্তি।

একদিন মাঝরাত্রে ঘুম ভেঙে ঠাকুমা দেখেন নাতনি সমুদ্রের ধারে ভেজা গায়ে পড়ে রয়েছে। আশপাশে কেউ কোত্থাও নেই। এবার তাঁর ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল। পরদিন সকালেই বাক্স- প্যাটরা বেঁধে বেন ও সিওর্শাকে নিয়ে চলে গেলেন শহরে তাঁর ছোট্টো ফ্ল্যাটে।

এদিকে সেল্কির খোঁজে বেরিয়েছে মাকার পোষা প্যাঁচারা, তাকে হাতে পেলেই আটক করে নিয়ে যাবে মাকার দরবারে। আর অন্যদিক থেকে তার সাহায্য চাইতে আসছে পরীরা। কিন্তু সিওর্শার নিজের শরীর ভাল নেই, গায়ের রং ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, মাথার চুল সাদা। সমুদ্রের জীবকে জলের থেকে দূরে নিয়ে গেলে যা হয়। বেন- এর ওপর পড়েছে তার বোনকে বাঁচাবার ভার। তার জন্য তাকে অনেক দূর যেতে হবে আর অনেক বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। সে কি তা পারবে?

ছবিটা দেখতে দেখতে একেক সময় বাকরুদ্ধ হয়ে পড়তে হয়। অপূর্ব সুন্দর অ্যানিমেশন। টম মুরের আগের ছবি 'দা সিক্রেট অফ কেলস'- এ এর আভাসমাত্র ছিল। কিন্তু এই ছবিটাতে তিনি তাঁর অ্যানিমেশনের বিশেষ ধরনটিকে মাজাঘষা করে একটা উন্নততর পর্যায় নিয়ে এসেছেন। তাঁর রঙের ব্যবহার, গল্পের গঠন, অ্যানিমেশনের গতি ও তার সাথে গান ও শব্দের মেলবন্ধন পুরো ছবিটাকে একটা সুপরিকল্পিত মিউজিকাল কম্পোজিশানের রূপ দিয়েছে। সংলাপ খুবই পরিমিত। মূলধারার অ্যানিমেটেড ছবিতে জোরালো আওয়াজ ও রঙের প্রাচুর্য- তার কোনটাই এতে নেই। তার ফলে ছবিটি খুবই স্নিগ্ধ লাগে, দেখে চোখের আরাম হয়। তার মানে কিন্তু এই ভেবে বোসো না যে এটা এমন খটমট একটা কিছু যে উইকিপিডিয়া খুলে রেখে না দেখলে কিছুই বোঝা যাবে না। গল্পটা সরল অথচ রোমাঞ্চকর আর তার সাথে আছে কেল্টিক উপকথার জাদু।

অতএব যত তাড়াতাড়ি পারো দেখে ফেল 'সং অফ দা সি' ও জানাও জয়ঢাককে কীরকম লাগল।

<u>কিছু তথ্যঃ</u>

পরিচালক- টম মুর

বছর- ২০১৪

ভাষা – ইংরিজি

সময় – ৯৩ মিনিট

রেটিং – বড় কারোর সঙ্গে দেখলে ভাল